ভারতের সংবিধান

প্রস্তাবনা

"আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্ররূপে গড়ে তুলতে এবং তার সকল নাগরিকই যাতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক, ন্যায়বিচার, চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার স্বাধীনতা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুনিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তাদের মধ্যে যাতে ভ্রাতৃত্বের ভাব গড়ে ওঠে তার জন্য সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করে, আমাদের গণপরিষদে আজ, ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর, এতদ্দ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ, বিধিবদ্ধ এবং নিজেদের অর্পণ করছি।"

মৌলিক কর্তব্য

(ভারতের সংবিধান, ধারা ৫১এ)

- সংবিধানের প্রতি আনুগত্য, সাংবিধানিক আদর্শ ও প্রতিষ্ঠান, জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সংগীত সম্পর্কে শ্রদ্ধাবোধ।
- মহৎ যেসব আদর্শ স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাদের উদ্‌বুদ্ধ করেছে তাদের লালন ও অনুসরণ।
- ভারতের সার্বভৌমত্ব, ঐক্য ও সংহতি রক্ষা।
- আহ্বান এলে দেশরক্ষা ও জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করা।
- ভাষা-ধর্ম-অঞ্চল-শ্রেণি নির্বিশেষে ভারতের জনগণের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্যচেতনা ও ভ্রাতৃত্ববোধ উদ্‌বোধন।
- দেশের মিশ্র সংস্কৃতির মূল্যবান উত্তরাধিকারের মাহাত্ম্য উপলব্ধি ও সংরক্ষণ।
- অরণ্য, হ্রদ, নদনদী, বন্যজীবনসহ প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষণ ও উন্নয়ন এবং প্রাণীজগতের প্রতি সহানুভূতি পোষণ।
- বিজ্ঞানমনস্কতা, মানবতাবাদ, অনুসন্ধান ও সংস্কারের বিকাশ।
- সরকারি সম্পত্তি রক্ষা করা ও হিংসা পরিহার করা।
- জাতি যাতে নিয়ত তার কর্মোদ্যম ও সাফল্যের উচ্চতর স্তরে পৌঁছোতে পারে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ও সমবেত প্রয়াসে উৎকর্ষের সেই লক্ষ্যে পৌঁছোনোর প্রচেষ্টা।
- পিতা-মাতা / অভিভাবকের দায়িত্ব ৬-১৪ বছর বয়স্ক শিশুদের শিক্ষার সুযোগের ব্যবস্থা করা।

শিক্ষা বিজ্ঞান

একাদশ শ্রেণির পাঠ্যবই

প্রস্তুতকরণ

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, ত্রিপুরা সরকার ।

© এস সি ই আর টি কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

এই বইয়ের সমস্ত স্বত্ব একমাত্র SCERT, Govt. of Tripura এর। লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইয়ের কোন অংশই প্রতিলিপি বা পুনরুৎপাদন করা যাবে না।

প্রথম প্রকাশ - জুন, ২০১৯

পুনর্মুদ্রণ : মার্চ, ২০২০

প্রচ্ছদ

এস সি ই আর টি।

অক্ষর বিন্যাস

শ্রী সমীরণ দেবনাথ, শিক্ষক

শ্রী লক্ষণ দেবনাথ, শিক্ষক

মুদ্রক

সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড,
১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২

মূল্য

১৩৫ টাকা মাত্র।

প্রকাশক

অধিকর্তা

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, ত্রিপুরা।

ভূমিকা

২০০৬ সাল থেকে রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকের মুদ্রণ ও প্রকাশের দায়িত্ব পালন করে আসছে।

রাজ্যের বিদ্যালয়স্তরে উন্নত ও সমৃদ্ধতর পাঠ্যক্রম চালু করার লক্ষ্যে ত্রিপুরা রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের প্রচেষ্টায় প্রথম থেকে অষ্টম, নবম ও একাদশ শ্রেণির জন্য ২০১৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের (এন সি ই আর টি) পাঠ্যপুস্তকসমূহ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বাংলা বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়গুলোর জন্য জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের প্রকাশিত পুস্তকগুলোর অনূদিত ও অভিযোজিত সংস্করণ ২০১৯ সালে প্রথম প্রকাশ করা হয় এবং এ বছর ওইসব পুস্তকগুলোর পুনর্মুদ্রণ করা হল। পাশাপাশি দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির বাংলা বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়গুলোর জন্য জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের প্রকাশিত পুস্তকগুলোর অনূদিত ও অভিযোজিত সংস্করণ ২০২০ শিক্ষাবর্ষে প্রথম প্রকাশ করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলা বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনার দায়িত্বও রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ পালন করে আসছে।

বিশাল এই কর্মকাণ্ডে যেসব শিক্ষক-শিক্ষিকা, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, শিক্ষাবিদ, অনুবাদক, অনুলেখক, মুদ্রণকর্মী ও শিল্পীরা আমাদের সঙ্গো থেকে নিরলসভাবে অক্লান্ত পরিশ্রমে এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত করেছেন তাদের সবাইকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রকাশিত এই পাঠ্যপুস্তকটির উৎকর্ষ ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য শিক্ষানুরাগী ও গুণীজনের মতামত ও পরামর্শ বিবেচিত হবে।

উত্তম কুমার চাকমা
অধিকর্তা
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ
ত্রিপুরা।

আগরতলা
মার্চ, ২০২০

CONTENT DEVELOPER

উপদেষ্টামণ্ডলী

ড. শম্ভুনাথ রক্ষিত

অধ্যাপক প্রত্যুষ রঞ্জন দেব

প্রথম অধ্যায় : শিক্ষা প্রক্রিয়ার ধারণা

ড. শান্তা দত্ত/ ড. দেবব্রত ভট্টাচার্য্য

দ্বিতীয় অধ্যায় : শিক্ষার প্রকারভেদ এবং শিক্ষার সংস্থাসমূহ

ড. ভবানী মোদক / শ্রীমতি মিত্রা আচার্য্য

তৃতীয় অধ্যায় : শিক্ষা ও সমাজ

ড. শান্তা দত্ত / ড. দেবব্রত ভট্টাচার্য্য

চতুর্থ অধ্যায় : প্রাচীনযুগ, মধ্যযুগ এবং প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে ভারতের শিক্ষা

শ্রীমতি মল্লিকা দাস / ড. নিবাস চন্দ্র শীল

পঞ্চম অধ্যায় : স্বাধীনোত্তর ভারতের শিক্ষা

ড. ভবানী মোদক / ড. শান্তা দত্ত / ড. দীপঙ্কর বিশ্বাস

ষষ্ঠ অধ্যায় : মহান ভারতীয় শিক্ষাবিদগণ

শ্রী প্রবীর ভৌমিক

সপ্তম অধ্যায় : মনোবিদ্যা ও শিক্ষা

শ্রীমতি চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায়

অষ্টম অধ্যায় : শিক্ষায় মূল্যায়ন

শ্রীমতি দীপিকা মুখোপাধ্যায় / শ্রীমতি মমতা ভট্টাচার্য্য / ড. দীপঙ্কর পাল / ড. দেবব্রত ভট্টাচার্য্য

প্রতিটি অধ্যায়ের অনুশীলনী প্রশ্ন তৈরি করেছেন ড: শান্তা দত্ত এবং ড: দেবব্রত ভট্টাচার্য্য।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : শিক্ষা প্রক্রিয়ার ধারণা পৃ: ১—৬৬

দ্বিতীয় অধ্যায় : শিক্ষার প্রকারভেদ এবং শিক্ষার সংস্থাসমূহ পৃ: ৬৭—১১৪

তৃতীয় অধ্যায় : শিক্ষা ও সমাজ পৃ: ১১৫—১৬২

চতুর্থ অধ্যায় : প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ এবং প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে ভারতের শিক্ষা পৃ: ১৬৩—২০৫

পঞ্চম অধ্যায় : স্বাধীনোত্তর ভারতের শিক্ষা পৃ: ২০৬—২৭৫

ষষ্ঠ অধ্যায় : মহান ভারতীয় শিক্ষাবিদগণ পৃ: ২৭৬—৩১৩

সপ্তম অধ্যায় : মনোবিদ্যা ও শিক্ষা পৃ: ৩১৪—৩৭৪

অষ্টম অধ্যায় : শিক্ষায় মূল্যায়ন পৃ: ৩৭৫—৪১৩

প্রাক্-কথন

শিক্ষা আমাদের সভ্যতার মূল চালিকা শক্তি। সভ্যতা যতই এগিয়েছে ততই উন্মেষ ঘটেছে নতুন নতুন জ্ঞান-ক্ষেত্রে। সভ্যতার নিয়ম মেনেই তৈরি হয়েছে সংকটের নতুনতর পটভূমির জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে নতুনতর পরিস্থিতির সঙ্গে সার্থক সংগতি সাধনের বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে সর্বাধিক। অতীতের জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে আহরিত অভিজ্ঞতা আর বর্তমানের জ্ঞান-ক্ষেত্র থেকে অর্জিত তত্ত্ব ও তথ্যের মিশেলে আমাদের আচরণ ধারায় পরিবর্তন আসে এই সংগতি সাধনের প্রশ্নেই। আর এই পরিপ্রেক্ষিতেই শিক্ষা শাস্ত্র বা শিক্ষা বিজ্ঞান (Education) আমাদের শিক্ষার পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্তির দাবি রাখে।

আমাদের জীবন বিকাশের বিভিন্ন স্তর সমূহ সম্পর্কে যথাযথ ধারণা লাভ করা যেমন আবশ্যক তেমনি অপরিহার্য আমাদের সংগতি সাধন ও সামাজিকীকরণের পদ্ধতি ও প্রকরণ সম্পর্কে অবহিত হওয়া। নিরবচ্ছিন্ন বিকাশ ও অগ্রগমনের লক্ষ্যে আমরা কী শিখব, কেন শিখব এবং কীভাবে শিখব তার সামগ্রিক ধারণা অর্জনও আবশ্যক। আর এই ধারণা অর্জনের প্রক্রিয়াকে সমৃদ্ধতর করে তুলতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ঐতিহাসিক অনুশীলনও জরুরি। এরই পাশাপাশি শিক্ষা প্রক্রিয়ার পদ্ধতি প্রকরণ নিয়ে যাঁরা তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছেন, সমাজ উন্নয়ন ও সমাজ পরিবর্তনে যাঁরা শিক্ষা প্রক্রিয়াকে মূল চালিকা শক্তি হিসেবে ব্যবহার করেছেন, তাঁদের জীবন এবং শিক্ষামূলক অবদান সম্পর্কে সম্যকরূপে জ্ঞাত হওয়াও সবিশেষ প্রয়োজনীয়। শিক্ষাকে সামাজিক প্রক্রিয়া হিসেবে উপলব্ধি করতে শেখা, ব্যক্তি জীবন ও সমাজ জীবনের কল্যাণ সাধনে শিখন ও শিক্ষণের প্রক্রিয়াজাত ফলশ্রুতির মূল্যায়ণে সমর্থ হওয়াও বিশেষভাবে জরুরি।

বর্তমান 'শিক্ষা বিজ্ঞান' গ্রন্থে শিক্ষা, শিখন ও শিক্ষণের এই ব্যাপক পরিসরকে পরিমিত প্রকাশ ক্ষেত্রে তুলে ধরা হয়েছে। বিষয়বস্তুর মূল ভাবনাকে শিক্ষার্থীদের সীমায়িত করা হয়েছে। অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে তত্ত্ব ও তথ্যের বিবিধ বিন্যাস। পাঠ্যসূচির বিষয় বিন্যাসে শিক্ষার্থীদের মন ও মনন যাতে স্বতঃস্ফূর্ত ও সাবলীলভাবে সঞ্চালিত হতে পারে তারও এক নিবিড় প্রচেষ্টা সংযোজিত হয়েছে এই গ্রন্থে।

ড. শম্ভুনাথ রক্ষিত

অধ্যাপক প্রত্যুষ রঞ্জন দেব

প্রথম অধ্যায় : শিক্ষা প্রক্রিয়ার ধারণা

- প্রথম একক : শিক্ষার অর্থ, ধারণা, প্রকৃতি
- দ্বিতীয় একক : শিক্ষার কাজ, পরিধি
- তৃতীয় একক : শিক্ষার উপাদান
- চতুর্থ একক : শিক্ষার লক্ষ্য
- পঞ্চম একক : শিক্ষার প্রক্রিয়া এবং শিক্ষার ভিত্তি

প্রথম একক শিক্ষার অর্থ, ধারণা ও প্রকৃতি

উদ্দেশ্য :

- *শিক্ষার্থীরা শিক্ষার অর্থ, ধারণা, প্রকৃতি সম্পর্কে বিস্তৃত ধারণা লাভ করতে পারবে।*
- *শিক্ষার্থীরা শিক্ষার কাজ, শিক্ষার পরিধি সম্পর্কে অবগত হতে পারবে।*
- *শিক্ষার্থীরা বিধিমুক্ত শিক্ষা, বিধিবদ্ধ শিক্ষা, অবিধিবদ্ধ শিক্ষা সম্পর্কে জানতে পারবে।*
- *শিক্ষার্থীরা শিক্ষনের মৌলিক নীতি, পাঠ্যক্রম নির্ধারনের মূলনীতি, পাঠ্যক্রম গঠনের বিবেচ্য বিষয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজ, শিক্ষার উপাদানগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক, গতানুগতিক পাঠ্যক্রম ও আধুনিক পাঠ্যক্রম ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে অবগত হতে পারবে।*
- *শিক্ষার্থীরা শিক্ষার লক্ষ্য, শিক্ষার লক্ষ্যের প্রয়োজনীয়তা, শিক্ষার্থীরা শিক্ষার বিভিন্ন লক্ষ্যের গুরুত্ব ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে জানতে পারবে।*

প্রাককথন : বর্তমান সময়, অতীত সময়, ভবিষ্যত সময় — এই তিনটি সময়ের স্রোতের সাথে বহমান অনেককিছু তার মধ্যে মানুষ অন্যতম। মানুষ অতীতেও ছিল, বর্তমানেও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে (অতি বিপর্যয় না ঘটলে)। মানব সমাজের বিবর্তন সময়ের সাথে সাথে হয়েছে এবং ক্রম:বিবর্তনের প্রবাহে মানুষের মধ্যে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। ধরা যাক, বর্তমানের কোন একজন মানুষ অতীত সময়ে যদি পৌঁছতে পারত বা অতীত সময়ের একজন মানুষ যদি বর্তমান সময়ে পৌঁছতে পারত তাহলে সময়ের পরিবর্তন ও ক্রমবিবর্তনকে উপলব্ধি করতে পারত।

অতীত সময়ের জীবন ছিল অতি সহজ সরল এবং মূলক প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। জনসংখ্যাও ছিল প্রভূত পরিমাণে কম। খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান এই তিনটি বিষয়ের প্রয়োজন সম্পন্ন করাই ছিল একটি প্রাথ্যমিক লক্ষ। ইংল্যাণ্ডে শিল্পবিপ্লবের পূর্ব অবধি মানুষ কায়িক কর্মেই জোর দিত। কিন্তু শিল্প বিপ্লবের ফলশ্রুতিতে মানুষের জীবনধারার আমূল পরিবর্তন হওয়া শুরু হল। ধীরে ধীরে প্রকৃতি নির্ভর সমাজ থেকে মানুষ যান্ত্রিক সমাজের দিকে নিজের অজান্তেই ধাবমান হল। সময়ের সাথে সাথে চিকিৎসা ব্যবস্থা উন্নত হল, ফলে মানুষের আয়ু এবং পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া শুরু হল। উন্নত খাদ্যাভ্যাস, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিজ্ঞান নির্ভরতা মানুষকে আক্ষরিক অর্থে পৃথিবীর নিয়ন্ত্রক হতে সহায়তা করল। ফলে জীবনের ধারা ও অতীতের ন্যায় সহজ সরল রইল না বরং জীবন হয়ে উঠল অত্যন্ত জটিল ও সুসংগঠিত। সময়ের সাথে সাথে তাল মিলিয়ে জনসংখ্যা অতিদ্রুত হারে বৃদ্ধি পাওয়া শুরু হল। ফলে খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের জন্য শুরু হল এক অসম লড়াই। অতীতে যেখানে সমগ্র পৃথিবী মানুষের বসবাসের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণের চাইতেও বেশি ছিল, বর্তমানে মানুষ বিকল্প গ্রহের সন্ধানে এগিয়ে চলেছে ভবিষ্যতে বসবাসের জন্য কারণ এই পৃথিবীর স্থান মানুষের বসবাসেরজন্য আর পর্যাপ্ত বলে মনে হচ্ছে না।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে একটি বিষয় উপলব্ধি করার মত তা হল মানুষের বিবর্তন সময়ের সাথে সাথে হয়েছে এবং তা হয়েছে বহুদিকে যার মধ্যে জৈবিক বিবর্তন ও সামাজিক বিবর্তন অন্যতম। বর্তমান সমাজ মানুষকে ভোগসর্বস্ব যান্ত্রিক সভ্যতার দিকে নিয়ে এসেছে এবং এখানে বেঁচে থাকতে হলে প্রয়োজন কিছু কৌশল বা দক্ষতার। অর্থাৎ মানুষকে হতে হবে 'Techno-centric' নতুবা বর্তমান বিশ্বে

তার বসবাস অসম্ভব। বর্তমানে বিশ্বে একজন মানুষ যদি নিজেকে টিকিয়ে রাখতে চায় তবে তাকে বর্তমান সময়ে প্রচলিত বিষয়ের সাথে যুক্ত থাকতে হবে এবং সেই সমস্ত বিষয়ে উপযুক্ত জ্ঞান লাভ করতে হবে। তাই বর্তমান মানুষ জ্ঞান অর্জনের আশায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হচ্ছে সেখানে নির্দিষ্ট একটা অর্থের বিনিময়ে একটা নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে দক্ষ করে তোলার প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। ফলে মানুষ হয়ে উঠেছে 'Materialistic' বা বস্তুবাদী।

যদি সময়ের হাত ধরে অতীতে যাওয়া যায় তবে লক্ষ করা যাবে মানুষে মানুষে নিবিড়তা সখ্যতা অনেক বেশি ছিল। মানুষ আগুন ও চাকা আবিষ্কার, চাষাবাদ ও পশুপালন ইত্যাদির পর সুসংগঠিত ভাবে থাকার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা শুরু করল। এই সুসংগঠিত হবার তাগিদ মানুষকে কিছু শৃঙ্খলায় আনা শুরু করল। মানুষ তার প্রচলিত ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-ভাবনা, জ্ঞান-বিশ্বাস, যুক্তি-তর্ক, সংস্কৃতি ইত্যাদি সংরক্ষণ করার চিন্তা ভাবনা শুরু করল। ফলে শুরু হল সামাজিক বিবর্তনের এক নতুন পথ চলা। মানুষ তার প্রচেষ্টা ও ভুলের মধ্য দিয়ে জ্ঞান অর্জন প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে লাগল। ধীরে ধীরে মানুষের জীবনযাত্রার প্রণালী জটিল হওয়া শুরু হল। বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল তাই ধীরে ধীরে অনিয়ন্ত্রতা থেকে নিয়ন্ত্রতা সমাজে বৃদ্ধি পেল।

মানুষ অতীতে প্রকৃতি নির্ভর বিভিন্ন বিমূর্ত বিষয়ের থেকে সরে আসা শুরু করল এবং স্বয়ংসম্পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়ে বিভিন্ন মূর্ত বিষয়ের উপর জোর প্রদান শুরু করল তাই মানুষ আধ্যাত্মিকবাদ থেকে বস্তুবাদী বা পদার্থ এ পরিগণিত হয়ে উঠল সময়ের হাত ধরে।

শিক্ষার অর্থ : সময়ের বিবর্তনের সাথে মানুষের অগ্রগতিকে লক্ষ করলে মূলত দুধরণের অগ্রগতি লক্ষ করা যায়— বস্তুগত (Material) এবং ভাবগত (Intellectual).

বস্তুগত উন্নয়ন বলতে বোঝায় বিজ্ঞান, আবিষ্কার, উদ্ভাবন ইত্যাদি আর ভাবগত উন্নয়ন বলতে বোঝায় দর্শন, সাহিত্য, চারুকলা ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে ইহা বলা বাঞ্ছনীয় যে এই ধরণের অগ্রগতিই শিক্ষার উপর নির্ভরশীল, কারণ শিক্ষা হল সকল প্রকার উন্নতির একমাত্র উৎস।

'শিক্ষা' শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ বিশ্লেষণ করলে জানা যায় মানুষের জ্ঞান অর্জনের ক্ষমতা বা অভিজ্ঞতা লাভের কৌশলকে নিয়ন্ত্রিত করা, 'শিক্ষা' শব্দটি সংস্কৃত 'শিক্ষ' ধাতু থেকে এসেছে। যার মূলগত অর্থ হল শৃঙ্খলিত করা বা নিয়ন্ত্রিত করা বা নির্দেশনা দেওয়া। বাংলা ভাষায় 'শিক্ষা' শব্দের সমার্থক হিসাবে 'বিদ্যা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। 'বিদ্যা' শব্দটি সংস্কৃত 'বিদ্' ধাতু থেকে এসেছে। 'বিদ্' শব্দটির অর্থ হল 'জ্ঞান অর্জন করা' বা 'জানা', এক্ষেত্রে 'বিদ্যা' এর অর্থ হয়েছে কোনো কিছু সম্পর্কে জ্ঞান বা কৌশল আয়ত্ত করা। ইংরেজি শব্দটি 'Education' শব্দটির বুৎপত্তি নির্ণয়ে চারটি Latin শব্দকে বিবেচনা করা হয়।

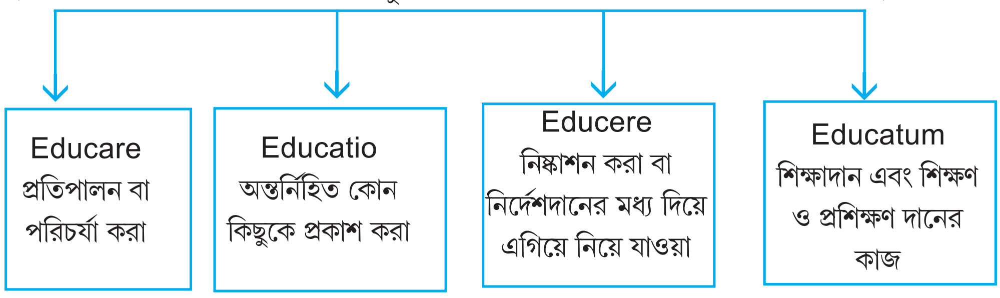

'শিক্ষা' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত বিষয়কে নির্যাস করে বলা যায় যে শিক্ষা হল—

- শিক্ষার্থীদের সঠিক পরিচর্যার ব্যবস্থা।
- শিক্ষার্থীদের অন্তর্নিহিত বিষয়কে প্রকাশ করা।
- শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত ক্ষমতা নিষ্কাশন করা এবং সঠিক নির্দেশদানের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়া।
- উপযুক্ত শিক্ষাদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিক্ষিত করে তোলা।

বিভিন্ন দর্শন অনুযায়ী শিক্ষা ঃ—

ভাববাদীদের মতে : আত্মোপলব্ধিই হল শিক্ষা, ভক্তি ও কর্মের দ্বারা এই আত্মোপলব্ধি সম্ভব হয়।
বস্তুবাদীদের মতে : শিক্ষা হল বস্তুনিষ্ঠ তথ্য যা শিক্ষার্থী বা ব্যক্তি অর্জন করে।
প্রকৃতিবাদীদের মতে : শিশুকে তার নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী সর্বাঙ্গীন বিকাশে সাহায্য করাই হল শিক্ষা।
প্রয়োগবাদীদের মতে : মানুষের অভিজ্ঞতার অবিরাম পুনর্গঠনের মাধ্যমে সামাজিক পটভূমিকায় ব্যক্তিনৈপুণ্য বৃদ্ধিই হল শিক্ষা।
ঋকবেদের মতে : শিক্ষা হল এমন এক প্রক্রিয়া যা মানুষকে আত্মবিশ্বাসী ও আত্মত্যাগী হতে উদ্বুদ্ধ করে।

প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাবিদদের মতে শিক্ষা :—

শঙ্করাচার্যের মতে : আত্মোপলব্ধির উপায় শিক্ষা।
(Shankaracharya : Education in the realization of self.)
কৌটিল্যের মতে : দেশমাতৃকার জন্য প্রশিক্ষণ ও জাতির প্রতি প্রীতি।
(Kautilya : Education means training of the country and love of the nation)
উপনিষদের মতে : শিক্ষা হল এমন কিছু যার অন্তিম পরিণতি মোক্ষলাভ (সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে)।
শ্রীমৎভাগবদ্‌গীতা-এর মতে: প্রজ্ঞা হল এমন এক বিষয় যার থেকে বিশুদ্ধকারী বিষয় পৃথিবীতে আর নেই।

আধুনিক ভারতীয় শিক্ষাবিদ্‌দের মতে শিক্ষা :

স্বামী বিবেকানন্দের মতে: শিক্ষা হল ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ।
(Swami Vivekananda : Education in the manifestation of the divine perfection, already existing in man.)
মহাত্মা গান্ধির মতে: শিক্ষা মানুষের দেহ, মন এবং আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটায়।
(Mahatma Gandhi : By education, I mean an all-round drawing out of the best in the child and man body, mind and spirit).
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে: শিক্ষা হল এমন একটি প্রশস্ত পথ যার দ্বারা সমস্ত সমস্যার সমাধান সম্ভব।
(Rabindranath Tagore : The widest road leading to the soultion of all our problem in education).
ঋষি অরবিন্দের মতে: শিক্ষা হল এমন একটি বিষয় যা মানুষকে স্বর্গীয় পথে উন্নীত করার পথ দেখায়, পথ দেখায় স্বদেশ, নিজের জন্য ও অন্যদের জন্য বাঁচতে শিখায়।

(Rishi Aurobindo : Education which will offer the tools whereby one can live for the divine, for the country, for overself and for others and this must be the ideal of every school which calls itseff national).

প্রাচীন পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদ্‌দের মতে :

অ্যারিস্টটল-এর মতে: সুস্থ দেহ সুস্থ মনের সৃষ্টিই হল শিক্ষা। এটি মানুষের মধ্যে এমন এক সত্তার আবির্ভাব ঘটায় যার দ্বারা মানুষ বিস্ময়কর শাশ্বত সত্য, মহত্ত্ব এবং সুন্দরের আরাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করতে সমর্থ হয়।

(Aristotle : Education is the creation of a sound mind in a sound body. It develops man's faculty, especially his mind so that he may be able to enjoy the contemplation of supreme truth, goodness and beauty of which perfect happiness essentially consists).

প্লেটোর মতে : শিক্ষা হল এমন একটি ধারণাশক্তি যা সঠিক মুহূর্তে আনন্দ ও বেদনা অনুভবে সাহায্য করে। এটি দেহ ও মনের সৌন্দর্য ও অন্তর্নিহিত পূর্ণতাকে বিকশিত করে।

(Plato : Education is the capacity to feel pleasure and pain at the right moment. It develops in the body and in the soul of the pupil all the beauty and all the perfection which he is capable of).

কমেনিয়াস এর মতে: পৃথিবীতে যারা মানুষ হিসাবে জন্ম নিয়েছে তাদের শিক্ষার প্রয়োজন। কারণ শিক্ষা হল এমন কিছু যা তাদের প্রকৃত হয়ে উঠতে সাহায্য করে। শিক্ষা ছাড়া তারা বন্যপ্রাণী, বুদ্ধিহীন পশু বা বন্য ঝোপের পর্যায়ে থেকে যাবে।

(Comenius : All who are born as human beings need education because they are destived to be real men, not wild beast, dull animals, and clumps of wood).

আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদ্‌দের মতে :

রুশোর মতে : মানুষের শিক্ষা শুরু হয় তার জন্মের সময় থেকেই, তার কথা বলার পূর্ব থেকেই। তার উপলব্ধি করার পূর্বে থেকেই যে তাকে নির্দেশদান করা হচ্ছে। অভিজ্ঞতা সঠিক তার অগ্রদূত হিসাবে পরিগণিত হয়।

(Rousseau : Education of man commences at his birth, before he can speak, before he can understand he is already instructed. Experience is the for runner of the perfect).

পেস্তালৎসীর মতে : শিক্ষা হল মানুষের সহজাত ক্ষমতাগুলোর স্বাভাবিক, সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং ক্রমন্বয়মূলক বিকাশ।

(Pestalozzi : Education is the natural, harmonious and prograsive development of man's innate powers).

ফ্রেডারিক ফ্রয়েবেলের মতে শিক্ষা হল বিকাশের প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যক্তি প্রকৃতির রাজ্যে নিজের বিস্তৃতি ঘটায় ও মনুষ্য সমাজের সঙ্গে নিজের সত্তাকে একীভূত করে।
(Friedrich Froevel : It is development by which mans life broadens until it has related it self to nature, until it participates in the achievement of the race and aspiration of humanity).

উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় শিক্ষা হল —

- আত্মউপলব্ধির উপায়।
- দেশমাতৃকার জন্য প্রশিক্ষণ।
- সৎচরিত্রবাণ হওয়া।
- আত্মবিশ্বাসী ও আত্মত্যাগীতে উদ্বুদ্ধ হওয়া।
- সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে
- পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিশুদ্ধকারী বিষয়।
- অন্তর্নিহিত সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ।
- দেহ-মন ও আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশ।
- সমস্ত সমস্যা সমাধান করার উপায়।
- সুস্থ দেহে সুস্থ মনের সৃষ্টি।
- সহজাত ক্ষমতাগুলোর স্বাভাবিক ও ক্রমোন্নয়নমূলক বিকাশ।

নমনীয়তা বা Plasticity হল এমন একটি বিষয় যা শিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য কারণ শিক্ষা শুধুমাত্র ব্যক্তির অগ্রগতি করেনি করেছে সমাজের অগ্রগতিও তাই শিক্ষার অর্থ সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত হয়েছে। তাই যে কোনো একটি নির্দিষ্ট সংজ্ঞার দ্বারা শিক্ষার প্রকৃত অর্থকে ব্যাখ্যা করা যায় না। 'শিক্ষা'র সত্যিকারের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক এবং 'শিক্ষা' সংকীর্ণ অর্থে সীমাবদ্ধ করা যায় না।

শিক্ষার ধারণা : সমাজ গতিশীল। গতিশীলতার আবহে সমাজ পরিবর্তনের ধারাবাহিকতার বজায় রেখেছে। জনসংখ্যা বিস্ফোরণ বা Population Explosion বা জ্ঞানের বিস্ফোরণ বা Explotion of Knowledge সমাজে মূল দুটি শ্রেণি চিহ্নিত করেছে যথাক্রমে শিক্ষিত এবং নিরক্ষর। শিক্ষিত ব্যক্তি হল সেই সমস্ত ব্যক্তি যারা বিধিবদ্ধভাবে শিক্ষা লাভ করেছে এবং নিরক্ষর হল সেই সমস্ত ব্যক্তিগণ যারা বিধিবদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষালাভ করেন নি। সেই সমস্ত ব্যক্তি হয়ত অবিধিবদ্ধভাবে শিক্ষাগ্রহণ করেছেন। (Acquired Education in Informal Mode).

শিক্ষার মূল তিনটি ধারা

অবিধিবদ্ধ শিক্ষা (*Informal* Education)	*বিধিবদ্ধ শিক্ষা* (*Formal* Educaiton)	*বিধিমুক্ত শিক্ষা* (*Non-formal* Education)

শিক্ষায় মূল চারটি উপাদান যথাক্রমে —

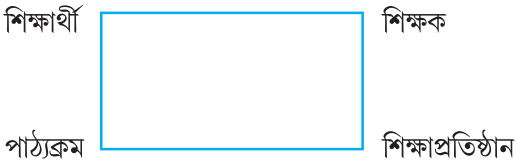

— এরা নিবিড়ভাবে যুক্ত বিধিবদ্ধ শিক্ষায় এবং অবিধিবদ্ধ শিক্ষায় এরা সুনির্দিষ্ট নয়, আবার বিধিমুক্ত শিক্ষায় এদের সম্পর্ক অনেকটাই নমনীয় এই প্রসঙ্গে এবিষয়টি স্মরণে রাখতে হবে যে বিধিবদ্ধ শিক্ষায় স্বল্প হলেও শিক্ষিত হতে হবে বিধিবদ্ধ শিক্ষায় প্রবেশের জন্য এবং কেউ সরাসরি অবিধিবদ্ধ শিক্ষা থেকে সরাসরি বিধিমুক্ত শিক্ষায় প্রবেশ করতে পারবে না। বিধিবদ্ধ শিক্ষা ও বিধিমুক্ত শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিক কোর্স সম্পন্ন করার পর সার্টিফিকেট প্রাপ্তির সাথে জড়িত কিন্তু অবিধিবদ্ধ শিক্ষায় এসমস্ত বিষয় অপ্রসাঙ্গিক। শিক্ষার এই ত্রিবিধ ধারার উপর ভিত্তি করেই শিক্ষার মূল দুপ্রকারের ধারণার উৎপত্তি —

ক) সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা। খ) ব্যাপক অর্থে শিক্ষা।

ক) সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা:

- সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা হল জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জন।
- সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা হল পাঠ্যপুস্তককেন্দ্রিক জ্ঞান আহরণের মাধ্যমে সীমাবদ্ধ।
- সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা হল কিছু তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতা অর্জন করা।
- সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা বিদ্যালয়ের চার দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং শিক্ষা সম্পূর্ণ অর্থেই পুস্তককেন্দ্রিক।
- সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা সার্টিফিকেট প্রাপ্তির সাথে সাথে সমাপ্ত হয়।
- সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা একটি নির্দিষ্ট সময় ও শিক্ষাবর্ষের মধ্যে সমাপ্ত করতে হয়।
- প্রতিটি শিক্ষার্থীর মধ্যে যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য রয়েছে তা সংকীর্ণ অর্থের শিক্ষায় মানা হয় না। প্রতিটি শিক্ষার্থীর মধ্যে মনোযোগ স্মৃতি, চিন্তন, প্রেষণা, সৃজনক্ষমতা ইত্যাদি বিষয়কে উপেক্ষা করা হয়।
- সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষার লক্ষ্য সীমাবদ্ধ। শিক্ষার লক্ষ্য কোর্স সম্পন্ন করা।
- শিক্ষা সংকীর্ণ অর্থে অপরিবর্তনীয়। এই অর্থে শিক্ষা হল কোন বিষয়ে অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান অর্জন করা।
- শিক্ষক/শিক্ষিকা তার অর্জিত জ্ঞান এর ভাণ্ডার থেকে শিক্ষার্থীর শূন্য জ্ঞানের ভাণ্ডার পূর্ণ করার প্রয়াস করেন। তাই শিক্ষক/শিক্ষিকা ও শিক্ষকের সম্পর্ক এখানে দাতা ও গ্রহীতার।
- এই অর্থে শিক্ষা মূলত স্মৃতি নির্ভর এবং স্মৃতির উপর এই প্রকারের শিক্ষা জোর দেয়।
- এই অর্থে শিক্ষা হল ডিগ্রিলাভের একটি প্রক্রিয়া।

খ) ব্যাপক অর্থে শিক্ষা :

- ব্যাপক অর্থে শিক্ষা হল জীবনব্যাপী। জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি চলতে থাকে।
- শিক্ষা এখানে পুঁথিগত নয়।
- শিক্ষা চার দেওয়ালে আবদ্ধ নয়।
- শিক্ষা হল শিশুর সমস্ত ক্ষমতার পরিপূর্ণ বিকাশ।
- শিক্ষা হল ব্যবহারিক জ্ঞানের সমন্বয়।
- শিক্ষা হল সক্রিয়তাভিত্তিক কৌশল আয়ত্তকরণ।
- শিক্ষা শিক্ষকের উপর নির্ভরশীল নয়।
- শিক্ষা হল ক্রমবিকাশমূলক প্রক্রিয়া যা শিশুর অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাগুলোর বিকাশে সহায়তা করা।
- শিক্ষা শিশুকে প্রাকৃতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সব ধরনের পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গো অভিযোজনে সাহায্য করে।
- যেহেতু শিশু বিভিন্ন সমস্যা নিজে সমাধান করে তাই সে অনেক বাস্তব অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয় এবং শিখন স্থায়ী হয়।

শিক্ষার সংকীর্ণ অর্থ ও ব্যাপক অর্থের মধ্যে পার্থক্য

শিক্ষার এই দুই প্রকার অর্থের মূল পার্থক্যগুলো নিম্নে বর্ণিত হল —

বিষয়	শিক্ষার সংকীর্ণ অর্থ	শিক্ষার ব্যাপক অর্থ
সংজ্ঞা	যে শিক্ষা দ্বারা কিছু জ্ঞান, দক্ষতা বা কৌশল আয়ত্ত করা কোন শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে তাকে শিক্ষার সংকীর্ণ অর্থ বলা হয়।	যে শিক্ষা শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ ঘটায় তাকে শিক্ষার ব্যাপক অর্থ বলা হয়।
পাঠ্যক্রম	পাঠ্যক্রম সুনির্দিষ্ট করা থাকে, কোন শ্রেণিতে কি বিষয়বস্তু পড়ানো হবে।	পাঠ্যক্রম সুনির্দিষ্ট নয় বরং বহুমুখী যা জীবনে প্রতিদিন চলার জন্য উপযোগী।
লক্ষ্য	জীবনধারণের জন্য কিছু সময় উপযোগী দক্ষতা বা জ্ঞান অর্জন করা যা বাধ্যবাধকতামূলক	স্বত:স্ফুর্তভাবে শিশুর সুপ্ত সম্ভাবনাগুলোর বিকাশ ঘটানো।

সংস্থা	বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যেমন-বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি।	নির্দিষ্ট কোন সংস্থা নেই। সমগ্র বিশ্ব শিক্ষার সংস্থা।
সময়সীমা	প্রতিটি শিক্ষাবর্ষের ও কোর্সের জন্য সময়সীমা ধার্য্য করা থাকে।	শিক্ষা এখানে নির্দিষ্ট কোন সময়সীমার উপর ধার্য্য করা থাকে না কারণ এখানে কোর্স এর বিষয়টি অবান্তর।
শিক্ষকের ভূমিকা	শিক্ষক/শিক্ষিকার ভূমিকা হল নির্দিষ্ট সিলেবাস অনুযায়ী বিষয়বস্তু নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করানো।	যেহেতু কে শিক্ষক/শিক্ষিকা তা সুনির্দিষ্ট নয়। তাই তাদের ভূমিকাও সুচিহ্নিত নয়।
শিক্ষার্থীর ভূমিকা	শিক্ষার্থীর ভূমিকা এখানে নিষ্ক্রিয়। সে শিক্ষক/শিক্ষিকার উপর নির্ভরশীল।	শিক্ষার্থীর ভূমিকা এখানে সক্রিয় কারণ নির্দিষ্ট করে শিক্ষার্থীরা চিহ্নিত নয়।
মূল্যায়ণ	মূল্যায়ণ সারা বৎসরব্যাপী এবং বৎসরের শেষে হয়ে থাকে। মূল্যায়ণকারী হিসেবে শিক্ষক/শিক্ষিকা রয়েছেন।	মূল্যায়ণ করার দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে কারোর উপর নেই।
প্রক্রিয়া	প্রক্রিয়া অত্যন্ত নির্দিষ্ট। সার্টিফিকেট প্রাপ্তি কোর্স লাভের পরে ঘটে থাকে। কি শিখতে পারল তা এখানে মূখ্য নয়।	সার্টিফিকেট প্রাপ্তি ও কোর্স এর বিষয় এখানে অবান্তর। কি শিখতে হবে তাই এখানে মূখ্য।
নমনীয়তা	অত্যন্ত অনমনীয়। নির্দিষ্ট শিক্ষাবর্ষে পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্তু পরিবর্তন করা যায় না।	সততই পরিবর্তনশীল কারণ নির্দিষ্ট কোন বিষয়বস্তু নেই।
শৃঙ্ক্ষলা	শৃঙ্খলা এখানে আরোপিত এবং শৃঙ্খলা মানতে বিভিন্ন ভাবে বাধ্য করা হয়।	শৃঙ্খলা এখানে স্বত:স্ফুর্ত এবং মানতে বাধ্য করা হয় না।
যান্ত্রিকতা	শিক্ষা এখানে একমুখী অর্থাৎ ডিগ্রি বা কোর্স সম্পন্ন করে সার্টিফিকেট লাভ করা।	শিক্ষা এখানে বহুমুখী এবং জীবনের প্রয়োজনে শিক্ষা লাভ করা হয় ।
শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাত	শিক্ষক শিক্ষার্থী অনুপাত মানার সুনির্দিষ্ট করা থাকে বিভিন্ন কোর্স ভেদে।	এই ধরনের কোন বিষয় এখানে স্থান পায় না কারণ এখানে শিক্ষা হচ্ছে মূখ্য অনুপাত নয়।
মান	মূলত পরিমাণগত শিক্ষার উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়।	মূলত পরিমাণগত ও গুণগত শিক্ষার উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

শিক্ষার মূল দুটি অর্থ সম্পর্কে অবগত হওয়া গেল অর্থাৎ শিক্ষার সংকীর্ণ অর্থ এবং ব্যাপক অর্থ। কোন প্রকারের শিক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ সে প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে জানা দরকার জীবনে বেঁচে থাকতে হলে কোন বৃত্তি বা পেশা নির্বাচন করতে হয় এবং সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা সেই দিকটি সুনিশ্চিত করে কারণ চাকুরীর জন্য যদি যোগ্যতা নিরূপিত হয় মাধ্যমিক/উচ্চমাধ্যমিক/স্নাতক ইত্যাদি তবে সেই শর্ত সংকীর্ণ অর্থের মাধ্যমে পূরণ হয়। তাই জীবনে বাঁচতে হলে সংকীর্ণ অর্থের ধারণাকে উপেক্ষা করা যাবে না।

আবার সংকীর্ণ অর্থের দ্বারা সমস্ত জীবনধারণ করা সম্ভব নয় কারণ জীবনের পরিসর অনেক ব্যাপক তাই প্রতিনিয়ত নিত্যনতুন বিষয়ের সাথে অভিযোজন করতে হয় প্রতিনিয়ত নানাবিধ বিষয় কিছু না কিছু ভাবে শিখতে হয়। তাছাড়া ধরা যাক একজন শিক্ষার্থী উচ্চমাধ্যমিক কোর্স সম্পন্ন করল এবং চাকুরীতে যোগদান করল। কিন্তু সময়ের সাথে তাকে আরো অনেক কিছু শিখতে হবে অথচ তা শেখার জন্য সে আর বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারবে না কারণ সে ইতোমধ্যে বিদ্যালয়ের গণ্ডি সম্পন্ন করেছে। তাই একজন ব্যক্তি সারা জীবনব্যাপী শিক্ষার্থী এবং সমগ্র পৃথিবী একটি ব্যাপক শিক্ষাক্ষেত্র।

তাই প্রতিটি ব্যক্তির জীবনে শিক্ষার দুইপ্রকারের ধারার মধ্যে দিয়েই স্নাত হওয়া দরকার কারণ জীবনে সুষ্ঠভাবে বেঁচে থাকতে হলে শিক্ষিত হতে হবে যা পূর্ণ হবে শিক্ষার সংকীর্ণ অর্থের দ্বারা আবার জীবনের প্রতিনিয়িত বিষয়ের সাথে অভিযোজন করতে গেলে প্রয়োজন শিক্ষার ব্যাপক অর্থের শিক্ষা। সুতরাং একজন ব্যক্তি সারাজীবন শিক্ষার্থী এবং দুই প্রকারের শিক্ষাই এই সর্বাঙ্গীনতা সম্পন্ন করে। ফলে দুইপ্রকারের শিক্ষা একে অপরের পরিপূরক। তাই নির্দ্বিধায় বলা যায় যেখানে সংকীর্ণ শিক্ষার শেষ সেইখান থেকেই শুরু হয় ব্যাপক অর্থের শিক্ষা।

সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে কিছু ডিপ্লোমা বা ডিগ্রি অর্জন। যে যত বেশি ডিপ্লোমা বাডিগ্রির অধিকারী সে ততবেশি শিক্ষিত। এজাতীয় শিক্ষার কেন্দ্রে আছে শিক্ষক যাদের কাজ হচ্ছে শিক্ষার্থীকে কিছু তথ্য, তত্ত্ব পরিবেশন করে বিদ্যালয় নামক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষর্থী এ শিক্ষা আয়ত্ত্ব করে। এজাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর মৌলিক স্বাধীনতা মোটেই নেই। এই জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় মনে করা হয় যে শিক্ষক হচ্ছেন জ্ঞান অর্জনের আধার। সেই জ্ঞানরাশি একটু একটু করে চুঁইয়ে শিক্ষার্থীর মগজে প্রবেশ করবে। শিক্ষাক্ষেত্রে একে বলা হয় Pipe Line Theory.। আবার মনে করা হয় যে শিক্ষক হচ্ছে বড় জ্ঞানের ভাণ্ডার এবং শিক্ষার্থী হচ্ছে ক্ষুদ্র ভাণ্ডার। বড় পাত্র থেকে ছোটো পাত্রে যেমন জল ভরা হয় তেমনি শিক্ষকের অফুরন্ত জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে শিক্ষার্থীর ক্ষুদ্র ভাণ্ডারে সেভাবে জ্ঞানভর্তি করা হবে এবং এই তত্ত্বের নাম হল 'Jug and Mug Theory'.

সংকীর্ণ অর্থে এই ধারণায় বিশ্বাস করা হত— Spare the rod and spoil the child অর্থাৎ বেত্রাঘাত ও কঠিন অনুশীলনের মাধ্যমেই শিক্ষার্থীকে শিক্ষা প্রদান করতে হবে।

সংকীর্ণ অর্থে বিশ্বাস করা হত কতকগুলো বিশেষধর্মী পাঠ্যবিষয় আছে সেগুলোর অনুশীলন আমাদের মনের বিশেষ বিশেষ শক্তিগুলোকে অধিকতর ক্ষমতাসম্পন্ন ও কর্মক্ষম করে তোলে। যেমন গণিতের চর্চা বিশ্লেষণ বাড়ায়, সাহিত্য-কাব্যের অনুশীলন মনের কোমলতাকে বাড়ায় ইত্যাদি। এইসব বিষয় ব্যাখ্যা করা হত মূলত মানসিক শৃঙ্খলার তত্ত্ব (Theory of Formal Discipline) অনুযায়ী কিন্তু শক্তিবাদ বা Faculty Psychology তত্ত্ব দ্বারা তা ভুল প্রমাণিত হয়েছে এবং বলা হয় মনের কোন বিশেষ সুনির্দিষ্ট শক্তি

নেই বরং সমস্ত কিছুই হল মানসিক প্রক্রিয়া বিশেষ। সুতরাং বর্তমানে শিক্ষা শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক এবং শিক্ষার ব্যাপক অর্থ নিহিত। শিক্ষার্থী আর নিষ্ক্রিয় শ্রোতা নয় বরং সে সক্রিয় । পাঠ্যক্রম পরিবর্তনশীল, শিক্ষক শ্রেণিতে সবসময় কর্তা হন বরং তিনি সাহায্যকারী, শৃঙ্খলা আরোপিত নয় বরং সহজাত। মূল্যায়ণ শিক্ষক কেন্দ্রীয় নয় বরং শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক। সুতরাং শিক্ষার প্রকৃতি বর্তমানে শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক কিন্তু সংকীর্ণ অর্থে তা ছিল শিক্ষক কেন্দ্রিক।

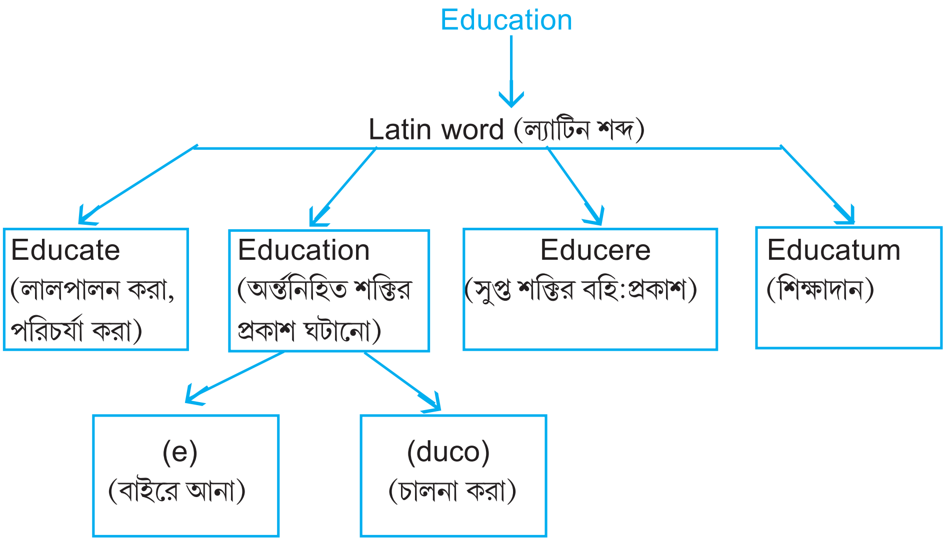

সুতরাং বলা যায় যে জ্ঞান মানুষকে পার্থিব জন্ম থেকে মুক্তির উপায়ের সন্ধান দেবে সেই জ্ঞানের অর্জনকেই প্রাচীন কালে প্রকৃত শিক্ষা বলা হতো।

শিক্ষার প্রকৃতি *(Nature of Education)* : বিজ্ঞান এবং দর্শনে 'Paradigns' বা দৃষ্টান্ত হল কিছু সমষ্টিগত চিন্তাভাবনার ফসল। অবয়ব বা Pattern। বিভিন্ন ধরনের তত্ত্ব, বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি এবং আরোও নির্দিষ্ট কিছু মানদণ্ড যা সেই নির্দিষ্ট ক্ষেত্র বা Field এর জন্য অত্যাবশ্যকীয় 'Paradigm' শব্দটির উৎপত্তি গ্রীক শব্দ— 'Paradeigma' অর্থাৎ অবয়ব। 'Paradigm' শব্দটি গ্রীক ভাষায় Plato এর 'Timaeus' গ্রন্থে প্রথম ব্যবহৃত হয় এবং এই গ্রন্থে Paradigm শব্দটি মূলত ব্যবহৃত হয়েছে ভগবান কর্তৃক সৃষ্টি তৈরির অবয়বকে বোঝাতে। The Oxfold English Dictionary 'Paradigm' শব্দটিকে সংজ্ঞায়িত করেছে। 'a typical example or pattern of something, a pattersn or model' 'Paradigm' ওই শব্দটির সাথে Thomas Kuhn (বিখ্যাত আমেরিকান দার্শনিক) এর নাম ওতোপ্রতোভাবে জড়িত এবং তাঁর লেখা বিখ্যতা গ্রন্থ 'The structure of scientific Revolutions (1962)' এ এই বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

মূলত পৃথিবীতে যে সমস্ত বিষয়সমূহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ানো হয় তার প্রায় সমস্তগুলোরই উৎপত্তি হয়েছে Philosophy বা দর্শন থেকে, তাই একে Mother of all Disciplines' বলা হয়। এর

থেকেই বৃক্ষের শাখার ন্যায় বিভিন্ন ধরনের ‘Disciplines বা শাখাসমূহের বিস্তার ঘটেছে সময়ের সাথে বিভিন্ন ধরনের অপসারী ও অভিসারী চিন্তনের দ্বারা। প্রতিটি শাখার ‘Paradigm shift’ এর বিষয়টি অত্যন্ত বিবর্তনগ্রাহী এবং একটি ক্রমবিবর্তনমূলক প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় জড়িত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—পর্যবেক্ষণ বা Interferance. প্রতিটি Experiment, সিদ্ধান্ত বা Interferance. প্রতিটি Discipline বা শাখার সাথে জড়িত তার নিজস্ব চিন্তাভাবনা, বিভিন্ন মতবাদ, দার্শনিক, মনস্তত্ববিদ, শিক্ষাবিদ ইত্যাদিদের অবদান, আদৌ বিভিন্ন ধরনের অনুমান নির্ভর প্রকল্প বা ‘Hypothesis’ এবং বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের দ্বারা প্রমাণিত বিষয়সমূহ।

ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার প্রকৃতি কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে সে সম্পর্কে জানতে হলে জানা দরকার প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার প্রকৃতি, মধ্যযুগীয় ভারতীয় শিক্ষার প্রকৃতি, ব্রিটিশ শাসিত ভারতীয় শিক্ষার প্রকৃতি, স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের শিক্ষার প্রকৃতি সম্পর্কে বৈদিক যুগে শিক্ষার মূল প্রকৃতি ছিল ‘আত্মজ্ঞান ও আত্মউপলব্ধি।’ গুরুকুল ভিত্তিক এই শিক্ষার লক্ষ পূরণ করার জন্য আশ্রম বিদ্যাকে দু’ভাগে ভাগ করাহত। যথা— পরা বিদ্যা ও অপরা বিদ্যা। পরাবিদ্যা হল পরমজ্ঞান লাভ করার জন্য তিনটি বেদ, ছয় বেদাঙ্গ, বেতান্ত অনুশীলন করা, আত্মসংযম ও যোগ সাধণার দ্বারা এই বিদ্যা অর্জন করা। আর অপরা বিদ্যা হল পার্থিব জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালনের জন্য যে জ্ঞান ও অনুশীলন প্রয়োজন তার চর্চা করা।

সূত্র যুগে শিক্ষার মূল প্রকৃতি ছিল শিক্ষার্থীর আভ্যন্তরীণ চরিত্র গঠন এবং বিশেষিকরণের শিক্ষা। এই যুগেই নানা ধরনের টোলের সৃষ্টি হয়েছিল।

ব্রাহ্মণ্যযুগের শিক্ষার মূল প্রকৃতি ছিল মননের সাহায্যে নিজের এবং পরমাত্মার শক্তিকে আবিষ্কার করা, যা চতুরাশ্রম (ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস)-এর উপরই নির্ভর ছিল।

বৌদ্ধযুগের শিক্ষার মূল প্রকৃতি ছিল জীবন ও জগৎ থেকে মুক্তি। সাধনা, নীতিজ্ঞান, নৈতিক জীবনযাপন, বন্ধনহীন সংঘজীবনে নিয়মানুবর্তিতার শিক্ষা ও সেবা ধর্ম, বাসনার অবলুপ্তিই ছিল শিক্ষার মূল লক্ষ্য।

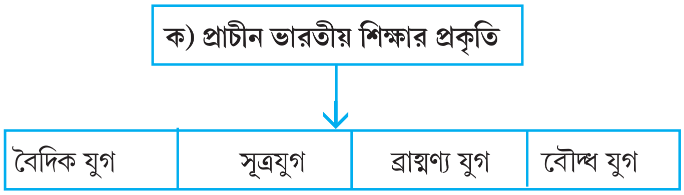

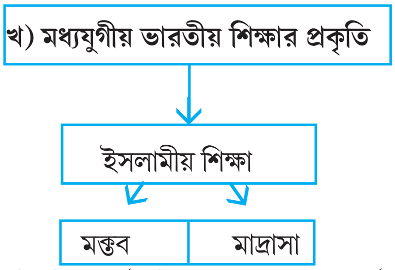

শিক্ষার মূল প্রকৃতি ছিল ধর্মভিত্তিক এবং মানুষকে ধর্মমানস্ক করে তোলা, নৈতিকতাই ছিল মূল কাঙ্খিত বিষয়। এই যুগে মক্তব, মাদ্রাসা গড়ে উঠেছিল।

গ) ব্রিটিশ শাসিত ভারতীয় শিক্ষার প্রকৃতি : ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে শিক্ষার মূল দুটি ধারার সূত্রপাত হয়েছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দ্বন্দ্বের দ্বারা। এই দ্বন্দ্ব থেকেই ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের শিক্ষার প্রকৃতি প্রধান দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে গেছিল।

Lord Macaulay (লর্ড ম্যাকলের) ভাষায়— a class of persons Indian in blood and colour but English in tasters, in opinions, in morals and in intellect. এর থেকেই ব্রিটিশদের শিক্ষার প্রকৃতির মূল লক্ষ চিহ্নিত করা যায়। তা ছিল ইংরেজি জ্ঞানের বিস্তার এবং প্রশাসন চালানোর জন্য একদল ইংরেজি জানা শ্রেণি তৈরী করা। অপরদিকে প্রাচ্যবাদীদের হাত ধরেই দেশীয় শিক্ষা, বিভিন্ন দেশীয় ভাষা যথা আরবিক, পার্শি, সংস্কৃত ইত্যাদিকে পুনরুদ্ধার করতে চেয়েছিলেন এবং স্বাধীনতা লাভের পূর্ব অবদি ভারতবর্ষের শিক্ষার প্রকৃতি জাতীয়তাবাদীদের হাত ধরেই এই দিকে অনুধাবিত হয়েছিল।

ঘ) স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের শিক্ষার প্রকৃতি : স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের শিক্ষার প্রকৃতি মূলত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নির্ভর এবং উৎপাদনমুখী, শিক্ষা শুধুমাত্র কেন্দ্রের উপরই ন্যাস্ত রইল না বরং রাজ্যের উপরও ন্যস্ত হল। কেন্দ্রের উপর ন্যস্ত রইল শতকরা ৫৫ শতাংশ এবং রাজ্যের উপর ন্যস্ত রইল শতকরা ৪৫শতাংশ শিক্ষার ক্ষমতা ও দায়বদ্ধতা।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা গেল যে প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার মূল প্রকৃতি ছিল মানুষ তৈরির শিক্ষা কিন্তু আধুনিক ভারতীয় শিক্ষা পরিগণিত হল বস্তুমুখী শিক্ষায়।

শিক্ষার প্রকৃতি নিম্নে বিবৃতি করার পূর্বে এ বিষয়টি উল্লেখযোগ্যভাবে মাথায় রাখতে হবে যে, ভারতবর্ষে ‘Education’ বা ‘শিক্ষাবিজ্ঞান’ বিষয়টি মূলত এসেছিল 1917-19 এর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন বা স্যাডলার কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে। *শিক্ষার প্রকৃতিগুলো নিম্নরূপ —*

১) শিক্ষা জীবনব্যাপী (Education is life long): মহাপুরুষ রামকৃষ্ণদেবের উক্তিটি গ্রহণযোগ্য— ‘যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি।’ অর্থাৎ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অবিচল ধারায় শিক্ষা চলে বলেই শিক্ষা জীবনব্যাপী।

২) শিক্ষা ধারাবাহিক (Education is systematic) : জানা থেকে অজানা, সরল থেকে জটিল এই লক্ষকে সামনে রেখে শিক্ষা অবিচল ধারায় ক্রমবর্ধমান শিক্ষার পরবর্তী স্তর পূর্ববর্তী স্তরের উপর নির্ভর করেই অগ্রসরমুখী হয়।

৩) শিক্ষা ব্যক্তি এবং সমাজের বিকাশ ঘটায় (Education helps to develops individual and society): শিক্ষা এমন একটি চালিকা শক্তি যা শুধু একক ব্যক্তিকেই নয় বরং সমাজকেও বিকাশের দিকে ধাবিত হতে সহায়তা করে। কেননা ব্যক্তিকে নিয়ে সমাজ এবং সমাজের মধ্যেই ব্যক্তি বিদ্যমান।

৪) শিক্ষা আচরণের পরিমার্জনা ঘটায় (Education helps to modify behaviour): ব্যক্তির আচরণ শিক্ষার দ্বারাই প্রভাবিত হয় ফলে সে তার আচরণের পরিমার্জনা ঘটাতে সক্ষম হয়।

৫) শিক্ষা উদ্দেশ্যমুখী (Education is purposive) : শিক্ষা একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে অগ্রসর হয়, সেই লক্ষ্য সমাজকেন্দ্রিক বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক যাই হোক না কেন।

৬) শিক্ষা হল প্রশিক্ষণ (Education is a training) : মানসিক, ইন্দ্রিয়মূলক, আচরণগত বিভিন্ন দক্ষতার উন্মেষ সাধনে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের প্রয়োজন এবং শিক্ষার মাধ্যমেই এই প্রশিক্ষণ পূর্ণ করা সম্ভব।

৭) শিক্ষা হল নির্দেশদান এবং দিক্ নির্ণয়ের প্রতীক (Education is the symbol of instruction and direction) : শিক্ষা ব্যক্তিকে সঠিক নির্দেশ দান ও কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছতে সহায়তা করে।

৮) শিক্ষা হল জীবন (Education if life) : সার্থকভাবে জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজন শিক্ষার কারণ শিক্ষার দ্বারাই ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন বিকাশ সম্ভবপর হয়ে থাকে।

৯) শিক্ষা হল অভিজ্ঞতার প্রতিনিয়ত পুনর্গঠন (Education is the continuous reconstruction of expreiences) : জীবনে চলার পথে প্রতিনিয়ত প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা কাঙ্খিত হতেও পারে নাও হতে পারে। কিন্তু শিক্ষা হল এমন একটি বিষয় যার দ্বারা ভবিষ্যৎমুখী অভিজ্ঞতা যাতে কাঙ্খিত হয় সেদিকে পুনর্গঠন করা সম্ভবপর হয়।

১০) শিক্ষা ব্যক্তিকে অভিযোজনে সহায়তা করে (Education helps in individual adjustment): ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে তারতম্য বোঝা যায় অভিযোজনের ভিত্তিতে। শিক্ষাই প্রতিনিয়ত পরিবর্তনমুখী বিশ্বে সার্থক অভিযোজনের পথ সুগম ও প্রশস্ত করে তোলে।

১১) শিক্ষা হল ভারসাম্যমুখী বিকাশ (Education is balanced development): প্রতিনিয়ত চলতে গেলে বিভিন্ন ধরনের অবস্থার সৃষ্টি হয় ব্যক্তিকে সম্মুখীন হতে হয় অনেক অনভিপ্রেত ঘটনার এবং সেই সমস্ত ঘটায়, শিক্ষাই ব্যক্তিকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়তা করেথাকে।

১২) শিক্ষা গতিশীল (Education is dynamic) : শিক্ষা অবিচল নয় গতিশীল। শিক্ষার মাধ্যমেই ব্যক্তি পরিবর্তনশীল পরিবেশে নিজেকেও পরিবর্তনমুখী করতে সক্ষম হয়।

১৩) শিক্ষা দ্বিমুখী নয় ত্রিমুখী (Education is not bipolar but tripolar): শিক্ষক—শিক্ষার্থী এই দ্বিমুখী প্রক্রিয়াটি জন এডাম্‌সের দ্বারা বিকৃত। অপরদিকে জন ডিউইর মতে শিক্ষা হল ত্রিমুখী।

এই ত্রিমুখী ধারণাই আধুনিক শিক্ষায় মূল কেন্দ্রীভূত বিষয়।

১৪) শিক্ষা হল বিকাশ (Education is development) : বিকাশ হল বহুমুখী একটি ধারণা যেমন সামাজিক বিকাশ, দৈহিক বিকাশ, মানসিক বিকাশ, নান্দনিক বিকাশ, ভাষাগত বিকাশ, প্রাক্ষোভিক বিকাশ ইত্যাদি। শিক্ষার দ্বারাই এই সমস্ত প্রকার বিকাশের পরিমাণগত ও গুণগত দিকগুলো অর্জন করা যায়।

১৫) শিক্ষা সামাজিক (Education is social) : সামাজিক পরিবেশেই সকল শিক্ষা সংঘটিত হয়। সমাজ বহির্ভূত পরিবেশে শিক্ষা কখনও সম্ভব হতে পারে না। অভিজ্ঞতা সঞ্চয়কারীর ক্ষেত্রই হল সামাজিক পরিবেশ। অভিজ্ঞতা সমাজ নির্ভর তাই শিক্ষা প্রক্রিয়াও সামাজিক।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা যায় যে শিক্ষার প্রকৃতি ক্রমপরিবর্তনশীল এবং পরিমার্জনশীল। শিক্ষার এই গতিশীলতাই শিক্ষাকে একটি অত্যন্ত আলোচিত বিষয় হিসাবে সমগ্র বিশ্বের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে।

দ্বিতীয় একক শিক্ষার কাজ, পরিধি

শিক্ষার কাজ (Function of Education) : শিক্ষা ও তার প্রকৃতি সময়ের সাথে সাথে বর্ধিত করে চলেছে। শিক্ষাকে মাধ্যম করেই ব্যক্তি ও সমাজ ক্রমবর্ধমান। বর্তমান সময়ের প্রায় সমস্ত মূর্ত বিষয়ের সংব্যাখান শিক্ষা দ্বারা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে এবং শিক্ষা নানাবিধ বিমূর্ত বিষয়ের ওপরেও অনুসন্ধান করার প্রক্রিয়া বজায় রেখেছে। ফলে শিক্ষার কাজ সময়ের সাথে সাথে অত্যন্ত পরিবর্ধিত হচ্ছে, কিন্তু তথাপি কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ শিক্ষা সর্বদাই সম্পন্ন করার প্রয়াস বজায় রেখেছে এবং তার কিছু হল নিম্নরূপ—

১) **ব্যক্তিজীবনের পূর্ণতা সাধন:** বর্তমান বিশ্বে সার্থকভাবে বেঁচে থাকতে হলে প্রয়োজন শিক্ষার। কারণ অশিক্ষিত ব্যক্তি ব্যবহারিক বিভিন্ন কার্যে শিক্ষিত ব্যক্তির উপর নির্ভর করে থাকে। সুতরাং, ব্যক্তি জীবনের পূর্ণতা শিক্ষার মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়।

২) **অন্তর্নিহিত ক্ষমতার বিকাশ :** প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যেই রয়েছে বহুমুখী ক্ষমতা কিন্তু তার প্রকাশ হতে গেলে প্রয়োজন উপযুক্ত পরিবেশের। শিক্ষার দ্বারা শুধুমাত্র কাঙ্খিত পরিবেশই নয় বরং অন্তর্নিহিত ক্ষমতার বিকাশ ঘটানোও সম্ভব হয়।

৩) **দক্ষতার বিকাশ :** প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যেই রয়েছে কিছু না কিছু দক্ষতা এবং এগুলোর বিকাশ সাধন সম্ভবপর হয় যদি উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ব্যক্তি লাভ করে । তবে, শিক্ষার দ্বারা উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে ব্যক্তির বহুমুখী দক্ষতার বিকাশ ঘটানো যায়।

৪) **সমাজের সংরক্ষণ :** বর্তমানের আধুনিক সমাজ অতীতের আদিম সমাজ, মধ্যযুগের সমাজ, প্রাক আধুনিক সমাজকে পার করেই এখানে পৌঁছেচে কিন্তু সুদূর অতীতকাল থেকে বর্তমানের সমাজ বহুবিষয় সংরক্ষণত্র করতে পেরেছে একমাত্র শিক্ষার হাত ধরেই।

৫) **ব্যক্তি এবং সমাজের অগ্রগতি :** শিক্ষার দ্বারা শুধুমাত্র ব্যক্তির অগ্রগতি সাধিত হয় তা নয় বরং ব্যক্তির সাথে সাথে সমাজের অগ্রগতি ও সম্ভবপর হয় । ব্যক্তি তার অবস্থানের উন্নতি ঘটাতে পারে এবং ব্যক্তির সাথে সাথে সমাজের সামগ্রিক অবস্থানেরও উন্নতি সাধন হয় শিক্ষার দ্বারা।

৬) **জ্ঞানমূলক উন্নয়ন:** পৃথিবীতে প্রচলিত নানাবিধ পুস্তকে যে শতাব্দী প্রাচীন জ্ঞান সংরক্ষিত আছে তার আহরণ কেবলমাত্র শিক্ষার দ্বারা করা সম্ভব এবং স্বীয় জ্ঞানক্ষেত্রের উন্নয়ন করা সম্ভব।

৭) **প্রক্ষোভমূলক উন্নয়ন :** জীবন থেকে মৃত্যু অবধি বেঁচে থাকতে হলে প্রয়োজন উপযুক্ত প্রক্ষোভের সুসমন্বয়তা এবং একমাত্র শিক্ষার দ্বারা প্রক্ষোভের উপযুক্ত উন্নয়ন ঘটানো যায়।

৮) **মূল্যবোধ সৃষ্টি ও সঞ্চালন :** মানুষের ব্যবহারই তাকে দেবত্বের বা পশুত্বের পর্যায়ে নিয়ে যায় এবং এর নিয়ন্ত্রক হল মূল্যবোধ। মূল্যবোধগুলোর সৃষ্টি প্রয়োজন অনুসারে এবং তা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সঞ্চালন করা শিক্ষার অন্যতম কাজ।

৯) **নতুন ভাবধারার সৃষ্টি ও সঞ্চালন :** ব্যক্তি ও সমাজের প্রয়োজনের তাগিদে নতুন ভাবধারার সৃষ্টির প্রয়োজন এবং প্রয়োজন ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চালন যাতে ভবিষ্যত অতীতের সাথে সুদূর ভিত্তি স্থাপন করতে পারে। শিক্ষার দ্বারা এই কাজ সুসম্পন্ন করা যায়।

১০) সৌভ্রাতৃত্ববোধের বিকাশ : প্রকৃত শিক্ষা ব্যক্তির অন্তর্নিহিত দুর করে এবং শিক্ষা ব্যক্তিকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে উন্মীলিত করে। মানুযে মানুযে ধর্ম-বর্ণ-অর্থের ভিত্তিতে কোন ভেদাভেদ নেই। এই বোধ শিক্ষা জাগ্রত করতে সহায়তা করে এবং শিক্ষার দ্বারাই সৌভ্রাতৃত্বের বিকাশ ঘটে।

১১) সুনাগরিকতা ও বিশ্বনাগরিকতার উন্মেষ ঘটানো : আধুনিক প্রগতিশীল বিশ্বে ব্যক্তি মাত্রেই রাষ্ট্র পরিচালনার অংশীদার। এই বিষয়টির উপর নির্ভরশীল সমগ্র বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা ও অগ্রগতি। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সুনাগরিকতা ও বিশ্বনাগরিকতার বার্তা পৌঁছানোও বিদ্যমান রাখা শিক্ষার দ্বারা সম্ভব।

১২) জাতীয় উন্নতি বিধান : একটি দেশের জাতীয় উন্নতি বিধান তখনই সম্ভবপর হবে যখন দেশের নাগরিকগণ শিক্ষিত হবে কারণ নিরক্ষর নাগরিক দ্বারা জাতীয় উন্নতি বিধান সম্ভবপর নয়। শিক্ষার দ্বারা তাই জাতীয় উন্নতি বিধান করা সম্ভব।

১৩) কৃষ্টির সংরক্ষণ ও সঞ্চালন : প্রতিটি স্থানেরই নিজস্ব কিছু কৃষ্টি বর্তমান থাকে এবং সময়ের সাথে প্রতিটি স্থানের অর্ন্তগত ব্যক্তিগত পেশা ও বৃত্তির তাগিদে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পরে কিন্তু তারা তাদের কৃষ্টির সংরক্ষণ ও সঞ্চালন ঘটাতে পারে পরবর্তী প্রজন্মকে শিক্ষার দ্বারা।

১৪) অভিযোজনে সহায়তা করা : প্রত্যহ জীবনে একজন ব্যক্তিকে নানাবিধ পরিবেশের সম্মুখীন হয় যেমন সামাজিক পরিবেশ, অর্থনৈতিক পরিবেশ, সাংস্কৃতিক পরিবেশ, নান্দনিক পরিবেশ ইত্যাদি। এই ভিন্নধর্মী পরিবেশের সাথে সার্থক অভিযোজন করতে শিক্ষা সহায়তা করে।

১৫) পেশা ও বৃত্তি নির্বাচনে সহায়তা করা : সমাজে বসবাসকারী বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন পেশায় ও বৃত্তিতে নিযুক্ত রয়েছে। একজন শিক্ষিত ব্যক্তির কাছে বৃত্তি ও পেশা নির্বাচন করা একজন অশিক্ষিত ব্যক্তির তুলনায় অনেকটাই সহজ। তাই শিক্ষা একজন ব্যক্তিকে পেশা ও বৃত্তি নির্বাচনে সহায়তা করে থাকে।

১৬) সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় করা : পৃথিবীতে মানব সভ্যতা নানাহ ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়েও বেঁচে আছে এবং এর পিছনে শিক্ষার ভূমিকা অন:স্বীকার্য। প্রতিটি মানুষ পৃথিবীতে এক অদৃশ্য বন্ধনে আবদ্ধ এবং তা হল মনুষ্যত্বের বন্ধন। শিক্ষার কাজ হল মানুষকে গোঁড়ামি, কুসংস্কার, মৌলবাদ ইত্যাদির থেকে মুক্ত করে যৌক্তিক ভাবে সবাইকে নিয়ে বেঁচে থাকার পথ সুগম করা।

শিক্ষার কাজ

- ব্যক্তিজীবনের পূর্ণতা সাধন
- অন্তর্নিহিত ক্ষমতার বিকাশ
- দক্ষতার বিকাশ
- সমাজের সংরক্ষণ
- ব্যক্তি ও সমাজের অগ্রগতি
- জ্ঞানমূলক উন্নয়ন
- প্রক্ষোভমূলক উন্নয়ন
- মূল্যবোধ সৃষ্টি ও সঞ্চালন
- নতুন ভাবধারার সৃষ্টি ও সঞ্চালন
- সৌভ্রাতৃত্ববোধের বিকাশ
- সুনাগরিকতা ও বিশ্বনাগরিকতার উন্মেষ ঘটানো
- জাতীয় উন্নতি বিধান
- কৃষ্টির সংরক্ষণ ও সঞ্চালন
- অভিযোজনে সহায়তা করা
- পেশা ও বৃত্তি নির্বাচনে সহায়তা করা
- সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় করা

উপরিউক্ত কাজগুলো ছাড়া শিক্ষা সময়, ব্যক্তি ও সমাজের প্রয়োজনে আরও নানাহ কাজ করে থাকে এবং শিক্ষার মূল কাজ তাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিহিত থাকে আর তা হল অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে যাওয়া ব্যক্তির মাধ্যমে সমাজকে ।

শিক্ষার পরিধি (Scope of Education) :

এই পৃথিবীতে মানবজাতির ইতিহাস অতি প্রাচীন। পরিবেশের সাথে মিথষ্ক্রিয়া করে মানুষ বর্তমানে সমগ্র বিশ্বের সর্বাধিক ক্ষমতাসম্পন্ন প্রাণী। সুদূর অতীতকাল থেকে বর্তমান সময় অবধি মানুষের ক্রমবিবর্তন এর প্রক্রিয়া সম্ভবপর হয়েছে তার পূর্ব অর্জিত জ্ঞান পরবর্তী প্রজন্মের হাতে তুলে দেবার প্রক্রিয়া দ্বারা। এই কার্যের সুসম্পন্নকরণ সম্ভবপর হয়েছে শিক্ষার দ্বারা। শিক্ষার পরিধিকে যে মূল ত্রিবিধ ধারার দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় তা হল নিম্নরূপ —

শিক্ষার পরিধি

ক) জ্ঞানের সংরক্ষণ *(খ) জ্ঞানের উন্নয়ন* *(গ) জ্ঞানের সঞ্চালন*

ক) জ্ঞানের সংরক্ষণ : বর্তমানে মানব সমাজে যে স্থানে দাঁড়িয়ে আছে তা সম্ভবপর হয়েছে অতীতের জ্ঞানভাণ্ডার বংশপরম্পরায় মানুষ পেয়েছে বলে। মানুষ এর জ্ঞান ভাণ্ডার সময়ের সাথে সাথে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে মানুষ এর জ্ঞান প্রাচীন মধ্য বর্তমানে যুগের মধ্যে এক অদৃশ্য বন্ধন স্থাপন করতে পেরেছে এবং জ্ঞান এর পরিধি বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সম্পূর্ণ ব্যাপার সম্ভবপর হয়েছ শিক্ষার হাত ধরেই। শিক্ষার দ্বারা মানুষ তার জ্ঞান পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সংরক্ষিত করে রাখতে পেরেছে। ফলে শিক্ষার পরিধি ক্রমউত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

খ) জ্ঞানের উন্নয়ন : শিক্ষার পরিধি সময়ের সাথে সাথে ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে এর কারণ হল যে মানুষ তার প্রয়োজনের তাগিদে তার জ্ঞানের উন্নয়ন ঘটিয়ে চলেছে। মানুষের চাহিদা, কৌতুহল, অনুরাগ, প্রেষণা, সৃজনক্ষমতা, বুদ্ধি ইত্যাদি মানুষকে জ্ঞানের ক্রমউন্নয়ন ঘটাতে সহায়তা করেছে। তাই শিক্ষার হাত ধরে মানুষের জ্ঞানের প্রভুত পরিমাণে উন্নয়ন ঘটেছে। শিক্ষার দ্বারা শুধু জ্ঞানের বিস্ফোরণ নয় হয়েছে অস্বাভাবিক উন্নয়নও হয়েছে তাই মানুষ তার শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে অতীতের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতাকে কাজে লাগিয়ে ক্রম উন্নতির পথে ধাবিত হচ্ছে।

গ) জ্ঞানের সঞ্চালন : সমাজে মানুষের জ্ঞান অর্জন জ্ঞানের সংরক্ষণ, জ্ঞানের উন্নয়ন এ সমস্ত কিছুই মূল্যহীন হয়ে পড়ত যদি শিক্ষার দ্বারা অতীতের জ্ঞান পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চালন না করা যেত। জ্ঞানের এই সঞ্চালন দ্বারা ব্যক্তি জীবন ও সমাজজীবনকে অগ্রসর করে সম্ভবপর হয়েছে। তাই শিক্ষার হাত ধরেই মানব সভ্যতা ক্রমউন্নতির দিকে এগিয়ে চলেছে।

উপরিউক্ত তিনটি বিষয় থেকে একথা উপলব্ধি করা যায় শিক্ষার পরিধি অত্যন্ত ক্রমবর্ধমান এবং তা সম্ভবপর হয়েছে শিক্ষার সারগ্রাহী প্রবণতা এর জন্য। বর্তমানে শিক্ষা সমাজবিজ্ঞানের একটি অন্যতম শাখা। শিক্ষা বর্তমানে একটি প্রয়োগমূলক বিজ্ঞানে পরিগণিত হয়েছে এবং এর পিছনে মূল কারণ হল শিক্ষা প্রায় সমস্ত বিষয়ের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হয়ে গেছে। এবং এই কারণে শিক্ষার পরিধি বর্তমানে Multi-disciplinary হয়ে উঠেছে। তাই শিক্ষার পরিধি ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং যে সমস্ত বিষয়গুলো শিক্ষা বিজ্ঞানের পরিধির অর্ন্তভুক্ত হয়েছে তার কিছু হল নিম্নরূপ—

১) শিক্ষাদর্শন (Educational Philosophy): বিভিন্ন দর্শন, দর্শনের লক্ষ্য, প্রকৃতি, প্রয়োজনীয়তা এর মাধ্যমে জানা যায়। বিভিন্ন দর্শনের প্রভাবে শিক্ষা কিভাবে সমৃদ্ধ করা যায় তাই শিক্ষা দর্শনের মূল লক্ষ্য।

২) শিক্ষা মনোবিদ্যা (Educational Psychology) : পৃথিবীতে প্রতিটি শিশু পৃথক এবং তাদের চিন্তন, মনন, বুদ্ধি, মনোযোগ, অনুরাগ, প্রেষণা, প্রক্ষোভ ইত্যাদি সমস্ত কিছু পৃথক— তা জানতে সহায়তা করে এবং শিক্ষণ ও শিখনের স্বরূপকে বহুলাংশে এই শাখা পরিবর্তন করে তুলতে সক্ষম হয়েছে।

৩) শিক্ষাশ্রয়ী সমাজবিদ্যা (Educational Sociology) : পৃথিবীতে আদিমকাল থেকে বর্তমান কাল অবধি বিভিন্ন ধরনের সমাজ, সমাজের প্রকৃতি, তার সংস্কৃতি, বিভিন্ন সমাজের মধ্যে আন্ত:নির্ভরতা জানতে সহায়তা করে এই শাখা।

৪) শিক্ষার ইতিহাস (History of Education) : কিভাবে বিভিন্ন বিষয়, শাস্ত্রের উন্মেষ, অন্য বিষয়ের সাথে সংমিশ্রণ, বিভিন্ন যুগের শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থার মূল লক্ষ্য ও প্রকৃতি ইত্যাদি জানতে সহায়তা করে এই শাখা।

৫) শিক্ষাগত অর্থনীতি (Economics of Education) : বিভিন্ন স্থানের আয়-ব্যয়, ক্রয় ক্ষমতা, উৎপাদন ইত্যাদি শিক্ষাকে কিভাবে প্রভাবিত করে সে বিষয় জানা যায় এবং পিতা মাতার আয় কিভাবে সন্তানের শিক্ষায় প্রভাব ফেলে, বেসরকারী শিক্ষায় ও সরকারী শিক্ষায় খরচের তারতম্য ইত্যাদি এই শাখাটি জানতে সহায়তা করে।

৬) শিক্ষন পদ্ধতি (Method of Teaching) : বিভিন্ন বিষয়ের জন্য শিক্ষণ পদ্ধতি ভিন্ন হবে, শিক্ষণ পদ্ধতি হবে শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক, শিক্ষায় যাতে সমস্ত ধরনের শিক্ষার্থীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে তার উপায়সমূহ ব্যাখ্যা করে এই শাখা।

৭) শিক্ষামূলক ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন (Educational Management and Administration) : শিক্ষণ-শিখনের পরিবেশ কিভাবে শিখন উপযোগী রাখতে হবে, কিভাবে গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখতে হবে। কিভাবে সবাইকে কাজের সমান সুযোগ দিতে হবে, কিভাবে পারস্পরিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যা মিটিয়ে নেওয়া যায়। কিভাবে কর্মীবৃন্দদের মধ্যে সম্পর্ক ভালো রাখা যায় তা ব্যাখ্যা করে এই শাখা।

৮) শিক্ষামূলক মূল্যায়ণ (Educational Evaluation) : কিভাবে প্রশ্নপত্র তৈরি করতে হবে, কিভাবে সমগ্র সিলেবাস অনুযায়ী প্রশ্ন হবে, কিভাবে দুর্বল মাঝারি উচ্চ শিখন ক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করা যাবে, কিভাবে অতিরিক্ত ক্লাসের ব্যবস্থা কাদের জন্য করতে হবে, শিক্ষন পদ্ধতির কি কি পরিবর্তন করতে হবে। শিক্ষার্থীদের শিখনকে কিভাবে গুণগত করা যায় ইত্যাদি এই শাখা ব্যাখ্যা করে।

৯) শিক্ষায় সাম্প্রতিক সমস্যা (Problem in Contemporary Education) : বিভিন্ন ধরনের সমস্যা যা শিক্ষার গতিপথকে ব্যাহত করছে। বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন ও কমিটির বিভিন্ন সুপারিশ বাস্তবায়নে কি কি বাধা ও কতটুকু বাস্তবায়ন করা সম্ভব, নতুন কি কি ধরনের সমস্যায় শিক্ষা সমস্যাগ্রস্থ হচ্ছে এবং তার থেকে উত্তরণের কি কি উপায়— এসমস্ত কিছু জানতে এই শাখা সহায়তা করে।

১০) জনসংখ্যামূলক শিক্ষা (Population Education) : এই শাখাটির দ্বারা জানতে পারা যায় বিভিন্ন স্থানের জনসংখ্যার শিক্ষিতের হার। শিক্ষার গতিপ্রকৃতি বিভিন্ন স্থানে কিরূপ, শিক্ষা কিভাবে জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে পারে, শিক্ষিত জনসংখ্যা ও অশিক্ষিত জনসংখ্যার জীবনধারার পার্থক্য, কিভাবে

শিক্ষিত জনসংখ্যা উপযুক্ত সম্পর্কে পরিণত করা যায় ইত্যাদির মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো।

১১) পরিবেশমূলক শিক্ষা (Environmental Education) : পরিবেশ বিভিন্ন প্রকারের তবে তার মধ্যে প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক পরিবেশ (কৃষ্টি, সংস্কৃতি ইত্যাদি) অন্যতম। শিক্ষার দ্বারা কিভাবে প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক পরিবেশকে সুস্থ, সুন্দর ও বসবাসযোগ্য রাখা যায় এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সুরক্ষিত রাখা যায় — এসমস্ত কিছু আলোচনা করে এই শাখাটি।

১২) শিক্ষক শিক্ষণ (Teacher Education) : উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ব্যতীত কোন কার্যই সম্পন্ন করা যায় না এবং শিক্ষার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি প্রশিক্ষণ ব্যতীত বর্তমান সময়ে কল্পনাও করা যায় না। তাই প্রতিটি শিক্ষকের প্রয়োজন প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষার স্তরভেদে D.El.Ed, B.Ed, M.Ed বিভিন্ন শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স প্রচলিত রয়েছে। 'Pre-Service', 'In-Service' শিক্ষকদের জন্য । কিভাবে এই প্রশিক্ষণ আরও গুণমান সম্পন্ন করা যায় সে বিষয়ে যথার্থ আলোকপাত করে এই শাখা।

১৩) মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা (Mental Hygiens) : জীবনে বেঁচে থাকতে হলে প্রয়োজন সুস্থ দেহ ও সুস্থ মন এবং সুস্থ মানসিকতার বিকাশের শিক্ষা শিক্ষার্থীদের প্রথম শ্রেণি থেকেই শুরু করা দরকার। বিভিন্ন ধরনের মানসিক অপসংগতি, মানসিক রোগ ও তার প্রতিবিধানের পথ কি সে বিষয়ে এই শাখা উপলব্ধি করতে সহায়তা করে।

১৪) শিক্ষামূলক পরিসংখ্যা (Statistics in Education) : পরিসংখ্যা হল এমন একটি বিষয় যার দ্বারা কোন তথ্য অতিসহজেই বিজ্ঞান সম্মতভাবে উপস্থাপন করা যায়। বিভিন্ন স্থানে, শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার যাবতীয় তথ্য ইত্যাদির ব্যবহার এই শাখা দ্বারা অতি সহজেই করা যায় । ফলে তথ্য অনেক সহজে বিশ্লেষণ করা যায় ও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় এই শাখার দ্বারা করা সম্ভবপর হয়।

১৫) নৈতিক ও মূল্যবোধের শিক্ষা (Moral and Value Education) : মানব সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে পৃথিবীতে মানব সমাজের উন্নতি প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু যে বিষয়টি সব থেকে বেশি হ্রাস পেয়েছে তা হল মানুষের মূল্যবোধ ও নৈতিকতা। ফলে মানুষ এসমস্ত কর্মের সাথে লিপ্ত হচ্ছে যা পৈশাচিকতাকেও হার মানায়। শিক্ষার মাধ্যমে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ জাগ্রত করণের দ্বারা মানুষ শান্তি, ভালবাসা, অহিংসা ইত্যাদির শিক্ষা দেওয়া সম্ভব এবং মানুষকে পশুত্ব থেকে দেবত্বের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব।

১৬) অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা (Inclusive Education) : সমাজের মূলস্রোত এ থাকবে সবার সমান অধিকার রয়েছে এবং তাকে শিক্ষার দ্বারা সুনিশ্চিত করতে হয়। কিন্তু শিক্ষার বাইরে থেকে যায় বিরাট পরিসংখ্যানে শিশু যার মধ্যে সামাজিক ও আর্থিকভাবে দুর্বল শিশুরা রয়েছে, উপেক্ষিত মানসিকভাবে দুর্বল শিক্ষার্থীরা এবং আশ্চর্য্যের বিষয় হল উচ্চবুদ্ধিসম্পন্ন Gifted Children রাও বিদ্যালয়ে উপেক্ষিত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে। তাই সমস্ত শিশু যাতে বিদ্যালয়ে শিক্ষা সুনিশ্চিত করতে পারে তার প্রতিবিধানমূলক পথ এই শাখাটি দৃষ্টিপাত করে।

১৭) শিক্ষাগত প্রযুক্তিবিদ্যা (Educational Technology) : বর্তমানে শিক্ষন ও শিখন বিজ্ঞানসম্মতভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বিভিন্ন প্রকারের নির্দেশদান এর ব্যবহার দ্বারা শিক্ষার্থীদের আত্মসক্রিয়তা ভিত্তিক স্বয়ংশিখনের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। শিক্ষার এই শাখা চূড়ান্ত শিখনের ধারণা বাস্তবগ্রাহ্য করে তুলতে শেখায় বিভিন্ন শিক্ষামূলক Software ও Hardware ব্যবহার করে ।

১৮) শিক্ষায় নির্দেশনা ও পরামর্শদান (Educational Guidance and Councelling) : বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় যে বিষয়টি সবথেকে বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছে তা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের মানসিক সমস্যা, অপসংগতি সমস্যামূলক আচরণ ইত্যাদি। প্রায় প্রতিটি বিদ্যালয়েই প্রতিবছর একটি বিশাল সংখ্যক শিক্ষার্থী এই সমস্যার দ্বারা আক্রান্ত ফলে শিক্ষা ব্যবস্থায় এক বিশাল সমস্যা শিক্ষার্থীদের আচরণের অসংলগ্নতা। উপযুক্ত নির্দেশনা ও পরামর্শদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থী যাতে সুস্থ ও স্বাভাবিক শিক্ষার্থী হিসাবে জীবন কাটাতে পারে এসমস্ত বিষয়ে শিক্ষার এই শাখা আলোকপাত করে থাকে।

১৯) পাঠ্যক্রম চর্চা (Curriculum Studies) : পাঠ্যক্রম হল একটি অত্যন্ত গতিশীল বিষয় এবং এর উপর নির্ভর করেই শিক্ষার বাকী তিনটি উপাদান যথাক্রমে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আবর্তিত হয়। তাই পাঠ্যক্রম তৈরির মূলনীতি সমূহ, পাঠ্যক্রমের প্রকারভেদ, পাঠ্যক্রমে বিভিন্ন বিষয় নির্বাচনের শর্ত ইত্যাদির মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ এই শাখা বিশ্লেষণ করে থাকে।

২০) পাঠ্যক্রমে ভাষা শিক্ষা (Language across the Curriculum) : মানব সভ্যতার অগ্রগতির এক অন্যতম চাবিকাঠি হল ভাষা। ভাষার ব্যবহার মানব সভ্যকে এক আন্ত:সম্পর্কের বন্ধনে যুক্ত হতে সহায়তা করেছে। তাই ভাষার প্রকৃতি ব্যবহার, বাচনভঙ্গী, তার যথাযথ প্রয়োগ আরও উন্নত হওয়া প্রয়োজন। যাতে মানব সভ্যতা আরোও গভীর আন্ত:সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে।

২১) পঠন ও পাঠের প্রতিফলন (Reading and Reflecting on Texts) : বর্তমানে শিক্ষায় বিভিন্ন প্রজেক্টের ব্যবহার করতে শিখানো হচ্ছে যাতে তাত্ত্বিক বিষয়গুলো ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হয়। তাই বিভিন্ন পঠিত বিষয়গুলো প্রজেক্টের মাধ্যমের শিক্ষার্থীদের আরও সার্থকভাবে শিখানো যায় তাই হল এই শাখার মূল কাজ।

২২) শিক্ষাবোধ ও বিষয়সমূহ (Understanding Discipline and Subjects) : শিক্ষায় বিভিন্ন শাখার প্রবেশ ঘটেছে ফলে শিক্ষা একটি বিষয় হিসেবে ক্রম:সমৃদ্ধ হয়েছে। এই বিষয়টি ধারণা পেতে সাহায্য করে যে বিভিন্ন বিষয় কিভাবে বিবর্তিত হয়েছে এবং নিজেদের স্বাতন্ত্র্যতা একটি শাখা হিসাবে বজায় রাখতে পেরেছো এবং অন্যান্য শাখার সাথে কি ধরণের অন্ত:সম্পর্ক রয়েছে তাও এই শাখা ব্যাখ্যা করে থাকে।

২৩) শিক্ষামূলক গবেষণা (Educational Research) : শিক্ষার এই শাখাটি ক্রমবর্ধমান এবং এই শাখার দ্বারা শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা গভীরভাবে আলোকপাত করা হচ্ছে এবং কি কি সম্ভাব্য উপায়ে সেই সমস্ত সমস্যার সমাধান সম্ভব তার একটি বিজ্ঞান সম্মত ব্যাখ্যা প্রদান করে এবং আরও নতুন নতুন ক্ষেত্রে গবেষণার পথ চিহ্নিত করতে সহায়তা করে।

২৪) বিদ্যালয়ভিত্তিক কর্মসূচি (School based Activities) : শিক্ষক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন কোর্সের মধ্যে শিক্ষা বিষয়ে বিদ্যালয় ভিত্তিক কর্মসূচি নতুন কলেবরে অর্ন্তভুক্ত হয়েছে। শিক্ষার এই নতুন শাখাটি একজন শিক্ষকের কি কি কর্মসূচি করণীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য সারা বৎসরব্যাপী সেই সমস্ত দিকে দৃষ্টিপাত করে এবং বিভিন্ন বিদ্যালয় ভিত্তিক কর্মসূচি যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায় তার প্ররিনত আলোকপাত করে।

২৯) শিক্ষাসংক্রান্ত প্রক্রিয়া (Pedagogical Process in Education) : শিক্ষা বর্তমানে একাধারে আর কলা নয়, তা বিজ্ঞানও নয়। বরং তা হল 'কলা ও বিজ্ঞানের' অভূতপূর্ব সমন্বয়। বিভিন্ন শ্রেণি ও বিষয়ভেদে কিভাবে কি কি পদ্ধতি ব্যবহার করে পড়ানো উচিত। কিভাবে পাঠটীকা প্রণয়ন ও ব্যবহার করতে হয় সময় তালিকা প্রণয়ন ইত্যাদি এই শাখা ব্যবহার করতে শেখায়।

৩০) তুলনামূলক শিক্ষা (Comparative Education) : বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্য, পরিবর্তন, বিবর্তন ইত্যাদি এই শাখা বানাতে সাহায্য করে। ফলে কোন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় কি কি ঘাটতি রয়ে গেছে শুধু তাই জানা যায় না বরং জানা যায় সেই সমস্ত ঘাটতি কিভাবে দূর করা যাবে তাও।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এই কথা বলা যায় যে শিক্ষাবিজ্ঞান একটি শাস্ত্র হিসাবে তার পরিধির ক্রমবিস্তার ঘটাচ্ছে এবং শিক্ষাবিজ্ঞানের কেবলমাত্র তাত্ত্বিক বিষয়সমূহই নয় প্রয়োগমূলক বিষয়সমূহও রয়েছে। *প্রতিটি বিজ্ঞান পদ্ধতির মধ্যে তিনটি স্তর আছে সেগুলো হল-*

ক) পর্যবেক্ষণ (Observation)

খ) পরীক্ষণ (Experiment)

গ) সিদ্ধান্ত (Infernce)

শিক্ষাবিজ্ঞানও এই তিনটি বিষয়ের সাহায্যে কোন পরীক্ষা নির্ভর সত্যকে আবিস্কার করার চেষ্টা করে। শিক্ষা বিজ্ঞান তার পরিধির ক্রম:বিস্তার ঘটাচ্ছে এবং শিক্ষাবিজ্ঞান যে সমস্ত নীতির উপর ভিত্তি করে এগুচ্ছে তার কিছু হল

১) জানা থেকে অজানা (From Known to Unknown)
২) সরল থেকে জটিল (From Simple to Complex)
৩) প্রত্যক্ষ থেকে অপ্রত্যক্ষ (From Direct to Indirect)
৪) মূর্ত থেকে বিমূর্ত (From Concreat to Indirect)

ফলে শিক্ষার পরিধি অতি বিস্তার লাভ করেছে। সমাজবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হিসাবে শিক্ষাবিজ্ঞান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তৃতীয় একক

শিক্ষার উপাদান

শিক্ষার তিনটি রূপ বা ধারা বর্তমান। যথাক্রমে —

- বিধিমুক্ত শিক্ষা (Informal Education)
- বিধিবন্ধ শিক্ষা (Formal Education)
- অবিধিবন্ধ শিক্ষা (Non-formal Education)

এই তিনটি ধারাতেই শিক্ষার চারটি উপাদান প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বর্তমান। এই চারটি উপাদান সর্বাপেক্ষা বেশি লক্ষ্যনীয় তা হল বিধিবন্ধ শিক্ষা । শিক্ষার চারটি উপাদান মূলত দুপ্রকার। যথা—

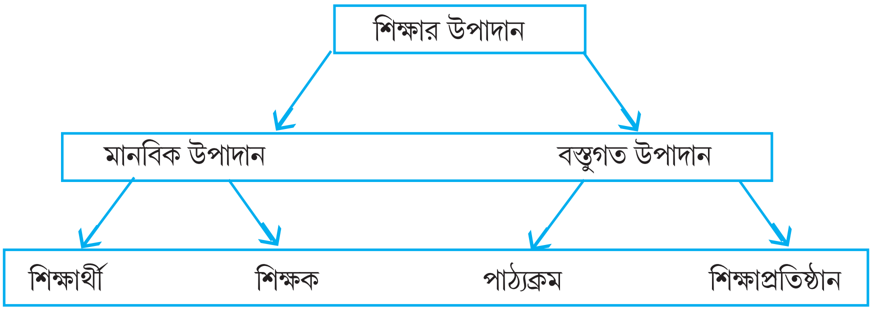

প্রথমে এই চারটি উপাদান সম্পর্কে প্রথমে ধারণা লাভ করা হবে এবং পরে এদের পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারে ধারণা প্রদান করার চেষ্টা করা হবে।

♦ শিক্ষার্থী ♦ শিক্ষখ ♦ পাঠ্যক্রম ♦ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

♦ **শিক্ষার্থী :** শিক্ষার্থী কে? এই প্রশ্ন সর্বপ্রথমেই আসে। শিক্ষার্থী হল যে শিক্ষাগ্রহণ করতে আসে। শিক্ষার্থী হল এক জৈব মানবীয় সত্তা। শিক্ষার্থীকে ভিত্তি করেই শিক্ষার সূত্রপাত কারণ শিক্ষার্থী ছাড়া শিক্ষক, পাঠ্যক্রম, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এর ভিত্তিই কল্পনা করা যায় না।

প্রাচীনকালে শিক্ষার্থীর মধ্যে জ্ঞান সঞ্চালন করার প্রক্রিয়াই হল শিক্ষা আর আধুনিককালে শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত গুণাবলীর বিকাশ ঘটানোর প্রক্রিয়াই হল শিক্ষা। শিক্ষার্থীর বুদ্ধি, আগ্রহ, প্রেষণা, অনুরাগ, প্রক্ষোভ, সৃজনক্ষমতা ইত্যাদির বিকাশ যাতে সর্বাত্মক হয় সেই প্রচেষ্টাই বর্তমান শিক্ষায় করতে হবে। শিক্ষার্থী প্রতিনিয়িত তার আচার-আচরণ, সক্রিয়তা, বিচারবুদ্ধি, অভিজ্ঞতা ইত্যাদির দ্বারা শিক্ষালাভ করার চেষ্টা বজায় রাখে। শিক্ষার্থীর দ্বারা সমাজ ব্যবস্থা এগিয়ে চলে কারণ বর্তমানের শিক্ষার্থী হল ভবিষ্যতের নাগরিক সুতরাং শিক্ষার্থীর প্রয়োজন অনুযায়ী তাকে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়াতেই শিক্ষার সার্থকতা।

শিক্ষার্থীর কাছে শিক্ষাগ্রহণ করার ক্ষমতাটি হল সহজাত এবং এর নাম হল নমনীয়তা। এই নমনীয়তার দ্বারা শিক্ষার্থী পূর্ব আচরণ পরিবর্তন ও পরিমার্জন সাধন করে নতুন আচরণ সম্পন্ন করতে পারে এবং এই ক্ষমতার দ্বারাই শিক্ষালাভ করা সম্ভবপর হয়ে থাকে। প্রতিটি শিক্ষার্থীর পূর্ণক্ষমতা বিকাশ করাই হল শিক্ষার কাজ। কিন্তু শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে আসে একটা নির্দিষ্ট পরিবেশ থেকে এবং বিরাট একটা সময় তাকে সেই

পরিবেশেই থাকতে হয়। ফলে পরিবেশের প্রভাব কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না। পরিবেশ অনেক প্রকারের হয়ে থাকে যথা- প্রাকৃতিক পরিবেশ, সামাজিক পরিবেশ, অর্থনৈতিক পরিবেশ, সাংস্কৃতিক পরিবেশ, রাজনৈতিক পরিবেশ ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীর বাসস্থানের প্রাকৃতিক পরিবেশ শিক্ষার্থীর উপর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই স্থানের আবহাওয়া, ঋতু (গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত) ইত্যাদির তীব্রতা ও দীর্ঘতা শিক্ষার্থীর উপর শিক্ষা সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। প্রাকৃতিক পরিবেশ শিক্ষার্থীর শিক্ষার অনুকূল ও প্রতিকূলও হতে পারে কিন্তু প্রতিকূল হলে শিক্ষার্থীকে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

সামাজিক পরিবেশ বলতে বুঝায় যে স্থানে শিক্ষার্থী থাকে তার পারিপার্শ্বিক প্রতিবেশিদের আর্থিক ক্ষমতা, শিক্ষার মাত্রা, বাসস্থানের ধরন ইত্যাদি বুঝায়। আর্থিক ক্ষমতা হতে পারে উচ্চ আয়ভুক্ত, নিম্ন আয়ভুক্ত, অতি নিম্নআয়ভুক্ত পরিবার, শিক্ষার মাত্রা বলতে বুঝায় যে প্রতিবেশি পরিবারগুলো কি উচ্চশিক্ষিত নিম্নলিখিত নাকি নিরক্ষর, বাসস্থান কি শহরে না কি গ্রামে নাকি আধা শহুরে — এই সমস্ত কিছুর উপর শিক্ষার্থীর শিক্ষা অর্জন করার বিষয়টি বহুলাংশে নির্ভর করে।

শিক্ষার্থীর মানসিক পরিমণ্ডল এর বেড়ে উঠা বহুলাংশে নির্ভর করে তার পারিপার্শ্বিক সাংস্কৃতিক পরিবেশের উপর। সাংস্কৃতিক পরিবেশ হল পারিপার্শ্বিক লোকদের লোকাচার রীতিনীতি, বিভিন্ন ধরনের সংস্কার ইত্যাদি। পারিপার্শ্বিক সংস্কৃতি যদি সুস্থ ও সুন্দর হয় তবে শিক্ষার্থীর শিক্ষালাভ করা অনেকটাই সহজ হয় ।

রাজনৈতিক পরিবেশের প্রভাবে ও শিক্ষার্থীর শিক্ষা প্রভাবিত হয়। যদি দেশটি গণতান্ত্রিক/স্বৈরতান্ত্রিক/একনায়কতান্ত্রিক মতাদর্শে পরিচালিত হয়, তবে শিক্ষার গতি প্রকৃতি সম্পূর্ণ পৃথক হয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শিক্ষার্থীর শিক্ষালাভের পথ অনেকটাই সুগম হয়ে থাকে অন্যান্য মতাদর্শ দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্র থেকে।

একজন মানব শিশুর শৈশবকাল অন্যান্য প্রাণীদের থেকে অনেকাংশে দীর্ঘ হয়, ফলে শিশু অনেক কিছু শেখার বিষয় পায় এবং শিশু যখন শিক্ষার্থী হিসাবে বিদ্যালয়ে আসে তখন সে একটি সুনিয়ন্ত্রিত ও সুসংগঠিত পরিবেশ পেয়ে থাকে যেখানে তার অবাঞ্ছিত আচরণগুলোর পরিমার্জনা ও সংশোধন করতে শিখানো হয়। শিক্ষার মাধ্যমেই শিক্ষার্থী তার জীবনকে সুষ্ঠু ও সার্থক করে তুলতে পারে এবং জীবন সন্তোষজনক পথে এগোতে পারে। বর্তমান সমাজ অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ত যদি সমাজে সভ্যতার অস্তিত্ব কল্পনাহীন হয়ে পড়ত যদি সমাজ ব্যবস্থায় শিক্ষা বহমান না হত তার শিক্ষার বহমানতার মূল স্রোতই হচ্ছে শিক্ষার্থী যাকে ছাড়া শিক্ষার কোনরূপ ভিত্তি প্রোথিত করা সম্ভপর নয়।

♦ **শিক্ষক (Teacher) :** পিতা মাতাকে বলা হয় শিশুর প্রথম অভিভাবক এবং শিক্ষককে বলা হয় দ্বিতীয় অভিভাবক। প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষক বা গুরুর স্থান অনেক উচ্চে ছিল। সেই সময় শিক্ষকের ভূমিকাও ছিল বর্তমান সময়ের থেকে অনেক বেশি পৃথক। শিক্ষক ছাড়া শিক্ষার্থীর জীবন এর গতিপথ ও লক্ষ কখনো ও সম্পূর্ণ করা সম্ভব নয় কারণ শিক্ষা কখনো শিক্ষককে ছাড়া সম্পূর্ণ হতে পারে না। শিক্ষক জানেন কাকে পড়াব (Whom to Teach), কি পড়াব (What to Teach), কখন পড়াব (When to Teach), কিভাবে পড়াব (How to Teach)।

কাকে পড়াব : শিক্ষার্থী সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে শিক্ষার্থীটির বোধগম্যতা কতটুকু , তার ক্ষমতা

কতটুকু, সে কি উচ্চ মেধাবী, মাঝারি মেধাবী, নিম্ন মেধাবী শিক্ষার্থী ইত্যাদি সম্পর্কে শিক্ষকের সম্পূর্ণ ধারণা থাকলেই শিক্ষক শিক্ষাদান কার্যে সফল হতে পারবেন।

কি পড়াব : অর্থাৎ শিক্ষককে জানতে হবে কি বিষয়বস্তু বা Content এবং এই বিষয়টি কোন শ্রেণিতে পড়াবেন কারণ একই বিষয় বিভিন্ন শ্রেণিতে থাকে কিন্তু তার ব্যাপ্তি ও গভীরতা উচ্চ শ্রেণিগুলোর উপর নির্ভরশীল থাকে।

কখন পড়াব : কোন Period এ শিক্ষক পড়াতে যাচ্ছেন কারণ যে বিষয় পড়াতে যাচ্ছেন তা যদি প্রথম দিকে Period এ হয় বা তা যদি শেষের পিরিয়ড এর দিকে হয় তবে শিক্ষককে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে শিক্ষার্থীদের শারীরিক স্ফুর্ততা, ক্লান্তি ইত্যাদি ব্যাপারগুলো। প্রথম পিরিয়ড এ যে পরিমাণ শারীরিক স্ফুর্ততা থাকে শেষের পিরিয়ড এ অনেকটা ক্লান্তি পরিলক্ষিত হয়। তাই কখন পড়ানো হচ্ছে যে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কিভাবে পড়াব : শিক্ষন পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষকের সম্পূর্ণ ধারণা থাকতে হবে। বিদ্যালয় এর ভৌগোলিক অবস্থান শিক্ষার্থীদের বোধগম্যতা, বিষয়ের গভীরতা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে থাকে শিক্ষক কি শিক্ষন পদ্ধতি ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের পড়াবেন।

শিক্ষককে অবশ্য খেয়াল রাখতে হবে শিক্ষনের কিছু মৌলিক নীতি সম্পর্কে যার কিছু হল নিম্নরূপ—

(১) নির্বাচনের নীতি : শিক্ষন-শিখন পরিবেশকে সদৃশশালী করতে যে সমস্ত বিষয় প্রয়োজন তার উপর গুরুত্ব প্রদান করা উচিত।

(২) প্রেষণার নীতি : শিখনের মূল ভিত্তি হল প্রেষণা এবং শিক্ষক যে উপযুক্ত প্রেষণা সঞ্চার করার উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

(৩) বৈচিত্র্যের নীতি : প্রতিটি শিক্ষার্থীর শিখন ক্ষমতা পৃথক তাই শিক্ষার্থীদের শিখনের জন্য নানারকম ক্রিয়াকলাপের ব্যবস্থা করবেন যেমন শিক্ষামূলক ভ্রমণ, সমস্যা-সমাধান মূলক, শিখন শিক্ষামূলক খেলা, নাটক, বিতর্ক ইত্যাদি।

(৪) পরিবেশের সঙ্গে অনুবন্ধনের নীতি :শিখনকে স্থায়ী ও অর্থবহ করে তোলার জন্য বিদ্যালয়ের চার দেওয়ালের বাইরের আর্থ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশকে শিখনের সাথে যুক্ত করবেন।

(৫) প্রতিক্রিয়ার নীতি : শিক্ষার্থীদের থেকে Feedback বা প্রতিক্রিয়া গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষক অবগত হতে পারবেন যে শিক্ষার্থীরা কতটুকু শিখতে পেরেছে এবং শিক্ষার্থীদের সক্ষমতা ও দুর্বলতার ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন।

(৬) ব্যক্তিগত পার্থক্যের নীতি : প্রতিটি শিক্ষার্থী একে অপরের থেকে তাদের মেধা, চিন্তন, মনন, বুদ্ধি, অনুরাগ, প্রক্ষোভ, প্রেষণা, দৈহিকভাবে আলাদা তাই শিক্ষককে পৌছানোর সময় ঐ সমস্ত বিষয়গুলো মাথায় রাখতে হবে।

(৭) সার্বিক বিকাশের নীতি : বিভিন্ন ধরনের পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী এবং সহ:পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যাতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে ও যাতে তাদের সার্বিক বিকাশ হয় তা সুনিশ্চিত করা।

(৮) সহজ থেকে কঠিনের নীতি : শিক্ষন কর্মে পরিচালনা করবেন শিক্ষক সহজ থেকে কঠিনের নীতির দ্বারা অর্থাৎ সহজ বোধগম্য বিষয় থেকে কঠিনের দিকে বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করবেন উপযুক্ত উদাহরণ সহকারে।

(৯) জানা থেকে অজানার নীতি : শিক্ষক তার শিক্ষণকার্যে পরিচালনা করবেন যাতে শিক্ষার্থী জানা থেকে অজানার দিকে যেতে পারে। ফলে শিখন অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক হয়।

(১০) মূর্ত থেকে বিমূর্তের নীতি : মূর্ত মানে হচ্ছে Concreate অর্থাৎ যা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় আর বিমূর্ত হচ্ছে Abstract মানে যা পঞ্চ ইন্দ্রিয়েরও বাইরে। শিক্ষক এই চেষ্টা করে থাকবেন যাতে শিক্ষা মূর্ত থেকে বিমূর্তের দিকে যায়।

(১০) সমগ্র থেকে অংশের নীতি : শিক্ষা হতে হবে সমগ্র থেকে অংশের দিকে (From Whole to Part) ফলে শিক্ষার্থীর শিক্ষা সামগ্রিক হবে।

(১২) সাধারণ থেকে নির্দিষ্টকরণের নীতি : শিক্ষক প্রথমে সাধারণ বিষয়গুলো পাঠদান করবেন এবং এরপর নির্দিষ্টকরণের দিকে শিক্ষাদান করবেন।

ইহা ছাড়াও শিক্ষক পাঠদানকালে বিভিন্ন নীতির প্রয়োগ করে থাকবেন যাতে শিক্ষা সার্থক পথে এগিয়ে যেতে পারে। শিক্ষককে খেয়াল রাখতে হবে যে শিক্ষণকার্য মূল তিনটি অংশে বিভক্ত।

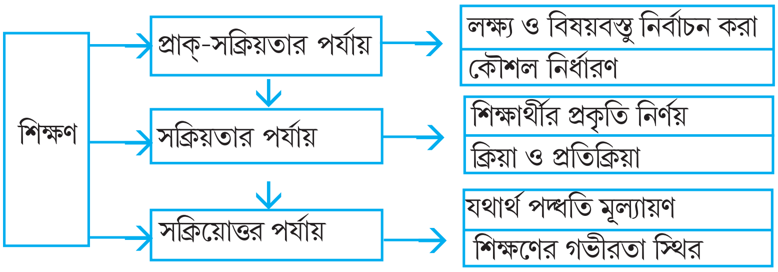

শিক্ষক তা খেয়াল রেখে শিক্ষা প্রদান করবেন।

ইহা ছাড়াও একজন শিক্ষককে কিছু বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হয় কারণ তিনি হলেন মূল অনুঘটক বা Catalyst যিনি শিক্ষার্থে পাঠ্যক্রম এর মধ্যে অনুঘটকের কাজ করেন। একজন শিক্ষকের কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল নিম্নরূপ —

(১) চরিত্র : একজন শিক্ষক উপযুক্ত চরিত্রবান হবেন এবং তার আচার আচরণ শিক্ষার্থীর উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে থাকে তাই তার আচার ব্যবহার যাতে অনুকরণযোগ্য হয় সে ব্যাপারে শিক্ষককে যথেষ্ট খেয়াল রাখতে হবে।

(২) পেশার প্রতি ভালবাসা: শিক্ষকতা হল এমন একটি পেশা যা অত্যন্ত মহান পেশা ও মানুষ তৈরির পেশা। তাই অন্তরের থেকে এই পেশাকে ভালবাসতে হবে। শুধু অর্থ উপার্জনের মাধ্যম হিসাবে এই পেশাকে গ্রহণ করলে হবেনা।

(৩) নিয়মানুবর্তিতা : সময়মত বিদ্যালয়ে আসা, শ্রেণিকক্ষে যাওয়া, কার্য সম্পাদন করা ইত্যাদি দ্বারা একজন শিক্ষক সবার সামনে সময়ের গুরুত্ব সম্পর্কে সবাইকে সচেতন করতে পারেন এবং অনুকরণযোগ্য হতে পারেন।

(৪) ন্যায় ও নিরপেক্ষতা : একজন শিক্ষকের কাছে সমস্ত শিক্ষার্থীই সমান হবেন এবং কোন শিক্ষার্থীকে তিনি পক্ষপাতিত্বমূলক ব্যবহার করবেন না।

(৫) ধৈর্য্য : কোন কোন শিক্ষার্থী শিক্ষকের পাঠ একবারেই বুঝতে পারবে আবার কোনো কোনো শিক্ষার্থীর জন্য তা কয়েকবার ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। এই সমস্ত ব্যাপারে শিক্ষককে চূড়ান্ত ধৈর্য্যের অধিকারী হতে হবে।

(৬) জ্ঞানার্জনের স্পৃহা : শিক্ষার বিষয়বস্তু ক্রমশই পরিবর্তনশীল তাই নিত্যনতুন জ্ঞানের সাথে শিক্ষককে সর্বদা জ্ঞান অর্জনের প্রচেষ্টা বজায় রাখতে হবে এবং তিনি নিজে হবেন একজন সারাজীবনব্যাপি শিক্ষা শিক্ষার্থীরা বা Life Time Learner.

(৭) দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য : শিক্ষার্থীর দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য যাতে সর্বদা সঠিক থাকে এই প্রচেষ্টা শিক্ষককে সর্বদা বজায় রাখতে হবে কারণ শরীর ও মন এই দুইয়ের ভারসাম্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

(৮) শিশুর প্রতি ভালোবাসা ও আগ্রহ : পেশার ক্ষেত্রে প্রতিটি শিশু তার বুদ্ধি, চিন্তন, মনোযোগ, প্রেষণা, প্রক্ষোভ, অনুরাগ ইত্যাদিতে পৃথক। তাই শিক্ষকের প্রয়োজন প্রতিটি শিক্ষার্থীকে ভালভাবে জানা এবং এর জন্য প্রয়োজন তার শিক্ষার্থীর প্রতি ভালোবাসা ও আগ্রহ।

(৯) মনোবিদ্যার জ্ঞান : শিক্ষকের প্রয়োজন মনোবিদ্যার তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিকগুলো সম্পর্কে বিশদভাবে জানা কারণ বর্তমানে শিক্ষণ মনোবিদ্যার দ্বারা প্রভাবিত। তাই শিক্ষণকে সার্থক করতে হলে শিক্ষককে মনোবিদ্যার জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়।

(১০) সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর জ্ঞান : শিক্ষককে শুধুমাত্র পাঠ্যক্রমিক বিষয়ের জ্ঞান থাকলেও হবে না তাকে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যের উপর জ্ঞান থাকতে হবে।

(১১) গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি : সবাইকে সমান দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখা ও সবাইকে সমান কাজের সুযোগ প্রদান করা হল শিক্ষকের কর্তব্য কারণ এর দ্বারা শিক্ষক কর্মক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করতে পারবেন।

(১২) বিষয়ের জ্ঞান : একজন শিক্ষককে পাঠদানের বিষয়বস্তুর উপর অত্যন্ত গভীর জ্ঞান থাকতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন করলে তিনি তার উত্তর প্রদান করতে পারেন প্রাঞ্জলভাবে।

(১৩) সৃজনশীলতা : একজন শিক্ষক হবেন যথেষ্ট সৃজনশীল। তিনি তার কার্যধারা গতানুগতিক বৃত্তের বাইরে গিয়ে সম্পন্ন করবেন যাতে একঘেঁয়েমীমূলক না হয় তার শিক্ষণ।

(১৪) শিক্ষণ দক্ষতা : বিভিন্ন শিক্ষামূলক উপাদান এর ব্যবহার, প্রশ্ন, ব্যাখ্যা, ব্ল্যাকবোর্ডের ব্যবহার, ফিডব্যাক, পুনরাবৃত্তি ইত্যাদির উপর পূর্ণ দখল থাকতে হবে।

(১৫) মূল্যায়ণে দক্ষতা : যেহেতু প্রতিটি শিক্ষার্থীর মেধা ও বোধগম্যতার স্তর সমান হয় না তাই শিক্ষককে মূল্যায়ণের সময় খেয়াল রাখতে হবে প্রতিটি শিক্ষার্থীর যাতে মূল্যায়ণ হয় এবং মূল্যায়ণের বিভিন্ন কৌশল সম্পর্কে জানতে হবে।

(১৬) গোঁড়ামি থেকে মুক্ত : শিক্ষক হবেন সমস্ত ধরনের ধর্মীয়, রাজনৈতিক গোঁড়ামি থেকে মুক্ত এবং তিনি হবেন বিজ্ঞান ভিত্তিক ও যৌক্তিক মানসিকতা সম্পন্ন।

♦ **পাঠ্যক্রম (Curriculum) :** এনসাইক্লোপেডিয়া বিট্রানিকাতে (Encyclopaedia Britannica Curriculum বা পাঠ্যক্রম সম্পর্কে বলা হয়েছে “A course of study laid down for the students of a university or school, or in a wide sense, for schools of certain standards”.

পাঠ্যক্রম শব্দটির উৎপত্তি ল্যাটিন শব্দ 'Cureere' থেকে যার অর্থ হল দৌড়। সুতরাং পাঠ্যক্রম বা Curriculum শব্দের মূল কথা হল নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য পথ। (A course to be run for reaching a certain goal.)

রস এর মতে পাঠ্যক্রমের মধ্যে বৌদ্ধিক, অনুভূতিমূলক ও মন:সঞ্চালনমূলক কার্যাবলীর অর্ন্তভুক্ত। (Ross - 'Curriculum includes congitive, affective and psychomotor activities).

ফ্রয়েবেলের মতে পাঠ্যক্রম হল মানবজাতির সার্বিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সুসমন্বিত রূপ। (Froebel- 'Curriculum should be conceived as an epitome of the rounded whole of the knowledge and experience of the human race.')

ক্যানিংহাম এর মতে পাঠ্যক্রম হল শিল্পীর (শিক্ষকের) হস্তে এমন যন্ত্রপাতি যার সাহায্যে তিনি তার উপাদানকে (শিক্ষার্থীকে) তাঁর চিন্তাভাবনা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী তাঁর কর্মস্থলে (বিদ্যালয়ে) রূপ দিতে পারেন।

(Cunningham- 'Curriculum is the tool in the hands of the artist (the teacher) to mould his materials (pupils) according to his ideals (aims and objectives) in his studio (school)'.

কিলপ্যাট্রিক এর মতে পাঠ্যক্রম বাস্তবজীবনের প্রতিফলন ঘটায়। (Kilpatrick- 'Curriculum manifests life in its reality.'

বর্তমান শিক্ষায়শিক্ষার উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু, পদ্ধতি ও মূল্যায়ণ — এই চারটি উপাদানের সার্থক সমন্বয়ে যে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় তাই হল পাঠ্যক্রম।

পাঠ্যক্রম নির্ধারণের মূলনীতি :

১) শিক্ষাশ্রয়ী দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠাতার নীতি : শিক্ষাশ্রয়ী দর্শন ছাড়া কোন নীতি গ্রহণ করলে পাঠ্যক্রমের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে, শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্ভর করে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের উপর এবং শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ভর করে শিক্ষাশ্রয়ী দর্শন শাস্ত্রের সংব্যাখ্যানের উপর।

২) ব্যক্তির চাহিদা ও সমাজের চাহিদার সমন্বয়ের নীতি : পাঠ্যক্রমের উপর নির্ভর করছে শিক্ষার পূর্ণতা। ব্যক্তির ও সমাজের চাহিদা উভয়েই যাতে পূর্ণ হয় তার খেয়াল রাখতে হবে।

৩) ব্যক্তি বৈষম্যের নীতির উপর প্রতিষ্ঠাতার নীতি : প্রতিটি শিক্ষার্থী একটি পৃথক সত্তা, নিজস্ব বৈচিত্র, বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে সে অন্য শিক্ষার্থী থেকে পৃথক। তাই পাঠ্যক্রম এমন ভাবে তৈরি করতে হবে যাতে সকল শিক্ষার্থীর বিকশিত হবার সুযোগ থাকে।

৪) বহুমুখী ও বৈচিত্র্যময়তার নীতি : পাঠ্যক্রম হতে হবে বহুমুখী ও বৈচিত্র্যময় এবং শিক্ষার্থীর বিভিন্ন আগ্রহ, প্রবণতা, রূচি ও সামর্থ্যতা যাতে বিকশিত হতে পারে যে দিক সুনিশ্চিত করতে হবে। তাছাড়া শিক্ষার্থীর শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক ভবিষ্যত পন্থাটি নির্ণয় করার জন্য ও পাঠ্যক্রমকে বহুমুখী ও বৈচিত্রময় হতে হবে।

৫) ব্যক্তি ও সমাজজীবনের প্রস্তুতির নীতি : পাঠ্যক্রম হতে এমন যাতে এর দ্বারা শিক্ষার্থী ভবিষ্যতে সমাজের যোগ্য নাগরিক হতে পারে এবং সমাজে সমস্ত কাঙ্খিত আচরণ শিক্ষার্থীর মধ্যে বিকশিত হতে পারে।

৬) জীবনকেন্দ্রিকতার নীতি : পাঠ্যক্রম এর একদিকে জীবনকেন্দ্রিকতার নীতি থাকতে হবে শিক্ষার্থীর পূর্বগামীদের সযত্ন সঞ্চিত সংস্কৃতি ও চিন্তাধারার কল্যাণকর প্রভাব আর একদিকে থাকবে শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্যময় ভবিষ্যত জীবনের প্রস্তুতির জন্য আয়োজন।

৭) কর্মকেন্দ্রিকতার নীতি : পাঠ্যক্রমকে কর্মকেন্দ্রিক করে তুলতে হলে শিক্ষার্থীর সক্রিয়তাকে গুরুত্ব দিতে হবে এবং শিক্ষার্থী বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সমাধান কর্মসূচি ইত্যাদি সম্পাদন করবে।

৮) পরিবর্তনশীলতার নীতি : পাঠ্যক্রম কখনই অপরিবর্তনীয় ও চিরস্থায়ী হবে না। শিক্ষার্থীর প্রয়োজনে পাঠ্যক্রম যেমন প্রণয়ন করা হয় ঠিক তেমনি শিক্ষার্থীর প্রয়োজনে পাঠ্যক্রম নীতি পরিবর্তন এর ব্যবস্থাও রাখতে হবে।

৯) অবসর যাপনের শিক্ষার নীতি : অবসরের সময় শিক্ষার্থী কিভাবে তার সময়কে গঠনমূলক কাজের মধ্য দিয়ে সার্থক করে তুলতে পারবে যে বিষয়টিও আবশ্যিক গুরুত্ব পাবে।

১০) শিক্ষার্থীর চাহিদা পূরণের নীতি : একজন শিক্ষার্থীর বিভিন্ন ধরনের সামাজিক, মানসিক, নান্দনিক, ভাষাগত, প্রক্ষোভগত বিভিন্ন ধরনের চাহিদা বিদ্যমান থাকে। সেগুলো যাতে বিপথে না গিয়ে সঠিক পথে পরিচালিত হতে পারে পাঠ্যক্রমে তা গুরুত্ব পাবে।

১১) শিক্ষার্থীর মূল্যায়ণ : শিক্ষার্থী পারদর্শিতার নিরিখে হতে পারে— উত্তম, মাঝারি ও নিম্নমানের কিন্তু মূল্যায়ণে যাতে সবাই গুরুত্ব পায় এবং মূল্যায়ণ যাতে পক্ষপাতিত্বহীন হয় সে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব পাবে।

১২) ধারাবাহিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণতার নীতি : পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্তু হবে ধারাবাহিক এবং একে অপরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। হঠাৎ করে কোন বিষয় উপস্থাপিত হতে পারবে না অসামঞ্জস্যহীন ভাবে।

১৩) সৃজনশীলতার নীতি : পাঠ্যক্রমের দ্বারা শিক্ষার্থীর যাতে বিভিন্ন ধরনের কার্য নিজেরা সম্পাদিত করতে পারে গতানুগতিক বৃত্তের বাইরে যে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব পাবে।

১৪) সংরক্ষণের নীতি : শিক্ষার দ্বারা সমাজে বিভিন্ন রীতি-নীতি, জ্ঞান, ঐতিহ্য, আচার আচরণ ইত্যাদি যাতে সংরক্ষিত হতে পারে তা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে।

১৫) সক্রিয়তার নীতি : বর্তমানে শিক্ষা হল শিক্ষার্থীর কর্মকেন্দ্রিকতা বা কর্মসঞ্চালনের উপর নির্ভরশীল তাই শিক্ষার্থীকে হতে হবে সক্রিয় এবং সে যাতে নিষ্ক্রিয় না হয়ে পাঠ্যক্রমের দ্বারা সামর্থকভাবে জ্ঞান আহরণ করতে পারে তা সুনিশ্চিত করার ব্যবস্থা থাকবে।

১৬) ব্যবহারিকতার নীতি : পাঠ্যক্রমের বিষয়গুলো এমনভাবে নির্বাচন করা উচিত যাতে সেগুলো শিক্ষার্থীদের জীবনের সঙ্গো, সমাজের সঙ্গো সম্পর্কযুক্ত হয় এবং শিক্ষার্থী যাতে সমাজ জীবনে তার প্রতিফলন ঘটাতে পারে।

১৭) ক্রমবিন্যাসের নীতি : পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত বিভিন্ন বিষয়বস্তু এমনভাবে ক্রমবিন্যাসিতভাবে নির্বাচিত হতে হবে তা যাতে শিক্ষার্থীর মানসিক ময়স অনুযায়ী হয়।

১৮) অগ্রমুখীনতার নীতি : পাঠ্যক্রম দ্বারা যাতে শিক্ষার্থী ভবিষ্যতের উপযোগী হয়ে উঠতে পারে তা সুনিশ্চিত করার দিকটি লক্ষ্য রাখতে হবে।

১৯) গণতান্ত্রিকতার নীতি : শিক্ষার্থীদের মধ্যে যাতে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ গড়ে উঠে এবং সবাইকে

সমান মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে পারে তা পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্তুর মাধ্যমে সুনিশ্চিত করতে হবে।

২০) নৈতিকতার নীতি : নৈতিকতা ও মূল্যবোধ ছাড়া কোন মানুষ সম্পূর্ণ হতে পারে না। তাই পাঠ্যক্রমের দ্বারা যাতে শিক্ষার্থীদের নৈতিকতা ও মূল্যবোধ জাগ্রত করানো যায় তা খেয়াল রাখতে হবে।

পাঠ্যক্রম গঠনের বিবেচ্য বিষয় :

১) শিক্ষার উদ্দেশ্য : যে লক্ষ্যকে সামনে রেখে পাঠ্যক্রম তৈরির কথা ভাবা হয়, সেই সমস্ত লক্ষ্যগুলো পূর্ণ করা যায় তা খেয়াল রাখতে হবে।

২) বিষয়বস্তুর প্রকৃতি : ভাষা, বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান এর অন্তর্গত বিভিন্ন বিষয় রয়েছে কিন্তু প্রতিটি বিষয়ের প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য, গঠন আলাদা — এসমস্ত বিষয়গুলো অবশ্যই উপেক্ষিত হতে পারবে না।

৩) শিশুর বিকাশ : পাঠ্যক্রমের মূল সাফল্য নির্ভর করছে শিক্ষার্থীদের উপর। শিক্ষার্থীদের সামাজিক, প্রাক্ষোভিক, নান্দনিক, ভাষাগত বিকাশ ইত্যাদি হয়ে থাকে। পাঠ্যক্রমের দ্বারা এই সমস্ত বিকাশগুলো যাতে গুরুত্ব পায় তা নিশ্চিত করতে হবে।

৪) সামাজিক বিষয় : পাঠ্যক্রম প্রণয়নে সমাজের ঐতিহ্য, মূল্যবোধ, আচার আচরণ বিশ্বাস, প্রথা, লোকাচার ইত্যাদি সামাজিক বিষয়গুলো যাতে উপেক্ষিত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৫) আর্থিক বিষয় : শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিষয় যেমন একটি শিক্ষাবর্ষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাজেট কতটুকু এবং তা কতটুকু বাস্তবায়ন করা সম্ভব — এ বিষয়গুলোও পাঠ্যক্রমের দ্বারা উপেক্ষিত হতে পারবে না।

৬) পরিবেশগত বিষয় : অতীতে মানবজাতি ছিল, বর্তমানে রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও যদি পৃথিবীতে বসবাস করতে চায় তবে তার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত পরিবেশ বিষয়ক জ্ঞান, যার দ্বারা প্রাকৃতিক পরিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নতিকরণ কিভাবে তা শিখানো হবে। পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্তুর দ্বারা সে সমস্ত বিষয় সুনিশ্চিত করতে হবে।

৭) প্রাতিষ্ঠানিক বিষয় : যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠ্যক্রম সঞ্চালিত হবে তার বস্তুগত ও মানব সম্পদ পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে কিনা তা খেয়াল রাখতে হবে অর্থাৎ পর্যাপ্ত পরিমাণে বেঞ্চ, আসবাবপত্র, শিক্ষা সহায়ক উপকরণ, শিক্ষক ও অশিক্ষিক কর্মচারী বিদ্যমান কিনা তা খেয়াল রাখা।

৮) শিক্ষক সম্পর্কিত বিষয় : পাঠ্যক্রম শিক্ষার্থীদের কাছে সঞ্চালিত হবে শিক্ষকদের দ্বারা। তাই শিক্ষকরা যাতে উপযুক্ত গুণমানসম্পন্ন হয় সে বিষয়টি অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে।

৯) পরিবর্তনশীল বিষয় : পাঠ্যক্রম হল সমাজের মূল চালিকা শক্তি এবং সমাজে পরিবর্তন একটি চিরন্তন সত্য। সুতরাং পাঠ্যক্রমকেও সমাজের পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তন করার বিষয়ও সুযোগ বর্তমানে রাখতে হবে।

১০) আন্তর্জাতিকতাবোধ বিষয় : একজন শিক্ষার্থীকে পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে সৌভ্রাতৃত্ববোধ, বিশ্বনাগরিকতার শিক্ষার বিষয়টি উপস্থিত থাকতে হবে যাতে সে কোন ধরনের সংকীর্ণ গোঁড়ামির স্বীকার না হয়, সে হয়ে উঠতে পারে প্রকৃত অর্থে বিশ্ব নাগরিক।

(ঘ) শিক্ষাগত প্রতিষ্ঠান (Educational Institution) : শিক্ষার অপর গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হল জড় উপাদান ও মানবিক উপাদানের এক সমন্বয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জড় উপাদান হল আসবাবপত্র, কক্ষ, পানীয় জলের ব্যবস্থা, লাইব্রেরি, ক্যান্টিন, শিক্ষা সহায়ক উপকরণ ইত্যাদি। আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মানবীয় উপাদান হল শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারী ইত্যাদি। শিক্ষাগত প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে সমাজের প্রয়োজনে যাতে সমাজে ব্যক্তির জীবনকে সুসংগঠিত করতে পারে প্রত্যক্ষভাবে ও পরোক্ষভাবে সমাজও সুসংগঠিত হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হল এমন একটি মাধ্যম যার দ্বারা শিক্ষার্থীদের সম্পূর্ণ জীবনের জন্য প্রস্তুত করে দেওয়া যায় বহুলাংশে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ হল বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি। যেকোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরই অনেক কাজ থাকে এবং তার মধ্যে মুখ্য কিছু কাজ হল নিম্নরূপ —

১) শিক্ষাদান : শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বৌদ্ধিক, মন:সঞ্চালনমূলক, অনুভূতিমূলক ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষাপ্রদান করা হয় যাতে শিক্ষার্থীর জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রটির সামগ্রিক ও সর্বাত্মক বিকাশ ঘটে।

২) ব্যক্তিত্বের বিকাশসাধন : শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত বিভিন্ন পাঠ্যক্রমিক এবং সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন ঘটানো সম্ভবপর হয়।

৩) সামাজিকীকরণ : শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হল সমাজের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ এবং এখানে সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে শিক্ষার্থীরা আসে। তাই প্রতিটি স্তরের শিক্ষার্থীদের সাথে মেলামেশা করার সাথে সাথে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার রীতি-নীতি তাদের কায়দা, আচার-আচরণ ইত্যাদির সাথে পরিচয় ঘটে। ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিকীকরণ ঘটে।

৪) ঐতিহ্যের সংরক্ষণ ও সঞ্চালন : সমাজ ব্যবস্থার বিভিন্ন ঐতিহ্যের সংরক্ষণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করে থাকে এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও ঐতিহ্যের সঞ্চালন করে থাকে। এরফলে সমাজের বিভিন্ন ঐতিহ্য প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বহমান থাকে।

৫) গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ : সকলকে সমদৃষ্টিতে দেখা, সমান অধিকার, সাম্য, অধিকার ও কর্তব্য ইত্যাদির মত ভাবধারাগুলোকে বিকাশ ঘটানো হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ ঘটানো সম্ভবপর হয়।

৬) নির্দেশনা : শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীকে শিক্ষাগত, বৃত্তিমূলক ও ব্যক্তিগত- এই তিনদিকেই নির্দেশনা প্রদান করে থাকে ফলে বিভিন্ন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমস্যা সমাধানে শিক্ষার্থীরা সক্ষম হয় এবং সুস্থ মানসিক জীবন কাটাতে সক্ষম হয়।

৭) মূল্যায়ণ : শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীকে সারা বছর ব্যাপী মূল্যায়ণ করে থাকে। শিক্ষার্থী সম্পর্কীয় বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে রাখা হয় এবং তা মূল্যায়ণের কাজে ব্যবহার করা হয়। মূল্যায়ণের মাধ্যমে শিক্ষার্থী তার নির্দিষ্ট কোর্স সম্পন্ন করিতে পারে।

৮) সংশোধনমূলক কাজ : শিক্ষার্থী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে অনেক সময় কাটায় এবং বিভিন্ন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় এবং বিভিন্ন ঘটনার সঙ্গে তার মিথস্ক্রিয়া ঘটে। ফলে অনেক সময়ই অবাঞ্ছিত অসামাজিক আচরণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেখা যায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীদের সেইসমস্ত কার্য সংশোধন করে থাকে।

৯) প্রতিরোধমূলক কাজ : শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানসিক, প্রাক্ষোভিক, নান্দনিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে যে ব্যাপক পরিবর্তন দেখা যায় তা অনেক সময়ই সঠিকপথে ধাবিত হয় না। ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নানা ধরনের অসংগঠিত লক্ষ্য যায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সেই সমস্ত দিকে সঠিক প্রতিরোধের কাজ করে থাকে। ফলে শিক্ষার্থী ভবিষ্যতে সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে সঙ্গতিমূলক আচরণ করে থাকে।

১০) সমন্বয়মূলক কাজ : শিক্ষার্থী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সাথে মিথস্ক্রিয়া করে থাকে এবং বিভিন্ন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে থাকে যা প্রায়শই পরিপূরক হয় না কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হাত ধরে সেই সমস্ত অভিজ্ঞতাগুলোকে কাঙ্খিত পথে ধাবিত করা যায় ।

১১) অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার বিকাশ : প্রতিটি শিক্ষার্থীর মধ্যে বহুমুখী সুপ্ত অবস্থায় থাকে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নানাবিধ কার্যকলাপ যেমন— বিতর্কসভা, নাটক, কবিতা, নৃত্য ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার বিকাশ সাধন সম্ভবপর হয়।

১২) সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি : শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সামাজিক কার্যকলাপ করে থাকে যেমন—রক্তদান শিবির, বন্যায় সাহায্য, ভূমিকম্পে সাহায্য ইত্যাদি ফলে এই সমস্ত কার্যকলাপের মধ্যে অংশ গ্রহণের দ্বারা শিক্ষার্থীদের সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায় ও তারা নিজেদের বৃহত্তর সমাজের অংশ বলে গণ্য করতে শিখে।

শিক্ষার উপাদানগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক :

শিক্ষার্থী, শিক্ষক, পাঠ্যক্রম ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই চারটি উপাদানের পারস্পরিক সম্পর্ক যত নিবিড় হবে ঠিক ততই শিক্ষা তার কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে। আবার এই উপাদানগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক মতই বিভিন্ন হবে ততই শিক্ষা তার কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে না।

শিক্ষণ ও শিখন প্রক্রিয়ায় শিক্ষক যেহেতু অনুঘটক-এর কাজ করে। তাই শিক্ষকের ভূমিকা পাঠ্যক্রম সঞ্চালনেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জন ডিউই বলেছিলেন শিক্ষক হলেন পরিচালক ও নির্দেশক। তিনি নৌকাটি চালিয়ে নিয়ে যান, কিন্তু চালিকা শক্তির উৎস হল শিক্ষার্থী। (John Dewey- 'The teacher is a guide and director. He steers the boat but the energy that propels it must come from those who are learning.'

শিক্ষা ছিল পূর্বে একমুখী কিন্তু বর্তমানে তা বহুমুখী এবং শিক্ষকের ভূমিকা প্রধানত তিনটি —

- শিখন সহায়ক (Facilitator)
- সংযোগকারী হিসাবে (Communicator)
- মাধ্যম হিসাবে (Mediator)

◆ **শিখন সহায়ক :** শিক্ষার্থীদের নিকট শিক্ষক পাঠ্য বিষয়কে সহজ ও সুষ্ঠুভাবে তুলে ধরবেন। শিক্ষার্থীদের বয়স, বোধগম্যতার স্তর ও পাঠ্য বিষয়ের চাহিদা অনুযায়ী পাঠ্য বিষয় পাঠদানের কৌশল স্থির করে থাকেন। শিক্ষার্থীদের সক্ষমতা ও দুর্বলতা বুঝে Advanced Class এবং Remedial Class এর ব্যবস্থা করে থাকেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীর প্রয়োজন অনুযায়ী শিখন বিষয়বস্তুকে একাধিকবার উপস্থাপন করে থাকেন প্রাঞ্জলতার সহিত যাতে বিষয়টি শিক্ষার্থীর নিকট বোধগম্য হয়।

♦ **সংযোগকারী হিসাবে :** শিক্ষার্থীরা যেভাবে বুঝতে পারবে সেভাবে শিক্ষক শিক্ষা উপকরণের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের নিকট উপস্থাপন করবেন এবং শিক্ষার্থীরা যাতে তথ্য, জ্ঞান ও দক্ষতা আয়ত্ত করতে পারে সেই লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় করে তুলতে বিভিন্ন কৌশল ও শিক্ষামূলক উপকরণ ব্যবহার করবেন। Feedback নেবেন যাতে বুঝতে পারেন শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝতে পারল। যদি শিক্ষক উপযুক্ত সংযোগকারী হিসাবে কাজ করেন তবে শিখনের মাত্রাও ভাল হয়।

♦ **মাধ্যম হিসাবে :** পাঠ্যক্রম সঞ্চালনের দায়িত্ব শিক্ষক গ্রহণ করে থাকেন এবং শিক্ষার্থীর ক্ষমতা অনুযায়ী বিষয়বস্তু বিন্যাস করে শিক্ষার্থীদের নিকট উপস্থাপন করেন যাতে শিক্ষার্থীদের স্তর অনুযায়ী তাদের জ্ঞান, বোধ ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে আবেগ ও অনুভূতি সঞ্চালনের মাধ্যম হিসাবে শিক্ষক কাজ করে থাকে ফলে শিক্ষার্থীরা বিষয়ের সাথে ও শিক্ষকের সাথে একাত্মবোধ করে থাকে আর এখানেই শিক্ষকের স্থান অন্যান্য যান্ত্রিক মাধ্যম থেকে অনেক বেশি আবেদনগ্রাহ্য।

একজন শিক্ষক সর্বদা শিক্ষার্থীর গৃহের অভিভাবকদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে থাকবেন। শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত জীবনাদর্শ গড়ে তুলতে সহায়তা করে থাকবেন। শিক্ষক হবেন শিক্ষার্থীর প্রতি দায়িত্বশীল ও বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন, শিক্ষকের থাকতে হবে শিশুমনোবিজ্ঞান সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান।

শিক্ষার্থী, শিক্ষক এর সাথে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল পাঠ্যক্রম এবং পাঠ্যক্রম প্রণয়নে শিক্ষার উদ্দেশ্য হল —

- শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিক বিকাশ, প্রাক্ষোভিক বিকাশ।
- শিক্ষার্থীর নৈতিক, সামাজিক, কৃষ্টিমূলক বিকাশ।
- শিক্ষার্থীকে পরিবেশের সাথে সংগতিবিধানে সহায়তা করা।
- শিক্ষার্থীকে সক্রিয় করে তোলা।
- শিক্ষার্থীর গণতান্ত্রিক ধারণার বিকাশ ইত্যাদি।

পাঠ্যক্রম প্রণয়নে শিক্ষার্থীর চাহিদার (সামাজিক, মানসিক, নৈতিক, প্রাক্ষোভিক ইত্যাদি) কথা, পরিণমন, আগ্রহ, প্রবণতা, মানসিক সামর্থ্য ইত্যাদির উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয় কারণ বর্তমানের পাঠ্যক্রম বা আধুনিক পাঠ্যক্রম গতানুগতিক বা পূর্বের ধারণা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করেন।

বিষয়	গতানুগতিক পাঠ্যক্রম	আধুনিক পাঠ্যক্রম
লক্ষ্য	লক্ষ্য সংকীর্ণ কারণ শুধুমাত্র শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক বিকাশের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।	লক্ষ্য ব্যাপক কারণ শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়।
বিষয়বস্তু	বিষয়বস্তু হল তা যেগুলো শুধুমাত্র শ্রেণিকক্ষে অনুশীলনযোগ্য।	বিষয়বস্তু শ্রেণিকক্ষ ও শ্রেণিকক্ষের বাইরে সমানভাবে অনুশীলনযোগ্য।
মূলভিত্তি	শিক্ষার্থীর শৃঙ্খলাবোধ।	বিজ্ঞানসম্মতভাবে স্বত:স্ফুর্ত শৃঙ্খলা ব্যবস্থা।
পরিবর্তনশীলতা	অপরিবর্তনশীল।	সমাজ ও ব্যক্তির প্রয়োজনে পরিবর্তনশীল।
শিক্ষার্থীর স্থান	শিক্ষার্থী নিষ্ক্রিয় শ্রোতা।	শিক্ষার্থী সক্রিয়, সে নিষ্ক্রিয় শ্রোতা নয়।

মাত্রিকতা	একমাত্রিক শিক্ষালাভ করা।	বহুমাত্রিক— পরিপূর্ণ জীবনধারনের উপযোগী হওয়া।
মূল্যায়ণ	পরিমাণগত।	পরিমাণগত ও গুণগত।
শিক্ষকের স্থান	শ্রেণিকক্ষের সর্বময় কর্তা।	শিক্ষক হলেন— Friend, Philosopher, guide and mentor.

শিক্ষার অন্যতম আরেক উপাদান হল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হল এমন একটি মাধ্যম যেখানে শিক্ষার অন্য তিনটি উপাদান (শিক্ষার্থী, শিক্ষক, পাঠ্যক্রম) পরস্পর পরস্পরের সাথে প্রতিক্রিয়া করার সুযোগ পায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উত্তম পাঠাগার আসবাবপত্র, উপযুক্ত শ্রেণিকক্ষ, লাইব্রেরি, শিক্ষকদের কক্ষ, অশিক্ষক কর্মচারীদের কক্ষ, খেলার স্থান ইত্যাদি শিক্ষক-শিখনকে সুসম্পন্ন হতে সহায়তা করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষন-শিখন পরিবেশ হতে হবে গণতান্ত্রিক অর্থাৎ এখানে সবার স্থান। মত প্রকাশের অধিকার সমান হতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ যদি স্বৈরতান্ত্রিক হয়, বা কোন বিশেষ মতাদর্শ দ্বারা পরিচালিত গোড়া মনোভাব সম্পন্ন হয় তবে শিক্ষার সার্থক পরিবেশ তা হতে পারবে না কখনোই।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট পোশাক ব্যবহার করবে, প্রার্থনা সংগীতে অংশগ্রহণ করবে, পাঠ্যক্রমে নির্ধারিত পাঠ্যক্রমিক এবং সহপাঠ্যক্রমিক কার্যে অংশগ্রহণ করবে। শিক্ষার্থী-শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মচারী সবাই দায়বদ্ধ ও শৃঙ্খলাপরায়ণ হবে। শিক্ষক-শিক্ষার্থী-অশিক্ষক কর্মচারীদের মধ্যে সুসম্পর্ক বর্তমান থাকবে। শিক্ষার্থীরা সামাজিক সাংস্কৃতিক নান্দনিক, সমাজসেবামূলক কার্যে অংশগ্রহণ করবে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব করবে। একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমাজের বিভিন্ন অংশ থেকে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অশিক্ষক কর্মচারী আসে, বিভিন্ন মতাদর্শের সাংস্কৃতিক, সামাজিক পরিবেশ, অর্থনৈতিক পরিবেশের লোক আসে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সবাই একত্রে সহবস্থানের সুযোগ পায়।

শিক্ষার চারটি উপাদান অত্যন্ত নিবিড় সম্পর্কযুক্ত এবং এদের পারস্পরিক আন্ত:সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতেই শিক্ষার সার্থকতা। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে বিভিন্ন অপ্রীতিকর ঘটনা, শিক্ষার্থী অসন্তোষ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী শিক্ষক এর অসম অনুপাত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন শিক্ষা সহায়ক উপকরণ এর অভাব, পানীয় জলের অভাব, শৌচাগারের অভাব, প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভৌগোলিক অবস্থান ইত্যাদি শিক্ষার পরিবেশকে অনেকটাই প্রভাবিত করে থাকে। শিক্ষার্থী শিক্ষায় কতটা সফল হবে, শিক্ষক কতটা সার্থক শিক্ষাদান করতে পারবে, পাঠ্যক্রম কতটা বাস্তবায়িত করা যাবে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষন-শিখন পরিবেশ কিরূপ- ইত্যাদি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এই সমস্ত দিকগুলোর ইতিবাচক দিকগুলোই নির্ধারিত করে শিক্ষার উপাদানগুলোর আন্ত:সার্থকতা। সর্বোপরি একথা খেয়াল রাখতে হবে যে যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সার্থক শিক্ষার পরিবেশ থাকে তবে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে পাঠ্যক্রম সঠিকভাবে সঞ্চালন করতে পারে এবং এর উপরই দেশ এবং সমগ্র জাতির ভবিষ্যত নির্ধারিত হয়। তাই এই প্রসঙ্গে কোঠারী কমিশন (১৯৬৪-৬৬) এর বক্তব্যটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক — 'The destiny of India is now being shaped in his classrooms.'

চতুর্থ একক

শিক্ষার লক্ষ্য

ব্যক্তিকে নিয়ে সমাজ, সমাজের মধ্যেই ব্যক্তি। সমাজ গতিশীল এবং গতিশীলতাকে বজায় রাখতে যে সমস্ত বিষয় কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছে তার মধ্যে শিক্ষা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন সময়ে ব্যক্তি সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটিয়েছে এবং এই পরিবর্তনের মাধ্যম হিসেবে শিক্ষাও পরিবর্তিত হয়েছে। নিম্নে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ইহা সুস্পষ্ট হবে যে শিক্ষা কিভাবে তার লক্ষ্যে পরিবর্তন ঘটিয়েছে।

শিক্ষার লক্ষ্য			
আদিম যুগ খাদ্য সংগ্রহ ও নিরাপত্তার কৌশল আয়ত্ত করা, (একমুখী)	**প্রাচীন যুগ** আত্মপোলব্ধি, পার্থিব দু:খ ও শোকতাপ থেকে মুক্তিলাভ করা (একমুখী)	**মধ্য যুগ** ধর্মীয় রীতিনীতি কঠোরভাবে মেনে চলা (একমুখী)	**আধুনিক যুগ** ব্যক্তির সার্বিক বিকাশ ও সামাজিক কল্যাণ (বহুমুখী)

শিক্ষার লক্ষ্যের প্রয়োজনীয়তা :

শিক্ষার লক্ষ্যের বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তাগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ দিক্‌গুলো নিম্নরূপ —

- শিক্ষামূলক বিভিন্ন প্রচেষ্টাকে অর্থমূলক গড়ে তোলা।
- শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক, অনুভূতিমূলক, মন:সঞ্চালনমূলক দিক্‌গুলোর বিকাশ সাধন করা।
- শিক্ষার্থীর প্রক্ষোভমূলক দিকগুলোর সমন্বয় ঘটানো।
- পাঠ্যক্রমের নীতি ও বিষয়বস্তু নির্ধারণের সহায়তা করা।
- মূল্যায়ণের একটি ভিত্তি গড়ে তুলতে সহায়তা করা।
- ব্যক্তি ও সমাজকে অগ্রসর হতে সহায়তা করা।
- ব্যক্তির বিভিন্ন অবাঞ্ছিত আচরণকে পরিমার্জিত ও সংশোধিত করা।
- জ্ঞানের সংরক্ষণ, সঞ্চালন এবং ক্রমবিস্তার ঘটানো।
- জীবনের লক্ষ্য স্থির করতে সহায়তা করা।
- শিক্ষার বিভিন্ন ভিত্তিগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন।

শিক্ষার বিভিন্ন লক্ষ্যগুলো হল নিম্নরূপ —

ক) জ্ঞানমূলক লক্ষ্য : শিক্ষার লক্ষ্য হল ব্যক্তিকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে যাওয়া। তাই শিক্ষার মূল লক্ষ্য হল ব্যক্তিকে জ্ঞানলাভের ব্যবস্থা করা। একজন মানুষ হল একটি জৈব মানসিক সত্তা এবং মানুষের জৈব মানসিক দিকগুলোর উন্মোচন, বিকাশসাধন ও পরিমার্জন শিক্ষার দ্বারাই সম্ভবপর হয়। ফলে শিক্ষার দ্বারা মানুষ পূর্ণ ব্যক্তিতে পরিণত হতে পারে। শিক্ষার দ্বারা ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করে। জ্ঞান অর্জনের দ্বারা কর্মের ও সমাজের বিভিন্ন দিকগুলো সম্পর্কে সচেতন হয় এবং সমাজের যোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে

তুলতে পারে। শিক্ষার লক্ষ্য কেবলমাত্র জ্ঞান আহরণই নয় বরং জ্ঞান আহরণের পদ্ধতিগুলো সঠিকভাবে আয়ত্ত করা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলোর ব্যবস্থা করা।

জ্ঞানমূলক লক্ষ্যের গুরুত্ব :

১) জ্ঞান মানুষকে স্বনির্ভর হতে সহায়তা করে।

২) জ্ঞান মানুষকে অশিক্ষা, কুসংস্কার, নিরক্ষর ইত্যাদির সাথে মোকাবিলা করতে সহায়তা করে।

৩) জ্ঞান মানুষের অন্তর্নিহিত প্রতিভার বিকাশ ঘটায়।

৪) জ্ঞান মানুষকে ও সমাজ ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা করে।

৫) জ্ঞান মানুষকে তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী প্রজন্মের সাথে একটি বন্ধন গড়ে তুলতে সহায়তা করে।

জ্ঞানমূলক লক্ষ্যের সীমাবদ্ধতা :

১) জ্ঞান-এর অর্জনের উপর ভিত্তি করে সমাজে অনেক স্তর সৃষ্টি হয় - উচ্চশিক্ষিত, নিম্নশিক্ষিত, নিরক্ষর ইত্যাদি।

২) ত্রুটিপূর্ণ জ্ঞান ব্যক্তি ও সমাজের পক্ষে কল্যাণকর নয়।

৩) জ্ঞান কেবলমাত্র আহরণ করলেই হয় না তার উপযুক্ত ব্যবহার ও প্রয়োজন।

৪) জ্ঞান আহরণ করার ফলে সমাজে মানুষ মানুষে বিভেদ তৈরি হয়।

৫) জ্ঞান আহরণ যে সর্বদা সমাজের কল্যাণে ধাবিত হবে বা প্রয়োগ করা হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই।

খ) আধ্যাত্মিক লক্ষ্য :

আধ্যাত্মিক লক্ষ্য অনুযায়ী শিক্ষা হল মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের একটি প্রক্রিয়া বা প্রচেষ্টা। এই লক্ষ্য ব্যক্তিকে পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে শেখায় ও মানুষকে যে তার অংশমাত্র সেই ধারণার বিকাশ ঘটায়। এই লক্ষ্য অনুযায়ী চারিপাশের বস্তুজগৎ ও জীবনের নানা ঘটনাগুলোর পিছনে রয়েছে এক চির শ্বাশত সনাতন সত্য এবং শিক্ষার্থী যাতে সেই লক্ষ্য অর্থাৎ শ্বাশত সত্যকে জানতে পারে সেই প্রচেষ্টা করা। এই লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে ভাববাদ নামক দর্শন গড়ে উঠেছে। এবং প্রাচীন বৌদ্ধিকযুগে ভারতে শিক্ষার লক্ষ্য ও মূলত আধ্যাত্মিক লক্ষ্য দ্বারা পরিচালিত হত এবং মানুষ পরস্পর পরস্পরের সাথে যে এক অদৃশ্য বন্ধনে আবদ্ধ সেই শিক্ষা এই লক্ষ্যের মাধ্যমে জাগ্রত করা যায়।

আধ্যাত্মিক লক্ষ্যের গুরুত্ব :

১) সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়ে তুলতে সহায়তা করে।

২) সমাজে পরস্পরের সহযোগিতায় ইতিবাচক দিকে এগিয়ে চলে।

৩) নিষ্ঠুরতা, লোভ, ক্রোধ ইত্যাদিকে এই লক্ষ্যের দ্বারা দূরে রাখা যায়।

৪) ব্যক্তির মানসিক উন্নতিবিধান সম্ভব হয়।

৫) সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা সম্ভবপর হয়।

আধ্যাত্মিক লক্ষ্যের সীমাবদ্ধতা :

১) বর্তমান বস্তুময় জীবনে কেবলমাত্র কোন বিমূর্ত (ইন্দ্রিয়াতীত) বিষয়ের উপর নির্ভর করা যায় না।

২) সমাজ ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করতে গেলে বাহ্যিক আইন-কানুন, নিয়মের প্রয়োজন, কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক লক্ষ্য দ্বারা তা সম্ভব নয়।

৩) সমাজ ব্যবস্থায় অনেক কলুষতা বর্তমান যেগুলোর অবলুপ্তি আধ্যাত্মিক লক্ষ দ্বারা সম্ভবপর নয়।

৪) আধ্যাত্মিক লক্ষ্যকে পূর্ণ করতে গেলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন একটি শ্রেণিহীন, শোষণহীন সমাজ কিন্তু বাস্তবে তা বহুলাংশে অসম্ভব।

৫) সমাজ ও ব্যক্তি ক্রমবিবর্তনের দ্বারা অনেক বিবর্তিত হয়েছে বিজ্ঞানভিত্তিক মানসিকতা ও যৌক্তিকতার দ্বারা সেখানে ভাবনা মূলত মূর্ত (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য) যা আধ্যাত্মিক লক্ষ্য দ্বারা কখনোই সম্ভবপর হত না।

গ) নৈতিক লক্ষ্য : শিক্ষার নৈতিক লক্ষ্য এই বোধ জাগ্রত করতে সহায়তা করে মানুষের ব্যবহার, আচার-আচরণই তাকে দেবত্ব অথবা পশুত্বের পর্যায়ে পর্যবসিত করে। সুতরাং সততা, দয়া, ভালবাসা, পরোপকার, সত্যআচরণ, বিশ্বস্ততা, সংযম, শালীনতা, শ্রদ্ধা ইত্যাদির মত ধারণাগুলোর উপলব্ধি ও ব্যবহার মানুষকে দেবত্বের পর্যায়ে পর্যবসিত করে এবং সমাজে এবং শান্তির স্বর্গীয় পরিবেশ বিদ্যমান হয়। শিক্ষার এই লক্ষ্যই ক্রমবর্ধমান অপরাধপ্রবণতাবোধ থেকে মানুষকেও সমাজকে রক্ষা করতে পারে।

নৈতিক লক্ষ্যের গুরুত্ব :

১) শিক্ষার্থীর মধ্যে চারিত্রিক বিকাশ ঘটানো সম্ভবপর হয়।

২) শিক্ষার্থীর মধ্যে ভালো-মন্দ আচরণের পার্থক্য উপলব্ধি করতে সহায়তা করে।

৩) সুস্থ সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে এবং পরিচালনা করতে সহায়তা করে।

৪) মানুষ তার আচরণদ্বারা দেবত্বের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে তা বুঝতে সহায়তা করে।

৫) মানুষ ও সমাজের মধ্যে বিদ্যমান কলুষতা যেমন- চুরি, ডাকাতি, হত্যা, মানহানি ইত্যাদি থেকে রক্ষা করে।

নৈতিক লক্ষ্যের সীমাবদ্ধতা :

১) শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশ কেবলমাত্র নৈতিক বিকাশ দ্বারা সম্ভবপর নয়।

২) বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক পরিবেশে নৈতিক আদর্শ সর্বদা একরকম রাখা সম্ভবপর নয়।

৩) সমস্ত মানুষ এই লক্ষ্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হবে এই ভাবনার সর্বদা বাস্তবায়ন সম্ভবপর নয়।

৪) বাস্তব জীবনে চলার পথে নানা ধরনের সমস্যা, দ্বন্দ্ব ইত্যাদির সম্মুখীন হতে হয় সেখানে প্রয়োজন নৈতিক লক্ষ ছাড়াও বিজ্ঞান সম্মত চিন্তাভাবনা।

৫) সমাজে ক্রমবর্ধমান বিভিন্ন অপরাধ দমনের জন্য বিভিন্ন শাস্তির ব্যবস্থা, বলপ্রয়োগ, প্রশাসনের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন কারণ সর্বত্র নৈতিক লক্ষ্য দ্বারা সমাজ ব্যবস্থা বজায় রাখা সম্ভবপর হয় না।

ঘ) সাংস্কৃতিক লক্ষ্য : সংস্কৃতি কোন সমাজব্যবস্থায় একদিনে গড়ে উঠে না বা তা একদিনে নি:শেষ হয়ে যায় না। মানুষের আচার-আচরণ, বেশ-ভূষা, লোকাচার, লোকপ্রথা, অলিখিত রীতি-নীতি, বিশ্বাস ইত্যাদি দ্বারা একটি শ্রেণীকে চিহ্নিত করা যায়। শিক্ষার সংস্কৃতিক লক্ষ্য সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ, উন্নতিসাধন ও পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সঞ্চালন করতে সহায়তা করে। প্রত্যেক পিতামাতা, অভিভাবক চান যে তাদের সন্তান সন্ততি প্রচলিত রীতি-নীতি, আদব কায়দা, ধর্মীয় আচার-আচরণ, বেশ-ভূষা, খাদ্যাভাস ইত্যাদির সাথে পরিচিত

হোক এবং শিক্ষার দ্বারা এই লক্ষ্য পূরণ হবে এটাই সমাজের ব্যক্তিরা প্রত্যাশা করে থাকে। শিক্ষার সাংস্কৃতিক লক্ষ্য শুধুমাত্র সাংস্কৃতিক লক্ষ্যকে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সঞ্চালন কেবলমাত্র করে থাকে না বরং ব্যক্তি ও সমাজের প্রয়োজনে তাকে পরিমার্জিত ও উন্নত করে থাকে।

সাংস্কৃতিক লক্ষ্যের গুরুত্ব :

১) শিক্ষার্থী তার পারিপার্শ্বিক কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সাথে পরিচিতি লাভ করতে পারে।

২) শিক্ষার্থীর সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার পথ সুগম হয়।

৩) নিজেদের ঐতিহ্য, পরম্পরা, আদর্শ, ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস ইত্যাদি সংরক্ষণ করতে শিখে।

৪) সমাজে নিজস্বতাবোধ বজায় থাকে ও সমাজের বহুমাত্রিকতার সাথে পরিচিত হতে পারে।

৫) সাংস্কৃতিক লক্ষ্যের দ্বারা সমাজের বৈচিত্রতা বিদ্যমান থাকে এবং এক সংস্কৃতির লোক অন্য সংস্কৃতির লোক থেকে বা সংস্কৃতি থেকে অনেক কিছু শিখতে পারে পারস্পরিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে।

সাংস্কৃতিক লক্ষ্যের সীমাবদ্ধতা :

১) সংস্কৃতির প্রকৃতি বিভিন্ন উপাদান যেমন অর্থনীতি, ভৌগোলিক অবস্থান ইত্যাদির উপর নির্ভর করে।

২) উগ্র সংস্কৃতিমূলক লক্ষ্য এক অসম আগ্রাসনের জন্ম দেয় ফলে তার দ্বারা অন্য সংস্কৃতিকে গ্রাস করার প্রবণতা দেখা দেয়।

৩) কোন বিশেষ একটি সংস্কৃতির প্রতি অন্ধ আনুগত্য ও ভালবাসা তৈরী করে।

৪) একটি সমাজ ব্যবস্থায় বহু সংস্কৃতি সর্বদা ঐক্যের কারণ না হয়ে বরং বিবাদের কারণও হতে পারে।

৫) সাংস্কৃতিক লক্ষ্য অনেক সময় জাতীয়তাবোধ ও আন্তর্জাতিকতাবোধের বিরুদ্ধে কাজ করে এবং কোন বিশেষ সংস্কৃতির উন্নয়নে কাজ করে।

ঙ) বৃত্তিমূলক লক্ষ্য : মানব সভ্যতার প্রথমদিকে জনসংখ্যা ছিল কম। জীবন ছিল মূলত প্রকৃতি নির্ভর। সন্তান-সন্ততি সাধারণ পিতা বা পূর্ব পুরুষদের বৃত্তি বা পেশা অনুসরণ করত। শিক্ষা মানব সভ্যতার প্রথমদিকে বৃত্তিমুখী হয়ে উঠেনি কিন্তু সময়ের সাথে সাথে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া শুরু হল। মানুষ হয়ে উঠল যন্ত্র-নির্ভর। ফলে বিভিন্ন প্রকারের বৃত্তির সুযোগ বৃদ্ধি পেতে লাগল। শিক্ষা হয়ে উঠল বৃত্তিমুখী অর্থাৎ অর্থ উপার্জন করার একটি মাধ্যম। বর্তমানে অভিভাবক চাইছে যে তার সন্তান-সন্ততি ভবিষ্যতের জীবনের জন্য অর্থনৈনিতকভাবে প্রস্তুত করা এবং এই দায়িত্ব বর্তিত হচ্ছে শিক্ষার বৃত্তিমূলক লক্ষ্যের উপর । তাই বর্তমানে শিক্ষা আর তাত্ত্বিক জ্ঞান আহরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং শিক্ষা হয়ে উঠেছে শিক্ষার্থীর ভবিষ্যতের অর্থ উপার্জনের একটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

বৃত্তিমূলক লক্ষ্যের গুরুত্ব :

১) ভবিষ্যত জীবনে শিক্ষার্থী সমাজের বোঝা হয়ে থাকবে না, সে উপার্জনশীল হবে।

২) উপযুক্ত বৃত্তি গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থী স্বনির্ভর হতে পারবে।

৩) শিক্ষার্থী বৃত্তিমূলক শিক্ষার দ্বারা শিক্ষিত হয়ে উপার্জনশীল হবে এবং সমাজেরপক্ষে সম্পদ হিসাবে পরিগণিত হতে পারবে।

৪) যারা কমবুদ্ধিসম্পন্ন, তারাও বৃত্তিমূলক শিক্ষার দ্বারা সার্থক জীবন কাটাতে পারবে।

৫) সবাই কর্মমুখী হলে সমাজে অপ্রীতিকর ঘটনাগুলো ক্রমে হ্রাস পাবে।

বৃত্তিমূলক লক্ষ্যের সীমাবদ্ধতা :

১) এই লক্ষ্য শিক্ষাকে একমুখী করে তোলে। তা হল উৎপাদনমুখীতা।

২) শিক্ষার্থীকে আত্মকেন্দ্রিক করে তোলে এবং সে বৃহত্তর বিশ্বের কথা চিন্তা না করে শুধু নিজের কথা ভাবে।

৩) শিক্ষার্থীর চরিত্রগঠন ও অন্যান্য মানবিক দিকগুলো এই লক্ষ্যে উপেক্ষিত।

৪) এই লক্ষ্যটি অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং শিক্ষার্থীকে অর্থ উপার্জনের যন্ত্রে পরিণত করে।

৫) শিক্ষার্থীর লক্ষ্য থাকে শুধু নিজস্ব বৃত্তি ও অর্থ উপার্জন । সমাজ, দেশ, বিশ্ব— এর ভাবনা উপেক্ষিত থাকে।

চ) গণতান্ত্রিক লক্ষ্য : গণতন্ত্রের মূল ধারণা হল সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা। শিক্ষায় গণতান্ত্রিক লক্ষ্যের মূল কথা হল সবার সমান অধিকার, ন্যায়, স্বাধীন চিন্তা ও কাজের সুযোগ, মত প্রকাশের অধিকার ইত্যাদি। এই লক্ষ্যের দ্বারা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন করা সম্ভব হয়। শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত দক্ষতা ও সামর্থ্যের বিকাশ সাধন করা সম্ভবপর হয়। সমাজের অগ্রগতির জন্য প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সমান অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা হয়। এই লক্ষ্যের দ্বারা দেশকে নেতৃত্ব দেবার মানসিকতা সম্পন্ন শিক্ষার্থী তৈরি করা হয়। এই শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে শিক্ষার্থীকে এই ধারণা ও বোধ জাগ্রত করানো হয় যে ধম-বর্ণ-অর্থ-কৃষ্টি ইত্যাদি নির্বিশেষে প্রতিটি শিক্ষার্থীর অধিকার ও কর্তব্য সমান। এই লক্ষ্যের দ্বারা শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক মানসিকতা, সহনশীলতা, অন্যের সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ইত্যাদির মত গুরুত্বপূর্ণ ভাবনা বিকশিত হতে সহায়তা করে।

গণতান্ত্রিক লক্ষ্যের গুরুত্ব :

১) প্রত্যেক শিক্ষার্থীর বিকাশ সাধন সম্ভবপর হয়। শিক্ষার্থী ব্যক্তিগত কল্যাণের সাথে যে দেশের কল্যাণও জড়িয়ে আছে তা বুঝতে পারে।

২) দেশের জন্য যোগ্য নাগরিক তৈরি করা ও দায়িত্বশীল নেতৃত্বের প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

৩) প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে সহনশীলতা, শ্রদ্ধা, সহযোগিতার মানসিকতার বিকাশ ঘটাতে সহায়তা করে।

৪) শিক্ষার্থীদের স্বত:স্ফুর্ত শৃঙ্খলা ও দায়িত্ববান হতে শেখায়।

৫) শিক্ষার্থীকে তাদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ করে তোলে।

গণতান্ত্রিক লক্ষ্যের সীমাবদ্ধতা :

১) সর্বদা সমস্ত শিক্ষার্থীকে সমান শিক্ষা প্রদান করা সম্ভবপর হয় না কারণ অনেক শিক্ষার্থী জন্মসূত্রে অত্যন্ত মেধাবী হয় যেখানে অনেক শিক্ষার্থী ঠিক ততটা মেধাবী হয় না।

২) প্রতিটি শিক্ষার্থীর অর্থনৈতিক সামাজিক অবস্থা একই রকমের হয় না ফলে কিছুটা বৈষম্য স্বভাবতই শিক্ষায় এসে পড়ে।

৩) শিক্ষন-শিখন পরিবেশ গণতান্ত্রিক লক্ষ্যে পরিচালিত করার মূল শর্ত হল নৈর্ব্যক্তিকতা, কিন্তু তা সর্বদা বজায় রাখা সম্ভবপর হয় না।

৪) প্রতিটি শিক্ষার্থী অধিকার ও কর্তব্যের দায়বদ্ধতা উপলব্ধি করতে পারে না।

৫) সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা এই ধারণা শিক্ষার সকল স্তরে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনেক জটিলতা দেখা যায়।

ছ) উদারনৈতিক লক্ষ্য : 'সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে' অর্থাৎ শিক্ষা ব্যক্তির চিন্তার বিকাশ সাধন করে। মানুষের মনকে সংস্কারমুক্ত করে তোলে। শিক্ষার উদারনৈতিক লক্ষ্যের দ্বারা শিক্ষার্থী সংকীর্ণতার গণ্ডী অতিক্রম করতে পারে ও শিক্ষার্থী নিরপেক্ষ চিন্তা ও বিবেচনার অধিকারী হতে পারে। শিক্ষার এই লক্ষ্য শিক্ষার্থীকে স্বাধীনভাবে বিকশিত হবার সুযোগ প্রদান করে ফলে কোন কিছুই এই শিক্ষায় চাপিয়ে দেওয়া হয় না।

উদারনৈতিক লক্ষ্যের গুরুত্ব :

১) শিক্ষার্থী তার নিজস্ব উদ্যোগে তার নিজস্ব আগ্রহের বিষয় নিয়ে শিক্ষালাভ করতে পারে।

২) সামাজিকীকরণের শিক্ষা ও সম্পন্ন হয় কারণ শিক্ষার লক্ষ্য এখানে সংকীর্ণ নয়।

৩) শিক্ষার্থী স্বাধীনভাবে তার জ্ঞানের ক্ষেত্রকে বিকশিত করার সুযোগ পায়।

৪) শিক্ষার্থীর সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সমৃদ্ধ হয় কারণ এই লক্ষ্যের দ্বারা কৃষ্টিমূলক উন্নয়ন সাধন করা সম্ভব।

৫) শিক্ষার্থী মানবতাবাদের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে।

উদারনৈতিক লক্ষ্যের সীমাবদ্ধতা :

১) কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির নেই।

২) শিক্ষার উপাদানগুলো পারস্পরিক সম্পর্কে খুব নিবিড় নয়।

৩) শিক্ষার্থীর পছন্দের বিষয় সর্বদা সঠিক এ ধারণা অনেক ক্ষেত্রে ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়।

৪) এই লক্ষ্যকে পূর্ণ করতে গেলে কিছু বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে যা এই লক্ষ্যে উপেক্ষিত।

৫) শিক্ষার্থীর জাতি-ধর্ম-বর্ণ, ধনী-দরিদ্র, স্ত্রী-পুরুষ এ সমস্তের নিরিখে মানতাবোধের ধারণা একই প্রকারের হয় না।

(জ) শিক্ষার ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্য :

ব্যক্তিকে নিয়েই সমাজ কারণ ব্যক্তিকেই কেন্দ্র করেই সমাজ গঠিত হয়েছিল। তাই ব্যক্তিই হল শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু। ব্যক্তির আগ্রহ, আশা-আকাঙ্খা, চাহিদা, মনোভাব ইত্যাদি সমস্ত কিছুই শিক্ষার মাধ্যমেই প্রতিফলিত হতে হবে। একদা সক্রেটিস বলেছিলেন সকল বিষয়ে মানুষই মুখ্য বিবেচ্য। (Socrates ' Man is the measure of all things'). ব্যক্তির প্রয়োজনেই সমাজ ব্যবস্থার সৃষ্টি-উন্নতি-ক্রমবিবর্তন তাই ব্যক্তির গুরুত্বই সর্বাধিক কারণ ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে শিক্ষার কোন লক্ষ্য হতে পারে না।ব্যক্তিকে সমস্ত ধরনের স্বাধীনতা, সুযোগ সুবিধা প্রদান করে উপযুক্ত শিক্ষিত করে তুলতে পারলে ব্যক্তি নিজেই সমাজের দায় দায়িত্ব, নিয়ম কানুন, বিভিন্ন অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে অবগত হবে। সুতরাং শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত ব্যক্তি সত্তার পূর্ণ বিকাশ সাধন কারণ ব্যক্তির পূর্ণ বিকাশ সাধন হলেই সমাজের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব। বর্তমানে যে সমাজে এখজ্রথন সবাই বসবাস করছে তাহল ক্রমবিবর্তন ও উন্নতির ফল এবং এর পিছনে ব্যক্তির অবদানই হল সর্বাপেক্ষা অনস্বীকার্য কারণ সমাজব্যবস্থা ব্যক্তি ছাড়া অর্থহীন। তাই বলা যায় যে ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্য ব্যক্তির

সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করার কথা বলে। স্যার পার্শিনানের মতে ব্যক্তির স্বাধীনভাবে কাজকর্ম করার সুযোগ না থাকলে মানব সমাজে কোন কল্যাণ সাধিত হতে পারে না। এই সত্যের উপর ভিত্তি করেই সব শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত হওয়া উচিত। ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্যের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক মনে করেন যে সুনাগরিক হবার আগে উৎকৃষ্ট ব্যক্তি হওয়া প্রয়োজন।

ব্যক্তি তান্ত্রিক লক্ষ্যের উপর বিভিন্ন উপাদানের প্রভাব :

প্রকৃতিবাদের প্রভাব : প্রকৃতিবাদীদের মতে সমাজ একটি কলুষিত প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তির নির্মল ও সুকোমল ভাবনাগুলোও কুলষিত হয়। বিখ্যাত ফরাসি দার্শনিক রুশোর ধারণা অনুযায়ী সমাজের সংস্পর্শেই এসেই মানুষের মহৎ গুণগুলোর অপমৃত্যু ঘটে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতি প্রকৃতিবাদীরা গুরুত্ব প্রদান করেছেন। প্রকৃতিবাদীদের মতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার আপন খেয়াল অনুযায়ী বৃদ্ধির সুযোগ প্রদান করতে হবে। ব্যক্তির বিকাশের উপর সমাজের কোন ধরনের প্রভাব কাম্য নয় কারণ ব্যক্তির আপন স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হবে এবং ব্যক্তির মধ্যে নানা প্রকার কৃত্রিমতা পরিলক্ষিত হবে। প্রকৃতিবাদের মত ব্যক্তির উপর কোন প্রকারের নিয়ন্ত্রণ অনভিপ্রেত ও ক্ষতিকর।

জীববিজ্ঞানের প্রভাব : কোন ব্যক্তি যদি দৈহিকভাবে সুস্থ না হয় তবে সমাজের অগ্রগতি সম্ভব নয়। জীববিজ্ঞানীরা এই ধারণা পোষণ করেন যে সুস্থ সবল ব্যক্তিই একমাত্র সমাজের কল্যাণ করতে পারে। জীব বিজ্ঞানের মতে প্রতিটি ব্যক্তি এক একটি পৃথক সত্তা এবং প্রত্যেকের সামর্থ্য, ক্ষমতা আলাদা। ব্যক্তির বৃদ্ধিতে ও বিকাশে সমাজের কোন গুরুত্ব স্বীকার করা হয়নি। শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত সুস্থ ও সবল শিশু করা এবং শিশুর দৈহিক স্বাস্থ্যের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

প্রয়োগবাদীদের প্রভাব : প্রয়োগবাদীদের মতে শিক্ষার লক্ষ্য হবে উপযোগিতার উপর অর্থাৎ জীবনে চলার জন্য যা উপযোগী তার সাধন করা। বর্তমান সভ্যতা এগিয়ে যেতে পারছে বিভিন্ন ব্যক্তির অবদান এর ফলে। বিভিন্ন ব্যক্তি তাদের প্রতিভা, কার্য, কর্মপদ্ধতি দ্বারাই সমাজের উন্নতি ঘটাতে পেরেছো। ফলে সমাজে মূলত ব্যক্তি নির্ভর ।

মানবতাবাদের প্রভাব : শিক্ষা প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রে থাকবে মানুষ নিজে অন্য কিছু নয়। মানবতাবাদীদের মতে ব্যক্তির মানসিক, অনুভূতিমূলক প্রভৃতি বিভিন্ন দিকগুলো যাতে পূর্ণভাবে বিকাশ লাভ করে তা দেখাই হবে শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য। বিভিন্ন চিকিৎসক, দার্শনিক, প্রকৌশলীবিদ, সাহিত্যিক ইত্যাদি ব্যক্তি বর্গের হাত ধরে সমাজ ব্যবস্থা ক্রমবিবর্তিত এবং প্রত্যেক ব্যক্তিই তার নিজস্ব ক্ষমতা দ্বারা সমাজের পক্ষে কাজ করে থাকে।

মনোবিদ্যার প্রভাব : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাদার টেরেসা, উইলিয়াম সেক্সপীয়ার, রুশো, অ্যারিস্টটল, শচীন তেণ্ডুলকর, মারাদোনা ইত্যাদি যেকোনো ব্যক্তিকেই উদাহরণ হিসাবে নেওয়া হোক না কেন— এখন অবধি পৃথিবীতে দুটি মানুষ সম্পূর্ণ আলাদা। যমজ্ লোকের ক্ষেত্রে শারীরিক আকৃতিতে মিল থাকলেও মানসিক সংগঠন কখনোই এক হয় না। আর মনোবিদ্যার ভাষায় ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এই পার্থক্যই হল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র বা Individual Difference। শিক্ষার লক্ষ্য হবে প্রতিটি শিশুতে যে পার্থক্য বিদ্যমান সেই ক্ষমতার ও সম্ভাবনার সম্পূর্ণ বিকাশ সাধনের ব্যবস্থা প্রদান করা। শিক্ষার লক্ষ্য হবে প্রতিটি শিশুকে তার নিজস্বতা অনুযায়ী বিকাশের সুযোগ করে দেওয়া কারণ এই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের জন্যই সমাজ বর্তমানে এত সমৃদ্ধশালী হতে পেরেছে পরিমাণগত ও গুণগত উভয় বিষয়েই।

ভাববাদের প্রভাব : ভাববাদের মতে সমস্ত দৃশ্যমান বস্তু জগতের পিছনে রয়েছে এক বিশাল অন্তহীন ভাবময় জগত এবং সমস্ত শক্তির উৎস ও নিয়ন্ত্রক হলেন এক ঐশ্বরিক শক্তি। শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে সেই চির শ্বাশত সত্যকে উপলব্ধি করতে সহায়তা করা এবং প্রতিটি ব্যক্তিই হল সেই প্রচণ্ড ঐশ্বরিক শক্তির অংশ। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'Man is potentialy divive.' অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ঐশ্বরিক শক্তি লুকিয়ে আছে। সুতরাং শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত। Self-realistion বা আত্মউপলব্ধিতে সহায়তা করে। প্রতিটি শিশুর উন্মেষণ করার কথা ভাববাদ বলে এবং 'Theory of Unfoldment' এই ব্যাখ্যাই দেয়।

শিক্ষার ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্যের গুরুত্ব :

১) প্রতিটি শিক্ষার্থীর মধ্যে যে সামর্থ্য, অন্তর্নিহিত ক্ষমতা আছে তা স্বীকার করে থাকে।

২) শিক্ষাদান পদ্ধতি দলগত না হয়ে ব্যক্তিকেন্দ্রিক হওয়া উচিত তা উপলব্ধি করতে সহায়তা করে।

৩) সমাজ হল ব্যক্তি নির্ভর, ব্যক্তির প্রয়োজনেই সমাজের সৃষ্টি ও ক্রমবিবর্তন হচ্ছে। তাই ব্যক্তিকে ছাড়া সমাজের অস্তিত্ব কল্পনাহীন।

৪) প্রতিটি ব্যক্তি কিছু সহজাত উপাদান নিয়ে জন্মগ্রহণ করে থাকে এবং এগুলো সম্পূর্ণ স্বকীয় ও কারো সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয় না। শিক্ষার লক্ষ্য হল সেই সমস্ত সম্ভাবনাগুলোর স্বাভাবিক বিকাশে ঘটানো এবং এর পক্ষের যাবতীয় প্রতিবন্ধকতাগুলোকে দুরে রাখার ব্যবস্থা করা।

৫) প্রতিটি শিক্ষার্থীর বিকাশের দ্বারাই সভ্যতার বিকশিত হয় যেমন প্রতিটি শিক্ষার্থী তার নিজস্ব স্বকীয়তার স্থান যেমন— অংকন, বিজ্ঞান, গণিত, ভাষা, প্রকৌশলবিদ্যা, স্থাপত্যবিদ্যা, মহাকাশবিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, আইন নিয়ে তার নিজস্ব চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষালাভ করে এবং ভবিষ্যতে সমাজ গঠনের ও পুন:নির্মাণের পথে অংশীদার হয়।

শিক্ষার ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্যের সীমাবদ্ধতা :

১) পৃথিবীতে কোন ব্যক্তি একা বাঁচতে পারেনা। প্রতিটি ব্যক্তির প্রয়োজন অন্য ব্যক্তির সহায়তা। তাই প্রতিটি ব্যক্তি কোন না কোন ভাবে অন্য ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল। আর এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতাই জন্ম দিয়েছে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এক অদৃশ্য আন্ত:সম্পর্কের বন্ধনের। এই বন্ধন এর মাধ্যমেই মানবজাতি পৃথিবীতে সবার উপর শাসন ও কর্তৃত্ব বিদ্যমান রাখতে পেরেছে।

২) প্রতিটি শিশু জন্মগ্রহণ করে বিভিন্ন অন্তর্নিহিত ক্ষমতা নিয়ে ঠিকই কিন্তু সেগুলোর বিকাশ একার পক্ষে কোনভাবেই সম্ভব নয় এবং সেগুলোর বিকাশের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত পরিবেশের এবং সেই পরিবেশ এ মানুষ একে অন্যের সাথে পারস্পরিক সহযোগিতাই লিপ্ত। ধরা যাক, একজন শিক্ষার্থীর মধ্যে উপযুক্ত চিকিৎসক হবার গুণ বর্তমান বা ক্রিড়াবিদ হবার গুণ বিদ্যমান। কিন্তু তাকে তার এই প্রতিভার বিকাশের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে হবে এবং অন্যের উপর নির্ভরশীল হতে হবে।

৩) শিক্ষায় ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্যকে স্বীকার করার মানে হল অর্থ-ধর্ম-বর্ণ-জাতি ইত্যাদি নির্বিশেষে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে আলাদা করা।

৪) এই লক্ষ্যে আত্মকেন্দ্রিকতা ও সংকীর্ণ স্বার্থপরতার দিকটির বিকাশে সহায় করা ব্যক্তির দম্ভ ও অহংকার এই লক্ষ্যকে স্বীকার করলে মান্যতা পাবে।

৫) সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা, দ্বন্দ্ব, আত্তীকরণ, অভিযোজন ইত্যাদি হল সমাজের ভিত্তি এবং এগুলো ছাড়া কোন ব্যক্তির পক্ষে সামাজিক জীব হিসাবে পরিগণিত হওয়া সম্ভবপর নয়। আর এটা একক ব্যক্তির পক্ষে কোনভাবেই সম্ভবপর নয়।

সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য : ব্যক্তি তার প্রয়োজনে সমাজ সৃষ্টি করে যাতে নিরাপদে বসবাস করা যায়। সমাজ স্থাপনের ফলেই ব্যক্তির বিভিন্ন চাহিদা যেমন - নিরাপত্তার চাহিদা, খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের চাহিদা, ভালবাসা ও একাত্মবোধের চাহিদা, আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা ইত্যাদি পূর্ণ করা সম্ভবপর হচ্ছে। সমাজ আছে বলেই মানব সভ্যতা ক্রমবিবর্তনের হাত ধরে এতদূর এগুতে পেরেছে সমাজের প্রয়োজনীয়তা যারা স্বীকার করেন তাদের বলা হয় সমাজতন্ত্রবাদী আর সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা থেকে জন্ম নিয়েছে শিক্ষার সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য। সমাজের হাত ধরেই ব্যক্তি তার আশা-আকাঙ্খা, চাহিদার পরিতৃপ্তি ঘটাতে পারে। সমাজবিহীন ব্যক্তির কল্পনা সম্পূর্ণ অবাস্তব। সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য হল যে সমাজের জন্য শিক্ষার হাত ধরে শারীরিক, মানসিক, নৈতিক দিক থেকে উন্নত দেশের জন্য সুযোগ্য নাগরিক তৈরি করা। তাই শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল সমাজকে শক্তিশালী ও সুদৃঢ় করা এবং সমাজের চাহিদাগুলো পূর্ণ করা আর এই কার্য যে লক্ষ্যের মাধ্যমে বাস্তবায়িত করা যায় তাই হল শিক্ষার সামাজিক লক্ষ্য।

- পাশ্চাত্য দার্শনিক হেগেল হলেন সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের একজন গুরুত্বপূর্ণ প্রবক্তা। উনার মতে ব্যক্তির কোন স্বাধীন সত্তা নেই। সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যেই তার ব্যক্তিত্বের পূর্নাঙ্গিন বিকাশ হয়। সমাজের কল্যান হলে ব্যক্তির কল্যাণ হয়।
- পাশ্চাত্য দার্শনিক রস বলেছেন, শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য হবে রাষ্ট্রে ও সমাজের কল্যাণ। আর সেটা হলেই ব্যক্তির কল্যাণ হবে।
- একটি সমাজের মধ্যেই শিশু জন্ম গ্রহণ করে। সে বড় হয়, তার বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটে। সুতরাং সমাজ এর প্রয়োজন অনস্বীকার্য।
- সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য অনুযায়ী শিক্ষা হবে সমাজ নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করার এক উপযুক্ত মাধ্যম। ব্যক্তির আচার আচরণ ও সমাজ থাকলেই নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- একজন ব্যক্তির মধ্যে সামাজিক, নান্দনিক, প্রাক্ষোভিক, নান্দনিক, ভাষাগত ইত্যাদি বিকাশ পরিলক্ষিত হয় এবং সমাজ ছাড়া তা সম্ভবপর হয় না।
- সবাই হল শিক্ষার পাঠ্যক্রম, মূল্যায়ণ সমস্ত কিছু নির্ণয়ের একমাত্র কর্তা। সমাজের বাইরে গিয়ে ব্যক্তির কোন ক্ষমতা থাকবে না কোন খেয়ালখুশীমত আচার-আচরণ করার অর্থাৎ ব্যক্তির সমস্ত কিছু হবে সমাজ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সমাজের অধিকার বিদ্যমান তার নিজের প্রয়োজনমত ব্যক্তিকে গড়ে তোলার।

সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের গুরুত্ব :

১) সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত প্রতিভাগুলোর বিকাশের ক্ষেত্র তৈরি করে এবং সমাজের অনুমোদনহীন ক্ষতিকর ইচ্ছা, কামনাগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে।

২) সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের দ্বারা শিক্ষার্থী ভবিষ্যতে সমাজের জন্য উপযুক্ত নাগরিক-এ পরিণত হতে পারে।

৩) ব্যক্তি তার আচার-আচরণের পরিমার্জন ও সংশোধন করতে পারে। ব্যক্তি সমাজ অনুমোদিত পথে নিজের বিকাশ সাধন ঘটাতে পারে।

৪) এই লক্ষ্যের দ্বারা সামাজিক সংহতি, সামাজিক নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা, সমাজের উন্নতি ও প্রগতি, বিবর্তন সম্ভবপর হয়।

৫) সমস্ত সমাজকে যদি একটি জীবদেহের সাথে তুলনা করা যায় তবে ব্যক্তি হল অঙ্গস্বরূপ। কোন অঙ্গকে যদি দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয় তবে সেই অঙ্গের মৃত্যু ঘটে। ঠিক তেমনি সমাজের বাইরে কোন ব্যক্তির একক অবস্থান কল্পনাও করা যায় না।

৬) সমাজই হল এমন এক ক্ষেত্র যেখানে ব্যক্তি বিকশিত হতে পারে। তার চিন্তা-ভাবনা, যুক্তি-তর্ক, প্রতিভা, অনুরাগ ইত্যাদির বিকাশ সাধন করতে পারে কিন্তু সমাজের বাইরে একা ব্যক্তির পক্ষে ব্যক্তি তার বিকাশ ঘটাতে পারে না।

সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের বিপক্ষে যুক্তি :

১) সমাজের নাম করে ব্যক্তির আশা-আকাঙ্খা, সুখ-দু:খ, চাহিদা ইত্যাদির বিসর্জন দেওয়া হয়। ফলে ব্যক্তি স্বার্থ ক্ষুন্ন হয়।

২) সমাজ যদি ব্যক্তির সর্বময় কর্তা হয় তবে ব্যক্তির স্বকীয়তাবোধ বিনস্ট হয় এবং ব্যক্তি মূলত রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সাধনের যন্ত্রে পরিণত হয়।

৩) প্রতিটি ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য বর্তমান আর সেই পার্থক্যের নিরিখেই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রতা। কিন্তু সমাজ তান্ত্রিক লক্ষ্য অনুযায়ী সেই স্বাতন্ত্রতাকে গুরুত্ব প্রদান করা হয় না। ;

৪) সমাজের স্বার্থ ব্যক্তি স্বার্থ থেকে বৃহত্তর ভাবা হয় তাই ব্যক্তির কোন গুরুত্ব স্বীকার করা হয় না।

৫) ব্যক্তির সামর্থ্য, রুচি ক্ষুন্ন করা হয় সমাজের স্বার্থে ফলে ব্যক্তির সক্রিয়তা ও সৃজনক্ষমতা, প্রতিভা অগ্রাহ্য হয়।

৬) সমাজের হাতে সর্বক্ষমতা প্রদান করায় ব্যক্তির স্বাধীনতা হরণ করা হয় ফলে ব্যক্তি পরাধীন সত্তাতে পরিণত হয়।

শিক্ষার ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্য ও সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের পার্থক্য :

বিষয়	ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্য	সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য
সমর্থকগণ	হেগেল, রস, জন ডিউই	পার্সিনান,সক্রেটিস, বাট্রান্ড রাসেল।
লক্ষ্য	ব্যক্তির উন্নতিবিধান	সমাজের উন্নতিবিধান
পরিধি	কেবলমাত্র একক ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ	সমাজের অন্তর্গত সকল ব্যক্তির জন্য
স্বার্থ	কেবল ব্যক্তিস্বার্থ চিন্তা করা হয়, সমাজের বৃহত্তর স্বার্থ চিন্তার বিষয় নয়	সমাজের বৃহত্তর স্বার্থ চিন্তনীয়
মাত্রা	একমাত্রিকা কারণ কেবলমাত্র ব্যক্তির বিভিন্ন দিক প্রাধান্য পায়	বহুমাত্রিক কারণে সমাজের সমস্ত ব্যক্তির বিভিন্ন দিক প্রাধান্য পায়

পরিবর্তনশীলতা	ব্যক্তি নিজের স্বার্থে পরিবর্তন ঘটায়	সমাজ তার নিজস্ব স্বার্থে পরিবর্তন ঘটায়।
গুরুত্ব	ব্যক্তি স্বাতন্ত্র স্বীকার করা হয়	ব্যক্তি স্বাতন্ত্র স্বীকার করা হয় না।
সীমাবদ্ধতা	সমাজ বিহীন এককব্যক্তির অবস্থান অবাস্তব	সমাজের স্বার্থে ব্যক্তির অবস্থানকে খর্ব ও সংকুচিত করা হয়
গ্রহণযোগ্যতা	পুরোপুরিভাবে গ্রহণযোগ্য নয়।	ব্যক্তিকে প্রাধান্য ও সমাজকে প্রাধান্য সমান মাত্রায় দিতে পারলে গ্রহণযোগ্য

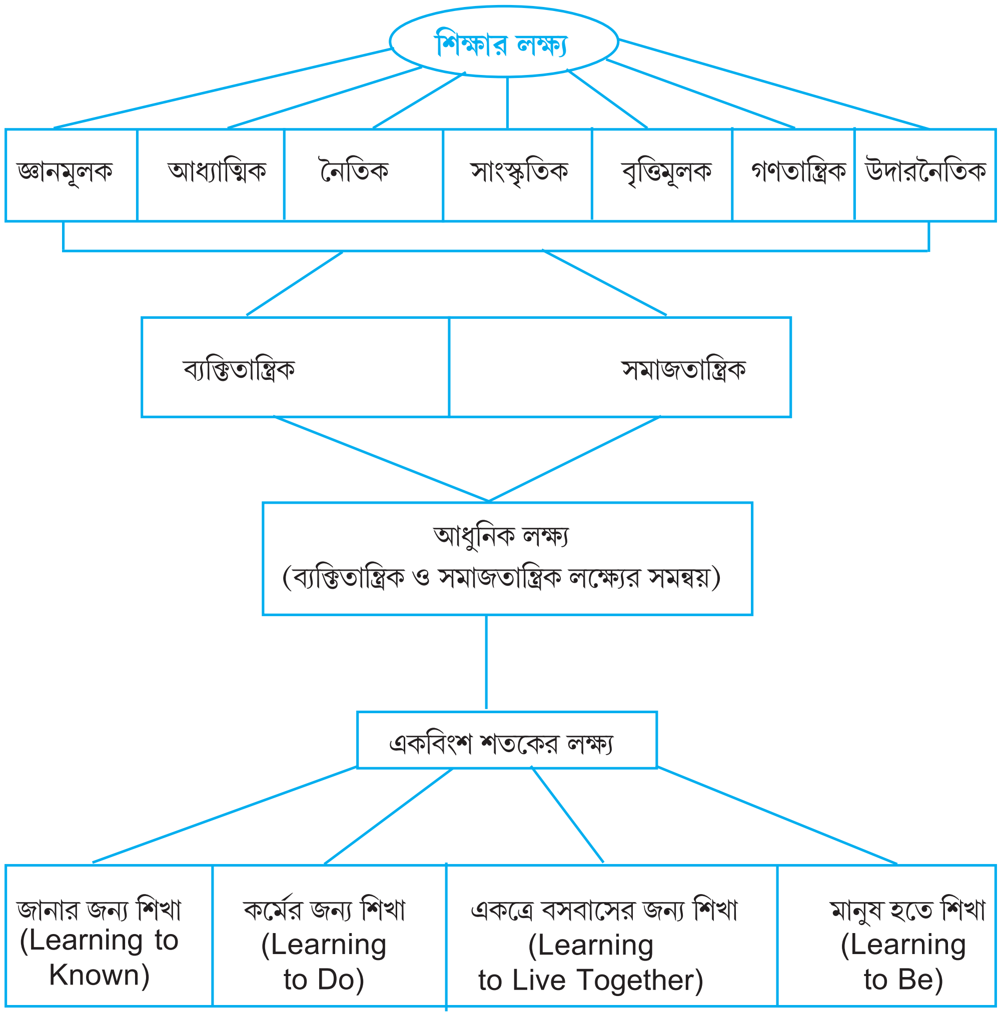

শিক্ষার আধুনিক লক্ষ্য : ব্যক্তি তান্ত্রিক লক্ষ্য ও সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের সমন্বয়

শিক্ষার আধুনিক লক্ষ্য উপলব্ধি করার পূর্বে নিম্নোক্ত ধারণাগুলোর সাথে পরিচিতি লাভ করা যাক।

❖ **জন ডিউই-এর ব্যাখ্যা :** জন ডিউই মনে করেন যে গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্য দিয়ে শিক্ষায় ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের সমন্বয় সাধিত হতে পারে। গণতান্ত্রিক শিক্ষার লক্ষ্য ব্যক্তিকে আদর্শ মানুষ রূপে গঠন করা। ব্যক্তিকে সুযোগ্য নাগরিকরূপে গড়ে তোলা এবং ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সামর্থ্য ও দক্ষতাকে সম্যক বিকশিত করে সমাজের উন্নতিতে সাহায্য করা। প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্রই সমাজের মধ্যে ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ দিয়ে থাকে। সামাজিক যোগ্যতা অর্জনই গণতান্ত্রিক শিক্ষার লক্ষ্য। তাই জন ডিউই মনে করেন আদর্শ গণতান্ত্রিক সমাজে, সমাজের স্বার্থ ও ব্যক্তির স্বার্থ আলাদা করা যায় না।

❖ **স্যার পার্শিনানের ব্যাখ্যা :** পার্শিনান ও শিক্ষার ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের মধ্যে সমন্বয় করতে চেয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন যে শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে প্রত্যেকটি ব্যক্তির জন্য এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা যার মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য পূর্ণভাবে বিকশিত হবে এবং ব্যক্তি বৈচিত্র্যপূর্ণ সমাজ জীবনকে তার নিজস্ব কিছু দিতে পারবে।

❖ **রাধাকৃষ্ণ কমিশনের মতে :** রাধাকৃষ্ণণ কমিশন ও গণতান্ত্রিক শিক্ষার উপযোগিতার কথা বলেছেন। গণতন্ত্রের ভিত্তি হল ব্যক্তি স্বাধীনতা। রাষ্ট্রের দ্বারা শিক্ষার কঠোর নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য করেছেন। কমিশন মনে করে যে আমরা মানুষকে শুধু সুনাগরিক করে গড়ে তুলবো তাই নয়, তাদের ব্যক্তি হবারও শিক্ষা দেব।

❖ **কোঠারী কমিশনের মতে :** কোঠারী কমিশন শিক্ষার সামাজিক উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দিলে ও ব্যক্তির উপর কম গুরুত্ব দেননি। কমিশনের মতে গণতন্ত্রে ব্যক্তিই হল চরম লক্ষ্য এবং শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হল ব্যক্তিকে তার সমস্ত সম্ভাবনার বিকাশের পূর্ণ সুযোগ দান।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে ইহা লক্ষ্য করা যায় যে সবাই মূলত ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক — এই উভয়ই শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত সমন্বিতভাবে কারণ ব্যক্তির অবস্থান সমাজের বাইরে হতে পারে না আবার সমাজও ব্যক্তি ছাড়া কল্পনা করা যায় না। সুতরাং ব্যক্তি ও সমাজের অবস্থান মুদ্রার দুদিক, একে অপরকে ছাড়া সার্থক নয়। আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য ও শিক্ষার গণতান্ত্রিক সমস্যা মূলত একই এবং তা হল ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের সমন্বয়। এই সমন্বয়তার প্রয়োজনীয়তা নীচে সংক্ষেপে ব্যক্ত করা হল—

- সমাজ হল একটি বিমূর্ত ধারণা এবং ব্যক্তি ছাড়া এই ধারণা কল্পনা করা যায় না।
- ব্যক্তি তার নিরাপত্তা, চাহিদার নিবৃত্তি সাধনে সমাজের সৃষ্টি করেছে।
- সমাজবিহীন ব্যক্তির অবস্থান না হয় মানবত্বের না হয় পশুত্বের না হয় দেবত্বের। সমাজ ব্যক্তিকে সামাজিকীকরণের মাধ্যমে পূর্ণ মানুষের স্বরূপে পরিণত করে তার আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, আদব-কায়দার পরিমার্জন ঘটিয়ে।
- সমাজের সৃষ্টি-অগ্রগতি-বিবর্তন-উন্নতি ইত্যাদি সবকিছুই সম্ভবপর হয়েছে ব্যক্তির অবদানের ফলে।
- সমাজ না থাকলে ব্যক্তির বিভিন্ন বিকাশ যেমন মানসিক, প্রাক্ষোভিক, নৈতিক, সাংস্কৃতিক, ভাষাগত ইত্যাদি সম্ভবপর হত না।

- সমাজ সমৃদ্ধশালী হয়েছে বিভিন্ন বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, মনোবিদ, প্রযুক্তিবিদ ইত্যাদি ব্যক্তিদের অসামান্য অবদানের ফলে। এই সমস্ত ব্যক্তিরা যদি সমাজে অবদান না করত তবে সমাজ বিবর্তিত হতে পারত না।
- যদি ব্যক্তি সামাজিক জীবন অবহেলা করে তবে যেমন ব্যক্তির স্বাস্থ্যময় মানসিক জীবন ব্যাহত হয় ঠিক তেমনি সমাজসংগঠনও বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে।
- শিক্ষার ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্য অনুযায়ী ব্যক্তির প্রয়োজন ও চাহিদাই সব থেকে বড় বিষয় কিন্তু অপরদিকে শিক্ষার সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য অনুযায়ী সমাজের চাহিদা ও প্রয়োজনই হল সবথেকে বড় বিষয়।
- ব্যক্তির নিরাপত্তা, চাহিদা যেমন সমাজের মাধ্যমে পূর্ণ হয় ঠিক তেমনি ব্যক্তির সৃজনশীলতা, গবেষণা, আবিস্কার, চিন্তাভাবনা, দায়িত্ব-কর্তব্য ইত্যাদির দ্বারা সমাজ ও পূর্ণতা পায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে।
- ব্যক্তির কল্যাণ সাধন করা যেমন সমাজের কর্তব্য ঠিক তেমনি ব্যক্তিরও কর্তব্য সমাজের কল্যাণ সাধন করা।

প্রাচীন গ্রীসের শিক্ষাব্যবস্থার দুটি পীঠস্থান ছিল এথেন্স ও স্প্যার্টা। এথেন্সের শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য ছিল উপযুক্ত নাগরিক তৈরি করা অর্থাৎ ব্যক্তির পূর্ণ বিকাশ সাধনই ছিল শিক্ষার লক্ষ্য। অপরদিকে স্প্যার্টার শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য ছিল দেশের জন্য উপযুক্ত সৈনিক তৈরি করা অর্থাৎ এখানে শিক্ষার কেন্দ্রে ছিল সমাজ ও ব্যক্তির স্থান ছিল গৌন। কিন্তু সামাজিক কল্যাণের জন্য যেমন ব্যক্তির ভূমিকা অনস্বীকার্য ঠিক তেমনি সমাজের কল্যাণের জন্যও ব্যক্তির ভূমিকা অনস্বীকার্য। ব্যক্তির কল্যাণ সাধন ও সমাজের কল্যাণ সাধনের মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে হবে। জন ডিউই এর মতে গণতন্ত্রই হচ্ছে সেই অভীষ্ট আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা যেখানে ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক এই দুই প্রকারের লক্ষ্যের মধ্যে আপনা থেকেই একটি সুষম সামঞ্জস্য দেখা যায়। তার মতে আদর্শ গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা ব্যক্তির স্বার্থ ও সমাজের স্বার্থ পরস্পরের সাথে মিলে এক হয়ে যায় এবং শিক্ষার লক্ষ্য হয়ে উঠে সমাজ ও ব্যক্তির কল্যাণ সাধন।

বর্তমানে আধুনিক শিক্ষার মূল লক্ষ্যের কিছু উল্লেখযোগ্য হল —

- নিরক্ষরতা দূরীকরণ।
- বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা।
- সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ।
- জাতিভেদ প্রথা, সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতার বিলোপসাধন।
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার।
- শিক্ষাকে প্রতি গৃহে নিয়ে যাওয়া।
- উপযুক্ত নৈতিক ও মূল্যবোধের শিক্ষা।
- পাঠ্যক্রমিক ও সহপাঠ্যক্রমিক বিষয়ের উপর গুরুত্ব প্রদান।
- পরিমাণগত ও গুণগত সার্বিক এবং নিরবিচ্ছিন্ন মূল্যায়ণ।
- দক্ষতার বিকাশ ও প্রয়োগসাধন।
- সুস্থ ও স্বাস্থ্যময় সমাজ নির্মাণ।
- উপযুক্ত অধিকার ও কর্তব্যবোধ সম্পন্ন নাগরিক তৈরি ইত্যাদি।

উপরিউক্ত মুখ্য বিষয়গুলো ছাড়াও আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য ব্যাপক এবং তা গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ছাড়া সম্ভবপর নয় এবং গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাই হচ্ছে ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের এক সার্থক সমন্বয় যেখানে প্রত্যেকেই সমান গুরুত্বপূর্ণ জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে।

•• একবিংশ শতকে শিক্ষার লক্ষ্য:

বর্তমান বিশ্ব অর্থাৎ একবিংশ শতকে শিক্ষা আর পূর্বের নির্দিষ্ট কোনো স্থানে নেই। শিক্ষা তার অবস্থান ক্রমপরিবর্তন করে এসেছে। বর্তমানে একবিংশ শতক পরিলক্ষিত করেছে জ্ঞানের প্রকৃত ব্যবহারের অভাব। পরিলক্ষিত করেছে যে তাত্ত্বিক জ্ঞান দ্বারা জীবন ধারন সম্ভবপর নয় কারণ শিক্ষা হতে হবে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানের সমন্বয়। একবিংশ শতক অতীত হতে শিক্ষা গ্রহণ করেছে যে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে মারামারি, হিংসা, দ্বন্দ্ব, অবিশ্বাস, ভারসাম্যহীন প্রতিযোগিতা বিশ্বকে নানাহ যুদ্ধ ও দুইটি প্রলংকারী প্রথম মহাযুদ্ধ ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সম্মুখীন করেছে এবং যার ফলে মানবজাতি ও সভ্যতা প্রশ্নচিহ্নের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। তাই শিক্ষা যদি মানুষকে তার পশুত্বভাব না কাটাতে পারে তবে ব্যক্তি-সমাজ-সভ্যতা আর কোন কিছুরই অস্তিত্ব থাকবে না। শিক্ষার কাজ হল অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে যাওয়া ও মানসিক অন্ধকার ও অশুভের হাত থেকে দূর করে এক স্বর্গীয় শান্তি ও প্রশস্তির পথে নিয়ে যাওয়া। ফলে শিক্ষার লক্ষ্য একবিংশ শতকে মূলত এমন একজন ব্যক্তি তৈরি করা যে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় প্রকার জ্ঞানেই দক্ষ হবে। সে সমাজে শান্তিময়ভাবে সবার সাথে সহবস্থান করবে এবং সে প্রকৃত মানুষ হবে। আর এই ধারণাগুলো ১৯৯৬ সালের ইউনেস্কোর উদ্যোগে প্যারিসে এক আন্তর্জাতিক শিক্ষা সম্মেলনের অনুষ্ঠানে আরো গুরুত্ব পায়। সেই সম্মেলনে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ জ্যাক্স ডেলারের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠিত হয়েছিল বিভিন্ন দেশের শিক্ষাবিদদের নিয়ে। এই কমিশন 'Learning : The Treasure Within' শীর্ষক একটি প্রতিবেদন পেশ করে ইউনেসকোর নিকট এবং প্রতিবেদনে শিক্ষার চারটি স্তম্ভের কথা বলা হয় :

শিক্ষার চারটি স্তম্ভ

জানার জন্য শিখা (Learning to Know)	কর্মের জন্য শিখা (Learning to Do)	একত্রে বসবাসের জন্য শিখা (Learning to Live Together)	মানুষ হতে শিখা (Learning to Be)

জানার জন্য শিখা (Learning to Know) : শিক্ষা হবে প্রকৃত মানুষ তৈরি করার এবং জ্ঞান অর্জন হবে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা যায় দ্বারা মানুষের অন্তর্নিহিত অন্ধকার দূর হবে। মানুষ তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় প্রকার জ্ঞানকেই ব্যবহার করতে পারবে ইতিবাচকভাবে যার দ্বারা ব্যক্তি ও সমাজের উভয়ের কল্যাণ সাধিত হয়। শিক্ষা জীবনের প্রাপ্তিলাভের মাধ্যম হবে এবং ব্যক্তিকে দায়িত্বশীল সত্তাতে পরিণত করবে। জ্ঞান হবে নিজস্ব চিন্তাধারা, স্মৃতি, যুক্তিশীলতা ইত্যাদি দ্বারা দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যম এবং শিক্ষা হবে জীবনব্যাপী।

কর্মের জন্য শিখা (Learning to Do) : শিক্ষা হবে জ্ঞান, তথ্য জানার একটি ব্যাপার যার দ্বারা দক্ষতার

বিকাশ ঘটানো যাবে এবং সমগ্র বিশ্বে লব্ধজ্ঞান ব্যবহারের উপযোগী হবে। শিক্ষা পূর্বে জীবনশৈলীর বিকাশের মাধ্যম। ব্যবহারিক জীবনে কি ঘটেছে তার উপলব্ধিতে সমর্থ হওয়া, নিজস্ব গুণবৃদ্ধি করা, দক্ষতা ও সামর্থ্য বৃদ্ধি করা, সমস্যা-সমাধানে দক্ষ দওয়া, সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী হওয়া, দলগত কাজের মনোভাব সৃষ্টি করা, প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যবহার জানা, সারাজীবন ব্যাপী শিখনকে উৎকর্ষতার দিকে নিয়ে যাওয়া।

একত্রে বসবাসের জন্য শিখা (Learning to Live Together) : দলবদ্ধ বা যুথবদ্ধভাবে বাঁচার শিক্ষা। শান্তি-সম্প্রীতি-ভালবাসা-সৌভ্রাতৃত্ববোধ-সৃজনশীলতা-পারস্পরিক বোঝাপড়ার দ্বারা পৃথিবীতে বসবাস করা। সামাজিক গুণাবলীর বিকাশসাধন করা, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের ধারণা বজায় রাখা, সম্মিলিতভাবে কাজ করার মানসিকতা বৃদ্ধি করা, শান্তি, বিশ্বাস এর বাতাবরণ বজায় রাখা। যুদ্ধ-হিংসা-দ্বন্দ্ব-ক্লেশ-অসহযোগিতা- অবিশ্বাসের বাতাবরণ নির্মূল করা যাতে প্রত্যেকেই সমগ্র বিশ্বের সন্তান হিসাবে সুস্থ ও সুন্দর ভাবে বেঁচে থাকতে পারে তা বর্ধিত করা।

মানুষ হতে শিখা (Learning to Be) : মানুষের অন্তর্নিহিত গুণাবলীর বিকাশ ঘটানো, নৈতিক ও মূল্যবোধ সম্পন্ন এক দায়িত্ববান ব্যক্তিতে পরিগণিত করা, ব্যক্তি নিজেকে নিজের জন্য ও সমাজের জন্য স্বয়ংসম্পন্ন করা, ব্যক্তির শরীর-মন-আত্মার সম্পূর্ণ বিকাশ সাধন করানো, যোগাযোগের দক্ষ ব্যক্তি হিসাবে তৈরি করা। একজন মানুষকে উপলব্ধি করতে সহায়তা করা মানবতাবাদ ও প্রকৃত মানুষের করণীয় কর্তব্যসমূহ।

অবশেষে বলা যায় শিক্ষার লক্ষ্য ব্যক্তি ও সমাজের চাহিদার সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়। শিক্ষার লক্ষ্যের ধারা পরিবর্তিত হয় সমাজের চাহিদার সাথে। শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য হল অন্তর্নিহিত অন্ধকার দূর করে আলোর পথে নিয়ে আসা এবং ব্যক্তিকে বিজ্ঞানসম্মত ও যৌক্তিক মানসিকতা সম্পন্ন করে তোলা। শিক্ষার লক্ষ্য হল মানুষকে কর্মক্ষম ও মানুষ হবার শিক্ষা প্রদান করা।

পঞ্চম একক শিক্ষার প্রক্রিয়া এবং শিক্ষার ভিত্তি

প্রক্রিয়া : প্রক্রিয়া হল এমন একটি বিষয় যার জন্য সর্বপ্রথমে প্রয়োজন উপাদানের। তারপর প্রয়োজন প্রক্রিয়াটির কি উদ্দেশ্য এবং তার সময়সীমা কতদিন বা বৎসর। প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে প্রক্রিয়াটির লক্ষ্য কি পরিমাণগত নাকি গুণগত। শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রক্রিয়ার ধারণাটি যদি নেওয়া হয় তবে শিক্ষার উপাদান হল মূল চারটি : শিক্ষার্থী, শিক্ষক, পাঠ্যক্রম ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।প্রতিটি স্তরেই (প্রাথমিক—মাধ্যমিক—উচ্চমাধ্যমিক—মহাবিদ্যালয়—বিশ্ববিদ্যালয়) শিক্ষার উদ্দেশ্য বর্তমান এবং নির্দির্শ্বষ্ট করা থাকে সময়সীমা। প্রক্রিয়াটি কি পরিমাণগত না গুণগত সে বিষয় পূর্বে থেকে অনেকটা বলা যায় এবং চূড়ান্তভাবে বলাযায় একটা নির্দিষ্ট সময়পরে যে সময় শিক্ষার্থী পূর্ব নির্দিষ্ট কিছু সম্পন্ন করে থাকে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত শিশু পরিবেশের সাথে সংগতিবিধান করে অনেক কিছু শিখে থাকে। শিশুর ক্রমবিকাশ, অভিযোজন, সমস্যাবিধান ইত্যাদির সাধন হয়। শিক্ষার দ্বারা শিশুর অন্তহীন এই বিষয়টি সাধিত হয় তাই শিক্ষা হল মূলত প্রক্রিয়া। প্রক্রিয়া হিসাবে শিক্ষার কিছু বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান এবং সেগুলোর কিছু হল নিম্নরূপ —

- শিক্ষার একটি উদ্দেশ্য থাকবে।
- প্রক্রিয়ার জন্য কিছু উপাদান প্রয়োজন।
- প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য কিছু লোক দরকার।
- প্রকিরয়ার সম্পন্ন করার জন্য সময়ের প্রয়োজন।
- যতক্ষণ না পর্যন্ত উদ্দেশ্য সম্পন্ন হচ্ছে ততক্ষন পর্যন্ত প্রক্রিয়া চলতে থাকবে।
- প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে কিছু বাধা থাকবে।
- বাধা অতিক্রম করে লক্ষ্যে পৌছানো অবধি প্রক্রিয়া চলতে থাকবে।
- বিভিন্ন উপাদানের প্রভাবে প্রক্রিয়া প্রভাবিত হয়।

প্রক্রিয়া হিসাবে শিক্ষা :

প্রক্রিয়া হিসাবে শিক্ষার অনেকগুলো দিক রয়েছে তারমধ্যে কিছু দিক হল নিম্নরূপ —

১) শিক্ষা হল একটি মিথস্ক্রিয়ামূলক প্রক্রিয়া : শিক্ষার্থী-শিক্ষক-পাঠ্যক্রম-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এই চারটি উপাদানের মূলত মিথস্ক্রিয়া হল শিক্ষা যার সাহায্যে শিক্ষার্থীর আচরণের পরিবর্তন ঘটে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান হয় ও আচরণধারার পরিবর্তন ঘটে। শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক ইত্যাদি দিকের বিকাশ ঘটে। শিক্ষক ও তার শিক্ষণ পদ্ধতি পরিমার্জিত করতে পারেন। পাঠ্যক্রম ও পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত। হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ও গঠনগত পরিবর্তন ঘটে। আর এই সমস্ত মিথস্ক্রিয়া শিক্ষার মাধ্যমেই ঘটে থাকেয

২) শিক্ষা হল সংগতিবিধানের প্রক্রিয়া : শিক্ষা পারিপার্শ্বিক বস্তুজগৎ এর সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে সহায়তা করে। শিক্ষা সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা, অভিযোজন, আত্তীকরণ, সহজোযন, উপযোজন ইত্যাদির মাধ্যমে সামাজিক পরিবেশের সাথে সংগতি বিধানে সহায়ক হয়। শিক্ষার দ্বারা ব্যক্তির মনের আশা আকাঙ্খা,

ইচ্ছা-অনিচ্ছা, দু:খ-ভালোবাসা ইত্যাদির মত প্রাক্ষোভিক বিষয়গুলোর সাথে সংগনিত বিধান সম্ভবপর হয়।

৩) শিক্ষা হল স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া : শিক্ষার ধারণা ও প্রকৃতি পূর্বের ন্যায় আর শিক্ষকের উপর ন্যস্ত নয়, বরং শিক্ষা হয়ে উঠেছে এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে শিশুর সক্রিয়তা ও স্বয়ংশিক্ষাই মূখ্য গুরুত্ব পেয়েছে। অভিজ্ঞতার গঠন ও পুনর্গঠনই হল শিক্ষা যেখানে শিক্ষার্থীকে সক্রিয়ভাবে শিখতে হয় এবং সে সম্পূর্ণভাবে শিক্ষক নির্ভর নয়। ফলে এই শিক্ষা শিক্ষার্থী লাভ করতে পারে সমস্যা সমাধান, আবিস্কারের মানসিকতা ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সাথে অভিযোজনের সাহায্যে। তাই বর্তমানে শিক্ষাকে একটি স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া হিসাবে পরিগণিত করা যায়।

৪) শিক্ষা হল জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়া : পূর্বে শিক্ষা ছিল শিক্ষকের উপর নির্ভরশীল এবং শিক্ষক যে পরিমাণ জ্ঞান দিতেন তার উপরই শিক্ষার্থী নির্ভরশীল থাকত। পূর্বে কেবলমাত্র তাত্ত্বিক শিক্ষার উপরই গুরুত্ব প্রদান করা হত। কিন্তু শিক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত গুণাবলীর বিকাশ সাধিত হত না। তাই বর্তমান শিক্ষার জ্ঞান অর্জন কেবলমাত্র তাত্ত্বিক বিষয়ের উপর কিংবা বিদ্যালয়ের চারদেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং বর্তমান শিক্ষা তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক এই উভয়ের সংমিশ্রণ। ফলে জ্ঞান অর্জন কেবলমাত্র বিদ্যালয়ের চার দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তা পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

৫) শিক্ষা হল সংহতিরক্ষার প্রক্রিয়া : ব্যক্তির প্রয়োজনে সমাজ গড়ে উঠেছে এবং সমাজ হল প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান এক অদৃশ্য সম্পর্কের জাল বা Web of human, inter-relationship.। সমাজের অন্তর্গত প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বা Individual difference পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু সমাজে বসবাস করতে হলে শান্তি, শৃঙ্খলা, প্রীতি ও ভালোবাসা, সৌভ্রাতৃত্ববোধ, সহনশীলতা, সহমর্মিতা ইত্যাদির প্রয়োজন কারণ এই মানবিক গুণাবলীর দ্বারা সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি পরস্পরের সাথে শান্তিপূর্ণ সহবস্থান করতে পারে এবং এর দ্বারা শিক্ষা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে সংহতি বজায় রাখতে পারে ও যুদ্ধ, হিংসা, অসহযোগ, নীতিহীনতা, দ্বন্দ্ব, অসমপ্রতিযোগিতা ইত্যাদির হাত থেকে লক্ষা করতে পারে।

৬) শিক্ষা হল উৎপাদনমূলক প্রক্রিয়া : শিক্ষাকে বর্তমানে Investment হিসাবে গ্রাহ্য করা হয় এবং শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, সমাজ সবাই প্রাপ্ত ফলে আশা করে থাকে। শিক্ষাকে উৎপাদনমূলক প্রক্রিয়া হিসাবে বুঝতে হলে বুঝতে হবে Inpur-Process-Output কে যেখানে Input হচ্ছে কি দেওয়া হচ্ছে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা হিসাবে। Process হচ্ছে মূলত শিক্ষণ-শিখন পরিস্থিতি। আর Output হল শিক্ষার্থীর পরীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফল।

৭) শিক্ষা হল উৎকর্ষবিধানের প্রক্রিয়া : ব্যক্তি শিক্ষার দ্বারা কোন বিষয় উপলব্ধি করতে পারে এবং কোন বিষয়ে কি প্রকারের সামর্থ্যতা প্রয়োজন তাও বুঝতে পারে। ফলে শিক্ষার দ্বারা ব্যক্তির উৎকর্ষবিধান সম্ভবপর হয়ে থাকে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত পাঠ্যক্রম ব্যক্তি ও সমাজের উৎকর্ষবিধানের জন্য ব্যবহৃত হয় ফলে শিক্ষার দ্বারা উৎকর্ষসাধন সম্ভবপর হয়।

৮) শিক্ষা হল স্বনির্ভরশীলতা প্রক্রিয়া : শিক্ষা হচ্ছে ব্যক্তির জন্য সেই মাধ্যম যার সাহায্যে ব্যক্তি অন্ধকার থেকে আলোর পথে যেতে পারে এবং জ্ঞান এর সাহায্যে স্বনির্ভর হতে পারে। ভালো-মন্দের বিচার-বুদ্ধি উপলব্ধি করতে পারে। যে ব্যক্তি শিক্ষিত সে ব্যক্তির কাছে সমস্যা বিশ্ব উন্মুক্ত কিন্তু যে ব্যক্তি নিরক্ষর তার কাছে সমগ্র বিশ্ব উন্মুক্ত নয় কাজের জন্য।

৯) শিক্ষা হল ব্যক্তিত্ব গঠনের প্রক্রিয়া : শিক্ষা হল ব্যক্তিত্ব গঠনের প্রক্রিয়া কারণ শিক্ষার দ্বারা ব্যক্তিকে সুনাগরিক করে তোলা যায় । ব্যক্তির অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে জাগরূক করে তোলা যায়। শিক্ষার দ্বারা ব্যক্তির আচরণের ত্রুটি ও বিচ্যুতিগুলো দূর করা যায়। ফলে শিক্ষা ব্যক্তিত্ব গঠনের প্রক্রিয়া হিসাবে সমাজে সুচারূ ভূমিকা পালন করে থাকে।

১০) শিক্ষা হল গবেষণামূলক প্রক্রিয়া : শিক্ষার্থী—শিক্ষক—পাঠ্যক্রম—শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হল শিক্ষার মূল চারটি উপাদান এবং এদের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া শিক্ষাকে একটি প্রয়োগমূলক বিজ্ঞানে উন্নীত করেছে। সমাজবিজ্ঞানের এই শাখাটির উপর প্রতিনিয়ত প্রচুর পরিমাণে গবেষণা হচ্ছে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন Project, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের Dissestation, M.phil, Ph.D., Post-Doctorate & D.Lit স্তরের নানা গবেষণা। ফলে নিরন্তন গবেষণার ক্ষেত্র হিসাবে শিক্ষা হল একটি গবেষণামূলক প্রক্রিয়া এবং গবেষণালব্ধ পরীক্ষা-নীরিক্ষা ও প্রাপ্ত ফলাফলের উপর ভিত্তি করে শিক্ষা তার আলো দ্বারা ব্যক্তি ও সমাজকে আলোকিত করে চলেছে।

উপরিউক্ত বিষয়গুলো ছাড়াও শিক্ষা প্রক্রিয়ার আরো দিক রয়েছে যেমন— সাংস্কৃতিক বিকাশের প্রক্রিয়া, সমাজ পুর্নগঠনের প্রক্রিয়া, সমাজের জন্য উপযুক্ত মানব সম্পদ তৈরি করার প্রক্রিয়া ইত্যাদি। শিক্ষা তার প্রকৃতি ক্রমপরিবর্তন করে চলেছে কারণ শিক্ষা তার পরিধির ক্রমবিস্তার ঘটিয়ে চলেছে। ফলে প্রক্রিয়া হিসাবে শিক্ষা শুধু নির্দিষ্ট কিছু ধারণার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে এমন নয় কারণ শিক্ষা বহমান স্রোতের মত এবং প্রক্রিয়াগুলো ক্রমবিবর্তিত।

শিক্ষার ভিত্তিসমূহ :

সমন্বয়ী প্রয়োগমূলক বিজ্ঞান হল আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞান, শিক্ষাবিজ্ঞানের বিকাশ এবং শিক্ষা বিষয়ক নীতিগুলোর নির্ধারণ যার সহায়তায় সম্ভব হয়েছে সেগুলোই শিক্ষার ভিত্তি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। একটি স্বতন্ত্র শাখা হিসাবে শিক্ষাবিজ্ঞান বর্তমানে ক্রমবিবর্তনের ধারায় একটি 'Multidisciplinary' বিষয় হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। বর্তমানে 'Social-Science' এর প্রায়শ: বিষয়ই শিক্ষাবিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। শিক্ষাবিজ্ঞানের এই স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্যতার পটভূমিকায় যার অবদান তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো হল শিক্ষাবিজ্ঞানের বিভিন্ন ভিত্তিসমূহ, যা নিম্নে বিশ্লেষিত হল ।

শিক্ষার ভিত্তিসমূহ

শিক্ষার জৈবিক ভিত্তি	শিক্ষার মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি	শিক্ষার দার্শনিক ভিত্তি	শিক্ষার সমাজবৈজ্ঞানিক ভিত্তি	শিক্ষার অর্থনৈতিক ভিত্তি

শিক্ষার জৈবিক ভিত্তি : বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্ ও চিন্তাবিদ্গণের মতে, মানুষের জৈবিক উপাদান ও জৈবনিক প্রক্রিয়াগুলো মানুষের জীবনের বহুমুখী বিকাশে সহায়তা করে।

ইংরেজি Biology শব্দের বিশ্লেষণ হল —

Bios — জীবন

Logos — জ্ঞান

শিক্ষা জীবন বিজ্ঞানের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। মানুষের দৈহিক ও মানসিক বিকাশে শিক্ষা ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়াকলাপ, পরিবেশের প্রভাব, প্রাণের অস্তিত্ব— জীববিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। তাই জীববিজ্ঞানকে শিক্ষার মূল ভিত্তি হিসেবে ধরা হয়েছে।

জীবকূলের শ্রেষ্ঠ প্রাণী মানুষ, মানুষ বৌদ্ধিক ক্ষমতায় এবং অভিযোজন ক্ষমতায় এগিয়ে থাকা সত্বেও আরও শক্তিশালী ও ব্যাপকতর করার জন্য প্রয়োজন শিক্ষার। এখানেই শিক্ষায় জীববিজ্ঞানের ভিত্তি শ্রেষ্ঠত্বের পেছনে জৈবনিক বৈশিষ্ট্যগুলো হল —

- চিন্তন, কল্পনা, যুক্তি, বিচারকরণ, ধারণা গঠন, স্মৃতি, সবকিছুই কেন্দ্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের দ্বারা সংঘটিত হয়।
- মানুষ পা-দুটি চলার কাজে এবং হাত দুটে নানাবিধ জটিল কাজ সম্পন্ন করতে ব্যবহার করে।
- উন্নত স্বরযন্ত্রের ব্যবহার বিবর্তনের আরেক পদক্ষেপ। ভাষা যেমন যোগাযোগের মাধ্যমে তেমনি ভাষাই ভাষাকে চিন্তা করার ক্ষমতা দেয়।
- পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গো অভিযোজন করার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষালাভ করে।

জীববিজ্ঞানের প্রভাব শিক্ষাক্ষেত্রে : শিক্ষায় জীববিজ্ঞানের যে অবদান তা পরিস্ফুট হয় আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য, প্রকৃতি, পদ্ধতি, স্থায়িত্ব নির্ধারণে জীববিজ্ঞানের যে প্রভাব তা দেখে।

১) শিশুর অন্তর্নিহিত সত্তার বহি:প্রকাশই হল আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য। জীববিজ্ঞানের মতে, প্রত্যেক শিশু বংশগতির ধারায় পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে কিছু বৈশিষ্ট্য লাভ করে। আধুনিক শিক্ষার ধারণার ভিত্তি হল - বংশগতি সম্পর্কে জীববিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত।

২) দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, প্রাক্ষোভিক, নান্দনিক অর্থাৎ শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশই শিক্ষার লক্ষ্য। জীববিজ্ঞানের অভিমত, স্বাভাবিক নিয়মেই বিকাশলাভ করতে পারে শিশুর জন্মগত সম্ভাবনাগুলো, আধুনিক শিক্ষাবিদ্গণের মতে পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গো সঠিক অভিযোজন সম্ভব শিক্ষার মাধ্যমেই যা জীবনবিকাশে সহায়তা করে।

৩) জীববিজ্ঞানে বলা হয়েছে উদ্দীপনা শিশুর জ্ঞানেন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করলেই সে প্রতিক্রিয়া করে। সঠিক উদ্দীপক নির্বাচন শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। পাঠ্যক্রম ও সহপাঠ্যক্রম নির্ধারণে এই নীতি অনুসরণ করা যা জীববিজ্ঞানের প্রভাবেই প্রভাবিত।

৪) শিক্ষার পদ্ধতি নির্ধারণেও জীববিজ্ঞানের প্রভাব আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপ করেছে। শিক্ষার্থীদের সক্রিয় করে তোলা যা জীববিজ্ঞানে বিভিন্ন উদ্দীপক ব্যক্তিকে সক্রিয় করে তুললেই প্রতিক্রিয়া করে- এই ধারণাই কাজে লাগানো হয়েছে।

৫) প্রেষণা যা চাহিদা থেকে উদ্ভূত আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে যার গুরুত্ব তাও জীববিজ্ঞানের ভাষায় উদ্দীপক ছাড়া আর কিছু নয়।

৬) ব্যক্তিসত্তার বিকাশ, অভ্যাসগঠন, ব্যক্তিত্ব— এসবই আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানের আওতাধীন। এসব কিছুই জীববিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের উপরই নির্ভর।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় শিক্ষার আধুনিক ধারণা গঠন, শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ, শিক্ষার জন্য উপযুক্ত পাঠ্যক্রম রচনা, সুষ্ঠু শিক্ষণ পদ্ধতি রচনা— সর্বক্ষেত্রেই প্রভাব বিস্তার করেছে জীববিজ্ঞান। মানুষের আচরণের জৈবিক কারণগুলোর অনুসন্ধান করে জীববিজ্ঞান, আর মানুষের আচরণের উন্নতি ঘটায় শিক্ষাবিজ্ঞান। গুণমানসম্পন্ন শিক্ষক হতে গেলে জীববিজ্ঞানের জ্ঞান থাকা আবশ্যক, শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তার সঠিক বিকাশ যা শিক্ষার মাধ্যমেই সঠিক বিকশিত হয়।

শিক্ষার মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি

শিক্ষার মনোবৈজ্ঞানিক দিকের প্রতি প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন শিক্ষাবিদ পেস্তালাৎসী। শিক্ষার প্রধান উপাদান শিশু। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ফরাসি চিন্তানায়ক ও শিক্ষাবিদ্ রুশো প্রথম শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার কথা বলেন। মনোবৈজ্ঞানিকেরা কিভাবে শিশু নানা বিষয় শেখে, নানা কৌশল ও দক্ষতা আয়ত্ব করে তা নিয়ে নানা গবেষণা করেছেন।

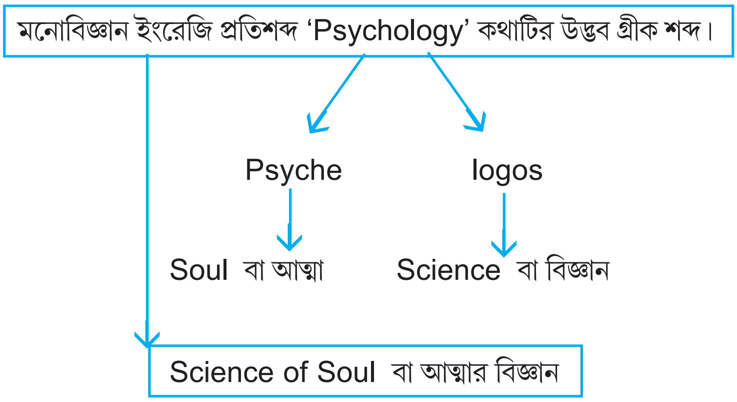

গ্রীক মনোবিজ্ঞানীরা মনোবিজ্ঞানকে গ্রহণ করেছিলেন—

- প্রাচীনকালে 'আত্মার বিজ্ঞান'
- মধ্যযুগে 'চেতনার বিজ্ঞান'
- আধুনিক যুগে 'আচরণের বিজ্ঞান'

তাই আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী মনোবিজ্ঞানী ম্যাকডুগালের মতে মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা হল - "Psychology is the positive science of the behaviour of living things.". অঙ্গাঙ্গীভাবে

জড়িয়ে আছে মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে শিক্ষা। মনোবিজ্ঞানের নীতিগুলো শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগের ফলেই উদ্ভব হয়েছে শিক্ষামনোবিজ্ঞানের। শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া কার্যকরী করার ক্ষেত্রে শিক্ষকের বিষয়ের জ্ঞানের পাশাপাশি শিক্ষার্থী সম্পর্কেও তাকে অবগত হতে হবে। এই প্রসঙ্গে John Adam-র উক্তিটি হল — "The teacher teacher John Latin/' শিক্ষাদান কার্যে অগ্রসর হতে গেলে শিক্ষাক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের নীতিগুলিকেই ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা আবশ্যক। ব্যক্তির আচার-আচরমের সংহত পরিবর্তনই শিক্ষা। ব্যক্তির আচার-আচারণের গতি প্রকৃতি মনের বিভিন্ন ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে মনোবিজ্ঞান। সমাজে সুষ্ঠু নাগরিক এবং সামাজিকীকরণের জন্য উপযুক্ত আচরণ শিক্ষা দেয় শিক্ষা মনোবিজ্ঞান। 'ভ্রুণ অবস্থা থেকে শেষ স্তর'— প্রতিটি স্তরই মনোবিজ্ঞানকে ভিত্তি করেই শিক্ষাদান সম্পন্ন হয়। তাই শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান ঘনিষ্ট সম্পর্কে আবদ্ধ।

প্রাচীন শিক্ষার ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় সে সময় শিক্ষাক্ষেত্রে শাস্তিকে প্রাধান্য দিয়ে শিশু মনকে কলুষিত করা হত। শিক্ষার নীতিই ছিল "Spare the rod and spoil the child.' শিক্ষাব্যবস্থাই ছিল শিক্ষক প্রধান। কালের প্রবাহে মনোবিজ্ঞানের জ্ঞানের প্রসারের ফলেই শিক্ষাক্ষেত্র শিশুকেন্দ্রিক। শিক্ষককে সচেতন হতে হয় শিশুর আগ্রহ, রুচি, চাহিদা, ভালোলাগা, মন্দ লাগা এমনকি কখন, কিভাবে এবং কি শিক্ষা দিতে হবে তার ভিত্তিতেই।

সামাজিক জীব বলে মানুষের মনের বিচিত্র ক্রিয়াকলাপ মনোবিজ্ঞান সামাজিক পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার-বিবেচনা করে থাকে। বর্হিজগতের উদ্দীপক মানুষকে বিভিন্ন কর্মপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে। মনোবিজ্ঞানই মানুষের মনে কিভাবে বিভিন্ন কর্মপ্রেরণার সৃষ্টি হয় এবং মানুষ কিভাবে বিভিন্ন কর্মে লিপ্ত হয় সে সম্পর্কে আলোচনা করে। কর্মপ্রেরণাই মানুষকে নানারূপ কাজকর্মে নিয়োজিত করে। কাজকর্মের মাধ্যমেই মানুষ পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিস্থাপন করে। সুষ্ঠু সঙ্গতিসাধন সম্ভব একমাত্র শিক্ষার দ্বারা। সেই হিসেবেই বলা যায় শিক্ষা এবং মনোবিজ্ঞান একে অপরের পরিপূরক।

মানসিক প্রতিক্রিয়ার বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যা দেয় মনোবিজ্ঞান। মানসিক প্রতিক্রিয়ার তিনটি পর্যায় দেখা যায় মনোবিজ্ঞানের বিশ্লেষণের মাধ্যমে।

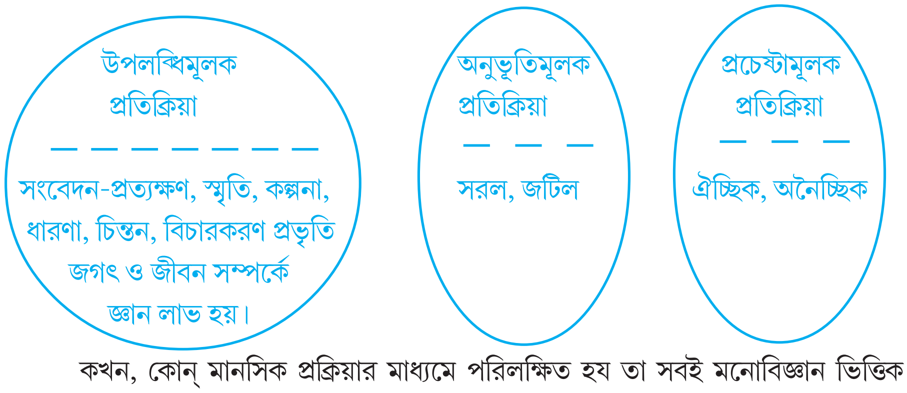

কখন, কোন্ মানসিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিলক্ষিত হয় তা সবই মনোবিজ্ঞান ভিত্তিক। ব্যক্তিত্ব, চরিত্রগঠন, ব্যক্তির মধ্যে কি ধরণের ব্যক্তিগত প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। দৈহিক-মানসিক প্রক্রিয়াগুলো কিভাবে পরস্পরকে প্রভাবিত করে - এসবই মনোবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে শিক্ষা ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত বলেই সঠিক সময়ে সঠিক ব্যাখ্যা সম্ভব হয়।

আধুনিক বিজ্ঞান হিসাবে স্বীকৃত মনোবিজ্ঞান। পরীক্ষা-নীরিক্ষার ভিত্তিতেই মনোবিজ্ঞান অন্তনিরীক্ষণের প্রাচীন পদ্ধতি অপেক্ষা বিভিন্ন প্রকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও উপকরণের সাহায্যে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে মানুষের আচরণকে বিশ্লেষণ করে। বর্তমানে শিক্ষার মাধ্যমেই জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও পদ্ধতির ব্যাপক প্রয়োগ ঘটে। মনোবিজ্ঞানের ব্যবহারিক শাখা হিসাবেই স্বীকৃত হয় শিক্ষা মনোবিজ্ঞান।

শিক্ষাক্ষেত্রে "Jug and mug theory' কিংবা Pipe line theory বর্তমানে পরিত্যক্ত মনোবিজ্ঞানের চিন্তার প্রসারের ভিত্তিতেই। শিক্ষক ও বিষয়কেন্দ্রিক শিক্ষার গুরুত্ব হ্রাস পেয়ে শিক্ষা দাঁড়িয়েছে শিশুর প্রতি স্নেহ, ভালবাসা, সহানুভূতি ও সজাগ দৃষ্টির উপর। সব শিশু সমানভাবে শেখে না। বুদ্ধি ও শিক্ষালাভের ক্ষমতাও পৃথক কিন্তু মনোবিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষাই আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থাকে পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত রূপ দেয়।

শিক্ষা মনস্তত্ব শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায় কতটা কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারল তা নিম্নে আলোচনা করা হল।

❖ শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুর ব্যক্তিত্বের মর্যাদা স্বীকৃত ছিল না। অনাদৃত ও উপেক্ষিত ছিল শিশু। মনস্তত্বের জ্ঞান প্রসারই শিশুমনকে জানার সুযোগ করে দেয়। শিক্ষক-শিখন প্রক্রিয়ায় শিক্ষকেরও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটল।

❖ শিক্ষার্থীর শক্তি সম্ভাবনা, আবেগ ও বুদ্ধি অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা, শিক্ষাকে ব্যক্তিমুখী করে শিক্ষন-শিখন প্রক্রিয়ায় কার্যকরী রূপ দেয়।

❖ শিখন প্রক্রিয়া, উপযুক্ত নির্দেশনা প্রভৃতিতে সঠিক পথ দর্শায় শিক্ষা মনোবিজ্ঞান। শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া বিভিন্ন রকম কৌশল তাও শিক্ষা মনোবিদ্যারই অন্তর্ভুক্ত বিষয়।

❖ শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা শিক্ষা মনোবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত বিষয়।

❖ মনের অর্ন্তদ্বন্দ্ব ও সংঘাত — বিশ্লেষম, প্রতিকার সবই শিক্ষা মনোবিদ্যা সহায়তা করে।

❖ শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ দিক হল সক্রিয়তাবাদ। সক্রিয়তাভিত্তিক শিক্ষা কর্মের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা অর্জনের ব্যবস্থা করে। মনোবিজ্ঞানের উপরই প্রতিষ্ঠিত সক্রিয়তাবাদের নীতি। মনোবিজ্ঞানী ই. এল. থর্নডাইক আত্মসক্রিয়তাকে গুরুত্ব দিয়েছেন প্রচেস্টা-ভুলের কৌশলে।

❖ শিক্ষার্থীর পঠন-পাঠনের যথাযথ মূল্যায়ণ, শিক্ষকের শিক্ষণ পদ্ধতির মূল্যায়ণ— এসবই মনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বনে সম্ভব।

❖ শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় ইতিবাচক মনোভাব, শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রেষণা সঞ্চার এবং প্রেষণার কৌশলগুলো মনোবিদ্যার পদ্ধতি অনুসরণেই আয়ত্ত করা যায়।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তাই বলা যায় শিক্ষার তাত্ত্বিক দিকে মনোবিজ্ঞানের প্রভাব অসীম। শিক্ষাক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের প্রভাব ক্রমশই বেড়ে চলছে। পরিবর্তনশীল সমাজব্যবস্থায় শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায় বিজ্ঞান সম্মত রূপ দেওয়ার জন্য সহায়ক ভূমিকা নেয় মনোবিজ্ঞান।

শিক্ষার দার্শনিক ভিত্তি :

আমি কে, কোথা থেকে এলাম, কি করব, কোথায় যাব, জগৎ কি, জীবনই বা কি, আত্মা কি, কোথায় থাকে ইত্যাদি— এসব প্রশ্ন থেকেই দর্শনের উদ্ভব। জীবনের সঙ্গো নিবিড় সম্পর্ক দর্শনের।

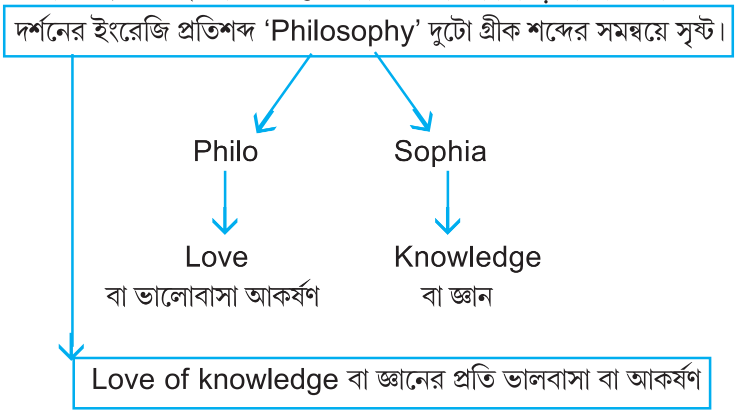

Philosopher বা দার্শনিক হলেন তিনি, কোন দিন যার জ্ঞানের প্রতি পিপাসা তৃপ্ত হয় না। দর্শনের কাজই হল জীবনের মূল স্রোত ও উদ্দেশ্যকে অনুসন্ধান করা। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও মানুষের জীবনের নানা প্রশ্ন, ঘটনাবলীর পারস্পরিক বন্ধন তৈরী করাও দর্শনের কাজ। পাশাপাশি জীবন বিকাশের জন্য প্রয়োজন শিক্ষার। কেননা শিক্ষা জীবনমুখী প্রক্রিয়া। সামাজিক দৃষ্টির ভিত্তিতে জীবনের সঙ্গো সংগতি রেখেই শিক্ষা মানুষকে উত্তরণের পথ দেখায় তা দর্শনেরই ফল। দর্শনের মাধ্যমেই জীবনের তাৎপর্য, সামগ্রিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত হওয়া যায় এবং শিক্ষাই সম্প্রসারণ করে জীবনের। এককথায় তাই বলা যায় জীবন, দর্শন ও শিক্ষা একে অপরের পরিপূরক। জীবন দর্শনের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় শিক্ষাদর্শনে।

দর্শন যুক্তিসিদ্ধ উন্নত চিন্তার শেষ ফল। ব্যক্তির নান্দনিক চিন্তাধারার প্রেরণা, যাকে সফল করতে প্রয়োজন বিজ্ঞানের এবং এই বিজ্ঞানই দর্শনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। শিক্ষাকে বিজ্ঞান হিসাবে বিবেচনা করলেও অর্থপূর্ণ করে তোলে দর্শন। এজন্যই দার্শনিক Fichte বলেছেন, ‘The art of education will never attain complete clearness in itself without philosophy.’

মূল্যবোধ ব্যতীত জীবন ব্যর্থ। মূল্যবোধ ব্যক্তিজীবনে জাগিয়ে তোলে দর্শন। বাস্তবে কার্যকরী রূপ দেয় শিক্ষাবিজ্ঞান। সেইজন্য নির্দ্বিধায় বলা যায় দর্শন ও শিক্ষার সম্পর্ক গভীর।

শিক্ষার লক্ষ্য বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন সমাজ-জীবনের ও বিভিন্ন লক্ষ্যের সঙ্গো সংগতিপূর্ণ। সত্য কথা বলতে কি— মানুষের জীবনের ইতিহাস ও শিক্ষার ইতিহাস একপথে এগিয়ে গেছে। মানব ইতিহাসে বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন জীবন দর্শন অনুসারে শিক্ষার বিভিন্ন লক্ষ্যকে সুস্পষ্ট করে শিক্ষার লক্ষ্যের ক্রমবিকাশের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে এবং তা সম্ভব হয়েছে দর্শনের দ্বারাই। তাই শিক্ষার লক্ষ্য দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত।

মানুষের প্রতিটি প্রচেস্টার পেছনে থাকে উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্যহীন ও লক্ষ্যহীনভাবে কোন কাজ সুশৃঙ্খল যখন আনতে সক্ষম হয় না। একজন মানুষ লক্ষ্যহীনভাবে তার বঞ্চিত, ইঙ্গিত ও অভীষ্ট বস্তুকে লাভ করতে পারে না। তাই বলা হয় লক্ষ্যহীন ব্যক্তি ঠিক যেন একটি দাঁড়বিহীন নৌকার মতন। উদ্দেশ্যহীন এলোমেলো

যাযাবর জীবন নির্দিষ্ট পথে পরিকল্পনামত এগিয়ে যেতে পারে না। উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য স্থির না করে শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ কাজে প্রবৃত্ত হলেও সঠিক পথে এগিয়ে না গিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। শুধু শিক্ষা নয় জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও উদ্দেশ্যহীনভাবে এগিয়ে যাওয়ার ফল নিছক দুর্ঘটনাকেই ডেকে আনে। উদ্দেশ্যহীনতা থেকে পরিত্রাণ সম্ভব দর্শনের সাহায্যে। দর্শনই বলে দেয় উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি জীবনের। দর্শন এবং জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই দর্শন ছুঁয়ে যায়। শিক্ষাবিদ্ নান্ (Nunn) বলেছেন — 'Every scheme of education, being to bottom a practical philosophy, necessarily touches life at every point.'

গণতান্ত্রিক শিক্ষাদর্শনের উপরই প্রতিষ্ঠিত আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা। ব্যক্তি ও সমাজের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনই শিক্ষাদর্শনের মূল উদ্দেশ্য। গতানুগতিক শিক্ষা পুঁথিগত বিদ্যাচর্চার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের গ্রন্থপন্ডিত করে তুলত, কিন্তু আধুনিক শিক্ষা শিক্ষার্থীদের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার বিকাশ সাধন এবং সামাজিক শিক্ষা- এ দুয়ের উপর সমান গুরুত্ব দেয়। এসব সম্ভব হয়েছে দর্শনের প্রভাবেই।

আধুনিক শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতাই হল শিশু-কেন্দ্রিকতা। গতানুগতিক শিক্ষায় সম্পূর্ণভাবে অবহেলিত ছিল শিশুর ব্যক্তিসত্ত্বা। কঠোর বিধিনিষেধের শৃঙ্খলা শিশুকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রাখত। দর্শনের প্রভাবেই কঠোর শৃঙ্খলমুক্ত হল শিশু এবং শিক্ষার কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করা হল শিশুকে। তাদের চাহিদা, আগ্রহ, রুচি, সামর্থ্যকে গুরুত্ব দিয়ে অবাধ শৃঙ্খলার উপর জোর দিয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হল। তাই বলা যায় শৃঙ্খলা ও দর্শনের দ্বারাই প্রভাবিত।

শিক্ষা দর্শনের তত্ত্ব প্রচার ও প্রসার করে। জীবনের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিকের প্রশ্নের উত্তর দেয় দর্শন এবং তার ভিত্তিতেই গড়ে উঠে জীবনাদর্শ। জীবনাদর্শের সঞ্চালন সম্ভব শিক্ষার মাধ্যমে। তাই শিক্ষা ও দর্শনের ভেতর নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। তাই Ross বলেছেন— 'Philosophy and education are the two sider of a coin'.

শিক্ষার বিভিন্ন দিক- লক্ষ্য, পাঠ্যক্রম, শৃঙ্খলা, শিক্ষকের ভূমিকা, শিক্ষণ পদ্ধতি সবই দর্শনের দ্বারাই প্রভাবিত। পাঠ্যক্রম এবং পাঠ্যপুস্তক রচিত হয় শিক্ষার আদর্শানুযায়ী লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য। শিক্ষার্থীর আগ্রহ, অনুরাগ সৃষ্টির জন্যই পাঠ্যপুস্তকে বিভিন্ন প্রকার ছবি, দৃষ্টান্ত, শিক্ষা উপকরণ ইত্যাদি সংযোজন করা হয়। আধুনিক শিক্ষায় তিন শ্রেণির দার্শনিক প্রভাব দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়— ভাববাদী দর্শনের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় পাঠ্যপুস্তক রচনার সময় শিক্ষার্থীর উপযোগী ভাব ও ভাষার প্রয়োগের ভিত্তিতে। শিক্ষণ পদ্ধতি ও শিক্ষা সহায়ক উপকরণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রকৃতিবাদী দর্শনের গুরুত্ব উপলব্ধ হয়। ব্যক্তিশিক্ষণ ও শ্রেণিশিক্ষণের সমন্বয়, শিশুর সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার উপর সমাজবাদের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। তাই প্রয়োগবাদী দর্শন থেকেই কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষণ পদ্ধতি ও শিক্ষার প্রয়োগমূলক দিকগুলোর উদ্ভব। শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় শিক্ষক যে পদ্ধতিই অবলম্বন করেন তা দার্শনিক চিন্তাধারার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত । ডিউই-র মতে শিক্ষাতত্ত্ব শিক্ষাদর্শনেরই ব্যবহারিক শাস্ত্র।

ব্যক্তিকে নিয়ে সমাজ এবং সমাজের মধ্যেই ব্যক্তি। ব্যক্তি ও সমাজের উন্নতি সাধন সম্ভব শিক্ষার দ্বারা। শিক্ষার সঙ্গে দর্শনের যেমন সম্পর্ক আছে তেমনি আছে সমাজের সঙ্গেও। শিক্ষা পরিবেশকে অস্বীকার করতে পারে না। তাই শিক্ষার সামাজিক ভিত্তিকে অস্বীকার করা যায় না। সামাজিক মূল্যায়ণ, শিক্ষার মূল্যায়ণ,

জীবনের মূল্যায়ণ-সবই দর্শনভিত্তিক। শিক্ষার মৌলিক তত্ত্ব ও নীতি থেকে আরম্ভ করে শিক্ষার ব্যবহারিক দিক সবকিছুই দর্শনশাস্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তাই বলা যায়— 'জীবনের দর্শন ও শিক্ষার দর্শনকে আজকাল আর পৃথক করে ভাবা যায় না। কারণ শিক্ষা ও জীবন এক সূত্রে গাঁথা।' জীবনের ক্রমোন্নতির জন্য যে মৌলিক নীতি ও তত্ত্বের প্রয়োজন তা গঠন করে দর্শন। দার্শনিক তত্ত্বের মূল উদ্দেশ্যই হল মানব কল্যাণ ও উন্নয়ন সাধন। দর্শন ও শিক্ষা উভয়েই মানব কল্যাণে ব্রতী - উভয়েরই মধ্যে রয়েছে গভীর যোগসূত্র। একের সহায়তা ছাড়া অপরটি অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়।

শিক্ষার সমাজতত্ত্বমূলক ভিত্তি

ব্যক্তিকে নিয়ে সমাজ আবার সমাজের মধ্যেই ব্যক্তি। শিক্ষা ব্যক্তির উন্নয়ন এবং সামাজিক উন্নয়ন ও প্রগতি উভয়ই সমান গুরুত্বপূর্ণ। তাই বলা হয় শিক্ষা ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রক্রিয়া। সমাজবদ্ধ জীব মানুষ। তাই মানুষের জন্ম,মৃত্যু, বৃদ্ধি-বিকাশ সবই এই সমাজেই।

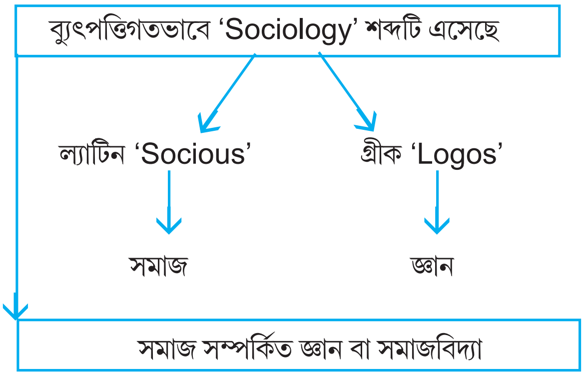

সমাজবদ্ধ মানুষের ভাবের আদান প্রদানের ফলে যা কিছু ঘটে সবই সমাজবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। ১৮৩৯ সালে সমাজবিজ্ঞানী August comte 'Sociology' শব্দটি ব্যবহার করেন। সমাজবিজ্ঞানের সংজ্ঞায় Ginsbery বলেছেন 'Sociology is the science of social relationship.'

প্রাচীন ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যাযাবর জবনে মানুষ তার নিজের প্রয়োজনের তাগিদেই একত্রিত হয়েছিল। একত্রিত হয়ে বিদ্যালয়মুখী শিক্ষা, সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তোলা, সভা সমিতি স্থাপন প্রভৃতি স্বত:প্রণোদিত হয়েই তৈরি কেননা মানুষ একত্রিত হয়ে সমাজবদ্ধভাবে বাস করতে চায়। এভাবেই সমাজের সৃষ্টি। তবে প্রত্যেক সমাজেরই তার নিজস্বতা, স্বাতন্ত্র্যতা, বিধিনিষেধ, নিয়মকানুন, অনুশাসন, প্রথা পৃথক পৃথক । প্রত্যেক সমাজের ব্যক্তি তার সমাজের সব বৈশিষ্ট্যগুলো মেনে চলে সমাজে বাস করার ফলে নয়ও সমাজজীবনের সংহতির ব্যাঘাত ঘটে এবং গোষ্ঠী জীবনের অগ্রগতি ব্যাহত হয়। সমাজ জীবনের বৈশিষ্ট্যগুলি একটি শিশু আয়ত্ত করে শিক্ষার মাধ্যমেই। সমাজবিজ্ঞানীদের মতে শিক্ষাই সমাজের উত্থান পতনের হাতিয়ার।

সমাজকে বাদ দিয়ে শিক্ষারম্ভ হত না প্রাচীন যুগেও, তা আদিম মানবজাতির মধ্যে আনুষ্ঠানিকতা থেকেই জানা যায়। এমনকি বৈদিক যুগেও উপনয়ন প্রথা সামাজিক শিক্ষার শুভারম্ভই ছিল। সমাজবিজ্ঞানীরা এই অভিমত পোষণ করেন যে শিক্ষাই সমাজের প্রত্যাশা মেটায় এবং বৈপ্লবিক ভাবধারার সম্প্রসারণ ঘটায়। চেতনাবোধ জাগ্রত করে শিক্ষা, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক পরিবেশে সচেতন করাই শিক্ষা ও শিখনের মূল্য লক্ষ্য এবং এই উদ্দেশ্যকে সার্থক করার জন্যই বিদ্যালয় স্থাপন যা সমাজেরই ক্ষুদ্র সংস্করণ। শিক্ষার মাধ্যমেই নতুন নতুন ভাবধারা, কার্যকর .. উদ্ভাবন, প্রগতিশীল তত্ব ও তথ্যের আহরণ, প্রযুক্তির উন্নয়ন, প্রাচীন চিন্তাধারার পরিবর্তন নতুনতত্ত্ব উদ্ভাবন- সবই সম্ভব যা সমাজকে গতিশীলতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। প্রাচীনত্ব সংরক্ষণ, সঞ্চালন ও পরিমার্জন সম্ভব একমাত্র শিক্ষার দ্বারাই, সেজন্য সমাজের ক্রমোন্নতি নির্ভর শিক্ষার উপরই।

মানুষ একা-অত্যন্ত অসহায়। প্রত্যেকে প্রত্যেকের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছা, সুপ্ত সম্ভাবনা সবই বিকশিত হয় সমাজে, ব্যক্তির ব্যক্তি সত্তার সংগঠনও নির্ভর সমাজের উপর। একমাত্র শিক্ষাই ব্যক্তি ও সমাজের সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে। উন্নততর সামাজিক জীবন ব্যক্তির সম্ভব শিক্ষার মাধ্যমেই । তাই সমাজ বিজ্ঞানীরা মনে করেন সামাজিক সংস্থার অন্তর্ভুক্ত হল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো। সমাজের শিক্ষাব্যবস্থাই সেই সমাজের লক্ষ্য ও আদর্শকে পরিস্ফুট করে তুলে। তাই ব্যক্তি শিক্ষা শুধুমাত্র ব্যক্তিমুখী নয়, সমাজমুখীও । ব্যক্তির সংগঠন, বৃদ্ধি, সংবর্ধন সবই সমাজের উপরই নির্ভরশীল।

ব্যক্তির শিক্ষা যে সব সামাজিক সংগঠনের মাধ্যমে হয়ে থাকে সেগুলো হল—

রাষ্ট্র : আধুনিককালে শক্তিশালী শিক্ষার মাধ্যমে রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের স্বার্থেই নাগরিকদের ব্যাপক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। বহুলাংশে সক্রিয় অংশগ্রহণ, জাতীয় সংহতি রক্ষা, আন্তর্জাতিকতাবোধ সবই সম্ভব শিক্ষার দ্বারাই, রাষ্ট্রীয় মনোভাব জাগ্রত হয় সামাজিক শিক্ষাকে ভিত্তি করে। তাই সমাজের পরে, রাষ্ট্র আবার বলা যায় সমাজ ও রাষ্ট্র অভিন্ন। রাষ্ট্র সমাজেরই অন্তর্ভুক্ত একটি সংগঠন।

প্রতিক্রিয়াশীল দল : দল বেঁধে থাকা মানুষের সহজাত ধর্ম। রুচি, আগ্রহ, প্রবণতা, প্রয়োজন, স্বার্থ, ধর্ম, সংস্কৃতি, সাহিত্য, শিল্প, আমোদ-প্রমোদ, খেলাধূলা, অবসর সময় কাটানোর তাগিদ প্রভৃতি দিককে অবলম্বন করেই বিভিন্ন দলের সৃষ্টি। সংকীর্ণ মনোভাব হলে সেই দলও সংকীর্ণ থেকে যায়। বৈচিত্র, অভিনবত্ব অর্থাৎ ব্যাপকতা বিস্তার হলেই সেই দলও ব্যাপক হয়। তবে এককথায় বলা যায় প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব যেই দলের থাকে সেই দলই ব্যাপক রূপ দাঁড় করাতে পারে এবং সমাজকে পাশাপাশি রাষ্ট্রকে ক্রমোন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

পরিবার : সামাজিক সংগঠনের সবচেয়ে স্থায়ী এবং ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে একজন ব্যক্তির জীবনে সেটি হল তার পরিবার। মানসিক তৃপ্তি লাভের প্রাথমিক এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থায়ী ক্ষেত্র পরিবার। জৈবিক চাহিদাগুলো যেমন ক্ষুধা, তৃষ্ণা, বিশ্রাম, স্বাচ্ছন্দ্য, দু:খ সবই তৃপ্ত হয় পরিবারে। এমনকি ভালবাসার চাহিদা, নিরাপত্তার চাহিদা, নান্দনিক চাহিদা সবকিছুই তৃপ্তের স্থল পরিবার। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পরিবারের প্রভাব কম হয় না, পরিণত মানসিকতা, আচার ব্যবহার, প্রক্ষোভমূলক অভিব্যক্তি, মনোভাব, জীবনদর্শন সবকিছুরই অক্ষুন্ন প্রভাব আসে পরিবার থেকেই। পরিবারের প্রভাব সবটাই নির্ভর করে শিক্ষার উপর। মানসিক কিংবা জৈবিক চাহিদাগুলো পরিপূর্ণতার ক্ষেত্রে পারিবারিক শিক্ষা অনেকটাই দায়ী।

বিদ্যালয় : শিক্ষার প্রত্যক্ষ মাধ্যম এবং সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ বিদ্যালয়। শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য নিয়েই সৃষ্ট বিদ্যালয়। বিদ্যালয় কেন্দ্রিক শিক্ষাই সমাজ ও রাষ্ট্র উভয়েরই ক্রমোন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। John Dewer-র মতে “School is a simplified, purified and better balanced Society.”

ধর্মায়তন : প্রত্যক্ষভাবে ধর্মের প্রভাব যদিও বর্তমানে মানুষের উপর তেমন পড়ে না তবুও দেখা যায় সকল সমাজেই ধর্মাচরণ ব্যক্তির চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে কিছু হলেও প্রভাবিত করে। নৈতিক মূল্যবোধ গঠনে ধর্মের ভূমিকা বর্তমান সমাজব্যবস্থায়ও উপেক্ষনীয় নয়। অবশ্য ধর্ম ব্যক্তিকে কলুষিত করতে পারে না যদি ব্যক্তির মধ্যে শিক্ষা থাকে।

জনসংযোগের মাধ্যমাবলী : জনসংযোগের মাধ্যমগুলো সমাজ পরিবেশে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। আধুনিক সমাজে প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে এগুলোর গুরুত্ব ক্রমবর্ধমান। শিক্ষামূলক বিনোদনমূলক সুপরিকল্পিত সুনিয়ন্ত্রিত সংবাদ ব্যক্তির মনোভাব, মতবাদ, দৃষ্টিভঙ্গী প্রভৃতি গঠন করে থাকে। প্রযুক্তি সামাজিক কাঠামো সুদৃঢ় করে শিক্ষার মাধ্যমে, তাই শিক্ষা, সমাজ ও প্রযুক্তি একে অপরের পরিপূরক।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় আধুনিক শিক্ষায় ব্যক্তির উন্নয়ন এবং সামাজিক উন্নয়ন একই ধারায় আবর্তিত। সমাজভিত্তিক শিক্ষা আধুনিক শিক্ষার একটি অঙ্গ। ব্যক্তির জীবনে সামাজিক পরিবেশের ভূমিকা অনেক বেশি, ব্যাপক বৈচিত্র্যপূর্ণ ও প্রভাবশালী। মানব সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক পরিবেশটিও শিক্ষার মাধ্যমেই ব্যক্তির মানসিক প্রাক্ষোভিক, নৈতিক, নান্দনিক প্রভৃতি ব্যক্তি সত্তার দিকগুলোর বিকাশের উপর ব্যাপক ও গভীর প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। শিক্ষার উপরই নির্ভর সমাজের অগ্রগতি। শিক্ষা ব্যক্তির উন্নয়ন করে এবং এই উন্নয়নের প্রভাব এসে পরে সমাজের উপর। একমাত্র শিক্ষাই কলুষিত মুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে পারে। তাই ব্যক্তির তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রভাব নির্ভর সমাজ বিজ্ঞানের উপর।

শিক্ষার অর্থনৈতিক ভিত্তি

প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ এর ভাষায় অর্থনীতি হল দেশগুলোর সম্পদের প্রকৃতি ও কারণ নিয়ে অনুসন্ধান করে। (Adam Smith - “Economics is concerned with an enquiry into the nature and causes of Health of Nations.’

লিউনেল রবিনসন (Lionel Robinson) এর মতে চাহিদা ও অপ্রতুল বহুমুখী ব্যবহারযোগ্য বস্তু সম্পদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে মানুষের যেসব আচরণ করে তার বিজ্ঞানসম্মত অনুশীলন হল অর্থনীতি।

অর্থনীতিতে মানুষের চাহিদা, যোগান, উৎপাদন, ভোগ্যপণ্যের আমদানী-রপ্তানী, সম্পদের বন্টন, আয়-ব্যয়ের ক্ষমতা, অর্থনৈতিক বন্টন ইত্যাদি প্রাধান্য পায়। অর্থনীতিতে মানুষের চাহিদা-উৎপাদন-সম্পদ-বন্টন ইত্যাদির পারস্পরিক সম্পর্ক ইত্যাদি বিশ্লেষণ করা হয়। অর্থনীতির দ্বারা ব্যক্তির সামাজিক উন্নতি ও সমাজের সামগ্রিক উন্নতি প্রাধান্য পায়। অর্থনীতির মূল উদ্দেশ্য হল মানব সম্পদ বৃদ্ধি করা যাতে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি পায়। তাই অর্তনীতির মূল উদ্দেশ্য হল সামাজিক সম্পদের উন্নতিবিধান ও সুষম বন্টন। তাই অর্থনীতি বর্তমানে শাস্ত্র হিসাবে একটি সামাজিক বিজ্ঞানে পরিগণিত হয়েছে।

শিক্ষার একটি অন্যতম উদ্দেশ্য হল ব্যক্তির কল্যাণ ও সমাজের কল্যাণ। তাই অর্থনীতি ও শিক্ষার মধ্যে এক পারস্পরিক সম্পর্ক বর্তমান এবং উভয়েই উভয়ের দ্বারা প্রভাবিত। অর্থনীতি যে কোন রাষ্ট্রের শিক্ষানীতি, শিক্ষাপরিকল্পনা, শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে আর শিক্ষা এসমস্ত বিষয়গুলোর বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। বর্তমানে শিক্ষা ও অর্থনীতির পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণের জন্য যে বিশেষ শাস্ত্রের বিবর্তন হয়েছে তা হল শিক্ষামূলক অর্থনীতি।

শিক্ষামূলক অর্থনীতি শিক্ষাক্ষেত্রে আয়-ব্যয়ের সুনির্দিষ্ট বিষয়গুলো চিহ্নিতকরণ, সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, শিক্ষামূলক বাজেট তৈরি, শিক্ষাকে উৎপাদনমুখী করে তুলতে সহায়তা করে থাকে। শিক্ষামূলক অর্থনীতি মানব শক্তির পরিকল্পনা, মানব সম্পদ উন্নয়ন, অর্থনৈতিক বিকাশের দ্বারা শিক্ষামূলক বিকাশ, অর্থনীতির বিভিন্ন তত্ত্ব ও কৌশলের ব্যবহারের দ্বারা শিক্ষাকে উন্নত করা ইত্যাদি সার্থকভাবে করতে সহায়তা করে থাকে।

অর্থনীতি শিক্ষার ভিত্তি হিসাবে শিক্ষাকে নানাভাবে সমৃদ্ধশালী করে তুলতে ব্যবহৃত হচ্ছে যেমন পাঠ্যক্রমের দ্বারা মানব সম্পদেরনির্মাণ, শিক্ষামূলক পরিকল্পনার সঠিক বাস্তবায়ন, শিক্ষায় অর্থের বন্টন ও নীতি নির্ধারণে প্রশাসনিক কাঠামোকে সুস্পষ্টকরণ, বাজেট এ শিক্ষার জন্য অর্থের সংস্থান ও ব্যবহারের স্পষ্টীকরণ ইত্যাদি। অর্থনীতির হাত ধরে উৎপাদনশীলতা কিভাবে বৃদ্ধি করা যায় তা খেয়াল রাখা হচ্ছে। অর্থনীতির ভিত্তিকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষা গ্রহণে ইনপুট—প্রসেস—আউটপুট (Input-Process-Output) হিসাবে একটি প্রক্রিয়ায় পরিগণিত, দারিদ্রতা, শিক্ষায় বেসরকারীকরণের প্রবেশ, সরকারী ব্যয় শিক্ষাখাতে, কেন্দ্রীয় বাজেটে শিক্ষার জন্য খরচ ইত্যাদি বিষয়গুলোর সার্থক বাস্তবায়ন সম্ভবপর হচ্ছে শিক্ষায় অর্থনীতির মেলবন্ধনের ফলে। তাই শিক্ষার অর্থনৈতিক ভিত্তি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে কাজ করে আসছে।

সারসংক্ষেপ

প্রথম একক : শিক্ষার অর্থ, ধারণা ও প্রকৃতি

'শিক্ষা' শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ বিশ্লেষণ করলে জানা যায় মানুষের জ্ঞান অর্জনের ক্ষমতা বা অভিজ্ঞতা লাভের কৌশলকে নিয়ন্ত্রিত করা, 'শিক্ষা' শব্দটি সংস্কৃত 'শিক্ষ্' ধাতু থেকে এসেছে। যার মূলগত অর্থ হল শৃঙ্খলিত করা বা নিয়ন্ত্রিত করা বা নির্দেশনা দেওয়া। বাংলা ভাষায় 'শিক্ষা' শব্দের সমার্থক হিসাবে 'বিদ্যা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। 'বিদ্যা' শব্দটি সংস্কৃত 'বিদ্' ধাতু থেকে এসেছে। 'বিদ্' শব্দটির অর্থ হল 'জ্ঞান অর্জন করা' বা 'জানা', এক্ষেত্রে 'বিদ্যা' এর অর্থ হয়েছে কোনো কিছু সম্পর্কে জ্ঞান বা কৌশল আয়ত্ত করা। ইংরেজি শব্দটি 'Education' শব্দটির বুৎপত্তি নির্ণয়ে চারটি Latin শব্দকে বিবেচনা করা হয়।

মূলত পৃথিবীতে যে সমস্ত বিষয়সমূহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ানো হয় তার প্রায় সমস্তগুলোরই উৎপত্তি হয়েছে Natural Philosophy বা প্রাকৃতিক দর্শন থেকে, তাই একে Mother of all Disciplines' বলা হয়। এর থেকেই বৃক্ষের শাখার ন্যায় বিভিন্ন ধরনের 'Disciplines বা শাখাসমূহের বিস্তার ঘটেছে সময়ের সাথে বিভিন্ন ধরনের অপসারী ও অভিসারী চিন্তনের দ্বারা। প্রতিটি শাখার 'Paradigm shift' এর বিষয়টি অত্যন্ত বিবর্তনগ্রাহী এবং একটি ক্রমবিবর্তনমূলক প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় জড়িত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়— পর্যবেক্ষণ বা Interferance. প্রতিটি Experiment, সিদ্ধান্ত বা Interferance. প্রতিটি Discipline বা শাখার সাথে জড়িত তার নিজস্ব চিন্তাভাবনা, বিভিন্ন মতবাদ, দার্শনিক, মনস্তত্ত্ববিদ, শিক্ষাবিদ ইত্যাদিদের অবদান, আদৌ বিভিন্ন ধরনের অনুমান নির্ভর প্রকল্প বা 'Hypothesis' এবং বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের দ্বারা প্রমাণিত বিষয়সমূহ।

দ্বিতীয় একক : শিক্ষার কাজ, পরিধি

• ব্যক্তিজীবনের পূর্ণতা সাধন • অন্তর্নিহিত ক্ষমতার বিকাশ • দক্ষতার বিকাশ • সমাজের সংরক্ষণ • ব্যক্তি ও সমাজের অগ্রগতি • জ্ঞানমূলক উন্নয়ন • প্রক্ষোভমূলক উন্নয়ন • মূল্যবোধ সৃষ্টি ও সঞ্চালন • নতুন ভাবধারার সৃষ্টি ও সঞ্চালন • সৌভ্রাতৃত্ববোধের বিকাশ • সুনাগরিকতা ও বিশ্বনাগরিকতার উন্মেষ ঘটানো • জাতীয় উন্নতি বিধান • কৃষ্টির সংরক্ষণ ও সঞ্চালন • অভিযোজনে সহায়তা করা • পেশা ও বৃত্তি নির্বাচনে সহায়তা করা • সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় করা

বর্তমানে শিক্ষা সমাজবিজ্ঞানের একটি অন্যতম শাখা। শিক্ষা বর্তমানে একটি প্রয়োগমূলক বিজ্ঞানে পরিগণিত হয়েছে এবং এর পিছনে মূল কারণ হল শিক্ষা প্রায় সমস্ত বিষয়ের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হয়ে গেছে। এবং এই কারণে শিক্ষার পরিধি বর্তমানে Multi-disciplinary হয়ে উঠেছে। তাই শিক্ষার পরিধি ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে শিক্ষাবিজ্ঞান একটি শাস্ত্র হিসাবে তার পরিধির ক্রমবিস্তার ঘটাচ্ছে এবং শিক্ষাবিজ্ঞানের কেবলমাত্র তাত্ত্বিক বিষয়সমূহই নয় প্রয়োগমূলক বিষয়সমূহও রয়েছে। *প্রতিটি বিজ্ঞান পদ্ধতির মধ্যে তিনটি স্তর আছে সেগুলো হল-*

ক) পর্যবেক্ষণ (Observation) খ) পরীক্ষণ (Experiment) গ) সিদ্ধান্ত (Infernce)

শিক্ষাবিজ্ঞানও এই তিনটি বিষয়ের সাহায্যে কোন পরীক্ষা নির্ভর সত্যকে আবিস্কার করার চেস্টা করে। শিক্ষা বিজ্ঞান তার পরিধির ক্রম:বিস্তার ঘটাচ্ছে এবং শিক্ষাবিজ্ঞান যে সমস্ত নীতির উপর ভিত্তি করে এগুচ্ছে তার কিছু হল

১) জানা থেকে অজানা (From Known to Unknown)
২) সরল থেকে জটিল (From Simple to Complex)
৩) প্রত্যক্ষ থেকে অপ্রত্যক্ষ (From Direct to Indirect)
৪) মূর্ত থেকে বিমূর্ত (From Concreat to Indirect)

ফলে শিক্ষার পরিধি অতি বিস্তার লাভ করেছে। সমাজবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হিসাবে শিক্ষাবিজ্ঞান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তৃতীয় একক : শিক্ষার উপাদান

শিক্ষার তিনটি রূপ বা ধারা বর্তমান। যথাক্রমে —

- বিধিমুক্ত শিক্ষা (Informal Education)
- বিধিবদ্ধ শিক্ষা (Formal Education)
- অবিধিবন্ধ শিক্ষা (Non-formal Education)

শিক্ষার্থী, শিক্ষক, পাঠ্যক্রম ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই চারটি উপাদানের পারস্পরিক সম্পর্ক যত নিবিড় হবে ঠিক ততই শিক্ষা তার কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে। আবার এই উপাদানগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক মতই বিভিন্ন হবে ততই শিক্ষা তার কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে না।

শিক্ষার চারটি উপাদান অত্যন্ত নিবিড় সম্পর্কযুক্ত এবং এদের পারস্পরিক আন্ত:সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতেই শিক্ষার সার্থকতা। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে বিভিন্ন অপ্রীতিকর ঘটনা, শিক্ষার্থী অসন্তোষ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী শিক্ষক এর অসম অনুপাত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন শিক্ষা সহায়ক উপকরণ এর অভাব, পানীয় জলের অভাব, শৌচাগারের অভাব, প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভৌগোলিক অবস্থান ইত্যাদি শিক্ষার পরিবেশকে অনেকটাই প্রভাবিত করে থাকে। শিক্ষার্থী শিক্ষায় কতটা সফল হবে, শিক্ষক কতটা সার্থক শিক্ষাদান করতে পারবে, পাঠ্যক্রম কতটা বাস্তবায়িত করা যাবে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষন-শিখন পরিবেশ কিরূপ- ইত্যাদি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এই সমস্ত দিকগুলোর ইতিবাচক দিকগুলোই নির্ধারিত করে শিক্ষার উপাদানগুলোর আন্ত:সার্থকতা। সর্বোপরি একথা খেয়াল রাখতে হবে যে যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সার্থক শিক্ষার পরিবেশ থাকে তবে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে পাঠ্যক্রম সঠিকভাবে সঞ্চালন করতে পারে এবং এর উপরই দেশ এবং সমগ্র জাতির ভবিষ্যত নির্ধারিত হয়। তাই এই প্রসঙ্গে কোঠারী কমিশন (১৯৬৪-৬৬) এর বক্তব্যটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক — 'The destiny of India is now being shaped in his classrooms.'

চতুর্থ একক : শিক্ষার লক্ষ্য

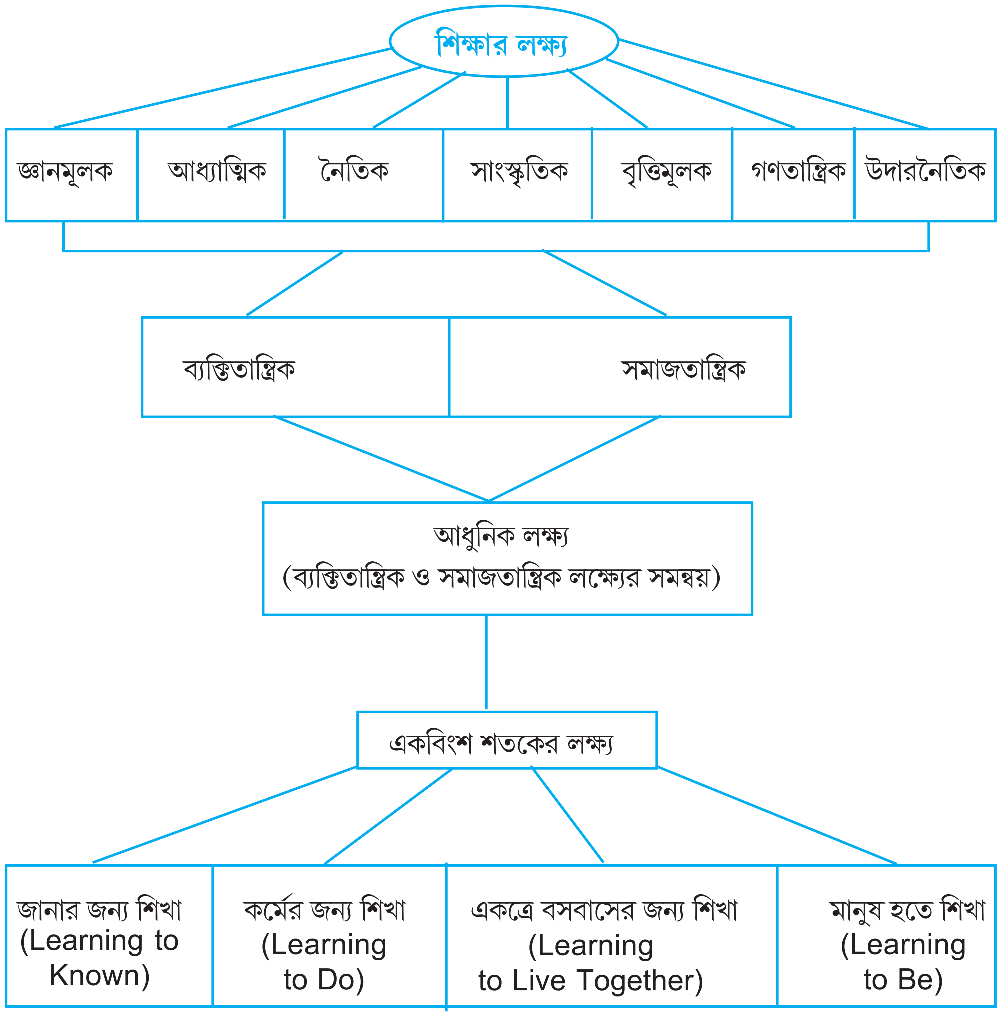

পঞ্চম একক : শিক্ষার প্রক্রিয়া এবং শিক্ষার ভিত্তি

প্রক্রিয়া হল এমন একটি বিষয় যার জন্য সর্বপ্রথমে প্রয়োজন উপাদানের। তারপর প্রয়োজন প্রক্রিয়াটির কি উদ্দেশ্য এবং তার সময়সীমা কতদিন বা বৎসর। প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে প্রক্রিয়াটির লক্ষ্য কি পরিমাণগত নাকি গুণগত। শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রক্রিয়ার ধারণাটি যদি নেওয়া হয় তবে শিক্ষার উপাদান হল মূল চারটি : শিক্ষার্থী, শিক্ষক, পাঠ্যক্রম ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।প্রতিটি স্তরেই (প্রাথমিক—মাধ্যমিক—উচ্চমাধ্যমিক—মহাবিদ্যালয়—বিশ্ববিদ্যালয়) শিক্ষার উদ্দেশ্য বর্তমান এবং নির্দিশ্বষ্ট করা থাকে সময়সীমা। প্রক্রিয়াটি কি পরিমাণগত না গুণগত সে বিষয় পূর্বে থেকে অনেকটা বলা যায় এবং চূড়ান্তভাবে বলাযায় একটা নির্দিষ্ট সময়পরে যে সময় শিক্ষার্থী পূর্ব নির্দিষ্ট কিছু সম্পন্ন করে থাকে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত শিশু পরিবেশের সাথে সংগতিবিধান করে অনেক কিছু শিখে থাকে। শিশুর ক্রমবিকাশ, অভিযোজন, সমস্যাবিধান ইত্যাদির সাধন হয়। শিক্ষার দ্বারা শিশুর অন্তহীন এই বিষয়টি সাধিত হয় তাই শিক্ষা হল মূলত প্রক্রিয়া।

সমন্বয়ী প্রয়োগমূলক বিজ্ঞান হল আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞান, শিক্ষাবিজ্ঞানের বিকাশ এবং শিক্ষা বিষয়ক নীতিগুলোর নির্ধারণ যার সহায়তায় সম্ভব হয়েছে সেগুলোই শিক্ষার ভিত্তি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। একটি স্বতন্ত্র শাখা হিসাবে শিক্ষাবিজ্ঞান বর্তমানে ক্রমবিবর্তনের ধারায় একটি 'Multidisciplinary' বিষয় হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। বর্তমানে 'Social-Science' এর প্রায়শ: বিষয়ই শিক্ষাবিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। শিক্ষাবিজ্ঞানের এই স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্যতার পটভূমিকায় যার অবদান তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো হল শিক্ষাবিজ্ঞানের বিভিন্ন ভিত্তিসমূহ, যা নিম্নে বিশ্লেষিত হল ।

অনুশীলনী

ক) ১ মানের প্রশ্ন : সর্বাধিক শব্দসংখ্যা ২০

১) 'শিক্ষা' শব্দটি সংস্কৃত কোন ধাতু থেকে এসেছে?
২) শিক্ষাবিজ্ঞানের একটি নীতি লিখ।
৩) 'Cureere' শব্দটির অর্থ কি ?
৪) মধ্যযুগে শিক্ষার লক্ষ্য কি ছিল?
৫) শিক্ষায় 'Output' বলতে কি বুঝায়?

খ) ২ মানের প্রশ্ন : সর্বাধিক শব্দসংখ্যা ৪০

১) শিক্ষার সংজ্ঞা লিখ।
২) শিক্ষার দ্বারা 'সমাজের সংরক্ষণ হয়'— কথাটি দ্বারা কি বুঝায়?
৩) বিধিমুক্ত শিক্ষা বলতে কি বুঝ?
৪) শিক্ষার জ্ঞানমূলক লক্ষ্যের দুটি গুরুত্ব লিখ।
৫) শিক্ষার ভিত্তি বলতে কি বুঝায়?

গ) ৪ মানের প্রশ্ন : সর্বাধিক শব্দসংখ্যা ১০০

১) শিক্ষার প্রকৃতি সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখ।

২) শিক্ষার পরিধি যে ত্রিবিধ ধারায় বিদ্যমান তা বিশ্লেষণ কর।

৩) পাঠ্যক্রম নির্ধারণের মূলনীতি সম্পর্কে লিখ।

৪) শিক্ষার গণতান্ত্রিক লক্ষ্য সম্পর্কে লিখ।

৫) শিক্ষার দার্শনিক ভিত্তি সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

গ) ৫ মানের প্রশ্ন : সর্বাধিক শব্দসংখ্যা ১৫০

১) শিক্ষার সংকীর্ণ অর্থ ও ব্যাপক অর্থের ধারণা ব্যাখ্যা কর।

২) শিক্ষার কিছু কাজ সংক্ষেপে বিশ্লেষণ কর।

৩) বিধিবদ্ধ শিক্ষা ধারণাটি ব্যাখ্যা কর।

৪) শিক্ষার ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের ধারণা ব্যাখ্যা কর।

৫) শিক্ষার মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি কিভাবে শিক্ষাবিজ্ঞানকে সহায়তা করে থাকে সে বিষয়ে তোমার মতামত বিশ্লেষণ কর।

ঙ) ৬ মানের প্রশ্ন : সর্বাধিক শব্দসংখ্যা ২০০

বোধপরীক্ষণমূলক :

শিক্ষার চারটি উপাদান অত্যন্ত নিবিড় সম্পর্কযুক্ত এবং এদের পারস্পরিক আন্ত:সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতেই শিক্ষার সার্থকতা। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে বিভিন্ন অপ্রীতিকর ঘটনা। শিক্ষার্থী অসন্তোষ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠা শিক্ষক, শিক্ষার্থীর অসম অনুপাত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন শিক্ষা সহায়ক উপকরণ এর অভাব, পানীয় জল এর অভাব, প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভৌগোলিক অবস্থান ইত্যাদি শিক্ষার পরিবেশকে অনেকটাই প্রভাবিত করে থাকে। শিক্ষার্থী শিক্ষায় কতটা সফল হবে, শিক্ষক কতটা সার্থক শিক্ষাদান প্রতিষ্ঠানে শিক্ষণ-শিখন পরিবেশ কিরূপ ইত্যাদি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এই সমস্ত দিকগুলোর ইতিবাচক দিকগুলোই নির্ধারিত করে শিক্ষার উপাদানগুলোর আন্ত:সার্থকতা সর্বোপরি একথা খেয়াল রাখতে হবে যে যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সার্থক শিক্ষার পরিবেশ থাকে তবে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে পাঠ্যক্রম সঠিকভাবে সঞ্চালন করতে পারে এবং এর উপরই দেশ এবং সমগ্র জাতির ভবিষ্যত নির্ধারিত হয়।

—শিক্ষার চারটি উপাদানের আন্ত-সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। ৬

দ্বিতীয় অধ্যায় : শিক্ষার প্রকারভেদ এবং শিক্ষার সংস্থাসমূহ

- প্রথম একক : শিক্ষার সংস্থা, নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা ও তার সংস্থা
- দ্বিতীয় একক : অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা ও তার সংস্থা
- তৃতীয় একক : নিয়ম বহির্ভূত শিক্ষা ও তার সংস্থা
- চতুর্থ একক : দূরাগত শিক্ষা ও মুক্ত শিক্ষা, জাতীয় মুক্ত বিদ্যালয় ও মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
- পঞ্চম একক : ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নমূলক কর্মসূচি

দ্বিতীয় অধ্যায় : শিক্ষার প্রকারভেদ ও শিক্ষার সংস্থাসমূহ

উদ্দেশ্য (Objectives) :

১) *শিক্ষার্থীরা শিক্ষা প্রক্রিয়ার বিভিন্ন প্রকারভেদ সম্পর্কে জানতে পারবে।*

২) *শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন প্রকারের শিক্ষা প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রক/পরিবেশক সংস্থাগুলো সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা ধারণা নিতে সক্ষম হবে।*

৩) *শিক্ষার্থীরা বর্তমান সময়ে দূরাগত শিক্ষা এবং মুক্ত শিক্ষাকে যে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে সে সম্পর্কেও শিক্ষার্থীরা বিশদ ধারণা লাভে সক্ষম হবে।*

প্রথম একক শিক্ষার সংস্থা, নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা ও তার সংস্থা

শিক্ষার সংস্থা (Agencies of Education) :

আধুনিক অর্থে শিক্ষা হল জীবনব্যাপী সামাজিক প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই সমাজজীবনের বিকাশ ও উন্নয়ন হয়। সমাজ জীবনের এই বিকাশ ও উন্নয়ন সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে ব্যক্তিসত্তার যথার্থ বিকাশের উপর। তাই ব্যক্তি ও সমাজের সার্বিক উন্নয়ন তখনই সম্ভব হবে যখন সঠিক উপায়ে সকলের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা যাবে। কারণ শিক্ষাই হল উপযুক্ত মাধ্যম যা সমগ্র দেশকে বা জাতিকে উন্নতির পথে নিয়ে যেতে পারে। এই কারণে সর্বজনীন শিক্ষার পরিকল্পনা ও কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। সমাজে বসবাসকারী সকল শিশু তার পরিবেশ থেকে শিক্ষা নেয়। পরিবেশের সঙ্গে প্রতিনিয়ত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে তার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারটিকে সমৃদ্ধ করে। সমাজ পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান ও সংস্থাগুলো শিশুকে প্রত্যেক সমাজের আচরণবিধি, রীতিনীতি ও নিয়মশৃঙ্খলা সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়ে থাকে। এই সংস্থাগুলোর মুখ্য উদ্দেশ্য হল, ব্যক্তি আচরণকে সুনিয়ন্ত্রিত করে, সমাজ নির্ণীত পথে পরিচালিত করা, অর্থাৎ যে সকল সামাজিক প্রতিষ্ঠান প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শিক্ষা প্রক্রিয়াকে সংঘটিত হতে সাহায্য করে, এবং ব্যক্তিজীবনের বিকাশে ও সামাজিক কল্যাণে সহায়তা করে থাকে তাদেরই শিক্ষার সংস্থা বলে গণ্য করা হয়।

শিক্ষার সংস্থার গুরুত্ব (Importance of Educational Agencies) :

ব্যাপক অর্থে শিক্ষা ব্যক্তির জন্ম থেকে শুরু হয়ে মৃত্যুতে গিয়ে শেষ হয়। আর ব্যক্তি এই শিক্ষালাভ করে শিক্ষার বিভিন্ন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। তাই প্রত্যেক সমাজব্যবস্থায় বিভিন্ন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে যেগুলো ধারাবাহিকভাবে নিজস্ব কৃষ্টি, সংস্কৃতি পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চালিত করে। প্রাচীনকালে শিক্ষা পরিচালিত হত অনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে। পরবর্তীকালে সমাজে জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হল নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার প্রতিষ্ঠান বিদ্যালয়। কিন্তু বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সমাজে প্রতিটি মানুষের মধ্যে শিক্ষার আলো পৌঁছানো বিদ্যালয়ের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ল। তাই শিক্ষাকে সমাজের

সকল স্তরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সৃষ্টি হল নিয়মবহির্ভূত শিক্ষাব্যবস্থা। সুতরাং বলা যায়, ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন বিকাশে শিক্ষার এই সংস্থাগুলোর গুরুত্ব বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

বিভিন্ন প্রকার শিক্ষার সংস্থা (Different Types of Agencies of Education):

আধুনিক শিক্ষাবিদগণ শিক্ষার সংস্থাগুলোকে দুটি ভাগে ভাগে করেছেন।

সেগুলো হল— ১) শিক্ষার প্রত্যক্ষ সংস্থা (Active Agency)

২) শিক্ষার অপ্রত্যক্ষ সংস্থা (Passive Agency)

শিক্ষার প্রত্যক্ষ সংস্থা — যে সকল শিক্ষা সংস্থায়, শিক্ষা প্রক্রিয়া উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে পারস্পরিক ভাবের আদান প্রদানের মধ্যে সংঘটিত হয়। সেগুলোকে বলা হয় শিক্ষার সক্রিয় সংস্থা। যেমন- বিদ্যালয়, পরিবার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি এই জাতীয় সংস্থার অন্তর্গত।

শিক্ষার অপ্রত্যক্ষ সংস্থা — যে সকল শিক্ষাসংস্থায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকেনা, সেগুলোকে বলা হয় অপ্রত্যক্ষ সংস্থা। যেমন- দূরদর্শন, বেতার, সংবাদপত্র, চলচ্চিত্র ইত্যাদি এই জাতীয় সংস্থার অন্তর্গত।

শিক্ষার সংস্থার কাঠামোগত দিক থেকে শিক্ষা প্রক্রিয়াকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়।

১) নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা (২) অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা (৩) নিয়মবর্হিভূত শিক্ষা।

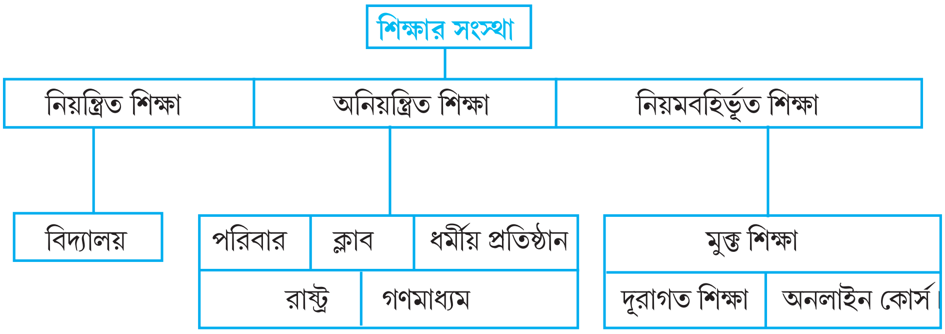

নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা (Formal Education) :

শিক্ষা হল একটি গতিশীল এবং পরিবর্তনধর্মী প্রক্রিয়া। মানুষের জীবনের সঙ্গে শিক্ষা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। জীবনের সকল ক্ষেত্রে এর অনুশীলন করা হয়ে থাকে। পরিবার, বিদ্যালয়, সমাজ, ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠান সবকিছুর মধ্য দিয়েই শিক্ষার কাজ চলতে থাকে। তাই শিক্ষা হল সাবলীল সুন্দর পথ নির্দেশক। শিক্ষা নিরবচ্ছিন্ন জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। আদর্শ মানুষ গঠনের প্রয়াস নেওয়ার ক্ষেত্রে একটি সার্থক মাধ্যম হল শিক্ষা। শিক্ষা ছাড়া আমাদের জাতীয় জীবনের কোন ক্ষেত্রেই অগ্রগতি সম্ভব নয়। ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের বক্তব্য এ বিষয়ে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ — “In a world based on science and techonology, it is education that determines the level of prosperity, welfare and security of the

people"- (Indian Education Commission) সুতরাং বলা যায় জীবনের সব ক্ষেত্রে শিক্ষা বিশেষভাবে প্রয়োজন।

নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার সংজ্ঞা (Definition of Formal Education) :

নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা হল নির্দিষ্ট নিয়মভিত্তিক সুপরিকল্পিত একটি শিক্ষা ব্যবস্থা। শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠন পাঠনের মাধ্যমে যে শিক্ষালাভ করে তা হল নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা। বলা যায়, যে শিক্ষা সব ধরনের সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে দেওয়া হয়ে থাকে তাকে বলা হয় নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা। অর্থাৎ কাদের শিক্ষা দেওয়া হবে, কতদিন শিক্ষা দেওয়া হবে, কী শিক্ষা দেওয়া হবে এবং কী পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হবে এসবই নিয়ন্ত্রণ করে সমাজ। শিক্ষা ব্যবস্থার মূল চারটি উপাদান- শিক্ষক, শিক্ষার্থী, পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষালয় এই প্রত্যেকটি উপাদান নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা ব্যবস্থায় পূর্ব নির্ধারিত হয়। নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার অর্থ হল নির্দিষ্ট বয়সসীমার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্বনির্ধারিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক নির্দেশনা ও প্রশিক্ষণ লাভ করা। এই শিক্ষা ব্যবস্থা সমাজে সচেতনভাবে পরিচালিত এবং শিক্ষা ব্যবস্থাপনার দ্বারা সংগঠিত। প্রশিক্ষণের ভিত্তিতে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ ও প্রশাসক দ্বারা পূর্বনির্ধারিত।

শিক্ষাবিদ পি ডি শুক্লা (P.D. Sukla) নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার সংজ্ঞায় বলেছেন- "It is the traditional system in which the teacher and the taught face each other in a class room situation on a regular or continuous basis, follow a fixed and pre-determined curriculum"- অর্থাৎ নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা হল গতানুগতিক এমন এক পদ্ধতি যাতে পূর্ব নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম অনুসরণ করা হয় এবং শ্রেণিকক্ষে নিয়মিতভাবে বা ধারাবাহিকভাবে ছাত্র শিক্ষক পরস্পরের মুখোমুখি হয়।

নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা : শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন বয়স অনুযায়ী পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে, যে সুপরিকল্পিত এবং সুনির্দিষ্ট শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়, তাকে নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা বলে।

মূলত, সমাজ দ্বারা নির্ধারিত কতগুলো সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে, উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান করার ব্যবস্থাই হল নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা।

নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার বৈশিষ্ট্যাবলি (Features of Formal Educations) :

নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলো হল - (১) নিয়ন্ত্রিত শিক্ষায় পূর্ব নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে। প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে মাধ্যমিক শিক্ষা, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শিক্ষা পর্যন্ত সমস্ত শিক্ষার্থীর জন্য নির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করা থাকে।

(২) নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার সময়কাল নির্দিষ্ট করা থাকে। বিভিন্ন নিয়মনীতির উপর নির্ভর করে এই শিক্ষা প্রদান করা হয়। বিদ্যালয়ের প্রথম দিন থেকে সুপরিকল্পিতভাবে এই শিক্ষা শিক্ষার্থীদের দেওয়া হয়ে থাকে।

(৩) এই শিক্ষার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম অনুসরণ করা হয়। বিভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই

পাঠ্যক্রম রচনা করা হয়। এখানে ব্যক্তির চাহিদা ও সমাজের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করা হয়। (৪) নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল এই শিক্ষায় পাঠ্যক্রম রচনার সময় যোগ্যতা অর্জনকারী শিক্ষকের ভূমিকা থাকে।

(৫) নিয়ন্ত্রিত শিক্ষায় শৃঙ্খলার একটি বিশেষ স্থান আছে। শিক্ষার্থী, শিক্ষক শিক্ষাকর্মী সকলে শৃঙ্খলা মেনে চলে। শৃঙ্খলার অভাব থাকলে শিক্ষাদান কার্য ব্যাহত হয়। বিদ্যালয়ে উপস্থিতি, শিক্ষার্থীদের আচার আচরণ, পাঠ প্রস্তুতি, পরীক্ষা ব্যবস্থা, মূল্যায়ণ সবক্ষেত্রেই শৃঙ্খলা মেনে চলা নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

(৬) নিয়ন্ত্রিত শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালিত হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুসারে শ্রেণীকক্ষে উপস্থিত থেকে শিক্ষক শিক্ষিকাদের বিভিন্ন আলোচনা শিক্ষার্থীদের শুনতে হয়।

(৭) নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ হল পরীক্ষা ব্যবস্থা। নির্দিষ্ট শিক্ষা স্তরের পাঠ্যক্রম শেষ করে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে পরীক্ষা দিতে হয়। পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীরা পরবর্তী শ্রেণিতে বা স্তরে উন্নীত হয়।

(৮) সবশেষে, নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার একটি বৈশিষ্ট্য হল এই শিক্ষা ব্যবস্থা ও পরিচালনার দায়দায়িত্ব রাষ্ট্র গ্রহণ করে। শিক্ষা পরিকল্পনা, পাঠ্যক্রম রচনা, নীতি নির্ধারণ, পরিচালনগত ব্যবস্থা সবকিছুই রাষ্ট্র দ্বারা পরিচালিত হয়।

নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার পরিধি (Scope of Formal Education) :

নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা শিক্ষা ব্যবস্থার এমন এক পদ্ধতি যা কেবলমাত্র কতগুলো তাত্ত্বিক বিষয় আলোচনা করে না। এর একটা প্রয়োগমূলক দিকও আছে। ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের কল্যাণ সাধনের জন্য শিক্ষার্থীর আচরণকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় তা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হল নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার কাজ। এই শিক্ষা বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠন পাঠনের দ্বারা অর্জিত হয়। তাই এই শিক্ষার পরিধি নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে পরিব্যাপ্ত। নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার কর্মপরিধি নিম্নরূপ:

(১) শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিক ও প্রাক্ষোভিক বিকাশের বিভিন্ন দিকগুলো পর্যবেক্ষণ করা নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার পরিধির অন্তর্গত।

(২) ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন সংলক্ষণগুলোর বিকাশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিষয়বস্তুর বৈচিত্রকরণ দ্বারা ব্যক্তিসত্তার বিকাশ ঘটানো নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার পরিধির অন্তর্গত।

(৩) শিক্ষার্থীর মানসিক সামর্থ্য ও গুণাবলির উপর ভিত্তি করে শিক্ষার পদ্ধতি নির্ধারণ করে নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা।

(৪) সবশিশুর শিক্ষা গ্রহণের সামর্থ্য এক নয়। শিক্ষার্থী কোন্ পদ্ধতিতে শেখে, প্রেষণা ও চাহিদার উপর শিক্ষা কতখানি নির্ভর করে, শিখন সঞ্চালন হয় কিনা ইত্যাদি পরীক্ষা নিরীক্ষা করা এবং শিখন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন সমস্যার আলোচনা করা নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার কর্মপরিধির অন্তর্গত।

(৫) শিক্ষার্থী কতটুকু শিখলো তার মূল্যায়ন করা নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার কর্মপরিধির অন্তর্গত। অনেক সময় দুর্বল শিক্ষার্থীদের পুনরায় শ্রেণি শিখনের মাধ্যমে শিক্ষণীয় বিষয় বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি করা হয়।

(৬) শিক্ষার্থীকে তার ভবিষ্যৎ জীবনের শিক্ষা ও বৃত্তি সম্বন্ধে যথাযথ নির্দেশনা দান করা নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার পরিধির অন্তর্গত। শুধু নির্দেশনা দেওয়া নয়, ভবিষ্যতে শিক্ষার্থী কোন্ বৃত্তি গ্রহণ করলে সফল হবে সে বিষয়েও পথ নির্দেশ করা হয়।

নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার পরিধি আলোচনার সময় মনে রাখা দরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রতিদিন নানা সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে। ফলে এই সংস্থার কর্মের পরিসর পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হচ্ছে।

নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার সীমাবদ্ধতা (Limitations of Formal Education) :

শিক্ষার বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে নিয়ন্ত্রিত শিক্ষাপদ্ধতি অধিকতর কার্যকরী। কিন্তু দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, এই শিক্ষা ব্যবস্থা একক ও ব্যক্তিগতভাবে মানুষের সবরকম চাহিদা পরিতৃপ্ত করতে পারছে না। এই শিক্ষার সীমাবদ্ধতাগুলো বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

(১) আধুনিক উন্নত সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের শিক্ষা গ্রহণের চাহিদা বেড়ে চলছে। এই চাহিদা মেটানোর জন্য যে ব্যবস্থা বা সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন ছিল তা বিভিন্ন কারণে করা যাচ্ছে না। ফলে বহু শিক্ষার্থী শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত।

২) নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার আরেকটি সীমাবদ্ধতা হল ভারতবর্ষের মত বিশাল দেশে যেখানে মানুষের চাহিদা ভিন্ন। সেক্ষেত্রে পরিবেশ ও চাহিদা উপযোগী করে শিক্ষা পরিবর্তন করা যায় না। ফলে শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নীতি অনুসরণ করা যায় না।

৩) নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার অপর একটি সীমাবদ্ধতার ক্ষেত্রে দেখা যায় এই শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে শিক্ষক নির্ভর। ফলে এই শিক্ষার সফলতা নির্ভর করে শিক্ষকের পাঠদানের কৌশলের উপর। কিন্তু দেখা যায় কিছু শিক্ষকের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাবে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা গ্রহণে উদ্দীপিত হয় না। ফলে শিক্ষাদান প্রক্রিয়া যথাযথভাবে কার্যকরী হয় না।

৪) নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার আরেকটি সীমাবদ্ধতা হল এখানে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার নীতি অগ্রাহ্য হয়। শিক্ষার্থীরা তাদের রুচি, চাহিদা, আগ্রহ এবং সামর্থ্য অনুযায়ী বৈচিত্রপূর্ণ পাঠ্যক্রম পায় না। ফলে বিভিন্ন মানসিক ক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের একই বিষয়বস্তু পড়তে হয়।

৫) নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা ব্যবস্থায় পাঠ্যক্রম পূর্ব নির্ধারিত থাকে ফলে সহজে পাঠ্যক্রমের নিয়মিত পরিবর্তন ও পরিমার্জন করা যায় না। ফলে শিক্ষার্থীদের আধুনিক তথ্য জানতে দেরি হয়।

৬) এই শিক্ষা পদ্ধতি মূলত পরীক্ষাকেন্দ্রিক। ফলে পরীক্ষায় সফলতা লাভ করা বা ভাল ফলাফল করাই মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। শিক্ষার্থীদের সঠিক জ্ঞান অর্জন এবং সার্বিক বিকাশ উপেক্ষিত হয়।

৭) নিয়ন্ত্রিত শিক্ষায় প্রবেশপথ থাকে একটি। শিক্ষার্থী সময়মত কোন শ্রেণিতে ভর্তি হতে না পারলে শিক্ষার সুযোগ নষ্ট হয়ে যায়। ফলে সময় এবং শ্রমের অপচয় হয়।

৮) সবশেষে, নিয়ন্ত্রিত শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষা পরিচালিত হয় বিদ্যালয়ের নিজস্ব শৃঙ্খলা এবং বিধিনিষেধের মাধ্যমে। অনেক সময় শিক্ষার্থীরা নিজের চাহিদা অনুযায়ী স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না। তাই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য চরিতার্থ হওয়ার ক্ষেত্রেও সীমাবদ্ধতা থেকে যায়।

নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা থাকলেও এই শিক্ষা ব্যবস্থা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে এবং চলতেই থাকবে। কারণ শিক্ষাব্যবস্থাকে অপরিকল্পিত ব্যবস্থার উপর ছেড়ে দেওয়া যায় না। শিক্ষার্থী এবং সমাজ উভয়ের স্বার্থেই শিক্ষাকে পরিকল্পিত রূপে সংগঠিত করতে হবে। নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার মধ্যেই পূর্ব পরিকল্পনার সুযোগ থাকে। তাই সকল সচেতন জনসাধারণ নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার উপর বেশি আস্থা রাখেন। সঙ্গে সঙ্গে বিকল্প ব্যবস্থার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত সহায়ক হিসাবে নিয়মবহির্ভূত শিক্ষার পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে।

বিদ্যালয় : নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার প্রতিষ্ঠান (School : Agency of Formal Education)

আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হল বিদ্যালয়। নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিদ্যালয়ের অস্তিত্বকে অস্বীকার করার উপায় নেই। মানব সমাজের প্রাথমিক পর্যায়ে জীবনযাত্রা যখন ছিল খুবই সহজ এবং সাধারণ তখন বিদ্যালয়ের কোন ধারণা দেখা যায় না। শিশুদের শিক্ষা হত দৈনন্দিন জীবনযাপনে কাজ পরিচালনার মাধ্যমে। সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের বিষয়ে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার প্রধান অবলম্বন হল বিদ্যালয় ।উচ্চস্তরের শিক্ষার জন্য মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় হল নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার প্রতিষ্ঠান। ইংরেজীতে ‘স্কুল’ (School) কথাটি এসেছে গ্রীক শব্দ ‘Skhole’ থেকে, যার অর্থ হল অবসর বিনোদনের সময়কালীন তত্ত্বমূলক আলোচনার স্থান। বাস্তবে বিদ্যালয় হল একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সকলে একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অভিমুখী শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা অর্জন করে, নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত থেকে। নির্দিষ্ট রীতিনীতি মেনে শিক্ষক-শিক্ষিকারা শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবিষয় অনুশীলনে সহায়তা করেন।

শিক্ষাবিদ ক্যাটারগুড (Catergood) বিদ্যালয় সম্পর্কে বলেছেন- ‘এক বা একাধিক শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীদের তত্বাবধানে, একটি নির্দিষ্ট আসবাবপত্র যুক্ত বাসগৃহ যেখানে নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করানো হয়।”

বর্তমানে বিদ্যালয়ে এই কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে থাকা প্রয়োজন— (১) নির্দিষ্ট গৃহ, (২) নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচি (৩) ছাত্র বা ছাত্রী, (৪) শিক্ষক (৫) আসবাবপত্র ও (৬) অন্যান্য সহকারী কর্মীবৃন্দ।

বিদ্যালয়ের কার্যাবলি (Functions of School) :

মানব সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় শিক্ষণীয় বিষয় অনেক উন্নত হয়েছে। তাই বিদ্যালয়ের উপর এখন অনেক গুরু দায়িত্ব আরোপ করা হচ্ছে। বিদ্যালয়ের যে সমস্ত কার্যাবলি রয়েছে সেগুলোকে মূলত দুভাগে ভাগ করা যায়। যেমন— শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক কার্যবলি এবং সমাজকেন্দ্রিক কার্যাবলি।

শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক কার্যাবলি (Student Oriented Responsibility) :

১) বৌদ্ধিক বিকাশ (Intellectual Development): বিদ্যালয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল শিক্ষার্থীদের বৌদ্ধিক বিকাশে সহায়তা করা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নিত্য নতুন আবিস্কারের ফলে জ্ঞানের জগত উন্নত হচ্ছে। ওই সমস্ত বিষয় শিক্ষার্থীদের কাছে তুলে ধরার প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে। বিভিন্ন

ধরনের চার্ট, মডেল, মানচিত্র, গ্রন্থাগার ও পরীক্ষাগার এগুলোকে কাজে লাগিয়ে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী শিক্ষার্থীদের বিকাশের কাজে এগিয়ে আসে।

২) ব্যক্তিসত্ত্বার বিকাশ **(Development of Personality) :** বিদ্যালয়ের অপর একটি কাজ হল সকল শিক্ষার্থীর সুপ্ত সম্ভাবনাময় ব্যক্তিসত্তার যথাযথ বিকাশ সাধন করা। বিভিন্ন পরিবার থেকে শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে আসে বিভিন্ন চাহিদা, সামর্থ্য, রুচি, আগ্রহ নিয়ে । বিদ্যালয় পরিবেশ সকল শিক্ষার্থীর বিভিন্ন চাহিদার পরিতৃপ্তি ঘটিয়ে ব্যক্তি সত্তার যথাযথ বিকাশে সহায়তা করে।

৩) বৃত্তিমূলক নির্দেশনা **(Vocational Guidance) ;** বিদ্যালয়ের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল বৃত্তিমূলক নির্দেশনা দেওয়া। শিক্ষাজীবন শেষ করে শিক্ষার্থীরা কর্মজীবনে প্রবেশ করে। কর্মজীবনে সফল হতে গেলে যোগ্যতা অনুযায়ী সঠিক বৃত্তি নির্বাচনের প্রয়োজন হয়। বিদ্যালয় জীবনে শিক্ষার্থীরা বৃত্তিমূলক নির্দেশনা পেয়ে থাকে।

৪) শিক্ষামূলক নির্দেশনা **(Educational Guidance) :** শিক্ষামূলক নির্দেশনা দান করা বিদ্যালয়ের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সমাজের বিভিন্ন অংশের ছেলেমেয়েরা শিক্ষালাভের জন্য বিদ্যালয়ে আসে। বিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের তাদের ক্ষমতা অনুযায়ী শিক্ষাগত ক্ষেত্রের সমস্যা সমাধানে শিক্ষামূলক নির্দেশনা দানের মাধ্যমে সহায়তা করে।

৫) মূল্যায়ন **(Evaluation) :** বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক শিক্ষার আর একটি কাজ হল শিক্ষার্থীর সামগ্রিক মূল্যায়ন করা। পঠন পাঠনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী কতটুকু সফলতা অর্জন করেছে তার পাশাপাশি চারিত্রিক গুণাবলির বিকাশ এবং নৈতিক মূল্যবোধের মূল্যায়ন বিদ্যালয় করে থাকে।

বিদ্যালয়ের সমাজ কেন্দ্রিক কার্যাবলি
(Society Oriented Responsibility of School) :

১) সামাজিক বিকাশ **(Social Development) :** বিদ্যালয়ের সমাজ কেন্দ্রিক কার্যাবলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল অগ্রগতির ধারাকে বজায় রেখে সামাজিক বিকাশের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। বিদ্যালয় নতুন নতুন ভাবধারা ও প্রগতিশীল চিন্তার ধারক, বাহক ও প্রচারক। সমাজে বসবাসকারী প্রতিটি মানুষকে কতগুলো রীতিনীতি ও নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়। বিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের এ ব্যাপারে সহায়তা করে। ফলে তাদের সামাজিকীকরণ ঘটে। বিদ্যালয় সমাজ উন্নয়নে শিক্ষার্থীদের কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণে আগ্রহী করে তোলে।

২) ঐতিহ্যের সংরক্ষণ **(Preservation of Cultural Herigate) :** সমাজ জীবনের যা কিছু ভাল তাকে ধরে রাখতে সহায়তা করে বিদ্যালয়। সমাজের আচার আচরণ রীতিনীতির সংরক্ষণ করা বিদ্যালয়ের কাজ। এই সংরক্ষণ পুঁথির মাধ্যমে হতে পারে, আবার বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কাজ পরিচালনার মাধ্যমে হতে পারে। তা না হলে সভ্যতার যে অগ্রগতি তার কোন মূল্যই থাকবে না। শিক্ষার্থীদের সমাজ জীবনে সার্থক উত্তরাধিকারী হিসাবে গড়ে তোলার জন্য ঐতিহ্যের সংরক্ষণ প্রয়োজন।

৩) ঐতিহ্যের সঞ্চালন **(Transmission of Heritage) :** সমাজ জীবনের অগ্রগতির ধারাকে বজায় রাখার জন্য বিদ্যালয়ের অন্তর্গত শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনুশীলনের দ্বারা সমাজের অভিজ্ঞতাকে যথাযথভাবে

সঞ্চালিত করা বিদ্যালয়ের সমাজকেন্দ্রিক কাজ। এর মধ্যে দিয়ে একদিকে সমাজ জীবনে সমতা আসে এবং অন্যদিক দিয়ে বৈচিত্র্যও দেখা যায়।

৪) গণতান্ত্রিক বোধের বিকাশ (Development of Democratic Ideas) :

ভারতবর্ষ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এখানে প্রত্যেক নাগরিকের কতগুলো দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকে। বিদ্যালয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো গণতান্ত্রিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতন করা।

৫) পরিবার-সমাজ সম্পর্ক (Family-Society Relationship) : পরিবার ও সমাজের মধ্যে একটি বন্ধন তৈরি করে বিদ্যালয়। বিভিন্ন পরিবার থেকে আসা শিক্ষার্থীদের সমাজের দায়িত্বশীল মানুষ হিসাবে তৈরি করে দেয় বিদ্যালয়। সংহতি রক্ষা, নিয়মানুবর্তিতা ও সহযোগিতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটিয়ে পরিবার ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক রক্ষার দায়িত্ব বিদ্যালয় যথাযথভাবে পালন করে।

মন্তব্য (Comments) :

বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কার্যাবলি সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হল তার মধ্যে প্রত্যেকটি কার্যাবলি গুরুত্বপূর্ণ এবং পরস্পর নির্ভরশীল। প্রত্যেকের ক্ষেত্রে একই উদ্দেশ্য কাজ করছে। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ এবং তাদের নিজস্ব ক্ষমতা অনুযায়ী এগিয়ে নিয়ে সার্থক উত্তরাধিকারী হিসাবে গড়ে তুলতে সহায়তা করাই হল শিক্ষালয়ের কাজ। শিক্ষার্থীর বিকাশের ধারাকে অব্যাহত রেখে তাঁকে সমাজমুখী করাই হল বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য।

বিদ্যালয়ের সীমাবদ্ধতা (Limitations of School) :

আদর্শগত দিক থেকে বিদ্যালয়গুলো বিভিন্ন ধরনের কার্যাবলি বা দায়িত্ব পালন করলেও বিদ্যালয়ের কাঠামোগত ও অবস্থানগত স্বল্পতার জন্য সব সময় ওই দায়িত্বগুলো সঠিকভাবে পালন করতে পারে না।

বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতাগুলো হলো :

১) বিদ্যালয়ের একটি সামাজিক দায়িত্ব হল শিক্ষার্থীদের সামাজিক বিকাশে সহায়তা করা। কিন্তু শিক্ষার্থীদের সম্পূর্ণ সামাজিক বিকাশ বিদ্যালয়ে সম্ভব নয়। এরজন্য প্রয়োজন সামাজিক পরিবেশ। তাছাড়া শিক্ষার্থীরা যে পারিবারিক পরিবেশ থেকে বিদ্যালয়ে আসে সেই পরিবেশের সঙ্গে বিদ্যালয় পরিবেশের অনেক দিক দিয়ে পার্থক্য বর্তমান। তাই বিদ্যালয়ের সংকীর্ণ পরিবেশে সংক্ষিপ্ত সময়ে শিক্ষার্থীদের সামাজিক বিকাশ অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

২) বিদ্যালয়ের গতানুগতিক পাঠদান পদ্ধতি এবং বৈচিত্রহীন পাঠক্রম শিক্ষার্থীর জীবন ও বিদ্যালয় শিক্ষার মধ্যে ঠিকভাবে সমতা বিধান করতে পারে না। ফলে বিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে না।

৩) বিদ্যালয় শিক্ষায় পাঠ্যক্রমের অতিরিক্ত বোঝা এবং তাত্ত্বিক শিক্ষণ পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের আনন্দ দিতে পারে না। ফলে বিদ্যালয় জীবন অনেক সময় শিক্ষার্থীদের আকর্ষণ করতে পারে না।

৪) বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতি অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না। একই শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর চাহিদা, রুচি, সামর্থ্য, আকাঙ্খা, প্রক্ষোভ একই ধরনের হয় না। ফলে সকল শিক্ষার্থী শ্রেণি শিক্ষণে উপকৃত হতে পারে না।

৫) অনেক ক্ষেত্রে এক একটি বিদ্যালয়ের উপর অত্যধিক শিক্ষার্থীর চাপ শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। প্রয়োজনের তুলনায় শ্রেণি কক্ষে শিক্ষার্থীর সংখ্যা অত্যধিক হওয়ার ফলে পড়াশোনার সুস্থ পরিবেশ বজায় থাকে না।

৬) শিক্ষাদান কার্যকে সার্থক রূপদান করার জন্য প্রয়োজন প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষক। বিদ্যালয়গুলোতে যথেষ্ট সংখ্যক প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব লক্ষ করা যায়।

এই আলোচনা থেকে দেখা যায়, দেশ, সমাজ এবং গোষ্ঠীর পক্ষে বিদ্যালয় অত্যন্ত কার্যকরী সংস্থা হলেও এর কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। কোন একটি নির্দিষ্ট সংস্থা, তা যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন কোন সময়ে তা এককভাবে শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে না। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সংস্থার প্রভাব ছাত্রছাত্রীদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। প্রথাগত শিক্ষার দায়িত্ব বিদ্যালয়ের উপর অর্পিত হলেও কৈশোরে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা বিভিন্ন সামাজিক সংঘের দ্বারাও হয়ে থাকে। প্রায় সব ধরনের শিক্ষাসংস্থা নিজস্বতা বজায় রেখে মানুষের জীবন ব্যাপী শিক্ষার দায়িত্ব নিয়ে থাকে। যেকোনো শিক্ষাসংস্থা মানুষের সর্বাঙ্গীন উন্নতির ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়কের ভূমিকা পালন করে।

বিদ্যালয় সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ (School is a Miniature of Society) :

বিদ্যালয় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এখানে শিক্ষার্থীর সবরকম সম্ভাবনা পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয় এবং সে ভবিষ্যতে সামাজিক জীবনযাপনে সমর্থ হয়ে ওঠে। আধুনিককালে শিক্ষাকে শিশু কেন্দ্রিক করার উপর জোর দেওয়া হয়। এই জন্য বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম শিশুর চাহিদার উপর ভিত্তি করে রচনা করা হয়। কিন্তু শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশ সামাজিক পরিবেশের মধ্যেই সম্ভব। তাই বিদ্যালয়কে সমাজের প্রতিরূপ করে সাজিয়ে তোলার চেষ্টা চলছে। শিক্ষা একটি সামাজিক প্রক্রিয়া, যার মুখ্য উদ্দেশ্য হল সমাজের অতীত কৃষ্টিকে ধরে রাখা এবং তাকে ভবিষ্যতের নাগরিকদের মধ্যে সঞ্চালিত করা। সুতরাং শিক্ষা ও সমাজ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

শিক্ষাবিদ জন ডিউই (John Dewey) এর মতে বিদ্যালয় হল এক ধরনের আদর্শ, মার্জিত, সুন্দর ও সুষম সমাজ। তিনি বলেছেন— "School is a simplified, purified and better balanced society"। ফ্রয়েবেল (Froebel) বিদ্যালয়কে সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। আধুনিক কালে সকল শিক্ষাবিদ বিদ্যালয় ও সমাজ জীবনের বিচ্ছিন্নতা মেনে নেননি এবং বিদ্যালয়কে সমাজেরই অংশ বা ক্ষুদ্র সংস্করণ হিসাবে অভিহিত করেন। বিদ্যালয়কে সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ হিসাবে বিবেচিত করার কারণগুলো হল :

১) সমাজ এবং বিদ্যালয় এই দুই সংগঠনের সাংগঠনিক ক্ষেত্রে অনেক মিল দেখা যায়। সমাজে যেমন গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ একটি সাধারণ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে একসাথে বসবাস করে এবং ওই মানুষগুলোর মধ্যে একটি সচেতন মানসিক মিথস্ক্রিয়া চলে, তেমনি বিদ্যালয়েও দেখা যায় একদল শিক্ষার্থী জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে বা ভবিষ্যৎ জীবনের উপযোগী কোন বৈশিষ্ট্যকে সামনে রেখে একসঙ্গে মিলিত হয়। তাদের মধ্যে অর্থাৎ শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শিক্ষাকর্মী সকলের মধ্যে একটি আন্ত:ক্রিয়া চলে।

২) বিবর্তনের দিক থেকেও সমাজ ও বিদ্যালয়ের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। বিভিন্ন যুগের সমাজব্যবস্থা যেমন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গিয়েছে তেমনি বিদ্যালয়ও তার রূপ পরিবর্তন করেছে। বিদ্যালয় ও সমাজকে জৈবিক সত্তা হিসেবে বিবেচনা করলে বলা যায়, বিদ্যালয় হল সমাজের অঙ্গামাত্র। অধ্যাপক কে কে মুখোপাধ্যায় বলেছেন — "It is an organic growth of society no less than a particular limb in the organic growth of an animal body." সুতরাং বলা যায় বিদ্যালয় সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ।

৩) লক্ষ্যের দিক থেকেও বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যে সাদৃশ্য দেখা যায়। সমাজের প্রতিটি মানুষ যেমন একটি লক্ষ্য নিয়ে দলবন্ধ ভাবে সমাজ গড়ে তোলে তেমনি বিদ্যালয় গঠনের ক্ষেত্রেও একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে। লক্ষ্য স্থির না থাকলে সমাজ ভেঙ্গে পড়ে, তেমনি বিদ্যালয় ও লক্ষ্যহীন অবস্থায় চলতে পারে না। মানুষের বিভিন্ন সংস্কারগত প্রবণতা যেগুলো সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে কাজ করে, তেমনি বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রেও একই বিষয় কাজ করে।

৪) সমাজের মধ্যে যেমন মানুষে মানুষে সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং মনোভাবের আদান প্রদান হয় তেমনি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের আচরণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তাদের মধ্যেও বিশেষ ধরনের আচরণের আদান প্রদান হয়। সহযোগিতা, অনুকরণ, প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব, আত্মপ্রকাশ এই বিষয়গুলো যেমন সমাজ জীবনে দেখা যায় তেমনি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যেও অনুরূপ আচরণ লক্ষ করা যায়। যেকোন সামাজিক গোষ্ঠীর মত বিদ্যালয়ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সামাজিক আনুগত্যমূলক প্রবণতা সৃষ্টি করতে পারে।

মন্তব্য : উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, বিদ্যালয় সমাজের বাইরে আলাদা প্রতিষ্ঠান নয়। সমাজ থেকেই শিক্ষার্থীরা পঠন পাঠনের জন্য বিদ্যালয়ে আসে। তাছাড়া বিদ্যালয় ও সমাজের গঠনগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকেও অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। সমাজের লক্ষ যেমন উপযুক্ত নাগরিক সৃষ্টি করে সমাজের উন্নতিবিধান করা, তেমনি বিদ্যালয়েরও লক্ষ হল শিক্ষার্থীর উপযুক্ত বিকাশ সাধনের দ্বারা সমাজ কল্যাণ করা এবং উন্নতিতে সাহায্য করা। এই দিক বিচার করলে বলা যেতে পারে বিদ্যালয় সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ।

দ্বিতীয় একক অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা ও তার সংস্থা

অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা (Informal Education) :

অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষায় জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যক্তি কোন নির্দিষ্ট নিয়মকানুন মেনে চলে না। তাই বলা হয় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে যেকোন সূত্র বা পদ্ধতি দ্বারা অর্জিত শিক্ষাই হল অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা। শিক্ষাবিদ Philip Hall Coombs অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন "Informal Education is education, which takes place all the time informally or incidentally." অর্থাৎ অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা হল এমনই এক শিক্ষা, যা মানবজীবনের যে কোন পর্যায়ে, যে কোন সময়ে অনিয়ন্ত্রিতভাবে বা অপরিকল্পিতভাবে ঘটে। গৃহপরিবেশ বা পরিবার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ক্লাব, খেলার মাঠ, বই, সংবাদপত্র, রেডিও, সিনেমা, দূরদর্শন সবই অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষার সংস্থা হিসেবে বিবেচিত হয় এবং এগুলোর দ্বারা ব্যক্তি প্রভাবিত হয়ে থাকে। তাই অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষার স্বরূপ জানতে হলে তার বৈশিষ্ট্যগুলো জানা আবশ্যক।

অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষার বৈশিষ্ট্যাবলি (Characteristics of Informal Education) :

১) অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষার শিক্ষার্থীরা স্বাভাবিক প্রবণতা ও চাহিদা অনুযায়ী অভিজ্ঞতা অর্জন করে থাকে।

২) অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা বিদ্যালয়ের বাইরে বৃহত্তর সমাজ, পরিবার ও অন্যান্য সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে হয়ে থাকে।

৩) অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষায় বয়সসীমার কোন বন্ধন নেই। যে কোন বয়সের মানুষ এই শিক্ষা লাভ করতে পারে।

৪) অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষায় নির্দিষ্ট পূর্বপরিকল্পিত কোন পাঠ্যক্রমের প্রয়োজন হয় না। এই বিশ্বপ্রকৃতির সজীব ও জড় সমস্ত উপাদানই এখানে শিক্ষার্থীর পাঠ্যক্রম।

৫) অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থী গৃহপরিবেশ বা বৃহত্তর সমাজ পরিবেশ থেকে পর্যবেক্ষণ ও অনুকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষালাভ করে।

৬) এই শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থী তার নিজের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী যে জ্ঞান লাভ করে তা সর্বদাই প্রাসঙ্গিক হয়।

৭) এই শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষাদানের দায়িত্ব নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির উপর নির্ভর নয়। পিতামাতা বা পরিবারের বয়স্ক ব্যক্তি এবং বিশ্ব প্রকৃতি শিক্ষকের ভূমিকা পালন করে।

৮) এই শিক্ষায় শিক্ষান্তে বিধিবদ্ধভাবে কোন পরিমাপ বা মূল্যায়ন করা হয় না।

৯) এই শিক্ষা ব্যবস্থা সর্বপ্রকার নিয়ন্ত্রণমুক্ত ও স্বাধীন। এখানে বাইরের কোন প্রকার চাপ থাকে না। স্বাভাবিক নিয়মে ব্যক্তি অভিজ্ঞতা লাভ করে।

অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষার পরিধি (Scope of Informal Education) :

অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা ব্যবস্থা হল নিয়ন্ত্রণহীন, স্বতঃস্ফূর্ত, স্বাভাবিক শিক্ষা। ব্যক্তি তার চাহিদা অনুযায়ী, প্রয়োজন অনুযায়ী এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অভিজ্ঞতা বা শিক্ষা লাভ করে থাকে। ব্যক্তি তার জীবনধারনের প্রয়োজনীয়

জ্ঞান, দক্ষতা, মনোভাব, চাহিদামূলক শিক্ষণ প্রতিনিয়ত অভিজ্ঞতা অর্জন ও পরিবেশের সঙ্গে পারস্পরিকক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে আয়ত্ত করে এবং পরোক্ষভাবে এই জ্ঞান সমাজের ব্যক্তিদের উপর প্রভাব বিস্তার করে। তাই অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষাব্যবস্থার পরিধি ব্যাপক। এই শিক্ষা মানুষের জীবনে সতত ঘটমান প্রক্রিয়া। আধুনিক জীবন পরিবেশে মানুষ অনেক অভিজ্ঞতা প্রথাগত শিক্ষা ব্যবস্থার বাইরে অর্জন করে থাকে। এই অভিজ্ঞতা শিশু তার পরিবার থেকে শুরু করে বিশ্ব প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান থেকে লাভ করে। এই জীবনোপযোগী অভিজ্ঞতাগুলো প্রথাগত শিক্ষার পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু আধুনিক প্রথাগত শিক্ষার সহযোগী হিসেবে এই অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা তার অস্তিত্ব বজায় রেখে প্রথাগত শিক্ষার পটভূমি প্রস্তুতিকরণে ও বিস্তৃতিতে সহায়তা করে চলেছে। এই ব্যাপক সামাজিক তাৎপর্যের বিচারে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ J.P. Naik বলেছেন, "সমাজ জীবনের মধ্যে তার সহায়ক ব্যক্তি যা কিছু শেখে তাই হল অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা।"

অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষার সীমাবদ্ধতা (Limitations of Informal Education) :

আদিম যুগের জীবনযাত্রা ছিল সহজ ও সরল। অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষাই ছিল চলার পথের পাথেয়। তবে বর্তমানে যন্ত্র সভ্যতার প্রভাবে জীবন যত জটিল হচ্ছে তত নতুন নতুন শিক্ষাপদ্ধতির প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা মনুষ্য সমাজের কাছে নিতান্ত প্রয়োজনীয় শিক্ষা হলেও এই শিক্ষা সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয়। অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষার সীমাবদ্ধতাগুলো হল —

১) অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষার মাধ্যমে গভীর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করা যায় না। তাছাড়া এই শিক্ষা সব সময় সব ধরনের সমস্যার সমাধান করতে পারে না।

২) অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা সুনাগরিক তৈরী করতে অক্ষম। একজন সুস্থ নাগরিক তৈরি করতে হলে প্রয়োজন নিয়ন্ত্রনযুক্ত সুনাগরিকতার শিক্ষা। আর এই শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণহীন পরিবেশে হয় বলে তা সুনাগরিক গড়ে তুলতে পারে না।

৩) অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা ব্যবস্থা সর্বপ্রকার নিয়ন্ত্রনমুক্ত। ফলে এই শিক্ষার মধ্য দিয়ে জীবনের সমস্ত কৌশল আয়ত্ত করা সম্ভব হয় না।

৪) অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষায় পর্যবেক্ষণ ও অনুকরণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যে জ্ঞানার্জন করে থাকে তার প্রকৃত মূল্যায়ন হয় না। আর প্রকৃত মূল্যায়ন ছাড়া শিক্ষার গতি প্রকৃতি নির্ধারণ করা যায় না।

৫) অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষার ক্ষেত্রে সাহায্যকারী বিভিন্ন গণমাধ্যম যেমন সংবাদপত্র, বেতার, চলচ্চিত্র, দূরদর্শন প্রভৃতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যে জ্ঞান লাভ করে তার দ্বারা সব সময় শিক্ষার্থীদের সম্যক বিকাশ সাধিত হয় না। এগুলোর মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর মধ্যে নেতিবাচক আচরণধারা গড়ে তুলতে পারে।

অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষার বিভিন্ন সংস্থা (Different Agencies of Informal Education): অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষার বিভিন্ন সংস্থাগুলো হল — (ক) পরিবার (খ) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (গ) ক্লাব (ঘ) রাষ্ট্র (ঙ) গণমাধ্যম— সংবাদপত্র, বেতার, চলচ্চিত্র, দূরদর্শন, কম্পিউটার।

ক) পরিবার (Family) : অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষার মাধ্যমগুলোর মধ্যে পরিবার হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সক্রিয় মাধ্যম। পরিবারের মধ্যে বা গৃহ পরিবেশে শিশু প্রথম জন্মলাভ করে এবং এই পরিবারের মধ্যেই শিশুর শিক্ষার ভিত্তি রচিত হয়। গৃহ পরিবেশেই শিশু সমাজজীবন সম্বন্ধে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ লাভ করে।

শিশুর নৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন ও পরিবারের দ্বারা প্রভাবিত। পরিবার হল শিশুর প্রথম শিক্ষালয়। পরিবারে মায়েরাই শিশুর আদর্শ শিক্ষিকা হিসাবে পরিগণিত হয়। George Herbert বলেছেন "One good mother is worth a hundred school masters." তাই অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষার মাধ্যমগুলোর মধ্যে পরিবারের ভূমিকা বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

পরিবারের শিক্ষামূলক কার্যাবলি (Educational Functions of Family) : *পরিবার হল শিশুর শিক্ষার এবং জীবন বিকাশের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। পরিবারের শিক্ষামূলক দায়িত্বগুলো হল—*

১) দৈহিক বিকাশ (Physical Development): সুস্থ দেহ সুস্থ মনের অধিকারী হয়। তাই শিশুর দৈহিক বিকাশে সহায়তা করা পরিবারের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। শৈশবে শিশুর মন অনেক বেশি নমনীয় থাকে তাই তাকে খুব সহজেই অনেক কিছু শেখানো যায় এবং বিভিন্ন সুঅভ্যাস গঠনে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় করে তোলা যায়। এছাড়াও পরিবার শিশুর মৌলিক চাহিদা যেমন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের পাশাপাশি দৈহিক নিরাপত্তা ও মানসিক নিরাপত্তা প্রদান করে।

২) সামাজিক বিকাশ (Social Development): শিশুর সামাজিকীকরণ গৃহ পরিবেশেই শুরু হয়। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে নানাবিধ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে শিশু সামাজিক শিক্ষালাভ করে। এই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমেই সে সমাজের রীতিনীতি, আচার আচরণ, সংস্কারের বিধিনিষেধ এবং বিভিন্ন সামাজিক গুণ যেমন- সহযোগিতা, সমবেদনা, সৌজন্য, মূল্যবোধ প্রভৃতি আয়ত্ব করে।

৩) নৈতিক বিকাশ (Moral Development) : শিশুর বিকাশে পরিবার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিশু পরিবারে পিতামাতা ও অন্যান্য বয়স্ক ব্যক্তিদের সংস্পর্শে এসে বিভিন্ন নৈতিক মূল্যবোধ যেমন দয়া, সততা, ধৈর্য, ত্যাগ, সহিষ্ণুতা, শ্রদ্ধা, প্রীতি-ভালোবাসা ইত্যাদি শেখে, যা শিশুর চারিত্রিক বিকাশে সহায়তা করে।

৪) বাচনিক বিকাশ (Language Development): মনের ভাবকে সঠিকভাবে ব্যক্ত করার জন্য বাচনিক বিকাশ অত্যন্ত জরুরী। বাচনিক বিকাশ ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক। পরিবার শিশুর বাচনিক বিকাশে সহায়তা করে। শিশুরা পরিবারে প্রথম মাতৃভাষার মাধ্যমে শিখে। পরিবারের প্রতিটি সদস্য যদি সঠিক উচ্চারণ ও মার্জিত ভাষায় কথা বলে এবং পরিবারে যদি লেখাপড়ার পাশাপাশি সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার সুযোগ সুবিধা থাকে, তাহলে লক্ষ করা যায় সেই পরিবারের শিশুরাও কথাবার্তা ও লেখাপড়ায় বেশ পারদর্শিতার পরিচয় দেয়।

৫) আধ্যাত্মিক বিকাশ (Spiritual Development) : পরিবারের মধ্যেই শিশুর ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক দিকের বিকাশ ঘটে। পরিবারে বিভিন্ন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়েই শিশুর মধ্যে আধ্যাত্মিক দিকের বিকাশ হয়। পরিবারই শিশুকে নিজের ধর্ম ও অন্যের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা করতে শেখায়।

৬) মানসিক বিকাশ (Mental Development) : শিশুর মানসিক বিকাশে পরিবার বিশেষভাবে সহায়তা করে। মানসিক বিকাশের ফলে শিশুর মধ্যে চিন্তনের ক্ষমতা, যুক্তিশক্তির ক্ষমতা, প্রত্যক্ষণের ক্ষমতা প্রভৃতি বৃদ্ধি পায়, ফলে শিশু ভবিষ্যত জীবনে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হয়।

৭) সাংস্কৃতিক বিকাশ (Cultural Development) : প্রত্যেক পরিবারের একটি নিজস্ব সংস্কৃতি বা কৃষ্টি থাকে। পরিবারের সদস্যরা ওই সংস্কৃতি বা কৃষ্টির দ্বারা পরিচালিত হয়। তাই শিশুরাও তার পছন্দ-অপছন্দ,

রাগ-অনুরাগ, শখ-শৌখিনতা সবই অর্জন করে পরিবারের কাছ থেকে। ফলে শিশুর সাংস্কৃতিক শিক্ষা পরিবার থেকেই ঘটে।

৮) বৃত্তিমূলক শিক্ষা (Vocational Education) : বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অনেক ক্ষেত্রে শিশুর মধ্যে পিতামাতার বৃত্তি অনুসরণ করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। শিশুর বৃত্তি নির্ধারণের ক্ষেত্রে পিতামাতা ও পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তির মতামত ও চিন্তাধারার প্রভাব অস্বীকার করা যায় না।

৯) সুনাগরিকতার শিক্ষা (Citizenship Education) : জনকল্যাণকামী রাষ্ট্র গড়তে হলে আদর্শ নাগরিক প্রয়োজন। নাগরিকতার শিক্ষা শিশুকে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। পরিবার শিশুদের মধ্যে আদর্শ নাগরিকের নীতিবোধগুলো জাগ্রত করে।

১০) ব্যক্তিসত্তার বিকাশ (Development of Personality) : শিক্ষার একটি অন্যতম লক্ষ্য হল ব্যক্তির ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়তা করা। যে ব্যক্তি চিন্তন, বিচারকরণ ও বুদ্ধির দ্বারা নিজের অহংসত্ত্বাকে উপলব্ধি করতে পারে সেই ব্যক্তিসত্তার অধিকারী। পরিবার শিশুর এই অহংসত্তাকে জাগিয়ে তাকে আত্মসচেতন করে তোলে।

পরিবারের সীমাবদ্ধতা (Limitations of Family) :

পরিবারের শিক্ষামূলক উপযোগিতার দিকগুলো বিবেচনা করে আমরা বলতে পারি যে, শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশ প্রক্রিয়াকে সুষ্ঠুভাবে গড়ে তুলতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পরিবারের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বর্তমানে সমাজে জটিলতা বৃদ্ধির কারণে পরিবার তার শিক্ষা সংক্রান্ত দায়িত্বগুলো সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারছে না। তাছাড়া পরিবারের নিজস্ব কতগুলো সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। পরিবারের সীমাবদ্ধতাগুলো হল—

১) পূর্বে আমাদের সমাজে যৌথ পরিবার প্রথা ছিল। জীবনযাত্রাও ছিল সহজ ও সরল। শিশুরা তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের কাছ থেকে অনুকরণ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষালাভ করত। বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির ফলে মানুষের কর্মপরিধিও বৃদ্ধি পেয়েছে। এমতাবস্থায় পরিবারের পক্ষে শিশুর শিক্ষার সার্বিক দায়িত্ব নেওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

২) আমাদের দেশে বহু পরিবার আছে যেখানে পিতামাতা ও পরিবারের বয়স্ক ব্যক্তিবর্গ নিরক্ষর। ফলে পরিবারের অন্তর্গত শিশুদের সঠিক শিক্ষাদানে তারা অক্ষম। এটাও পরিবারের একটি বিশেষ সীমাবদ্ধতা।

৩) অনেক সময় দেখা যায় পরিবারের বিভিন্ন সদস্য নেশায় আসক্ত থাকে ও বিভিন্ন ধরনের কু-অভ্যাসে লিপ্ত থাকে। ফলে ওই পরিবারের শিশুরাও অনুকরণের মাধ্যমে সেইসব কু-অভ্যাসগুলো গ্রহণ করে যা তার ভবিষ্যতজীবনের উপর প্রভাব ফেলে।

৪) আমাদের দেশে অনেক পরিবারই দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করে। ফলে অর্থের অভাবে তারা তাদের শিশুদের জন্য সুষম খাদ্য ও গুণগতমানের শিক্ষা প্রদান করতে পারছে না। ফলে শিশুর দৈহিক ও মানসিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।

(খ) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (Religious Institution) :

শিক্ষার উদ্দেশ্য হল ব্যক্তির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশ সাধন করা। ব্যক্তির মধ্যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ জাগ্রত করার ক্ষেত্রে ধর্মীয প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রাচীন যুগে মন্দির, মঠ, গীর্জা এবং মসজিদ প্রভৃতিকে কেন্দ্র করেই শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। ইংরেজি শিক্ষার প্রসারও আমাদের দেশে খ্রিষ্টান মিশনারীরা চার্চের মাধ্যমেই করেছিল। এই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর উদ্দেশ্য হল ধর্মীয় আচার-আচরণ ও ধর্মের মূলনীতিগুলোর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নৈতিক মান উন্নত করা। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো আজও শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বেশ কিছু দায়িত্ব পালন করে থাকে। সেগুলো হল—

১) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে মানুষ নানারকম সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। এই সমস্ত অনুষ্ঠানগুলো পালন করতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিভিন্ন দিকের সঙ্গে পরিচিত হয় । ফলে তাদের মানসিক ও সামাজিক বিকাশ ঘটে।

২) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যক্তির আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রিত করে, তাদের আচরণের মধ্যে একটা গুণগত পরিবর্তন নিয়ে আসে।

৩) বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মহাপুরুষদের জীবনীপাঠ, বাণী, আদর্শ ও জীবনযাপনের রীতি সম্পর্কে ধারণা ব্যক্ত করা হয়। এই সমস্ত বিষয়গুলো ব্যক্তিকে সৎ এবং চরিত্রবান করে গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

৪) আমাদের দেশে বিভিন্ন ধর্মের লোক বসবাস করে, প্রত্যেক ধর্মেরই কিছু রীতিনীতি, কৃষ্টি, আদর্শ রয়েছে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যক্তিকে তার নিজস্ব কৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত করে।

৫) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের সাহায্য করে। ভারতবর্ষে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন, ভারত সেবাশ্রম সংঘ ইত্যাদির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সীমাবদ্ধতা (Limitations of Religious Institution) :

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর অনেক শিক্ষামূলক উপযোগিতা থাকা সত্ত্বেও এর কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সীমাবদ্ধতাগুলো হল—

১) আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশে সহায়তা করা। কিন্তু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে শিক্ষার্থী যে শিক্ষালাভ করে তা দিয়ে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধিত হয় না।

২) বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষার্থীর সকল প্রকার চাহিদা ও আগ্রহ অনুযায়ী শিক্ষা দিতে পারে না।

৩) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো কখনো কখনো নিজের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য অন্য ধর্মকে ছোট করে দেখে যার প্রভাবে সমাজজীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৪) ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানগুলো অনেক সময় মানুষকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন করে তোলে।

গ) ক্লাব (Club) :

বর্তমানে সমাজ শিক্ষার ক্ষেত্রে ক্লাব একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রতিটি সমাজেই মানুষ নিজেদের প্রয়োজনের তাগিদে একসময় বিভিন্ন দল গঠন করে নিজেদের মতামত প্রকাশ করত এবং সমাজের বিভিন্ন সেবামূলক এবং শিক্ষামূলক দায়িত্ব পালন করত। আধুনিককালে ক্লাবের এই দায়িত্ব উত্তরোত্তর

বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্লাব বিভিন্ন ধরনের হয। যেমন- বিজ্ঞান ক্লাব, গলফ্ ক্লাব, ক্রিকেট ক্লাব, লায়ন্স ক্লাব, লাফিং ক্লাব, রোটারী ক্লাব, স্থানীয় ক্লাব, স্পোর্টস ক্লাব, সাংস্কৃতিক সংঘ ইত্যাদি। ক্লাব বা সংস্থাগুলো যে কাজেই নিয়োজিত থাকুক না কেন তারা কতকগুলো শিক্ষামূলক দায়িত্ব পালন করে সেগুলো হল—

১) ক্লাবের বিভিন্ন সদস্যগণ একত্রিত হয়ে পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন কর্মধারা পরিচালনা করে। যার মাধ্যমে তাদের মধ্যে সমবেদনা, সহযোগিতা, সহনশীলতা, সহমর্মিতা ইত্যাদি সামাজিক গুণের বিকাশ হয়।

২) ক্লাবগুলো ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সৃজনাত্মক ক্ষমতা বিকাশে সহায়তা করে। ক্লাবগুলো অনেক সময় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। যেখানে শিক্ষার্থী এবং সাধারণ জনগণ অংশগ্রহণ করে নিজেদের প্রতিভার পরিচয় দিতে পারে।

৩) ক্লাবের কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালিত করার জন্য প্রত্যেক সদস্যকে কিছু নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়। ফলে তাদের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা, সময়জ্ঞান, শৃঙ্খলাবোধ প্রভৃতি গড়ে ওঠে এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে শৃঙ্খলিতভাবে কাজ করার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

৪) ক্লাবগুলো ব্যক্তির দৈহিক বিকাশে সহায়তা করে। ক্লাবগুলোতে ব্যায়াম, খেলাধূলা, শরীরচর্চা, আত্মরক্ষামূলক কর্মসূচি প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকে। শিক্ষার্থীরা একটা নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে ওই সমস্ত শরীরচর্চামূলক কাজে অংশ নিতে পারে।

৫) ক্লাবের বিভিন্ন সদস্যরা একত্রিতভাবে সংগঠিত হয়ে বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করে এবং সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হয়, ফলে তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধের জন্ম হয় যা পরবর্তীকালে জাতীয় সংহতি রক্ষার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়।

৬) সাম্প্রতিককালে ক্লাবগুলো বিভিন্ন সমাজসেবা মূলক কার্য সম্পাদন করে থাকে। যেমন গরীব ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে বই খাতা বিতরণ, দু:স্থদের বস্ত্র বিতরণ, স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির ইত্যাদি বিষয়ের আয়োজন করে।

ক্লাবের সীমাবদ্ধতা (Limitations of Club) :

ক্লাবগুলো সমাজে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সামাজিক ক্ষেত্রে নানা গঠনমূলক কাজ করলেও কয়েকটি ক্ষেত্রে এর কতগুলো সীমাবদ্ধতা আছে। যেমন —

১) ক্লাবের শিক্ষামূলক ভূমিকার কথা বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে খুব কম সংখ্যক ক্লাবই এইসব দায়িত্ব পালন করে। কিন্তু প্রমোদমূলক অনুষ্ঠানের মধ্যেই ক্লাবের দায়িত্ব বা কাজ সীমাবদ্ধ রয়ে যায়।

২) ক্লাবগুলো সাধারণত কতগুলো বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে গড়ে ওঠে। সেই উদ্দেশ্যগুলো চরিতার্থ হলে আর অন্য কোন দিকে গুরুত্ব দিতে সাধারণত দেখা যায় না।

৩) একটি ক্লাবের যা পরিকাঠামো থাকা দরকার, অর্থ ও সম্পদ দরকার তা প্রায় অধিকাংশ ক্লাবেরই নেই। এর ফলে ইচ্ছা থাকলেও ক্লাবগুলো প্রকল্প অধিগ্রহণ করতে পারে না। এ ব্যাপারে সরকারী অনুদানও সবসময় পাওয়া যায় না। ফলে ক্লাবের শিক্ষামূলক গুরুত্ব হারিয়ে যায়।

৪) পাশাপাশি অবস্থিত ক্লাবগুলোর মধ্যে অনেক সময় প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব দেখা যায়। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রে ক্লাবগুলোর মধ্যে তিক্ততার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়, যা ক্লাবের মহৎ উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দেয়।

৫) অনেক সময় দেখা যায় কোনো কোনো ক্লাব বিশেষ কোন ধর্মীয় মত বা রাজনৈতিক আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়। এর ফলে সমাজের সকল নাগরিকের কল্যাণ চিন্তা ও শিক্ষার মান উন্নয়নের বিষয়টি যথাযথ গুরুত্বলাভ করে না।

ঘ) রাষ্ট্র (State) :

রাষ্ট্র হল একটি সুসংগঠিত সামাজিক সংগঠন, যেখানে বসবাসকারী মানুষ তার দ্বারা পরিচালিত হয় এবং তার নির্ধারিত বিধিনিষেধ মেনে চলতে বাধ্য থাকে। রাষ্ট্রের কাজ হল দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করা, আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখা, বহি:শত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করা এবং সর্বোপরি দেশের জন্য আদর্শ সুনাগরিক তৈরি করা। যেকোন রাষ্ট্রের চারটি মৌলিক উপাদান আছে। সেগুলো হল- এলাকা (Territory), জনসংখ্যা (Population), সরকার (Government) এবং সার্বভৌম ক্ষমতা (Sovereigntes)। প্রত্যেক রাষ্ট্রের একটি সুনির্দিষ্ট এলাকা থাকে এই সুনির্দিষ্ট এলাকায় বসবাসকারী কিছু স্থায়ী জনসংখ্যা থাকে, এই জনসংখ্যার মতাদর্শের ভিত্তিতে নির্বাচিত একটি সরকার গঠিত হয় এবং এই নির্বাচিত সরকার রাষ্ট্র পরিচালনা করে তার সার্বভৌম ক্ষমতার ভিত্তিতে।

রাষ্ট্র ব্যক্তিজীবনের আদর্শের রক্ষক। আর একজন আদর্শ নাগরিক গড়ে তুলতে হলে চাই প্রকৃত শিক্ষা। তাই রাষ্ট্রকে তার দেশের অন্তর্গত সকল নাগরিকের শিক্ষার দায়িত্ব অবশ্যই নিতে হয়। হারল্ড যোশেফ লাস্কি বলেছেন, নাগরিকদের শিক্ষা, আধুনিক রাষ্ট্রের প্রাণকেন্দ্র (Harold Joseph Laski) (Education of the citizen is the heart of the modern state)। তাই আধুনিককালে রাষ্ট্রকে শিক্ষার সংস্থা হিসাবে গণ্য করা হয়। রাষ্ট্রের শিক্ষামূলক দায়িত্বগুলো নিম্নে আলোচনা করা হল —

রাষ্ট্রের শিক্ষামূলক দায়িত্ব (Educational Functions of the State) :

১) রাষ্ট্র শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে। গণতান্ত্রিক যে কোন রাষ্ট্রের সমাজ ব্যবস্থার মূল কথা হল, প্রত্যেক ব্যক্তিকে এই সমাজাদর্শে অনুপ্রাণিত করা এবং প্রকৃত শিক্ষার মধ্য দিয়ে উপযুক্ত নাগরিক তৈরি করা। তাই এই সমাজ ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার উদ্দেশ্য কী হবে, শিক্ষার্থীর কোন্ কোন্ গুণের বিকাশ করতে হবে, এইসব কিছু শিক্ষালয়কে নির্দেশ করে দেবে রাষ্ট্র।

২) সমাজের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষালয় স্থাপন, শিক্ষালয়গুলোকে আর্থিক সাহায্য প্রদান ও বিভিন্ন কারিগরি ও বৃত্তিশিক্ষার প্রতিষ্ঠান তৈরি করাও রাষ্ট্রের দায়িত্ব। অর্থাৎ সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের আয়োজন রাষ্ট্রকে করতে হয়।

৩) রাষ্ট্রের অন্তর্গত ৬-১৪ বছর বয়সের সকল শিশুর অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য। সংবিধানের ৪৫নং ধারায় ৬-১৪ বছর বয়সের সকল শিশুর অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের কথা বলা হয়েছিল। বর্তমানে ২০১০ সালে সংবিধানের ৮৬তম সংশোধনে ২১(এ) উপধারায় শিক্ষাকে মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৪) দেশের প্রাক্ প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত সকল শিশুকে গণশিক্ষা প্রদানের জন্য রাষ্ট্র জাতীয় শিক্ষানীতি এবং জাতীয় পাঠ্যক্রমের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা তৈরি NCF-2005 (National Curriculumn Framework) বর্তমানে পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি সংক্রান্ত সমস্ত দায়িত্ব বহন করছে।

৫) আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থায় দেখা যায় রাষ্ট্র সকল স্তরের ছাত্রছাত্রীদের জন্য পাঠ্যবই ও শিক্ষা সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধা প্রদান করে। প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সকল ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে বই ও স্কুল ড্রেসের ব্যবস্থা করছে। বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রছাত্রীদের জন্য মিড-ডে-মিলের ব্যবস্থা করেছে। নবম ও দশম শ্রেণিতে পাঠরত দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে বই প্রদান এবং নবম শ্রেণিতে পাঠরত ছাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য বাইসাইকেলের ব্যবস্থা করেছে রাষ্ট্র।

৬) সাধারণত সমগ্র দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব রাষ্ট্রকে নিতে হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্দিষ্ট পথে পরিচালনা করার জন্য রাষ্ট্র বিভিন্ন নিয়মনীতি প্রণয়ন করছে। এই কারণে ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের (কোঠারী কমিশন ১৯৬৪-৬৬) প্রতিবেদনে স্নাতক স্তর পর্যন্ত শিক্ষাব্যবস্থার তদারকির জন্য জেলা স্কুলবোর্ড (District School Board) গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে।

৭) আধুনিককালে শিক্ষার উন্নতিকল্পে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে বিশেষভাবে কাজে লাগিয়ে শিক্ষার্থীদের গুণগত শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করছে রাষ্ট্র। শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণার জন্য এবং কর্মরত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য জাতীয় শৈক্ষিক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা (NCERT) আমাদের দেশে বর্তমানে বিশেষভাবে কার্যকরি পদক্ষেপ নিয়ে চলেছে। বর্তমানে NCERT, SCERT, DIET শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। যেমন- সেমিনার, কনফারেন্স, কর্মশালা, রিফ্রেসার কোর্স, গ্রীষ্মকালীন ওরিয়েন্টেশান প্রোগ্রাম ইত্যাদি।

৮) রাষ্ট্র দেশের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতিকল্পে বিভিন্ন কমিটি ও কমিশন নিয়োগ করে যেগুলো দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সমস্যাগুলো পর্যালোচনা করে এবং সেই সমস্যাগুলোর সমাধানকল্পে বিভিন্ন সুপারিশ ও পরামর্শ রাষ্ট্রকে প্রদান করে।

ঙ) গণমাধ্যম (Mass Media) :

মানুষ সামাজিক জীব। কোন মানুষই সমাজে একা বসবাস করতে পারে না। আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার যুগে সমাজে বসবাসকারী প্রতিটি মানুষ একে অন্যের সঙ্গে তথ্য ও জ্ঞানের আদান প্রদান করে। আর যার মাধ্যমে এই জ্ঞান একটা বৃহত্তর সমাজে ছড়িয়ে পড়ে সেই যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বলা হয় গণমাধ্যম। আধুনিক বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার উন্নতির ফলে নানা ধরনের গণমাধ্যমের আবির্ভাব ঘটেছে। সেগুলো মানুষের মনের উপর বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। যে গণমাধ্যমগুলো শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সহায়তা করে সেগুলো হলো — সংবাদপত্র, রেডিও, সিনেমা, টেলিভিশন, ইন্টারনেট ইত্যাদি।

সংবাদপত্র (Newspaper) :

আধুনিক বিশ্বে সাক্ষর ব্যক্তিদের কাছে সংবাদপত্র একটি কার্যকরী গণমাধ্যম। সংবাদপত্র মানুষের জীবনের একটি অপরিহার্য অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়। সংবাদপত্র ছোটো বড়ো সকলের মানসিক চাহিদা অনুযায়ী খবর পরিবেশন করে। মানবজীবনের সকল দিকে যেমন- রাজনৈতিক বিশ্লেষণ, শিক্ষামূলক প্রতিবেদন, জনগণের মতামত, সাধারণ মানুষের সমস্যাবলি, বিজ্ঞাপণ, ছোটোদের পাতা ইত্যাদি বিষয়ে ছাপানো হয় বলে সংবাদপত্র সকলের কাছে খুবই জনপ্রিয় গণমাধ্যম। সংবাদপত্রের শিক্ষামূলক উপযোগিতাগুলো নিম্নরূপ—

১) সংবাদপত্র মানুষের মধ্যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ জাগ্রত করে। সংবাদপত্র জাতীয় সমস্যাবলি এবং জাতীয় ঐক্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলে এবং দুর্নীতি, সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদির বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলে।

২) সংবাদপত্র বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হয় ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভাষার বিকাশ হয়। বিভিন্ন লেখক ও সাহিত্যিকদের গল্প, উপন্যাস, প্রতিবেদন পাঠ করে শিক্ষার্থীদের ভাষাজ্ঞানের বিকাশ হয়।

৩) সংবাদপত্র ব্যক্তির আচরণধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে। কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যদি বিসদৃশ আচরণ করে, তবে সংবাদপত্র তাকে এ বিষয়ে সচেতন করে দেয়।

৪) সংবাদপত্র শিক্ষানীতি নির্ধারণ, বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা, জগতের পরিবর্তনশীলতার সঙ্গে সংগতি রেখে নতুন পাঠ্যক্রম রচনা ইত্যাদি বিভিন্ন শিক্ষামূলক বিষয়ে জনগণকে অবহিত করে।

৫) বর্তমানে সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনগুলোর দ্বারা জনগণ বিশেষভাবে প্রভাবিতহচ্ছে। শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কোর্সে ভর্তি সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন, বেকার যুবক যুবতীদের জন্য চাকুরী সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন এছাড়াও শিক্ষার্থীদের পাঠ্যক্রমভিত্তিক বিভিন্ন বিষয় সুচারুরূপে পরিবেশিত হয়।

৬) সংবাদপত্রে স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ঘটনাবলি ছবি সহকারে প্রকাশিত হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দিকে ঘটে যাওয়া নিত্যনতুন ঘটনাবলি, উন্নয়ন ও বিকাশ, নতুন নতুন আবিষ্কার এই সব কিছুর সঙ্গে পরিচয় ঘটায় সংবাদপত্র।

সংবাদপত্রের সীমাবদ্ধতা (Limitations of Newspaper) :

১) সংবাদপত্র হল একমুখী মাধ্যম। এর মাধ্যমে পাঠক তার মতামত ব্যক্ত করতে পারে না। তাকে শুধু সংবাদপত্রের মতামতের উপরই নির্ভর করতে হয়।

২) সংবাদপত্র নিরক্ষর মানুষের কাছে মূল্যহীন। ২০১১-এর সেনসাস্ রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতের জনসংখ্যার প্রায় ২৬ শতাংশ মানুষ নিরক্ষর। ফলে তাদের পক্ষে সংবাদপত্র পাঠ করে জ্ঞান অর্জন করা কঠিন।

৩) ব্যহত দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদের কাছে সংবাদপত্র একটি মূল্যহীন মাধ্যম।

৪) সংবাদপত্র শিক্ষার্থীদের মধ্যে সবসময় শিক্ষাভিমুখী প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। নানারকম কু-অভ্যাস গঠন, সামাজিক কোনো আদর্শের প্রতি বিরূপ মনোভাব এবং বিভিন্ন খারাপ জিনিসের প্রতি আগ্রহ সংবাদপত্রের মাধ্যমে কখনো কখনো সঞ্চারিত হতে পারে।

বেতার (Radio) :

অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষার একটি উল্লেখযোগ্য শক্তিশালী মাধ্যম হল বেতার। বেতার চিত্তবিনোদনমূলক ও শিক্ষামূলক কর্মসূচি প্রচার করে। ভারতে প্রথম বেতার প্রচলিত হয় ১৯২৭ সালের ২৩ জুলাই। বর্তমানে ভারতবর্ষে ‘প্রসার ভারতী’ গঠন করা হয়েছে। যার দ্বারা সমাজের সর্বস্তরের মানুষ যেমন ছাত্র, শিক্ষক, কৃষক, সাধারণ জনগণ, সাক্ষর ও নিরক্ষর ব্যক্তি সকলেই উপকৃত হচ্ছে। তাই বেতার হল একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষামূলক গণমাধ্যম।

বেতারের শিক্ষামূলক ভূমিকা (Educational Role of Radio) :

১) বেতারের মাধ্যমে যে সকল বিষয় সম্প্রচার করা হয় সেগুলো সর্বজনগ্রাহ্য হয়। বেতারে প্রচারিত অনুষ্ঠানগুলো সহজ সরল ভাষায় পরিবেশন করা হয় ফলে সাক্ষর ও নিরক্ষর সকল ব্যক্তিই বুঝতে পারে এবং সহজে গ্রহণ করতে পারে।

২) বেতারে বিভিন্ন দেশাত্মবোধক কার্যক্রম প্রচারিত হয় যা ব্যক্তির মধ্যে সামাজিক ঐক্য, জাতীয়তাবোধ, জাতীয় সংহতি ও আন্তর্জাতিকতাবোধ জাগিয়ে তোলে। ব্যক্তিকে তার দায়িত্ব, কর্তব্য, অধিকার সম্বন্ধে

সচেতন করে একজন সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

৩) বেতারে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি বিষয়ক বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। পরিবেশ দূষণ, বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা ইত্যাদি বিষয়ে মানুষকে অবহিত করে এবং পরিবেশ রক্ষায় ব্যক্তির দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করে।

৪) বেতার একটি শ্রবণভিত্তিক গণমাধ্যম। বেতার শিক্ষার্থীর মধ্যে ভাষার দক্ষতা ও শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধি করে। বেতারে বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি ইত্যাদি ভাষায় অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় বলে শিক্ষার্থীর ভাষার বিকাশ সাধিত হয়।

৫) বেতারে সমাজের সকল স্তরের লোকদের চাহিদা অনুযায়ী অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। এই সকল অনুষ্ঠানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল গান বাজনা, নাটক, কৃষিশিক্ষা, স্বাস্থ্যশিক্ষা, সংবাদ, মহিলাদের জন্য অনুষ্ঠান, বয়স্কদের জন্য অনুষ্ঠান, খেলাধূলার খবর, ছোটোদের জন্য অনুষ্ঠান ইত্যাদি। এই সকল অনুষ্ঠান বিভিন্ন বয়সের শ্রোতাদের আনন্দ জোগায়।

৬) বেতার কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, ধর্মান্ধতা প্রভৃতির বিরুদ্ধে জনমত গঠন করে জনগণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি জাগ্রত করে।

৭) অন্ধদের শিক্ষার ক্ষেত্রে বেতার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অন্ধজনেরা চোখে দেখতে পায় না। ফলে দর্শন নির্ভর মাধ্যমগুলোকে তারা শিক্ষার ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে পারে না। বেতার এই ক্ষেত্রে অন্ধদের বিশেষভাবে সহায়তা করে।

৮) বেতারের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং ওনাদের পরামর্শ শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে প্রচার করা হয়। কোন কোন সময় টেলিফোনের সাহায্যে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে শ্রোতাদের সরাসরি যোগাযোগের ব্যবস্থা করা হয়। ফলে জনগণ তাদের সমস্যার সমাধান করতে পেরে বিশেষভাবে উপকৃত হয়।

৯) বর্তমানে অতি ক্ষুদ্র আকারের বেতার যন্ত্র কিনতে পাওয়া যায় ফলে বহু মানুষ বেতার যন্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। বেতার শহরাঞ্চলের তুলনায় গ্রামাঞ্চলের মানুষের একঘেয়েমি দূর করে তাদের মধ্যে বৈচিত্র এনে দেয়।

বেতারের সীমাবদ্ধতা (Limitations of Radio) :

১) বেতার যেহেতু একটি শ্রুতিনির্ভর মাধ্যম তাই এর প্রতি বহু মানুষ আকৃষ্ট হয় না। আধুনিককালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতির ফলে মানুষের কাছে বিনোদনের অনেক মাধ্যম চলে এসেছে। তাই বেতারের জনপ্রিয়তা ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে।

২) বেতারে সম্প্রচারিত অধিকাংশ অনুষ্ঠান এক মুখী হয়। তাই অনুষ্ঠান সম্পর্কে শ্রোতাদের মনে প্রশ্ন জাগলেও তার উত্তর পাওয়া যায় না, ফলে মানসিক অতৃপ্তি থেকে যায়।

৩) বেতারে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান তুলনামূলকভাবে কম প্রচার করা হয়। বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান বেশি প্রচারিত হয় বলে শিক্ষার্থীরা এর দ্বারা উপকৃত হয় না।

৪) শ্রবণেন্দ্রিয়জনিত ত্রুটির কারণে বধির শিশুরা বেতারের দ্বারা উপকৃত হয় না। বেতার শ্রুতিনির্ভর মাধ্যম হওয়ার কারণে বধির শিশুরা বেতারে প্রচারিত অনুষ্ঠান উপভোগ করতে পারে না।

৫) প্রথাগত শিক্ষাক্ষেত্রে বেতার কর্মসূচির সঙ্গে বিদ্যালয় কর্মসূচির সামঞ্জস্য রক্ষা করা সম্ভব হয় না। অনেক সময় দেখা যায়, বেতারে যখন শিক্ষামূলক বিষয় সম্প্রচারিত হয়, তখন শিক্ষার্থী হয়তো বিদ্যালয়ে অথবা অন্য কাজে ব্যস্ত থাকে। তাই শিক্ষার্থীরা এই অনুষ্ঠান থেকে সহজেই বঞ্চিত হয়।

চলচ্চিত্র (Cinema) :

অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষার গণমাধ্যমগুলোর মধ্যে চলচ্চিত্র একটি শক্তিশালী মাধ্যম। এই গণমাধ্যম একদিকে যেমন শিক্ষার্থীদের আনন্দ দান করে তেমনি শিক্ষার কাজকে নানাদিক থেকে সহায়তা করে। এই মাধ্যমের মধ্য দিয়ে বহু মানুষের কাছে শিক্ষামূলক আদর্শকে নিয়ে যাওয়া যায়। তবে চলচ্চিত্রের যে নেতিবাচক দিকও রয়েছে সে সম্পর্কে অবশ্য সচেতন থাকা উচিত। এখানে চলচ্চিত্রের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক সম্পর্কে আলোচনা করা হল—

চলচ্চিত্রের শিক্ষামূলক ভূমিকা (Educational Role of Cinema) :

১) চলচ্চিত্রে শিক্ষার্থীর দর্শনেন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয় উভয়ই সক্রিয় থাকায় পরিবেশিত বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর সামগ্রিক জ্ঞান আহরণে সহায়তা করে এবং এর মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান দীর্ঘস্থায়ী হয়। এখানে ভাষা, শব্দ, গতি ও মাত্রার সার্থক সমন্বয় হয়।

২) চলচ্চিত্র খুব সহজেই সমাজের সকল স্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। এর জন্য উচ্চশিক্ষিত বা উচ্চবুদ্ধিসম্পন্ন হওয়ার প্রয়োজন হয় না।

৩) চলচ্চিত্র শিক্ষার্থীর জ্ঞান, বুদ্ধি, দক্ষতা, মনোভাব, বিচারক্ষমতা, চিন্তন ক্ষমতার বিকাশ ঘটায়। চলচ্চিত্রে যে ধরনের চরিত্র বা বিষয়বস্তু উপস্থাপিত করে সামাজিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয় সেগুলো শিক্ষার্থী বুদ্ধির দ্বারা বিচার বিশ্লেষণ করে গ্রহণ করে। ফলে জ্ঞানের ভাণ্ডার বৃদ্ধি হয়।

৪) চলচ্চিত্রে বিশেষ কোন সামাজিক রীতিনীতির প্রতি শিক্ষার্থীদের আদর্শ মনোভাব গড়ে তুলতে সাহায্য করে। চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক ঘটনা ও সমস্যাকে দেখানো হয়। ফলে শিক্ষার্থী বা জনগণ সমাজ সচেতন হয়।

৫) চলচ্চিত্র শিক্ষণীয় বিষয়ে শিক্ষার্থীকে আগ্রহী করে তোলে। চলচ্চিত্রের মাধ্যমে যে সকল তথ্য পরিবেশন করা হয় সেগুলো বাস্তবসম্মত হয় এবং প্রত্যক্ষ জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত থাকে। তাই এগুলোর দ্বারা শিক্ষার্থী সহজেই প্রভাবিত হয়।

৬) জনশিক্ষা প্রসারে শিক্ষামূলক চলচ্চিত্রগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সমাজের ছোটো বড়ো সকল বয়সের লোকের কাছে চলচ্চিত্র একটি জনপ্রিয় মাধ্যম। এখানে সকলের চাহিদা, রুচি ও পছন্দ অনুযায়ী বিষয়বস্তু পরিবেশন করা হয়। অনেক জটিল বিশেষধর্মী বিষয়কে শিক্ষামূলক চলচ্চিত্রের মাধ্যমে অনেক বেশি সহজ করে দেখানো হয়। বর্তমানে জনশিক্ষা প্রসার ও বয়স্ক শিক্ষার কর্মসূচিতে শিক্ষামূলক চলচ্চিত্রকে হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করা হয়।

৭) চলচ্চিত্র শিক্ষার উপযোগী এক আদর্শ পরিবেশ রচনায় সহায়তা করে। চলচ্চিত্র প্রদর্শনের জন্য যে পরিবেশ রচনা করা হয়, সেই পরিবেশে বিষয়বস্তুর প্রতি শিক্ষার্থীর মনোযোগ বৃদ্ধি পায়। ফলে শিক্ষার্থীরা উপস্থাপিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান আহরণ করতে পারে।

৮) শিক্ষামূলক চলচ্চিত্রে উপস্থাপিত শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে যদি শিক্ষার্থীর জ্ঞান অপূর্ণ থাকে সেই ক্ষেত্রে পরিবেশিত বিষয়বস্তু পুন:পুন: উপস্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অসম্পূর্ণ অভিজ্ঞতাকে পূর্ণতার স্তরে নিয়ে যাওয়া হয়।

৯) চলচ্চিত্র জনগণের মধ্যে এক বিশেষ ধরনের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এই প্রতিক্রিয়া জনমত গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের উপর নির্মিত চলচ্চিত্র জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রেরণা যোগায়। অর্থাৎ চলচ্চিত্র শিক্ষার বহুমুখী উদ্দেশ্যসাধনে সহায়তা করে।

চলচ্চিত্রের সীমাবদ্ধতা (Limitation of Cinema) :

চলচ্চিত্র অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করলেও এর অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। চলচ্চিত্রের সীমাবদ্ধতাগুলো নিম্নে আলোচনা করা হল—

১) চলচ্চিত্র অল্পবয়সী শিক্ষার্থীদের উপর বিশেষভাবে প্রভাব ফেলে। চলচ্চিত্রে কখনো কখনো এমন কিছু দৃশ্য দেখানো হয় যেগুলোর বাস্তবতা প্রায় থাকে না বললেই চলে। আর অপরিণত শিক্ষার্থীরা সেইসব ঘটনা বা চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাকে নকল করতে গিয়ে অঘটনের শিকার হয়।

২) চলচ্চিত্রের প্রদর্শিত বিভিন্ন ঘটনার প্রভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নানা ধরনের কু-অভ্যাস ও সমস্যামূলক আচরণ গড়ে ওঠার অবকাশ থেকে যায়। বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষার্থে চলচ্চিত্রে কখনো কখনো কিছু অশ্লীল দৃশ্য, সংলাপ, উদ্ভট সব বিষয় বা অলৌকিক ঘটনা দেখানো হয় যার ফলে শিক্ষার্থীদের রুচি-বিকার ঘটে।

৩) অনেক শিক্ষার্থী চলচ্চিত্র দেখার পর সে তার মানসিক ক্ষমতা অনুযায়ী বিষয়বস্তু সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করে এবং সেই ভুল ধারণা সংশোধন করে দেওয়ার মতো ক্ষমতা চলচ্চিত্রের নেই।

৪) চিত্ত বিনোদনের জন্য চলচ্চিত্র নির্মাতারা বিভিন্ন ঘটনা যেমন, হিংসা, খুন, হিংস্রতা, যৌনতা ইত্যাদি তুলে ধরে যা সমাজে বিতর্কের সৃষ্টি করে । সমাজকে ভুল পথে পরিচালিত করে। চলচ্চিত্র দেখে শিক্ষার্থীরা অনেক সময় সমাজ সম্পর্কে বিরূপ মতাদর্শ গড়ে তোলে।

৫) বাণিজ্যিক ভিত্তিতে যে সমস্ত চলচ্চিত্র তৈরি হয় সেগুলোর শিক্ষাগত উদ্দেশ্য খুবই কম।

দূরদর্শন (Television) :

অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষাব্যবস্থায় দূরদর্শনের ভূমিকা সুদূর প্রসারী। বর্তমানে দূরদর্শন একটি শক্তিশালী ও জনপ্রিয় মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানে শিক্ষার্থীর দর্শনেন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয় উভয়ই সক্রিয় থাকায় শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রেষণার সঞ্চার হয়। ভারতে প্রথম ১৯৬১ সালে দিল্লির একটি বিদ্যালয়ে প্রথম শিক্ষার ক্ষেত্রে দূরদর্শনের ব্যবহার শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে ১৯৮২সালে ইনস্যাট্ উপগ্রহের মাধ্যমে বিশেষভাবে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানসূচী সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দূরদর্শনে সম্প্রচারিত বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন খেলাধূলা, বিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান, চিকিৎসা-বিদ্যা, শিক্ষামূলক কার্যক্রম, ব্যবসায়িক ও বিনোদনমূলক কার্যক্রম প্রভৃতি মানুষের জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। দূরর্শনের শিক্ষামূলক ভূমিকাগুলো হল—

১) দূরদর্শনে সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানগুলো বাস্তবজীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয় । ফলে জনগণ সেগুলোর প্রতি আকৃষ্ট হয়। দূরদর্শনে প্রচারিত নাটক, গানবাজনা, সিরিয়াল, আলোচনাচক্র, খবর ইত্যাদি থেকে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন তথ্য পায় এবং সেগুলো থেকে বিভিন্ন জ্ঞান লাভ করে থাকে।

২) জনমত গঠনের ক্ষেত্রে দূরদর্শন এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। সামাজিক, রাজনৈতিক বিভিন্ন

বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা এবং বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের মতামত জনগণের সামনে তুলে ধরে ফলে সাধারণ মানুষ উপকৃত হয়।

৩) শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রেও দূরদর্শন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সঙ্গে তথ্য আদান প্রদান করা হচ্ছে। প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষাস্তর থেকে শুরু করে উচ্চ-শিক্ষাস্তর পর্যন্ত শিক্ষাদানের জন্য টেলিভিশন স্যাটেলাইটের ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়াও দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিভিন্ন শিক্ষামূলক কর্মসূচি, বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচি প্রভৃতি দূরদর্শনের মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে।

৪) দূরদর্শন শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সাক্ষর-নিরক্ষর সকলের কাছে একটি গ্রহণযোগ্য মাধ্যম। প্রতিবন্ধী শিশুদের কাছেও দূরদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণ বিশেষ সুবিধাজনক। জনশিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে, স্বাস্থ্য সচেতনতার ক্ষেত্রে, পরিবেশসংক্রান্ত নানা তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে দূরদর্শন বিশেষ কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে।

৫) জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে দূরদর্শনের ভূমিকা বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। পৃথিবীর নতুন নতুন আবিষ্কার, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতি, বিভিন্ন দেশে কৃষি, শিল্প, কারিগরি শিক্ষা, সাহিত্য বা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কিরকম সাফল্য ঘটছে, তার সংবাদ ও প্রতিচ্ছবি ঘরে ঘরে পৌঁছে দিচ্ছে দূরদর্শন। আর এই আধুনিকতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে জনগণের জীবনযাত্রাও আধুনিক হচ্ছে।

৬) দূরদর্শনের মাধ্যমে অল্পব্যয়ে বহু শিক্ষার্থীকে একসঙ্গে গুণগত মানের শিক্ষা দেওয়া যায়। নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচি অনুযায়ী অভিজ্ঞ শিক্ষক শিক্ষিকার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। বর্তমানে ইউ জি সি (University Grants Commission), এন সি ই আর টি (National Council of Education and Research & Training), ইগনৌ (Indra Gandhi National Open University) , এন আই ও এস (National Institute of Open Schooling) বিভিন্ন শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান দূরদর্শনের মাধ্যমে প্রচার করছে।

৭) দূরদর্শনে কোনো কোনো বিষয় ঘটমান অবস্থায় প্রদর্শিত হয। যেমন- বিশ্বকাপ ক্রিকেট, বিশ্বকাপ ফুটবল, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, লোকসভা, বিধানসভার অধিবেশন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি ঘটনা ঘটমান অবস্থায় জনগণের কাছে দূরদর্শনের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। জনসাধারণ এগুলো দেখে ও শুনে বাস্তবসম্মত জ্ঞান লাভ করে।

৮) দূরদর্শনের মাধ্যমে কোনো বিষয়কে চিত্র, ধ্বনি, আলো প্রভৃতির সংমিশ্রণে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে তোলা হয় বলে বিষয়গুলো শিক্ষার্থীদের কাছে সহজে বোধগম্য হয়।

দূরদর্শনের সীমাবদ্ধতা (Limitations of Television) :

বর্তমান সমাজজীবনে দূরদর্শন একটি গুরুত্বপূর্ণ গণমাধ্যম সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অনেক সময় দূরদর্শন শিক্ষার্থীদের মনে বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি করতে পারে। দূরদর্শনের সীমাবদ্ধতাগুলো নিম্নরূপ -

১) দূরদর্শন ব্যয়সাপেক্ষ মাধ্যম যেহেতু ভারতবর্ষের অনেক মানুষ এখনও দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করে তাই সকল শ্রেণির জনগণের পক্ষে তা ক্রয় করা সম্ভব নয়। তাই দূরদর্শন সমাজের সকল শ্রেণির লোকের উপকারে আসে না।

২) দূরদর্শনে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান তুলনামূলকভাবে কম প্রচারিত হয়। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে যে সমস্ত অনুষ্ঠান দেখানো হয় তার পেছনে কোন নির্দিষ্ট শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য থাকে না। এর প্রভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নানারকম

কু-অভ্যাস গড়ে উঠে। যা শিক্ষার্থীদের আসল উদ্দেশ্যে বাধার সৃষ্টি করে।

৩) দূরদর্শনে প্রচারিত কিছু অনুষ্ঠান দ্বিমুখী হলেও প্রায় সমস্ত অনুষ্ঠানকে আজও দ্বিমুখী করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এই কারণে দূরদর্শনে প্রচারিত বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর মনে কোনো প্রশ্ন জাগলে তার সঠিক উত্তর পাওয়া যায় না।

৪) দূরদর্শনে প্রচারিত তথ্যে ত্রুটি থাকলে তার ফল ভালো হয় না। বর্তমানে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে অনেক সময় ত্রুটিপূর্ণ তথ্য পরিবেশিত হয়, এর ফলে জনমানসে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

৫) দূরদর্শনে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর পুন: প্রচার সম্ভব হয় না।

কম্পিউটার (Computer) :

বর্তমানে মনোবৈজ্ঞানিক নীতির প্রভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের শিখন সহায়ক মাধ্যম বা উপকরণ ব্যবহার করা হচ্ছে। সেগুলো মনোবিদ্যাসম্মতভাবে শিক্ষার্থীদের কাছে বিষয়বস্তু উপস্থাপনে সহায়তা করে। চলচ্চিত্র, বেতার, দূরদর্শন ইত্যাদিকে আমরা অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করি। বর্তমানে এইসব উপকরণের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কম্পিউটার। কম্পিউটার শিক্ষার ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। কম্পিউটার হল একটি তথ্যসমৃদ্ধ স্মৃতিভাণ্ডার। বর্তমানে দুধরনের কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়, যেমন (ক) অ্যানালগ কম্পিউটার (Analog Computer) (খ) ডিজিটাল কম্পিউটার (Digital computer) শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রেষণা সঞ্চারের জন্য ও ভবিষ্যত জীবনের পথ সুগম করে তোলার জন্য বিভিন্ন কম্পিউটার সূচী গ্রহন করা হয়েছে। যেমন কম্পিউটার সহযোগী শিক্ষণ (Computer Assisted Instruction : CAI), কম্পিউটার সহযোগী শিখন (Computer Assisted Learning :CAL), কম্পিউটার পরিচালিত শিক্ষণ (Computer Managed Instruction : CMI), কম্পিউটার ভিত্তিক শিক্ষা (Computer Based Education : CBE) । কম্পিউটারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের বহুমুখী চাহিদা পূরণ করতে পারে। শিক্ষাক্ষেত্রে কম্পিউটার ব্যবহারের সুবিধাগুলো আলোচনা করা হল —

১) কম্পিউটার ভিত্তিক শিক্ষা শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিখন অভিমুখী প্রেষণা সঞ্চারে সহায়তা করে। কম্পিউটারের মাধ্যমে শিক্ষার্থী তার নিজের অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে পারে যা তাকে পরবর্তী কাজের জন্য প্রেষণা জোগায়।

২) কম্পিউটার ভিত্তিক শিক্ষা পুন:শিখন বা বারবার অনুশীলনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে সহায়তা করে। অনুশীলনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষার্থীরা তাদের চাহিদা অনুযায়ী কম্পিউটারে সমস্যা সৃষ্টি করে অনুশীলন করতে পারে।

৩) কম্পিউটার ভিত্তিক শিক্ষা সক্রিয়তা নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, কম্পিউটারে কাজ করার সময় শিক্ষার্থীকে সর্বদা সক্রিয় থাকতে হয়। সমস্যার সমাধান করার জন্য তথ্য সরবরাহ, তথ্য আদান প্রদান ও ফলাফল শিক্ষার্থীকে সবসময় সক্রিয় রাখে।

৪) শিক্ষার্থীরা কম্পিউটারের মাধ্যমে বাস্তব ও জটিল সমস্যার সমাধান করতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় তাদের মেধাশক্তি ও দক্ষতা উভয়ই বৃদ্ধি পায়।

৫) কম্পিউটার ভিত্তিক শিক্ষা শিক্ষার্থীদের সৃজনী প্রতিভার বিকাশ ঘটায়।

৬) কম্পিউটার শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজে বিশেষভাবে সহায়তা করে। যেমন প্রশ্নপত্র রচনা, মূল্যায়ণ,

পাঠ্যক্রম রচনা, শিক্ষামূলক গবেষণা, শিক্ষামূলক পরিকল্পনা রচনা ইত্যাদি কাজ করে শিক্ষার কাজকে সহজকরে দেয়।

৭) কম্পিউটার শিক্ষার্থীর বহুমুখী চাহিদা পূরণে সহায়তা করে। একদিকে তারা কম্পিউটার ব্যবহার করে সমগ্র বিশ্ব ও জীবন-জীবিকার সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে জানতে পারে অন্যদিকে ইন্টারনেট ও ই-মেল এর সাহায্যে নানারকম তথ্য আদান প্রদান করতে পারে।

কম্পিউটার ভিত্তিক শিক্ষার সীমাবদ্ধতা (Limitation of Computer) :

শিক্ষাক্ষেত্রে কম্পিউটারের ব্যবহার ক্রমশই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যার প্রয়োগ স্বাচ্ছন্দ্য আনলেও সেগুলো মানুষকে কখনই নিশ্চিত করতে পারেনি। কম্পিউটার ভিত্তিক শিক্ষণের বহু সুবিধা থাকলেও এর অনেক অসুবিধাও পরিলক্ষিত হয়। এই শিক্ষার প্রধান সীমাবদ্ধতাগুলো হল —

১) শিক্ষার সঙ্গে মানবীয় সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। শিখনের ক্ষেত্রে পিতামাতা, শিক্ষক-শিক্ষিকা, ও অন্যান্য শিক্ষাদাতাদের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের যে মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠে, কম্পিউটারের সান্নিধ্যে তা গড়ে ওঠে না।

২) কম্পিউটার শিক্ষার্থীর মধ্যে যান্ত্রিক মানসিকতার সঞ্চার ঘটায়। পরিবারে পিতা,মাতা ও অন্যান্য বয়স্ক ব্যক্তিরা অথবা বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকারা কোন নীরস বিষয়বস্তুকে সরস করে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান করতে পারে যেহেতু কম্পিউটার একটি যন্ত্র, তার এই যান্ত্রিক কলাকৌশল শিক্ষার্থীর অন্তরকে স্পর্শ করতে পারে না।

৩) কম্পিউটার একটি ব্যয়সাপেক্ষ মাধ্যম। এর ব্যয় বহুলতার জন্য অনেক অভিভাবকের পক্ষে শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যক্তিগত কম্পিউটার কিনে শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। আর অন্যদিকে সমস্ত বিদ্যালয়গুলোতে উপযুক্ত সংখ্যক কম্পিউটারের ব্যবস্থা করা সরকারের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

৪) বর্তমানে কম্পিউটারে ইন্টারনেট ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা যেমন বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয়ে জ্ঞানলাভ করতে পারছে আবার অন্যদিকে ইন্টারনেটের ক্ষতিকারক দিকগুলোও শিক্ষার্থীর উপর প্রভাব বিস্তার করছে। আজকাল ছেলেমেয়েরা কম্পিউটারে ইন্টারনেট ব্যবহার করে বিভিন্ন সাইবার অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে যার থেকে মুক্তি পাওয়া অনেক সময় তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠে না।

তৃতীয় একক নিয়ম বহির্ভূত শিক্ষা ও তার সংস্থা

নিয়মবহির্ভূত বা প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা (Non-formal Education) :

আদিম সমাজে মানুষের জীবনের যাত্রাপথ ছিল সহজ ও সরল। জীবন ছিল অনাড়ম্বর। শিক্ষার লক্ষ্য ছিল অন্ন বস্ত্র ও বাসস্থানের মতো কিছু মৌলিক চাহিদার নিবৃত্তিসাধন। তখন অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষাই ছিল শিক্ষার একমাত্র হাতিয়ার। তারপর যখন সমাজজীবন জটিল থেকে জটিলতর হল, অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা মানুষের চাহিদা মেটাতে অক্ষম হল তখন নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা বা প্রথাবদ্ধ শিক্ষার প্রয়োজন হয়। কিন্তু নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার নিয়ম কানুন ও অন্যান্য সীমাবদ্ধতার কারণে সমাজের সকল স্তরের মানুষের শিক্ষার ব্যবস্থা করা এর পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ল। এমতাবস্থায় নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার নিয়ম কানুনকে কিছুটা শিথিল করে এক নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠে শিক্ষাবিজ্ঞানীরা যার নাম দিয়েছেন নিয়মবহির্ভূত শিক্ষা বা প্রথামুক্ত শিক্ষা । এই শিক্ষা অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষার মত সহজ সরল নয়, আবার নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার মত নিয়ম শৃঙ্খলেও আবদ্ধ নয়। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ জয়ন্ত পান্ডুরঙ্গা নায়েক এর মতে 'প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা হল, নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষার বাইরে গিয়ে সুপরিকল্পিত শিক্ষার প্রচলন করা।' (Non-formal education differs from formal education in the sense that it takes place outside the formal school system. It also differs from incidental education in that it is organised (Which incidental education is not.)'

প্রথা-বহির্ভূত শিক্ষার উদ্দেশ্য (Objectives of Non-formal Education):

১) সমাজের যে সব ব্যক্তিরা কোন কারণে প্রথাগত শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করতে পারছে না। তাদের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করাই হল প্রথামুক্ত শিক্ষার উদ্দেশ্য।

২) প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষালাভের পরও মানুষের মধ্যে শিক্ষার চাহিদা থাকে। তার সেই চাহিদাকে পরিতৃপ্ত করা প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার উদ্দেশ্য।

৩) বিভিন্ন বৃত্তি ও পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিরা যাতে তাদের পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করে সামাজিক উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারে, সে বিষয়ে উপযুক্ত সুযোগ সৃষ্টি করা প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার উদ্দেশ্য।

৪) প্রত্যেক ব্যক্তি যাতে তার নিজের জ্ঞানের পরিসরকে নিয়মিতভাবে বিস্তৃত করতে পারে এবং আধুনিক জ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে সে বিষয়ে সহায়তা করা প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার উদ্দেশ্য।

প্রথা-বহির্ভূত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা (Need of Non-formal Education) :

১) প্রথাগত শিক্ষার সীমাবদ্ধতার দরুন সকলে ওই শিক্ষাব্যবস্থায় বিদ্যার্জন করার সুযোগ পায় না। তাই সেই সকল স্তরের মানুষগুলোর চাহিদা পূরণের জন্য প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার প্রয়োজন আছে।

২) বর্তমানে চাহিদার তুলনায় প্রথাগত শিক্ষালয়ের সংখ্যা কম। আবার সকলে প্রথাগত শিক্ষালয়ে ভর্তির সুযোগও পায় না। তাই ওই স্তরের শিক্ষার্থীদের চাহিদা মেটাতে প্রথা-বহির্ভূত শিক্ষার প্রয়োজন আছে।

৩) যারা অন্ন, বস্ত্র সহ বিভিন্ন মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত তারা প্রথাগত শিক্ষালাভ করার সুযোগ পায় না। কিন্তু তাদের কর্মক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির জন্য ডিগ্রি বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়।

এক্ষেত্রে প্রথা-বহির্ভূত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

৪) বর্তমানে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় নিয়ন্ত্রিত শিক্ষালয়গুলোর ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হয়েছে। ওই চাপ হ্রাসের জন্য প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার প্রয়োজন আছে।

৫) প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেখানে স্কুল কলেজের মাধ্যমে বিদ্যার্জনের সুযোগ কম সেখানে প্রথামুক্ত শিক্ষার প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

প্রথা-বহির্ভূত শিক্ষার পরিধি (Scope of Non-formal Education) :

প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা এমন একটি ব্যাপক ধারণা যে তাকে খুব সীমিত ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। এই শিক্ষা ব্যবস্থার গুরুত্ব প্রথাগত শিক্ষা ব্যবস্থার তুলনায় কোন অংশে কম নয়। উন্নত এবং উন্নয়নশীল উভয় শ্রেণির রাষ্ট্রের জন্য এই শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন একান্ত কাম্য একথা পৃথিবীর সব দেশের শিক্ষা বিশেষজ্ঞরা স্বীকার করেছেন। যেহেতু প্রথাগত শিক্ষা সমাজের সার্বিক উন্নয়নে সকল দিক থেকে সহায়তা করতে পারে না তাই প্রথা-বহির্ভূত শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তির চাহিদাগুলোকে পরিতৃপ্ত করে তার শিক্ষা প্রচেষ্টাকে চলমান রাখতে হবে। ভারতে নাগরিকদের বর্তমান ও ভবিষ্যত শিক্ষার চাহিদার কথা বিবেচনা করে কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পর্যদ (CABE) প্রথামুক্ত শিক্ষার একটি কর্মসূচির প্রস্তাব করেছে। যেমন ৬-১৬ বছর বয়সের ছেলেমেয়েরা যারা প্রথাগত শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি, তাদের জন্য শিক্ষার কর্মসূচি, ১৫ থেকে ২৫ বছর বয়সের নিরক্ষর ব্যক্তিদের শিক্ষার কর্মসূচি, গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন বৃত্তিতে নিযুক্ত বয়স্কদের শিক্ষার কর্মসূচি, বিভিন্ন শিল্পসংস্থায় নিযুক্ত কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি সূচক কর্মসূচি, বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নিযুক্ত ব্যক্তিদের শিক্ষামূলক ও পেশামূলক উন্নতি সহায়ক কর্মসূচি ইত্যাদি। এই কর্মসূচিগুলো সামগ্রিকভাবে বিচার করলে দেখা যায়, এর দ্বারা সমাজের যে কোন ব্যক্তিকে বিধিমুক্ত শিক্ষার মধ্যে আনা সম্ভব। তবে প্রসঙ্গক্রমে স্মরণ রাখার দরকার কেবলমাত্র নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার দ্বারা যেমন জীবনব্যাপী শিক্ষার চাহিদা মেটানো যায়না, তেমনি নিয়মবহির্ভূত শিক্ষার দ্বারাও শিক্ষার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করা সম্ভব নয়। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সুগঠিত করতে হলে এই দুই ব্যবস্থার সার্থক সমন্বয় প্রয়োজন।

প্রথা-বহির্ভূত শিক্ষার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Non-formal Education) :

১) যে সকল শিক্ষার্থী প্রথাগত শিক্ষালাভের সুগেযাগ পায় না বা অর্থনৈতিক বা অন্য কোন কারণে প্রথাগত শিক্ষা চলাকালীন পড়া ছেড়ে দেয়, প্রথা -বহির্ভূত শিক্ষা পরবর্তী সময়ে তাদের শিক্ষার মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করে।

২) বর্তমানে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চাহিদাও বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রমভিত্তিক শিক্ষালাভ করতে বাধ্য হয়। প্রথা-বহির্ভূত শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়েরই চাহিদা পরিতৃপ্ত হয় এবং বিষয় সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে পারে।

৩) প্রথা-বহির্ভূত শিক্ষার সময়কাল জীবনব্যাপী। এই শিক্ষায় প্রবেশের ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট বয়সসীমা থাকে না। যে কোন বয়সের শিক্ষার্থী এতে অংশ নিতে পারে।

৪) প্রথা-বহির্ভূত শিক্ষায় আর্থিক ব্যয় তুলনামূলকভাবে কম হয়। এখানে শিক্ষার দায়িত্ব শিক্ষালয় ছাড়াও অন্যান্য সামাজিক সংস্থা বহন করে।

৫) প্রথা-বহির্ভূত শিক্ষায় শিক্ষণ পদ্ধতি কোন ধরাবাঁধা নিয়মের অধীন নয়। শিক্ষার্থীর নিজস্ব জীবন অভিজ্ঞতাগুলোর পূনর্বিন্যাসের প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে শিক্ষণ পদ্ধতি পরিচালিত হয়।

৬) প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার পাঠ্যক্রম অনেক বেশি নমনীয় থাকে। এখানে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর নিজস্ব চাহিদা এবং স্বাতন্ত্র্যকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়।

৭) পেশাগত যোগ্যতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নিয়ম-বহির্ভূত বা প্রথা-বহির্ভূত শিক্ষা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিক্ষকতা ও অন্যান্য পেশায় অনেক ক্ষেত্রে যোগ্যতা বৃদ্ধির প্রয়োজন হয় তখন তারা তাদের প্রয়োজন মেটাতে প্রথা-বহির্ভূত শিক্ষার স্মরণাপন্ন হয়।

নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা, অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা ও নিয়মবহির্ভূত শিক্ষার তুলনামূলক আলোচনা
(Difference between Formal, Informal and Non-formal Education) :

নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা	অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা	নিয়মবহির্ভূত শিক্ষা
১) নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা হল এমন এক শিক্ষাব্যবস্থা যেখানে পূর্ব নির্ধারিত নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রমকে অনুসরণ করে শ্রেণিকক্ষে নিয়মিতভাবে বা ধারাবাহিক ভাবে ছাত্র-শিক্ষক মুখোমুখি হয়।	১) সমাজজীবনে বাঁচতে গিয়ে প্রত্যক্ষ অনুশীলনের মাধ্যমে ব্যক্তি যে বাস্তব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করে তাকে অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা বলে।	১) নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার বাইরে সুপরিকল্পিতভাবে যে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন করা হয়, তাকে নিয়মবহির্ভূত শিক্ষা বা প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা বলা হয়।
২) নিয়ন্ত্রিত বা প্রথাগত শিক্ষার প্রতিষ্ঠান হল বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি।	২) অনিয়ন্ত্রিত বা অপ্রথাগত শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলো হল পরিবার, ক্লাব, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম ইত্যাদি।	২) এই শিক্ষাব্যবস্থায় নির্দিষ্ট কোন প্রতিষ্ঠান থাকে না। এক্ষেত্রে মুক্ত বিদ্যালয়, নৈশ বিদ্যালয়, দূরশিক্ষা ইত্যাদি শিক্ষার দায়িত্ব নেয়।
৩) নিয়ন্ত্রিত শিক্ষায় বয়সকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। জীবনের একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এই শিক্ষা ব্যবস্থা চলে।	৩) অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষার বয়স সীমার কোন প্রসঙ্গ থাকে না। সারাজীবন ধরেই এই শিক্ষা চলতে থাকে।	৩) এই শিক্ষায় বয়সের কোন বাধ্যবাধকতা নেই। যে কোন ব্যক্তি যে কোনো বয়সে এই শিক্ষায় প্রবেশ করতে পারে।
৪) নিয়ন্ত্রিত শিক্ষায় একটি নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম, পাঠ্যসূচি সামনে রেখে শিক্ষা প্রক্রিয়া চলে।	৪) এই শিক্ষা ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট কোন পাঠ্যক্রম থাকে না। জীবনের প্রয়োজনে ব্যক্তি যা কিছু শেখে সবই তার পাঠ্যক্রম।	৪) এই শিক্ষায় বিভিন্ন ধরনের পাঠ্যক্রম থাকে। শিক্ষার্থী তার ব্যক্তিগত চাহিদা, মানসিক চাহিদা অনুযায়ী পাঠ্যক্রম নির্বাচন করে থাকে।
৫) নিয়ন্ত্রিত শিক্ষায় প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়।	৫) এই শিক্ষায় অর্থের খুব বেশি প্রয়োজন নেই, সক্রিয় প্রচেষ্টাই মুখ্য।	৫) এই শিক্ষায় প্রথাগত শিক্ষার তুলনায় অর্থের প্রয়োজন অনেক কম।

৬) এই শিক্ষাব্যবস্থায় পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর গুণগত মান বিচার করা হয়। অর্থাৎ এই শিক্ষায় মূল্যায়ন প্রক্রিয়া আবশ্যক।	৬) এখানে পরীক্ষার কোন ব্যাপার নেই।	৬) নিয়ম বহির্ভূত শিক্ষা ব্যবস্থাতে মূল্যায়ন আছে কিন্তু তা প্রথাগত শিক্ষার মত আবশ্যক নয়।
৭) নিয়ন্ত্রিত শিক্ষায় শিক্ষাকে মূর্ত করে তোলার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা, পদ্ধতি ও উপকরণের সাহায্য নেওয়া হয়।	৭) অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষায় শিক্ষার্থী সর্বদা পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান, উপকরণ ঘটনা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে থাকে।	৭) এখানে শিক্ষার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোন শিক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় না।
৮) এই শিক্ষায় শিক্ষার্থী, শিক্ষক সকলে সচেতন থাকে।	৮) এই শিক্ষায় শিক্ষার্থী সচেতন থাকে না। মনের অজান্তেই অনুকরণ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থী শিক্ষাগ্রহণ করে।	৮) নিয়ম বর্হির্ভূত শিক্ষায় সচেতনতার বিশেষ প্রয়োজন হয় না।
৯) আধুনিক জটিল সমাজে প্রতিযোগিতামূলক জীবন যাপনে নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা একান্ত জরুরি।	৯) এই শিক্ষার মধ্য দিয়ে সাধারণ জ্ঞান ও কৌশল আয়ত্ত করা যায়।	৯) এই শিক্ষার মধ্য দিয়ে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ উপকৃত হয়।

চতুর্থ একক

দূরাগত শিক্ষা ও মুক্ত শিক্ষা, জাতীয় মুক্ত বিদ্যালয় ও মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

দূরাগত শিক্ষা (Distance Education) :

উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ যেগুলোতে দূরাগত শিক্ষার সূচনা হয়। কালক্রমে সারা বিশ্বে দূরাগত শিক্ষা বিস্তার লাভ করে এবং ভারতবর্ষেও তার প্রভাব পড়ে। ১৯৬২ সালে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় ডাক যোগে শিক্ষার সূচনা করে ভারতের ইতিহাসে উজ্জ্বল উদাহরণ স্থাপন করে। বর্তমানে আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, সিকিম মনিপাল বিশ্ববিদ্যালয়, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং আরোও অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে দূরাগত শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। দূরাগত শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দূর শিক্ষার কোর্সগুলোর তত্বাবধান, তাদের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন প্রভৃতির জন্য একটি সর্বোচ্চ সংস্থার প্রয়োজন দেখা দেয়। Distance Education Council (DEC) এই চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে ১৯৮৫ সালে দিল্লিতে Indira Gandhi National Open University স্থাপন করে। এতে দূরশিক্ষার সমস্যা সমাধান ও পরিচালনগত কাজ অনেক সহজ হয়।

দূরাগত শিক্ষার ধারণা (Concept of Distance Education) :

প্রথা বহির্ভূত শিক্ষার ক্ষেত্রে দূরাগত শিক্ষা হল এক বিশেষ ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং এর গুরুত্ব অপরিসীম। ভারতবর্ষ একটি বিশাল জনবহুল দেশ হওয়ার কারণে প্রথাগত শিক্ষার আঙ্গিনায় সকল মানুষের শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু শিক্ষা সকল মানুষেরই এক আবশ্যকীয় চাহিদা। তাই এত বিপুল পরিমাণ ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার চাহিদা মেটাতে দূরাগত শিক্ষার জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়ছে। দূরাগত শিক্ষাকে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন অধ্যাপক হোলমবার্গ (Holmberg, 1981) দূরাগত শিক্ষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, “The various form of study at all level which are not under the continuous, immediate, supervision of tutors present with their students in lecture rooms or on the same ..., but which, nevetheless, benefit from the planning, guidance and tution of a tutorial organization.” অর্থাৎ সকল স্তরের নানা ধরনের পঠন পাঠন যাতে ধারাবাহিক এবং তাৎক্ষণিকভাবে শিক্ষকের দ্বারা শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা থাকে না — কিন্তু যাতে কোন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে পরিকল্পনা, নির্দেশনা এবং প্রশিক্ষণ নেওয়ার সুযোগ থাকে তাকে দূরাগত শিক্ষা বলে।

ডেভিড বাটস্ (Devid Butts) দূরাগত শিক্ষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন — দূরাগত শিক্ষা হল সেই জাতীয় শিক্ষা যাতে শিক্ষার্থীদের নিজস্বতা ও নমনীয়তার সুযোগ দেওয়া হয়, যাতে তারা নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী এবং সময় অনুযায়ী পঠন পাঠন সম্পন্ন করে নিজেদের শিক্ষিত করে তোলে।

আলোচ্য সংজ্ঞাগুলোকে বিশ্লেষণ করে দূরাগত শিক্ষার ধারণাটি নিম্নলিখিতভাবে ব্যক্ত করা যায় —

১) দূরাগত শিক্ষা হল প্রথা-বহির্ভূত শিক্ষার এক আধুনিক রূপ।
২) এ শিক্ষা দূর থেকে প্রাপ্ত, এখানে শিক্ষকের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি থাকে না।
৩) এটি মুক্ত শিক্ষা যেখানে প্রবেশের ক্ষেত্রে কোন বাধা নেই এবং শিক্ষার্থী তার নিজের পছন্দ অনুযায়ী শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।
৪) এই শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিন মাধ্যমকে ব্যবহার করে অতি স্বল্প সময়ে, স্বল্প খরচে শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। অর্থাৎ বলা যায়, দূরাগত শিক্ষা হল এমন শিক্ষা ব্যবস্থা যেখানে শিক্ষার্থীরা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে না গিয়ে, শিক্ষকের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ ছাড়া, ডাক যোগে বা বিভিন্ন প্রযুক্তিগত কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করে থাকে।

আরও বলা যায়, এই শিক্ষা হল নিয়মানুগ, সুসংবদ্ধ স্বশিক্ষা প্রণালী যাতে শিক্ষার্থীদের কাছে শিখনের বস্তু সামগ্রী উপস্থাপিত করা হয় এবং শিক্ষকের অপ্রত্যক্ষ দায়িত্বে পরিদর্শকের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সাফল্য অর্জন করে। আরও ব্যাপক ভাবনায় বলা যায়, যে শিক্ষায় শিক্ষকের ধারাবাহিক ও প্রত্যক্ষ তত্বাবধান দ্বারা শিক্ষণ ক্রিয়া হয় না, বিশেষ শিক্ষণ সংস্থার পরিকল্পনা ও নির্দেশনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পেয়ে থাকে তাই দূরাগত শিক্ষা।

দূরাগত শিক্ষার উদ্দেশ্যাবলি (Objectives of Distance Education) :

১) যে সব শিক্ষার্থী নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা থেকে কোন কারণে বঞ্চিত হয়েছে, সেইসব শিক্ষার্থীদের শিক্ষামূলক চাহিদা পূরণ করা দূরাগত শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য।
২) দূরাগত শিক্ষার অপর একটি উদ্দেশ্য হল বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষাকে সমস্ত শিক্ষার্থীর কাছে পৌঁছে দেওয়া।
৩) যেসব নাগরিক বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত থাকে তাদের কাছে শিক্ষা পৌঁছে দেওয়া এবং বিজ্ঞান প্রযুক্তির অত্যাধুনিক আবিষ্কৃত বিষয় অবসর সময়ে পাঠ করে তাদের জ্ঞান দক্ষতা বৃদ্ধি করা দূরাগত শিক্ষার উদ্দেশ্য।
৪) বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা উন্নয়নে সহায়তা করাও দূরাগত শিক্ষার উদ্দেশ্য।
৫) বিভিন্ন ধরনের বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে নির্দেশনা দানে সাহায্য করা দূরাগত শিক্ষার উদ্দেশ্য।
৬) এই শিক্ষার আরেকটি উদ্দেশ্য হল নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা থেকে চাপ কমানোর ব্যবস্থা করা।
৭) দূরাগত শিক্ষার আরেকটি উদ্দেশ্য হল এই শিক্ষার দ্বারা ইংরেজি মাধ্যমের পাশাপাশি বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা। ফলে বহু শিক্ষার্থী মাতৃভাষায় উচ্চ শিক্ষালাভ করতে পারে।
৮) এই শিক্ষার উদ্দেশ্য হল নিয়মিত বিদ্যালয়ে পাঠ্য গ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পাঠ গ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের পার্থক্য কমিয়ে আনা।
৯) দূরাগত শিক্ষার উদ্দেশ্য হল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজকর্মকে শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা।
১০) দূরাগত শিক্ষার আরেকটি উদ্দেশ্য হল স্বল্প খরচে আগ্রহী শিক্ষার্থীর কাছে শিক্ষা ব্যবস্থা পৌঁছে দেওয়া।

দূরাগত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা (Need of Distance Education) :

দূরাগত শিক্ষা প্রকৃতিগত দিক থেকে গণতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক এই উভয় ভাবধারার সমন্বয়। এই শিক্ষাধারা শিক্ষামূলক সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে সমতা আনে। কারণ এই সময়টি হল সবার জন্য শিক্ষার যুগ। ভারতের মত জনবহুল দেশে বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এত বিপুল সংখ্যক ছাত্র ভর্তি করাতে পারছে না। ফলে উচ্চশিক্ষিত মানুষের অপ্রতুলতার কারণে জাতীয় অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রথাগত শিক্ষার পরিপূরক হিসাবে দূরাগত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

যে সমস্ত ব্যক্তি নিজেদের কার্যকারিতার ও উদ্যমের সাথে তাদের ইচ্ছামত শিক্ষার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে চায় তাদের জন্য দূর শিক্ষা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। কারণ এখানে স্বশিক্ষা কোর্স এবং ডাক যোগে শিক্ষার যথাযথ ব্যবস্থা আছে। এই শিক্ষা নবসাক্ষর ব্যক্তিদের মধ্যে জ্ঞান আহরণের আগ্রহকে উজ্জীবিত করে এবং ব্যক্তির বিকাশ ঘটায়।

দূরাগত শিক্ষায় বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য রয়েছে। নিজস্ব সামর্থ্য ও ক্ষমতা অনুসারে শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। পাঠদান পদ্ধতিও যথেষ্ট আধুনিক। এক্ষেত্রে বিভিন্ন সফট্‌ওয়্যার তৈরির আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। কম্পিউটার, টেপরেকর্ডার, রেডিও, সিনেমা, টেলিভিশন, ভিডিও প্রভৃতি কাজে লাগিয়ে শিক্ষাদান করা হয়। এর মাধ্যমে একই সময়ে কয়েক লক্ষ ছাত্রের কাছে বক্তব্য বিষয় পৌঁছে দেওয়া সম্ভব।

শিক্ষকদের মানোন্নয়ন ও তাদের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে দূর শিক্ষা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা। পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশগুলোতে দেখা গেছে যে শিক্ষক শিক্ষণের মান যথাযথ নয় । কারণ তারা উপযুক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারেননি। এই ক্ষেত্রে দূরশিক্ষা অন্যতম সহকারি প্রক্রিয়া।

দূরাগত শিক্ষার বৈশিষ্ট্যাবলি (Characteristics of Distance Education):

দূরাগত শিক্ষার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হল :

১) দূরাগত শিক্ষা প্রাথমিক ভাবে একটি স্বয়ংশিখন পদ্ধতি এবং প্রথাগত শিক্ষার একটি বিকল্প ব্যবস্থা।

২) দূরাগত শিক্ষায় শিক্ষক অতি অল্প সময়ের জন্য শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মুখোমুখি সম্পর্ক স্থাপন করেন।

৩) এই জাতীয় শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট কোন শ্রেণিকক্ষ বা বক্তৃতাকক্ষ থাকে না।

৪) এই শিক্ষণ ব্যক্তিগতভাবে হয়, দলগত নয়।

৫) এই জাতীয় শিক্ষায় বিভিন্ন ধরনের গণমাধ্যম যেমন, রেডিও, টেলিভিশন, ডাকঘর পরিসেবা, তথ্যচিত্র প্রভৃতির সাহায্য নেওয়া হয়।

৬। এই শিক্ষার পাঠ্যক্রম, পঠনপাঠন, মূল্যায়ন পদ্ধতি নমনীয় হয় । ফলে সকল শিক্ষার্থী তাদের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

৭) যেসব ব্যক্তি নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার সুযোগ নিতে পারেনি তারা সহজেই দূরাগত শিক্ষার মাধ্যম ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পায়।

৮) এই শিক্ষায় পড়াশোনার খরচ তুলনামূলকভাবে কম।

৯) এই শিক্ষা ব্যবস্থায় আসন সংখ্যা নির্দিষ্ট নয়, আবার বয়সেরও কোন বাধ্যবাধকতা থাকে না । ফলে এক সঙ্গে অনেক শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পেয়ে থাকে।

১০। এই শিক্ষা শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক। শিক্ষার্থী নিজের ইচ্ছামত বিষয় নির্বাচন করতে পারে । তাই শিক্ষার্থী আত্মনির্ভরশীল ও আত্মবিশ্বাসী হয়।

দূরাগত শিক্ষার সুবিধা (Advatnage of Distance Education) :

১) গণতান্ত্রিক এই শিক্ষা ব্যবস্থা সারা পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ জনগণের শিক্ষার চাহিদা পূরণে অত্যন্ত কার্যকরী একটি ব্যবস্থা।

২) বিভিন্ন পেশাগত উন্নয়নের ক্ষেত্রেও এই শিক্ষার প্রয়োগ সম্ভব।

৩) যেকোন ধরনের বৃত্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তি, গৃহবধূ, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তি সকলে দূরশিক্ষার সাহায্যে শিক্ষার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারে।

৪) এই শিক্ষা মনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুযায়ী পরিচালিত হয় ফলে স্বশিখনের অভ্যাস তৈরী করে।

৫) দূরাগত শিক্ষা জীবনব্যাপী শিক্ষার ধারণা ও শিক্ষার সমসুযোগের ধারণাকে বাস্তবায়িত করতে পারে।

৬) এখানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা নির্দিষ্ট করা থাকে না। ফলে বহুসংখ্যক শিক্ষার্থী সহজেই এই ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

৭) দূরাগত শিক্ষার উন্নয়নের জন্য প্রযুক্তিগত কৌশলের ব্যবহার, তার উন্নয়ন ও বিভিন্ন গবেষণাধর্মী কাজের ব্যবস্থা করাহয়।

দূরাগত শিক্ষার সীমাবদ্ধতা (Limitations of Distance Educations) :

১) দূরাগত শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের মত বিনিময়ের সুযোগ থাকে না। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরীক্ষা দেওয়া ও ডিগ্রি অর্জন করাই মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

২) এই শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে একমুখী। শিক্ষার্থীদের নিজস্ব প্রচেষ্টার উপরই এর কার্যকারিতা নির্ভর করে।

৩) শিক্ষার্থীর শিখনে কতগুলো আবশ্যক উপাদান যেমন গ্রন্থাগার বা গবেষণাগার এসবের সুবিধা দূর শিক্ষায় পাওয়া যায় না।

৪) বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাহায্যে পরিবেশিত শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের সময়সীমা খুবই কম থাকে। এই সংক্ষিপ্ত সময়ের শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তু বোধগম্যতার অভাব দেখা যায়।

৫) দূর শিক্ষায় ব্যবহারিক বিষয় (Practical Based Subjects) পঠনপাঠনের সুযোগ নেই।

৬) দূরশিক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মীর অভাব দেখা যায়, অনেক ক্ষেত্রে এর তত্বধায়ক দক্ষতা সম্পন্ন হয় না।

৭) শিক্ষার্থীর সকল রকম চাহিদা দূর শিক্ষার দ্বারা পূরণ হয় না।

তবুও বলা যায়, সমস্ত রকম সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠে দূরশিক্ষা বর্তমানে সাধারণ শিক্ষার পরিপূরক একটি ব্যবস্থা রূপে গড়ে উঠেছে। এখানে প্রাপ্ত সমস্ত ডিগ্রি প্রথাগত ডিগ্রির সমতুল্য বলে স্বীকৃতি প্রাপ্ত হয়েছে। দূরশিক্ষায় শিক্ষার্থী অন্তর্ভুক্তির সময় এবং তাদের সাহায্যের জন্য উন্নত ব্যবস্থা করতে পারলে তাদের শিক্ষাগত ও বৃত্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এতে দূর শিক্ষার সাফল্য ত্বরান্বিত হবে।

মুক্ত শিক্ষা (Open Learning)

প্রথা-বহির্ভূত শিক্ষার একটি বিশেষ ব্যবস্থাপনা হল মুক্ত শিক্ষা। যে সমস্ত ব্যক্তি নির্দিষ্ট সময়ে প্রথাগত শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেনি তাদের জন্যই এই শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। মুক্ত শিক্ষা হল সেই শিক্ষা যেখানে যারা নানা কারণে প্রথাগত শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে পারেনি, অথচ পরবর্তী সময়ে মনে করেছেন যে তারা নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণ করবেন । তাদের জন্যই এই বিশেষ ব্যবস্থা। পেশাগত নানা শিক্ষাও এখানে দেওয়া হয়। এই শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন সর্বোচ্চ বয়সসীমা নেই। মাধ্যমিক স্তরের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা ন্যূনতম অষ্টম শ্রেণি পাশ এবং উচ্চ মাধ্যমিকের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা মাধ্যমিক উত্তীর্ণ। এই সমস্ত সংস্থার শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ও মহাবিদ্যালয়ে পাঠকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে Central Advisory Board of Education (CABE) , National Council of Educational Research and Training (NCERT) এর যৌথ প্রয়াসে ভারতবর্ষের দিল্লিতে প্রথম মুক্ত বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এরপর ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে অন্ধ্রপ্রদেশে এবং ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে দিল্লিতে ইন্দিরা গান্ধি জাতীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চ শিক্ষার জন্য স্থাপিত হয়। বিদ্যালয় ভিত্তিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠান হল মুক্ত বিদ্যালয় (Open School) । যেমন দিল্লির জাতীয় মুক্ত বিদ্যালয় Natinal Institute of Open Schooling (NIOS)। উচ্চস্তরের শিক্ষা পরিচালনার জন্য যে সব প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছে তাদের মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বলে। যেমন ইন্দিরা গান্ধি জাতীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (দিল্লি,১৯৮৫), নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (কলকাতা, ১৯৯৭)। এগুলো ছাড়াও আরো অন্যান্য মুক্ত বিদ্যালয় এবং মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। ১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে মুক্ত শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়ার কথা উল্লেখ করার ফলে পরবর্তী সময়ে দেখা যায় আরও ১০টি রাজ্য মুক্ত বিদ্যালয় ও মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে। ১৯৯২ সালে কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি রূপায়নের জন্য যে কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন তাতে প্রোগ্রাম অব অ্যাকশন (Programme of Action), সংক্ষেপে POA-1992, এ মুক্ত শিক্ষার ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে—মুক্ত শিক্ষা হল শিক্ষার ব্যাপক সুযোগসৃষ্টিকারী, সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য, অর্থ সাশ্রয়কারী, তাৎপর্যপূর্ণ, নমনীয় এক মৌলিক শিক্ষা ব্যবস্থা।

মুক্ত শিক্ষার মৌলিক ধারণাটি হল :

'মুক্ত শিক্ষা' শব্দটিই মুক্ত শিক্ষার অর্থ বুঝতে সাহায্য করে, যেমন (১) এটি এক প্রকারের স্থায়ী শিক্ষা । (২) সকল স্তরের মানুষর জন্য এ শিক্ষা মুক্ত। (৩) জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রবহমান এক বহুমুখী শিক্ষা প্রক্রিয়া । (৪) নির্দিষ্ট সময়ের কোনো বালাই নেই। (৫) বয়সের কোনো সীমারেখা নেই।
শিক্ষার মুক্ত নীতি একটি পরম গুণ নয় বরং বিস্তৃত এক সম্ভাবনা। 'মুক্ত শিক্ষা' একটি ব্যাপক ধারণা, এর অর্থের ব্যাপ্তি বিশাল, সম্ভাবনা প্রবল।

মুক্ত শিক্ষার অর্থ :

মুক্ত শিক্ষা (Open Learning) এর অর্থ হল প্রথাগত বিধিনিষেধ এবং বাধ্যবাধকতার শর্ত থেকে শিক্ষার ব্যবস্থাপনাকে মুক্ত আঙ্গিকে নিয়ে আসা। মুক্ত শিক্ষা হল শিক্ষা প্রক্রিয়ার এমন এক ব্যবস্থাপনা

যেখানে সমাজের সকল অংশের মানুষ যেকোন সময়ে যেকোন বয়সে তার চাহিদা অনুসারে কিংবা সুনির্দিষ্ট প্রয়োজন ভিত্তিক শিখন ও শিক্ষণের সুযোগ গ্রহণ করতে পারে।

শিক্ষা গ্রহণে ইচ্ছুক সমাজের সকল অংশের শিক্ষার্থীদের একটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষার বিশেষ সুযোগ সুবিধা প্রদান করা, শিক্ষার্থীদের বিষয় নির্বাচনে, মাধ্যম নির্বাচনে এবং শিখন পদ্ধতি অনুসরণে স্বাধীনতা দেওয়া হয় মুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থায়। এই শিক্ষার ক্ষেত্রে বহুমুখী শিখন পদ্ধতি অনুসরণের সুযোগ থাকে।

মুক্ত শিক্ষার উদ্দেশ্যাবলি (Objectives of Open Education) :

মুক্ত শিক্ষার উদ্দেশ্য —

১) সমাজের সকল অংশের মানুষের কাছে শিক্ষার সুযোগ সুবিধা উন্মুক্ত করা এবং শিক্ষার মাধ্যমে সার্বিক সমাজকল্যাণ সাধন করা এই শিক্ষার উদ্দেশ্য।

২) দূরাগত শিক্ষা ব্যবস্থাকে সহযোগিতা করা এবং তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা মুক্ত শিক্ষার উদ্দেশ্য।

৩) সমাজে পশ্চাদপদ মানুষের কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া এবং সর্বসাধারণের কাছে শিক্ষাকে আরও জনপ্রিয় করে তাদের জ্ঞানের পরিধিকে বিস্তৃত করা মুক্ত শিক্ষার উদ্দেশ্য।

৪) মুক্ত শিক্ষার উদ্দেশ্য হল বিদ্যালয় ছুট এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষদের কাছে শিক্ষার সুযোগ প্রসারিত করা।

৫) বিদ্যালয় স্তরে শিক্ষার প্রসার এবং প্রবহমান শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা মুক্ত শিক্ষার উদ্দেশ্য।

৬) মুক্ত মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার সুযোগ আপামর জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া মুক্ত শিক্ষার উদ্দেশ্য।

৭) চাকুরিতে নিযুক্ত ব্যক্তিদের যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জনের জন্য শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করা মুক্ত শিক্ষার উদ্দেশ্য।

৮) নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা নির্দিষ্ট সময় ভিত্তিক বলে স্থায়ীভাবে জনগণের চাহিদা পরিতৃপ্ত করতে পারে না। এক্ষেত্রে মুক্ত শিক্ষা নিয়মবহির্ভূত শিক্ষার মাধ্যমের মানুষের চাহিদা পূরণে সমর্থ হয়।

৯) মানুষের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের বিকাশ ঘটানো, জাতীয় সংহতি বজায় রাখা, সুনাগরিক তৈরি করা এবং রাষ্ট্রের উন্নতিতে সহায়তা করা মুক্ত শিক্ষার উদ্দেশ্য।

১০) যারা নানা ধরনের বৃত্তি ও জীবনমুখী শিক্ষা নিতে চান তাদের চাহিদা পূরণ করা মুক্ত শিক্ষার উদ্দেশ্য।

মুক্ত শিক্ষার বৈশিষ্ট্য (Features of Open Education) :

১) মুক্ত শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল এই শিক্ষায় অংশগ্রহণের সময় শিক্ষার্থীর নির্দিষ্ট কোন পূর্ব যোগ্যতার প্রয়োজন হয় না।

২) শিক্ষার্থীরা এখানে নিজের সুযোগ সুবিধামত পঠনপাঠন করতে পারে। নির্দিষ্ট সময়ে শ্রেণিকক্ষে উপস্থিত থাকার বাধ্যবাধকতা থাকে না।

৩) যেকোন ধরনের বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা স্বাধীনতা পায়। আবার কোন একটি বিষয়ের প্রাপ্ত নম্বর অন্য বিষয়ে স্থানান্তরিত করা যায়।

৪) এই শিক্ষার ব্যবস্থাপনা আধুনিক ও উন্নত । এই শিক্ষায় বিভিন্ন প্রযুক্তি-মাধ্যমের, যেমন, রেডিও, টেলিভিশন, টেপরেকর্ডার, কম্পিউটার, ইন্টারনেট সাহায্য নেওয়া যায়।

৫) শিক্ষার কর্মসূচি এবং বিভিন্ন বিষয়ে শিখনের বিষয়বস্তু দেশের অভিজ্ঞ শিক্ষকদের দ্বারা তৈরি করা হয়।

৬) স্বল্প খরচে, স্বল্প সময়ের মধ্যে বেশি লোকের কাছে শিক্ষা ব্যবস্থা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়।

৭) মুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে ডিগ্রি, ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট কোর্সের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যাপারেও সহায়তা করা হয়।

৮) মুক্ত শিক্ষা সকলের জন্য অবারিত। বয়স, লিঙ্গ, আর্থ সামাজিক অবস্থান কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না। এটি একটি স্বশিখন পদ্ধতি।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, মুক্ত শিক্ষায় সবক্ষেত্রেই, যেমন-ভর্তির ক্ষেত্রে, শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে, বয়সের ক্ষেত্রে, বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে, কর্মসূচি শুরু এবং শেষ করার ক্ষেত্রে একটা শিথিল, নমনীয় বা মুক্তভাব প্রকাশ পায়।

মুক্ত শিক্ষার প্রতিষ্ঠান :

মুক্ত শিক্ষার দু'ধরনের প্রতিষ্ঠান আছে — (১) মুক্ত বিদ্যালয় (Open School)
(২) মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (Open University)

মুক্ত বিদ্যালয় :

প্রথা বর্হির্ভূত শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যালয় ভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হল মুক্ত বিদ্যালয়। ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে নভেম্বর মাসে দিল্লিতে মুক্ত বিদ্যালয় (National Institute of Open Schooling (NIOS) প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় পশ্চিমবঙ্গের রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয়। ২০০১ খ্রিস্টাব্দের পয়লা আগস্ট থেকে এই বিদ্যালয় নিয়ম বহির্ভূত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। মুক্ত বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীরা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। মুক্ত বিদ্যালয়গুলোতে মাধ্যমিক স্তরে ভর্তি হওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা অস্টম শ্রেণি মান উত্তীর্ণ হতে হয় এবং উচ্চমাধ্যমিক স্তরে শিক্ষাগত যোগ্যতা মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হতে হয়। বিভিন্ন মুক্ত বিদ্যালয়গুলোকে ১৯৯১-৯২ খ্রিস্টাব্দে স্বায়ত্ব শাসন দেওয়া হয়। মুক্ত বিদ্যালয়গুলো নিজস্ব পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যবই তৈরি করতে পারে। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের ব্রিজ কোর্স পরিচালনা করে থাকে।

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় :

উচ্চশিক্ষার চাহিদা পরিপূরণের জন্য চিরাচরিত নিয়ম বিধির বাঁধন থেকে আপেক্ষিকভাবে মুক্ত যেসব প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছে তাদের মক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বলে অর্থাৎ উচ্চশিক্ষার সম্প্রসারণ ঘটানো ও মান উন্নয়ন করার জন্য যেসব বিশেষ বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা হয়েছে তাদের মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বলা হয়। মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৃতপক্ষে এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয় যার শিক্ষামূলক ব্যবস্থাপনা পুরোপুরি ভাবে মুক্ত। মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ পদ্ধতি, পাঠ্যক্রম এবং অন্যান্য সমস্ত পরিকাঠামো নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা ব্যবস্থার মতো পুরোপুরিভাবে কঠোর শৃঙ্খলায় আবদ্ধ নয়, আবার অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষার মত বন্ধন মুক্ত নয়। আমাদের দেশে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠান হল দিল্লিতে প্রতিষ্ঠিত ইন্দিরা গান্ধি জাতীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৮৫)।

জাতীয় মুক্ত বিদ্যালয় (National Institute of Open Schooling) :

ভারতে নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বারা বিদ্যালয় ছুট, কর্মরত ব্যক্তিবর্গ, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কারণে অনগ্রসর ব্যক্তিদের শিক্ষা সমস্যা পুরোপুরি সমাধান করা সম্ভব নয়। সেজন্য প্রথামুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা হিসাবে একটি নমনীয়, গ্রহণযোগ্য একটি শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রক, NCERT এবং CBSE যৌথভাবে সভায় মিলিত হয়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের ১৮জন অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদ এখানে অংশগ্রহণ করেন। ওই সেমিনারের ভিত্তিতে সিবিএসই এর চেয়ারম্যান মুক্ত বিদ্যালয়ের একটি খসড়া প্রস্তুত করেন। ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রক এটি মঞ্জুর করে। এর ভিত্তিতেই ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে দিল্লিতে মুক্ত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যন্ত সমস্ত শ্রেণির শিক্ষা এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এখানে শিক্ষার মাধ্যম হল হিন্দি এবং ইংরেজি। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বোর্ড, মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক এবং শ্রম মন্ত্রক দ্বারা জাতীয় মুক্ত বিদ্যালয় একটি স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান।

জাতীয় মুক্ত বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য (Objectives of National Institute of Open Schooling):

ভারতে জাতীয় মুক্ত বিদ্যালয় কিছু উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিচালিত হয়। ওইগুলো হল—

১) একটি প্রথা -বহির্ভূত পরিপূরক শিক্ষা পদ্ধতির পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করা এবং তার মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের জন্য বিভিন্ন কোর্সের ব্যবস্থা করা।

২) পেশাগত, বৃত্তিমূলক, কারিগরি ও জীবন উন্নয়নকারী শিক্ষা কোর্সের ব্যবস্থা করা।

৩) প্রকাশনা ও তথ্য প্রদানের জন্য একটি মুক্ত দূরাগত শিক্ষা পদ্ধতির ব্যবস্থা করা।

৪) দশম এবং দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়া শিক্ষার্থীরা মুক্ত বিদ্যালয়ে পুনরায় লেখাপড়া চালাতে পারে।

৫) যেসব শিক্ষার্থী পেশার কারণে বা আর্থিক কারণে প্রথাযুক্ত শিক্ষায় অগ্রসর হতে পারেনি তাদের জন্য মুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

পাঠ্যক্রম :

মুক্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের বিষয় নির্বাচনের স্বাধীনতা থাকে। একটি ভাষাসহ মোট পাঁচটি বিষয় নির্বাচন করতে হয়। এই বিষয়গুলো হল— ১) হিন্দি ২) ইংরেজি ৩) গণিত ৪) বিজ্ঞান ৫) সমাজবিজ্ঞান ৬) অর্থনীতি ৭) বাণিজ্য ৮) গৃহবিজ্ঞান ৯) টাইপরাইটিং (ইংরেজি বা হিন্দি)।

পরীক্ষা ব্যবস্থা :

মুক্ত বিদ্যালয়ের জন্য একটি পৃথক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। এই পরীক্ষাটি সরকারী স্বীকৃত সমস্ত বোর্ড এর নিয়মিত শিক্ষার্থীদের সমতুল হিসেবে বিবেচিত হয়। পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় একটি বা একাধিক বিষয়ে। একসঙ্গে মোট পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। শিক্ষার্থীরা মোট পাঁচটি বিষয় পাশ করার পর পর্ষদের পক্ষ থেকে সেকেণ্ডারি স্কুল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। পাঁচটি বিষয় একসঙ্গে বা আলাদা সময়ে হতে পারে। পরীক্ষা শুরু থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে পাঁচটি বিষয়ে পাশ করতে হয়। মুক্ত বিদ্যালয় যেসব সার্টিফিকেট প্রদান করে তা Association of Indian University এবং UGC দ্বারা স্বীকৃত।

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (Open University) :

প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় উচ্চস্তরের শিক্ষা পরিচালনার জন্য যে প্রতিষ্ঠান রয়েছে তার মধ্যে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় উল্লেখযোগ্য। উচ্চশিক্ষার সম্প্রসারণ ঘটানো ও মান উন্নয়নের জন্য যে সব বিশ্ববিদ্যালয় প্রথাবহির্ভূতভাবে গড়ে উঠেছে তাদের মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বলা হয়। শিক্ষার গণতন্ত্রীকরণের একটি হাতিয়ার হিসাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা হয়েছে।

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রথমে গ্রেট ব্রিটেনের বাকিংহামশায়ারে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে জানুয়ারি মাসে চালু হয়। শিক্ষার সুযোগ সকলের সামনে তুলে ধরা ছিল এর উদ্দেশ্য। আমাদের দেশে হায়দ্রাবাদে (১৯৮২) সালে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বর্তমানে আমাদের দেশে যে সমস্ত মুক্ত বিশ্ব বিদ্যালয় তাদের কার্যাবলি পরিচালনা করছে তাদের মধ্যে কয়েকটি হল — ইন্দিরা গান্ধি জাতীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৮৫), দিল্লি যশোবন্ত রাও চ্যবন মহারাষ্ট্রীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৮৯), কোটা মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৮৭), রাজস্থান নালন্দা মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৮৭), বিহার, ভোজ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৯৪), এম পি, ড: বাবা সাহেব আম্বেদকর মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৯৪), গুজরাট নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৯৭), কলকাতা। তবে ভারতবর্ষের সবথেকে বড় পরিসরের মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়টি হল ইন্দিরা গান্ধি জাতীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (ইগনৌ)।

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যাবলি (Objectives of Open University) :

১) সমাজের সকল অংশের মানুষের কাছে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দেওয়া মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান উদ্দেশ্য।

২) এই শিক্ষার আরেকটি উদ্দেশ্য হল পেশাগত বা বৃত্তিমূলক বিভিন্ন কোর্সের মাধ্যমে দেশের কৃষি, শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন করা এবং দেশের আর্থিক বিকাশে সহায়তা করা।

৩) মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেকটি উদ্দেশ্য হল স্বল্প খরচে শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষা প্রদান করা।

৪) উচ্চ শিক্ষার স্তরে উন্নতমানের সর্বাধুনিক জ্ঞান সরবরাহ করা মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য।

৫) প্রথাগত শিক্ষার অসাম্য দূর করা এবং বিভিন্ন ধরনের বৃত্তিমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা করা মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য।

৬) দেশের প্রতিটি নাগরিক যাতে নিজের অঞ্চলে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারে সেই বিষয়ে বিশেষ ব্যবস্থা করা মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য।

৭) শিক্ষার্থীরা যাতে নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী বিষয় নির্বাচন করতে পারে এবং পাঠে অগ্রসর হতে পারে সে বিষয় সুনিশ্চিত করা মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য।

৮) উৎসাহী ব্যক্তিরা যাতে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে সে বিষয়ে সহায়তা করা মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি উদ্দেশ্য।

৯) মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য হল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা।

১০) জাতির উন্নতিতে সহায়তা করা এবং ধর্ম নিরপেক্ষ, বিজ্ঞানসম্মত ও গণতান্ত্রিক শিক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করা মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য।

পাঠদান পদ্ধতি (Scheme of Teacing) :

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় অভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা প্রস্তুত শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু ছাপানো অবস্থায় শিক্ষার্থীর কাছে দেওয়া হয়। প্রতি বিষয়ে প্রতিটি পত্রের উপর কতগুলো প্রশ্ন দেওয়া হয় অ্যাসাইনমেন্ট হিসাবে। শিক্ষার্থীরা শিক্ষণীয় বিষয় পড়ার পর অ্যাসাইনমেন্টের প্রশ্নের উত্তরগুলো লিখে ডাকযোগে স্টাডি সেন্টারে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট বিভাগে পাঠিয়ে দেয়। নিকটবর্তী স্টাডি সেন্টারে ছুটির দিন আলোচনা বা সেমিনারের ব্যবস্থা করা হয়।

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন স্তরে শিখন ও শিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এরমধ্যে বৃত্তিমূলক কোর্স, সার্টিফিকেট কোর্স, ডিপ্লোমা, বাণিজ্য বিষয়ক বিভিন্ন বিষয় এবং স্নাতক, স্নাতকোত্তর পর্যন্ত ডিগ্রি অর্জন করা ছাড়াও গবেষণার ব্যবস্থাও রয়েছে।

মূল্যায়ন (Evaluation) :

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের জন্য দু'ধরনের ব্যবস্থা আছে। (১) প্রত্যেকটি পাঠ্য এককের সঙ্গে মূল্যায়ন ব্যবস্থা যুক্ত থাকে। তাতে শিক্ষার্থীদের অগ্রগতির ধারাবাহিক মূল্যায়ন সম্ভব হয়। (২) প্রত্যেক পাঠ্যক্রম অনুশীলন শেষে একটি সামগ্রিক মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়। এই দুধরনের মূল্যায়নের ফলাফল একত্রিত করে, শিক্ষার্থীর সাফল্যের মান নির্ধারণ করা হয়।

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি নতুন কর্মসূচি। তবুও এই ব্যবস্থা ইতিমধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এমন সব পাঠ্যক্রম অনুশীলনের ব্যাবস্থা করা হয়েছে, যেগুলোর অনুশীলনের ব্যবস্থা আমাদের প্রচলিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নেই । বর্তমানে এই মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আগ্রহী ছাত্রছাত্রীদের কাছে নতুন আলোর সন্ধান দেখিয়েছে। তাই এক ব্যাপক অংশের শিক্ষার্থী বর্তমানে এই ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য ভর্তি হচ্ছে।

ইগনৌ (IGNOU) — ইন্দিরা গান্ধি জাতিয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় :

ইন্দিরা গান্ধি ন্যাশনাল ওপেন ইউনিভার্সিটি সাধারণ্যে ইগনৌ নামে পরিচিত। এটি ভারতের নয়াদিল্লিতে অবস্থিত। ইন্দিরা গান্ধি ন্যাশনাল ওপেন ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট ১৯৮৫ পাস করার পর এটি ১৯৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইগনৌ ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা পরিচালিত এবং বিশ্বের বৃহত্তম মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতির দাবী রাখে। ইগনৌ দূর শিক্ষা ও মুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে সমাজের সকল স্তরের জনগণের জন্য উচ্চ শিক্ষার সুযোগ প্রদান করে। এটি দূর শিক্ষা ও মুক্ত শিক্ষার মানকে উৎসাহিত করা, সমন্বয় সাধন ও মান নির্ধারণ এবং শিক্ষার মাধ্যমে ভারতের মানব সম্পদকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কাজ করে।

ইগনৌ সার্ক কনসোর্টিয়াম অন ওপেন অ্যান্ড ডিস্টেন্স লার্নিং (স্যাকোডিআইডল) এবং গ্লোবাল মেগা ইউনিভার্সিটি নেটওয়ার্ক (GMUNET) এর মাধ্যমে কাজ করে যা প্রাথমিকভাবে ইউনেস্কো সমর্থিত। এইচ আর ডি (Human Resource Development) মন্ত্রণালয় ইগনৌকে ওপেন এন্ড ডিস্টেন্সে লার্নিং এবং অনলাইন কোর্সগুলোতে খসড়া নীতির বিকাশের দায়িত্ব দিয়েছে।

ইন্দিরা গান্ধি ন্যাশনাল ওপেন ইউনিভার্সিটিতে ১১টি বিভাগ রয়েছে যা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনা করে।

পাঠ্য বিষয়সমূহ (Courses of Study) :

ইগনৌ নানা বিষয়ে পাঠদান পরিচালনা করে থাকে। এদের মধ্যে রয়েছে, ইংরেজি, হিন্দি, সংস্কৃত, ইতিহাস, ভূগোল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, লাইব্রেরি সায়েন্স, আইন, কম্পিউটার সায়েন্স, খাদ্য ও পুষ্টি, ওসনোগ্রাফি, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, গণিত, পরিবেশ বিজ্ঞান, ম্যানেজমেন্ট সায়েন্স ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়।

ইগনৌ-র উদ্যোগ :

ইগনৌর সাম্প্রতিকতম উদ্যোগ হল Inter University Consortium for Technology Eneable Flexible Education and Development (IUC-TEFED) উচ্চশিক্ষার সংযোগস্থলের কেন্দ্র হিসাবে কাজ করে এবং সব ধরনের কার্যকলাপে মুক্ত এবং দূরবর্তী শিক্ষাক্রম, ই-লার্নিং ও যথার্থ প্রযুক্তির সহযোগিতা প্রদান করে।

ইন্দিরা গান্ধি জাতীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (ইগনৌ) আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশাল কর্মসূচি পালন করছে। এই শিক্ষা সংগঠন আমাদের দেশে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। বহু ছাত্রছাত্রী এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন কোর্স নিয়ে পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছে। আজ এটি ভারতের সর্ববৃহৎ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

পঞ্চম একক ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নমূলক কর্মসূচি

ধারাবাহিক পেশাগত উন্নতি হল কোন প্রশিক্ষণরত ব্যক্তির নিয়ন্ত্রিত ও অনিয়ন্ত্রিত ভাবে জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জনের একটি নিরবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। কোন বিষয়ে একজন ব্যক্তি শিক্ষাগত দিক দিয়ে খুবই দক্ষ হতে পারেন কিন্তু পেশাগত দিক দিয়েও তিনি ঐ বিষয়ে দক্ষ হবেন, এর কোনও মানে নেই। কিন্তু সঠিক শিক্ষা, পথ নির্দেশনা, বিষয়বস্তু ও তার শিক্ষা প্রণালীর ক্ষেত্রে নতুন উন্নতিগুলোকে কাজে লাগিয়ে ব্যক্তি অনেকাংশে পেশাগত দিকে দক্ষ হয়ে উঠতে পারেন। পেশাগত শিক্ষা বলতে কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শিক্ষণ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ শিক্ষাকে বোঝায়। পেশাগত শিক্ষার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের সংস্থা রয়েছে। যেমন, চিকিৎসাবিদ্যার জন্য রয়েছে AIIMS (All India Institute of Medical Sciences), শিল্প শিক্ষার জন্য রয়েছে AICTE (All India Council for Technical Education), শিক্ষক শিক্ষণের জন্য রয়েছে NCTE (National Council for Teacher Education) ইত্যাদি। এই সংস্থাগুলো ওইসব বিষয়ে গুণগত মানোন্নয়নের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রককে পরামর্শ দেয়। এগুলো ছাড়াও পেশাগত শিক্ষার উন্নয়নের জন্য আরও অনেক সংস্থা রয়েছে। যেমন NCERT (National Council of Educational Research and Training), SCERT (State Council of Educational Research and Trainign), UGC (University Grants Commission) ইত্যাদি। এরা পেশাগত শিক্ষালয়গুলোর মানোন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা নেন এবং বিভিন্ন রাজ্য সরকারগুলোকে এব্যাপারে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন।

স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে শিক্ষার উন্নতিকল্পে বিভিন্ন কমিটি ও কমিশন গঠিত হয়েছে, যেমন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন (১৯৪৮), মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (৯১৫২-৫৩), কোঠারি কমিশন (১৯৬৪-৬৬)। প্রতিটি কমিশনই পেশাগত শিক্ষার উন্নতির জন্য বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করেছিল। পরবর্তীকালে জাতীয় শিক্ষানীতি (NPE-1986- National Policy on Education) এবং সংশোধিত জাতীয় শিক্ষানীতি (NPE-POA-Programme of Action 1992) পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির উপর জোড় দিয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে, দেশের শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থা এমনভাবে সুগঠিত করতে হবে যাতে প্রত্যেক শিক্ষকের পেশাগত জীবনে সেটি একটি চলমান প্রক্রিয়া (Continuous Process) হিসাবে সক্রিয় থাকে। এছাড়াও UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) এর সম্মতিক্রমে ১৯৯৩ সালে Jacques Delores-এর সভাপতিত্বে গঠিত আন্তর্জাতিক শিক্ষা কমিশন ১৯৯৬ সালে যে প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন তার মধ্যে শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে সক্ষম করে তোলার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি ও কৌশলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই কর্মসূচিগুলো হল সেমিনার, সম্মেলন, কর্মশালা, আলোচনাসভা, রিফ্রেসার কোর্স, ওরিয়েন্টেশান কর্মসূচি ইত্যাদি। নিম্নে কয়েকটি কর্মসূচি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

অনলাইন কোর্স (Online Course) :

বর্তমানে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার সহায়তায় যে সমস্ত মাধ্যমে শিক্ষালাভ করা যায় তার মধ্যে অনলাইন কোর্স অন্যতম। এই কোর্সের মাধ্যমে শিক্ষার্থী একটি সুসংগঠিত পথে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু বুঝতে পারে এবং নিজেকে উন্নতির পথে নিয়ে যেতে পারে। অনলাইন কোর্সের মাধ্যমে শিক্ষা ক্ষেত্রের বিভিন্ন দিক যেমন সাধারণ শিক্ষা, বৃত্তিমূলক ও পেশাগত শিক্ষা, প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষা, চিকিৎসা বিদ্যা, গবেষণা ইত্যাদি বিভিন্ন দিকে শিক্ষার্থীরা বিশেষভাবে উপকৃত হয়। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা অনলাইনেই পঠন পাঠন সম্পাদন করে। এর মধ্যে আধুনিকতম বিভিন্ন কোর্স অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেমন- সাইবার নিরাপত্তা, ডিজিটাল মার্কেটিং, কম্পিউটার আর্কিটেকচার ইত্যাদি। এখানে শিক্ষার্থী শিখন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় অনলাইনের মাধ্যমেই পেয়ে থাকে। যেমন- বিশেষজ্ঞ শিক্ষক, লাইভ ডেমনস্ট্রেশন, রীডিং মেটিরিয়াল ইত্যাদি। তবে শিক্ষার্থীকে পোর্টালে নাম নথিভুক্ত করতে হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে চাকরির উপযোগী করে তোলার জন্য সব রকমের প্রচেষ্টা চালানো হয়।

অনলাইন কোর্সের সুবিধা (Advantage of Online Course) :

১) অনলাইনের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষালাভ করা যায় ফলে শিক্ষার্থীরা তাদের পছন্দ অনুযায়ী বিষয় নির্বাচন করে নিজেদেরকে উন্নতির পথে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়।
২) একজন শিক্ষার্থী একাধিক বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করতে পারে।
৩) কলেজে পড়াকালীন শিক্ষার্থীরা অনলাইনে একটি বাড়তি ডিগ্রি অর্জন করতে পারে।
৪) প্রথাগত শিক্ষালাভ করতে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তার তুলনায় অনেক স্বল্প খরচে অনলাইন কোর্স সম্পন্ন করা যায়।
৫) অনেক সময় দেখা যায় প্রথাগত শিক্ষালয়ের শ্রেণিশিক্ষণের তুলনায় অনলাইন কোর্স শিক্ষার্থীকে অনেক বেশি আগ্রহী ও মনোযোগী করে তোলে। অর্থাৎ অনলাইন কোর্সে শিক্ষার্থীরা বেশি মনোনিবেশ করতে পারে বলে শিক্ষা ফলপ্রসু হয়।

সেমিনার (Seminer) :

সেমিনার হল একটি বিশেষ ধরনের উচ্চ নির্দেশদান কৌশল। এই পদ্ধতিতে উপস্থাপক আমন্ত্রিত সভ্যদের সামনে তাঁর গবেষণা পত্রটি উপস্থাপন করে থাকেন। সংগঠিত বিষয়ে গবেষণা পত্র বা বক্তৃতা আগে থেকে অংশগ্রহণকারীদের দিয়ে দেওয়া হয় যাতে তারা খুব ভালো ভাবে পড়ে ও ভেবে আসে এবং বিষয়বস্তুকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে পারে। সংগঠক সেমিনারের কাজকর্ম পরিচালনা করেন। তার প্রধান কাজ হল সেমিনারের একটি সামগ্রিক কর্মপ্রণালী প্রস্তুত করা। তাছাড়া সভার কাজকর্ম পরিচালনার সমস্ত দায়িত্ব পালন করেন সভাপতি। সেমিনারের বিষয়বস্তু অনুযায়ী আলোচনা চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অংশগ্রহণকারীদের অনুপ্রাণিত করেন। সেমিনারে কিছু অতিথি পর্যবেক্ষক আমন্ত্রিত থাকেন। আলোচনা শেষে সভাপতির অনুমতিক্রমে তারা পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত প্রাপ্ত ফলাফলটি ব্যাখ্যা করেন। সেমিনার বিভিন্ন ধরনের হয় যেমন —১) ক্ষুদ্র সেমিনার (২) প্রধান সেমিনার (৩) জাতীয় সেমিনার (৪) আন্তর্জাতিক সেমিনার ইত্যাদি।

সম্মেলন (Symposium) :

সম্মেলন হল দলগত নির্দেশনার এমন এক গুরুত্বপূর্ণ কৌশল, যেখানে নির্বাচিত বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে সুচিন্তিত ও যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করতে দেওয়া হয়। এটা একটা বিশেষ ধরনের আলোচনা পদ্ধতি, যাতে একাধিক বক্তা বক্তব্য রাখতে পারে। প্রত্যেক বক্তার বক্তব্য শেষ হওয়ার পর শ্রোতাদের কাছ থেকে প্রশ্ন ও মন্তব্য আহ্বান করা হয়। তবে সম্মেলনের ক্ষেত্রে কতগুলো প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। যেমন বক্তারা সবাই সম্মেলনের নিয়মাবলি জানবেন, সময় জানবেন এবং বিষয়ের পশ্চাদপর্ব জানবেন। বক্তা নিজের বক্তব্য রচনায় সম্পূর্ণ স্বাধীন অবস্থানে থাকেন। বর্তমান আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় সম্মেলনগুলোতে বিভিন্ন প্রযুক্তিগত কৌশলের ব্যবহারও লক্ষ্য করা যায়।

কর্মশালা (Workshop) :

কয়েকজন ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত কোনো দল যখন প্রশিক্ষণ বা অনুশীলন কার্যে নিয়োজিত থাকে তখন তাকে বলা হয় কর্মশালা। এখানে শিক্ষার্থীরা নতুন নতুন কৌশলে প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের সুযোগ পায়। এর উদ্দেশ্য হল কোনো বিশেষ বিষয়ে জ্ঞান ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা। একটি কর্মশালা সাধারণত তিনদিন থেকে দশদিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। একে সংগঠিত করতে হলে যেসব উপাদানের প্রয়োজন হয় তা হল— সংগঠক, আহ্বায়ক, তথ্য সমৃদ্ধ ব্যক্তি ও অংশগ্রহণকারী। কর্মশালা চারটি পর্যায়ে সম্পাদিত হয়ে থাকে। এইগুলো হল যথাক্রমে- প্রস্তুতি পর্ব, কর্ম-সম্পাদন পর্ব, প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ পর্ব এবং অনুসরণ পর্ব।

আলোচনা সভা বা অধিবেশন (Conference) :

কোন একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে একাধিক ব্যক্তিবর্গের সভাকে বলে অধিবেশন। এইরকম সভায় একদিকে যেমন সমস্যার প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয়, আবার অন্যদিকে সমস্যার সম্ভাব্য সমাধানের পথ নির্দেশ করা হয়। অধিবেশন সংগঠিত করার জন্য একটি কার্যকরী কমিটি থাকে। সভাপতি, সহ-সভাপতি, সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ ও কিছু সভ্যবৃন্দ নিয়ে এই কমিটি গঠিত হয়। অধিবেশন প্রতি বছরই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই অধিবেশনে সাম্প্রতিক সমস্যাবলি নিয়ে আলোচনা করা হয়। সেখানে উপস্থিত থাকেন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি, আমন্ত্রিত সদস্য ও সমাজ সচেতন ব্যক্তি। অধিবেশনের উদ্দেশ্য হল যুক্তিশক্তি ও চিন্তাশক্তির উন্মেষ ঘটানো, সৃজনমূলক ক্ষমতার বিকাশ সাধন করা, স্বাধীন চিন্তামূলক ক্ষমতার বিকাশ সাধন করা ইত্যাদি। এই অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় ও এর কার্যসূচী, দিন, তারিখ, সময়, স্থান ইত্যাদি অংশগ্রহণকারীদের পূর্বেই জানিয়ে দেওয়া হয়। অধিবেশন কয়েকটি স্তরের মধ্য দিয়ে পরিচালিত হয়। এই স্তরগুলো হল—(ক) উদ্বোধন কার্য (খ) গবেষণাপত্র উপস্থাপন (গ) দলগত আলোচনা (ঘ) বিদায়-সম্ভাষণ কার্য।

ওরিয়েন্টেশান কর্মসূচী (Orientation Programme) :

ওরিয়েন্টেশান কর্মসূচির উদ্দেশ্য হল যে কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদেরকে সেই প্রতিষ্ঠানের নিয়মনীতি, দায়িত্ব, কাজের ধরন এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সম্পর্কে ধারণা দেওয়া। এই কর্মসূচিগুলো কর্মীগণকে কাজে উৎসাহিত করে তোলে। কোন ব্যক্তি যখন প্রথম কাজে নিযুক্ত হয়, সেই ব্যক্তির কাছে এই

কর্মসূচি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। শুধু তাই নয়, কাজে নিযুক্ত হওয়ার পরও এই কর্মসূচিগুলোতে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সে তার পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারে। ওরিয়েন্টেশান কর্মসূচিতে সাধারণত যে ধরনের তথ্য পরিবেশন করা হয় সেগুলো হল — ১) সংস্থা সম্বন্ধে সাধারণ তথ্য পরিবেশন ২) যে প্রতিষ্ঠানে ব্যক্তি কাজে নিযুক্ত হয়েছে তার ইতিহাস, উদ্দেশ্য, কর্মধারা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্বন্ধে ধারণা পরিবেশন।

ওরিয়েন্টেশান কর্মসূচির সুবিধা (Advantage of Orientation Programme) :

১) এই কর্মসূচিগুলো বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের গুণগতমান ও পেশাদারিত্বের মান বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে।

২) পেশায় ক্রমাগত জ্ঞানের বৃদ্ধি ঘটাতে পারে।

৩) বিষয়গত বোধগম্যতা ও জ্ঞানের প্রসার ঘটাতে সাহায্য করে।

৪) এই কর্মসূচির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য সহকর্মীদের সঙ্গে মেলবন্ধন ঘটে । ফলে ব্যক্তির কাজ অনেক সহজ ও সাবলীল হয়।

৫) এই কর্মসূচিগুলো জোড়ালোভাবে কর্মীদের কার্যকারিতা এবং উৎপাদনমূল্য বৃদ্ধি করে।

রিফ্রেশার কোর্স (Refresher Course) :

রিফ্রেশার কোর্স হল একটি প্রশিক্ষণ কোর্স যার মাধ্যমে ব্যক্তি তার পেশা সম্বন্ধীয় বিভিন্ন জ্ঞান ও দক্ষতা বাড়াতে পারে এবং সে যে কাজের সাথে সম্পর্কিত হয় সেই ক্ষেত্রের নতুন নতুন উন্নতিগুলো সম্বন্ধে জানতে পারে ও শিখতে পারে। রিফ্রেশার কোর্সগুলো দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর মানুষকে কাজে ফেরার জন্য সাহায্য করে। যেকোন ব্যক্তি তার পড়াশোনা শেষ করার পর কোন কাজে নিযুক্ত হওয়ার আগে পর্যন্ত তার সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে রিফ্রেশার কোর্সের প্রশিক্ষণ লাভ করে। এই প্রশিক্ষণ পরবর্তীকালে তার পেশাগত বিষয়ে বিশেষভাবে সহায়তা করে।

রিফ্রেশার কোর্সের সুবিধা (Advantage of Refresher Course) :

১) রিফ্রেশার কোর্স ব্যক্তির কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করে।

২) কর্মক্ষেত্রে ভুলের পরিমাণ কমাতে সাহায্য করে।

৩) জ্ঞানের ক্ষেত্রে যে ফাঁক রয়েছে সেগুলোকে পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়।

৪) কর্মীগণকে তার বিষয় সম্বন্ধে আধুনিক করে তোলে।

৫) এই কোর্সের মাধ্যমে ব্যক্তি তার শিখনকে আরও জোড়ালো করে তুলতে পারে এবং এইভাবে তার মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও মনোবল বৃদ্ধি পায়।

৬) কর্মীদেরকে কাজে নিযুক্ত রাখতে সহায়তা করে।

সারসংক্ষেপ

প্রথম একক : শিক্ষার সংস্থা, নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা ও তার সংস্থা

- শিক্ষার বিভিন্ন মাধ্যম — নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা, অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা, নিয়মবহির্ভূত শিক্ষা।
- নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা — শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন বয়স অনুযায়ী পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে যে সুপরিকল্পিত এবং সুনির্দিষ্ট শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় তাকে নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা বলে। নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার প্রতিষ্ঠান হল বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি।
- বিদ্যালয়ের কার্যাবলি — বিদ্যালয়ের কার্যাবলি দুটি ভাগে বিভক্ত। একটি হল শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক কার্যাবলি এবং অপরটি হল সমাজকেন্দ্রিক কার্যাবলি।
- শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক কার্যাবলি হল — বৌদ্ধিক বিকাশ, ব্যক্তি সত্তার বিকাশ, বৃত্তিমূলক নির্দেশনা, শিক্ষামূলক নির্দেশনা, মূল্যায়ণ।
- সমাজ কেন্দ্রিক কার্যাবলিগুলো হল — সামাজিক বিকাশ, ঐতিহ্যের সংরক্ষণ, ঐতিহ্যের সঞ্চালন, গণতান্ত্রিক বোধের বিকাশ।

দ্বিতীয় একক : অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা ও তার সংস্থা

- অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা — অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা হল এমনই এক শিক্ষা,যা মানবজীবনের যে কোন পর্যায়ে, যে কোন সময়ে অনিয়ন্ত্রিতভাবে বা অপরিকল্পিতভাবে ঘটে। গৃহপরিবেশ বা পরিবার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ক্লাব, রাষ্ট্র, খেলার মাঠ, বই, সংবাদপত্র, বেতার, চলচ্চিত্র, দূরদর্শন, কম্পিউটার সবই অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষার সংস্থা হিসাবে বিবেচিত হয়।
- পরিবারের শিক্ষামূলক কার্যাবলি — দৈহিক বিকাশ, সামাজিক ও নৈতিক বিকাশ, বাচনিক বিকাশ, আধ্যাত্মিক বিকাশ, মানসিক বিকাশ, সাংস্কৃতিক বিকাশ, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, সুনাগরিকতার শিক্ষা, ব্যক্তিসত্তার বিকাশ।
- রাষ্ট্রের শিক্ষামূলক দায়িত্ব — ১) রাষ্ট্র শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে। ২) শিক্ষালয়গুলোকে আর্থিক সাহায্য প্রদান ও বিভিন্ন কারিগরী ও বৃত্তি শিক্ষার প্রতিষ্ঠান তৈরি করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। ৩) রাষ্ট্রের অন্তর্গত ৬-১৪ বছর বয়সের সকল শিশুর অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য। ৪) দেশের প্রাক্ প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত সকল শিশুর সমশিক্ষার জন্য রাষ্ট্র জাতীয় শিক্ষানীতি ও জাতীয় পাঠ্যক্রমের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে।
- গণমাধ্যম — অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গণমাধ্যমগুলো শিক্ষার ক্ষেত্রে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির ফলে নানা ধরনের গণমাধ্যমের আবির্ভাব ঘটেছে যেগুলো শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সহায়তা করে। এই গণমাধ্যমগুলো হল সংবাদপত্র, বেতার, চলচ্চিত্র, টেলিভিশন, কম্পিউটার ইত্যাদি।

তৃতীয় একক : নিয়ম বহির্ভূত শিক্ষা ও তার সংস্থা

• নিয়মবহির্ভূত শিক্ষা — J.P. Naik-এর মতে 'প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা হল নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষার বাইরে গিয়ে সুপরিকল্পিত শিক্ষার ব্যবস্থা করা।" নিয়মবহির্ভূত শিক্ষার মাধ্যম হল মুক্ত বিদ্যালয়, মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, দূরাগত শিক্ষা, অনলাইন কোর্স ইত্যাদি।

চতুর্থ একক : দূরাগত শিক্ষা ও মুক্ত শিক্ষা, জাতীয় মুক্ত বিদ্যালয় ও মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

• দূরাগত শিক্ষা — দূরাগত শিক্ষা একটি স্বয়ংশিখন পদ্ধতি। দূরাগত শিক্ষার পাঠ্যক্রম, পঠন পাঠন, মূল্যায়ন পদ্ধতি নমনীয় হয়। দূরাগত শিক্ষার ব্যয়ভার কম হয়। দূরাগত শিক্ষা শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক। এই শিক্ষায় শিক্ষার্থী আত্মনির্ভরশীল ও আত্মবিশ্বাসী হয়।

• মুক্ত শিক্ষা — মুক্ত শিক্ষা হল একধরনের অপ্রথাগত শিক্ষা। যে সকল ব্যক্তি ব্যক্তিগত কারণে বা কর্মরত হয়ে পড়ার জন্য প্রথাগত শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে মুক্ত শিক্ষা পুনরায় তাদের শিক্ষার সুযোগ করে দেয়। মুক্ত শিক্ষার দুধরনের প্রতিষ্ঠান আছে। সেগুলো হল মুক্ত বিদ্যালয় এবং মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

• মুক্ত বিদ্যালয় — প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা ব্যবস্থায় বিদ্যালয় স্তরে শিক্ষার জন্য যে প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাদের মুক্ত বিদ্যালয় বলে। যেমন জাতীয় মুক্ত বিদ্যালয়, রবীন্দ্রমুক্ত বিদ্যালয় ইত্যাদি।

• মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় — প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা ব্যবস্থায় উচ্চস্তরের শিক্ষা পরিচালনার উদ্দেশ্যে যেসব প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছে তাদের মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বলে। যেমন ইন্দিরা গান্ধি জাতীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি।

পঞ্চম একক : ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নমূলক কর্মসূচি

• অনলাইন কোর্স — অনলাইন কোর্সের মাধ্যমে সাধারণ শিক্ষা, বৃত্তিমূলক ও পেশাগত শিক্ষা, প্রযুক্তি ও কারিগরী শিক্ষা, চিকিৎসা বিদ্যা, গবেষণা ইত্যাদি বিভিন্ন দিকে শিক্ষালাভ করা যায়। অনলাইন কোর্সের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা খুব স্বল্প খরচে একাধিক বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করতে পারে।

• ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নমূলক কর্মসূচি — এটি হল কোন প্রশিক্ষণরত ব্যক্তির নিয়ন্ত্রিত ও অনিয়ন্ত্রিতভাবে জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জনের একটি নিরবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। পেশাগত উন্নয়নের বিভিন্ন সংস্থাগুলো হল- AIIMS (All India Institute of Medical Sciences), AICTE (All India Council for Technical Education), NCTE (National Council for Teacher Education) ইত্যাদি। এই সংস্থাগুলো পেশাগত উন্নয়নের জন্য যেসব কর্মসূচি ও কৌশলের ব্যবস্থা করেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— সেমিনার, সম্মেলন, কর্মশালা, আলোচনাসভা, রিফ্রেশার কোর্স, ওরিয়েন্টেশান কর্মসূচি ইত্যাদি।

অনুশীলনী

ক) ১ মানের প্রশ্ন। সর্বাধিক শব্দসংখ্যা ২০।

১) শিক্ষার সংস্থা কয়ভাগে বিভক্ত?
২) অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা বলতে কি বুঝায়?
৩) প্রথা-বহির্ভূত শিক্ষা বলতে কি বুঝায়?
৪) দূরাগত শিক্ষা বলতে কি বুঝায়?
৫) NIOS কখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?

খ) ২ মানের প্রশ্ন : সর্বাধিক শব্দসংখ্যা ৪০।

১) নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা — এই ধারণাটি সংক্ষেপে লেখো।
২) অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষার সীমাবদ্ধতা লেখ।
৩) প্রথা-বহির্ভূত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা লেখ।
৪) দূরাগত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা লেখ।
৫) মুক্ত বিদ্যালয়ে পরীক্ষাব্যবস্থা কি রূপ হয়? তা লেখ।

গ) ৪ মানের প্রশ্ন : সর্বাধিক শব্দসংখ্যা ১০০।

১) নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা কর।
২) অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা কর।
৩) প্রথা-বহির্ভূত শিক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা কর।
৪) দূরাগত শিক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা কর।
৫) মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যাবলি বর্ণনা কর।

ঘ) ৫ মানের প্রশ্ন : সর্বাধিক শব্দসংখ্যা ১৫০।

১) একটি নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানে হিসাবে বিদ্যালয়ের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।
২) একটি অনিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিবারের কার্যাবলী ব্যাখ্যা কর।
৩) সমাজে প্রথা-বহির্ভূত শিক্ষার বাস্তবগ্রাহ্যতা বিশ্লেষণ কর।
৪) শিক্ষায় মুক্ত শিক্ষার বাস্তবগ্রাহ্যতা বিশ্লেষণ কর।
৫) ইন্দিরা গান্ধিমুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, অনলাইন কোর্স, সেমিনার সম্পর্কে ধারণা বিশ্লেষণ কর।

ঙ) ৬ মানের প্রশ্ন : সর্বাধিক শব্দসংখ্যা ২০০।

বোধপরীক্ষণমূলক :

ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশগুলিতে দূরাগত শিক্ষার সূচনা হয়। কালক্রমে সারা বিশ্বে দূরাগত শিক্ষা বিস্তার লাভ করে এবং ভাররতবর্ষেও তার প্রভাব পড়ে। দূরাগত শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দূরশিক্ষার কোর্সগুলোর তত্ত্বাবধান, তাদের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন প্রভৃতির জন্য একটি সর্বোচ্চ সংস্থার প্রয়োজন দেখা দেয়। Distance Education Council (DEC) এই চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে ১৯৮৫ সালে দিল্লিতে Indira Gandhi National Open University (IGNOU) স্থাপন ক'রে। এতে দূরশিক্ষার সমস্যা সমাধান ও পরিচালনগত কাজ অনেক সহজ হয়।

— দূরাগত শিক্ষার বর্তমান ভারতবর্ষে ভূমিকা এবং বাস্তবায়নে সীমাবদ্ধতার ধারণা ব্যাখ্যা কর। ৩+৩=৬

তৃতীয় অধ্যায় : শিক্ষা ও সমাজ

- ❖ **প্রথম একক :** শিক্ষা ও সমাজের সম্পর্ক
- ❖ **দ্বিতীয় একক :** শিক্ষা ও সামাজিক পরিবর্তন
- ❖ **তৃতীয় একক :** শিক্ষা এবং বিকাশ
- ❖ **চতুর্থ একক :** সামাজিক স্তর বিন্যাসের অর্থ ও ধারণা
- ❖ **পঞ্চম একক :** সামাজিক সচলতা এবং শিক্ষা, শিক্ষায় সুযোগের সমতা বিধান

শিক্ষা ও সমাজ (Education and Society)

উদ্দেশ্যসমূহ (Objectives) :

শিক্ষা ও সমাজের সম্পর্ক :

- শিক্ষার্থীরা শিক্ষা ও সমাজ সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবে।
- শিক্ষার্থীরা শিক্ষা ও সমাজে সম্পর্ক বিষয়ে অবগত হতে পারবে।

শিক্ষা ও সামাজিক পরিবর্তন :

- শিক্ষার্থীরা সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কে অবগত হতে পারবে।
- শিক্ষার্থীরা সামাজিকীকরণ সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবে।
- শিক্ষার্থীরা সমাজে পরিবর্তনে শিক্ষার ভূমিকা সম্পর্কে অবগত হবে।

শিক্ষা এবং বিকাশ :

- শিক্ষার্থীরা বিকাশের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে পরিচিত লাভ করবে।
- শিক্ষার্থীরা বিকাশের ক্ষেত্রে সামাজিক প্রভাবকারী উপাদানসমূহ সম্পর্কে অবগত হতে পারবে।
- শিক্ষার্থীরা বিকাশের ক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকা সম্পর্কে জানতে পারবে।

সামাজিক স্তরবিন্যাসের অর্থ ও ধারণা :

- শিক্ষার্থীরা সামাজিক স্তর এর বৈশিষ্ট্য, শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কে জানতে পারবে।
- শিক্ষার্থীরা শিক্ষার্থীরা শিক্ষার দ্বারা সামাজিক স্তরের সংহতিসাধন কিভাবে করা যায় তা উপলব্ধি করতে পারবে।

সামাজিক সচলতা এবং শিক্ষা, শিক্ষা সুযোগের সমতাবিধান :

- শিক্ষার্থীরা সামাজিক সচলতা সম্পর্কে বিস্তৃত ধারণা লাভ করতে পারবে।
- শিক্ষার্থীরা শিক্ষা ক্ষেত্রে সুযোগের সমতার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবগত হতে পারবে।

প্রথম একক শিক্ষা ও সমাজের সম্পর্ক

শিক্ষা কি ? (What is Education?) :

যুগে যুগে মানুষ আপন দৃষ্টিভঙ্গিতে কিংবা নিজস্ব জ্ঞানচর্চার ভিত্তিতে 'শিক্ষা' শব্দটির ব্যাখা দিয়েছেন, যেমন, - জীববিজ্ঞানীর কাছে 'শিক্ষা' হল অভিযোজন, মনোবিজ্ঞানীদের কাছে 'শিক্ষা' ও 'শিখন' প্রায় সমার্থক। দার্শনিকের কাছে 'শিক্ষা' হল তার নিজস্ব চিন্তাধারার প্রতিচ্ছবি । তেমনি ব্যক্তির বা মানুষের বর্হিজগতে যা কিছু আছে তার গভীরের প্রবেশ করেছে সমাজবিদ্যা এবং এর মূল বিষয়বস্তু হল সমাজ ও এর সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত বিষয়সমূহ।

সমাজ কি ? (What is Society ?) :

শিক্ষা বা Education এই ধারণার সাথে আমরা পূর্বে অবগত হয়েছি। এই প্রসঙ্গেঁ একথা বলা বাঞ্ছনীয় বর্তমান সমাজে শিক্ষার যে অবস্থা, তা অতীত শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে অনেকাংশে পরিবর্তিত এবং পরিমার্জিত। শিক্ষার এই পরিবর্তন ও পরিমার্জন সমাজের পরিবর্তন ও পরিমার্জনের সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। আজ সমাজ একটি গ্লোবাল ভিলেজে পরিবর্তিত হয়েছে, যার মূল চালিকাশক্তি হল শিক্ষা। শিক্ষা সম্পর্কিত ধারণা পরিস্ফুট হওয়ার সাথে সাথে সমাজ কি? সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা পরিস্কারভাবে লাভ করা প্রয়োজন।

সমাজ হল মানুষের সৃষ্টি, কোনো মানুষ একা বাঁচতে পারে না, মানুষ বিভিন্ন কারণে যূথবদ্ধতার চাহিদার (Gregarious Instinct) প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিল এবং এই যূথবদ্ধতা থেকেই সৃষ্টি হল সমাজের। সমাজ কবে উৎপত্তি হয়েছিল সে সম্পর্কে পরিস্কারভাবে কোনো ধারণা দেওয়া অত্যন্ত সহজ নয়, কিন্তু প্রথম সমাজব্যবস্থা থেকে শুরু করে বর্তমানকালের সমাজব্যবস্থার মূল চাবিকাঠিই হল মানুষের যূথবদ্ধতার প্রয়োজনীয়তা।

'Society' এই শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে ল্যাটিন (Latin) শব্দ 'Socius' যার মানে হচ্ছে সাহচার্য্যতা বা বন্ধুত্ব। অ্যারিস্টটলের (Aristotle) ভাষায় 'মানুষ হল সামাজিক জীব। অ্যারিস্টটল এই কথা বলে গিয়েছিলেন অনেক পূর্বে। মানুষ বাস করে বিভিন্ন স্থানে এবং সে কখনও একাকী জীবন ধারণ করতে পারে না। তাই মানুষ তার নিজের প্রয়োজনের স্বার্থেই অর্থাৎ সংঘবদ্ধভাবে থাকার জন্যই জন্ম দিয়েছিল সমাজের। এই প্রসঙ্গে একথা বলতে হচ্ছে যে সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে জনগোষ্ঠী (Population) যে রুপ প্রয়োজনীয়, ঠিক তেমনি এর জন্য প্রয়োজনীয় ভৌগোলিক অবস্থান এবং জনগোষ্ঠী এই দুটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে মূলত Society বা সমাজ ক্রমবির্বতন লাভ করেছে অর্থাৎ Society বা সমাজের বহুমাত্রিকতা বিস্তার লাভ করেছে।

সমাজের সংজ্ঞা (Definition) :

জি.ডি .এম. কোলে এর মতে সমাজ হল একটি সুসংবদ্ধ সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান যা সম্প্রদায় এর সাথে যুক্ত। (G.D.M Cole - " Society is the complex of organised associations and institutions with a community".)

প্রফেসর গিডিংস এর মতে সমাজ হল এমন একটি ঐক্য মূলক ব্যবস্থা বা সংঘ যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি বিধিবদ্ধ সম্পর্কের বন্ধনে পরস্পরের সাথে ঐক্যবদ্ধ হতে বাধ্য।(Prof. Giddings - " Society is the union itself, the organisation, the sum of formal relations in which associating individuals are bound together".)

ল্যাপিয়ার এর মতে সমাজ শব্দটি শুধু কিছু ব্যক্তির দল বোঝায় না, কিন্তু ইহা বোঝায় পারস্পরিক রীতিনীতির মিথস্ক্রিয়ার একটি জটিল প্রণালী যা তাদের থেকেই উৎপত্তি হয় এবং তাদের মধ্যেই নিহিত থাকে। (Lapire - "The term society refers not to group of people, but to the complex pattern of the norms of interaction".)

ম্যাকআইভার এর মতে সমাজ হল সম্পর্কের জাল।

(Maciver- "Society is a web of relationship.")

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলির বিশ্লেষণ করে বলা যায়-

সমাজ হল-
- সুসংবদ্ধ সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান।
- বিধিবদ্ধ সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ।
- ঐক্যবদ্ধতাই মূল চাবিকাঠি।
- সম্পর্কের জাল।

সমাজ সম্পর্কিত ধারণা (Concept of Society) :

ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে কোনো সম্পর্ক গড়ে উঠলেই তাকে একটি সমাজ বলা যায় না এবং ঐ সম্পর্ক জাল দ্বারা গঠিত সমাজ কখনই মূর্ত হতে পারে না, তাই সমাজও একটি বিমূর্ত ধারণা, সমাজ হল মূলত: একটি সংগঠন, ব্যক্তির ভেতরে গড়ে ওঠা সম্পর্ক-ব্যবস্থা অথবা মানুষের মধ্যে বিদ্যমান একটি ধাঁচ। সমাজ হল একটি গতিশীল তথা বিবর্তনমুখী ধাঁচ বা কাঠামো। বিভিন্ন প্রকার সাদৃশ্য ও বৈশাদৃশ্য নিয়েই সমাজ বহমান। বিভিন্ন বৈসাদৃশ্যের মধ্যে ঐক্যবিধান সমাজের অগ্রগমনে প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দিতা এবং দ্বন্দের ক্রিয়াশীলতা অনস্বীকার্য। সুতরাং বাদ (Thesis), প্রতিবাদ (Anti-thesis)— এই দুয়ের সংঘাতে সংশ্লেষ (Synthesis) ঘটে এবং নতুন বাদ (Thesis) এর আর্বিভাব ঘটে।

প্রতিটি সমাজের মধ্যেই রয়েছে শৃঙ্খল, সুসংগঠন, শ্রমবিভাগ, সংস্কৃতি, ইত্যাদি। কখনও কখনও এই বিষয়গুলি অত্যন্ত নিবিড় আবার কখনও কখনও এই বিষয়গুলি নিবিড় নয়। এর উপরই নির্ভর করে ব্যক্তির মানসিক বিকাশ যা সমাজকে এগিয়ে নেওয়ার একমাত্র হাতিয়ার। যেহেতু সমাজ একটি বিমূর্ত(Abstract) ধারণা সুতরাং সমাজের কোনো ইন্দ্রিয়গাহ বাহ্যিক অবয়ব নেই, সমাজ অনুভূতি কেন্দ্রীক। পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ সচেতনতা, ঐক্যবোধ সহযোগিতা, সহনশীলতা ইত্যাদি সমাজ গঠনের মূল

ভিত্তি রুপে কাজ করে একদিকে এবং সমাজ গড়ে সমাজ গড়ে উঠার মূলে বিভিন্ন বৈশাদৃশ্যতার (বেশভূষা, খাদ্যাভাস, বৃত্তি নির্বাচনের ভিন্নতা) গুরুত্ব রয়েছে অন্যদিকে। কারণ- সর্বক্ষেত্রে যদি সাদৃশ্যের (বেশভূষা, খাদ্যাভাস, বৃত্তি নির্বাচনের অনুকরণ) ভিত্তিতে সমাজ স্থাপিত হয়, তখন সামাজিক সম্পর্ক বলে কিছু স্থাপিত হবে না। তাই সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে ভিন্নতা ও অভিন্নতা উভয়েরই গুরত্ব ও তাৎপর্য অনস্বীকার্য। সামাজিক এই কার্য প্রক্রিয়াকেই সমাজের মূল চাবিকাঠি হিসেবে গণ্য করা হয়। সামাজিক আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, প্রথা-প্রকরণের মাধ্যমেই সামাজিক কার্যপ্রক্রিয়া ক্রমপ্রকাশিত হয়ে থাকে এবং একটি সাংগঠনিক রুপে বিকাশ লাভ করে। এককথায় বলা যায় সমাজ হল একটি নিরবিচ্ছিন্ন কার্যপ্রক্রিয়ার বিকাশ, অবিরাম স্রোতধারার মত গতিশীল এবং সতত:পরিবর্তনশীল।

সমাজের বৈশিষ্ট্য (Characteristic of Society) :

Society বা সমাজের মূল কিছু বৈশিষ্ট্য হল নিম্নরুপ :

ক) সমাজ ব্যক্তিনির্ভর (Society Consists of People): যে কোনো সমাজ সৃষ্টি হতে হলে প্রয়োজন ব্যক্তির, কারণ ব্যক্তিকে নিয়েই সমাজ। পাশাপাশি সমাজের মধ্যেই ব্যক্তি অর্থাৎ যেমন ব্যক্তি ছাড়া কোনো সমাজ গড়ে উঠতে পারে না তেমনি কোনো সামাজিক জীবনও গড়ে উঠতে পারে না।

খ) পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া এবং পারস্পরিক সচেতনতা (Mutual Interaction and Mutual Awareness): সমাজ হল কিছু ব্যক্তিকে নিয়ে গঠিত একটি জনগোষ্ঠী (Group of People) যাদের মধ্যে সর্বদা মিথস্ক্রিয়া বজায় থাকে। এই ভাবের আদান প্রদান হয়ে থাকে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে। এই মিথস্ক্রিয়া হল মূলত: এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি অন্য একজন ব্যক্তি বা অনেক ব্যক্তির সাথে আন্ত:যোগাযোগ স্থাপন করে থাকেন। এই মিথস্ক্রিয়াই (Interaction) সচেতনার জন্ম দেয় এবং সচেতনতা থেকেই সমাজস্থ বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্কের গভীরতা মাত্রা নির্দেশ করে।

গ) সমাজ পছন্দ নির্ভর (Society Depends on Likeness): কোনো বিষয়কে কেন্দ্র করে পছন্দ নির্ভরতাই যে কোনো সমাজের মূল চালিকাশক্তি। এই পছন্দের মাত্রা নির্দেশ করে সাদৃশ্যতার উপর। বিভিন্ন ব্যক্তি তাদের চাহিদা, কর্ম, লক্ষ্য, আদর্শ, জীবনের প্রতি ধারণা ইত্যাদি সাদৃশ্যের উপর নির্ভর করেই সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং ইংরাজীর একটি প্রবাদ এখানে প্রণিধানযোগ্য 'Birds of the same feather flock together'.

ঘ) সমাজ অপছন্দ নির্ভর (Society Relies on Dislikeness): Likeness বা পছন্দ যেমন সমাজ গঠনে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় ঠিক তেমনি Dislikeness বা অপছন্দতা ও সমাজ গঠনেও ভূমিকা নেয়, উদাহরণ স্বরুপ বলা যায় বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে সামর্থ্য, প্রতিভা, রুচি, বুদ্ধিমত্তা, বিশ্বাস, সৃজনক্ষমতা, নান্দনিকতা ইত্যাদিতে তারতম্য বিদ্যমান এবং এই তারতম্য সেই ব্যক্তিসকলের মধ্যে বৈসাদৃশ্যের বীজ বপন করে। সেজন্যই সমাজে ব্যক্তিবর্গ শ্রমিক, শিক্ষক/শিক্ষিকা, সৈনিক, ব্যবসায়ী, ব্যঙ্ককর্মী, ডাক্তার, সেবিকা, ইনজিনীয়ার, আইনজীবি, শিল্পী, বিজ্ঞানী, ইত্যাদি বিভিন্ন বিভাজন দেখা যায় এবং এই বিভাজনের মূল চাবিকাঠিই হল বৈসাদৃশ্যতা।

ঙ) শ্রমবিভাজন (Division of Labour) : সমাজের একটি ক্ষুদ্রতম একক হল পরিবার (Family) যার মধ্যে পিতা-মাতা, এবং অন্যান্য সদস্যদের কর্মের গতিধারা সুনির্দিষ্ট এবং কর্মের বিভাজন পরিবারের

বৃহত্তর ক্ষেত্র সমাজের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়, যেমন- কৃষিকার্যে যুক্ত কৃষক, কলকারখানায় যুক্ত শ্রমিক, অধ্যয়নে যুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকারা, আইনের কাজে যুক্ত আইনজীবিরা, স্থপতি বিদ্যায় যুক্ত প্রকৌশলীরা, ব্যবসার কাজে যুক্ত ব্যবসায়ীরা, ইত্যাদি।

চ) সমাজ পরস্পর নির্ভর (Interdependence in Society): সমাজ হল একটি মানববন্ধনের পারস্পরিক ক্রমশৃঙ্খল (Human Chain) এবং এই অদৃশ্য শৃঙ্খলতাতেই সমাজের মধ্যে প্রতিটি ব্যক্তিই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পারস্পরিক নির্ভরতার বন্ধনে আবদ্ধ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়- প্রতিটি ব্যক্তির জীবনধারা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় পারস্পরিক মানববন্ধন ব্যতীত কোনো ব্যক্তিরই জীবনশৈলী সম্পূর্ণ হয় না।

ছ) সমাজ গতিশীল (Society is Dynamic) : সমাজ হচ্ছে বহমান নদীর স্রোতের মত এবং কখনই নিশ্চল(Static) নয়। কখনও এই পরিবর্তন গুরত্বপূর্ণভাবে লক্ষ্যণীয় আবার কখনও সেই স্পষ্ট রুপে লক্ষ্যণীয় নয়। কিন্তু পরিবর্তনশীলতা একটি সমাজের গতিধারা স্থির করে দেয়।

জ) সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (Social Control) : সামাজিক নিয়ন্ত্রণ নির্ভর করে সেই সমাজের ব্যক্তিবর্গের ব্যবহারের উপর। প্রতিটি সমাজেই তার নির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্য থাকে এবং সেই লক্ষ্য পূরণের ক্ষেত্রে নিয়োজিত থাকে সেই সমাজের চালিকাশক্তি অর্থাৎ বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ। এই সমস্ত ব্যক্তিবর্গ এবং তাদের কার্যপদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত হয় বিভিন্ন ধরণের বিধিবদ্ধ (Formal) যেমন- আইন, আদালত, প্রশাসন ইত্যাদি এবং অবিধিবদ্ধ (Informal) যেমন রীতিনীতি(Mores) আচরণ (Manners), লোকাচার(Folkways), সৃষ্টাচার(Etiquette) ইত্যাদি বিষয়ের উপর। কখনও কখনও বিধিবদ্ধ এবং অবিধিবদ্ধ এই দুটির মেলবন্ধনে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে আবার কখনও এরা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ভাবেও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে।

সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার প্রকারভেদ (Kinds of Social Interaction) :

একটি সমাজে একজন ব্যক্তির আচরণ অন্য অপর ব্যক্তির আচরণ দ্বারা প্রভাবিত হয় ঠিক তেমনি অন্যান্য ব্যক্তিদের আচরণ দ্বারা সেই ব্যক্তির আচরণও প্রভাবিত হয়। আচরণগত পারস্পরিক এই প্রভাব- প্রতিক্রিয়াই হল মিথস্ক্রিয়া (Interaction) এবং সমাজের মূল কেন্দ্রই হল এই মিথস্ক্রিয়া। সামাজিক এই মিথস্ক্রিয়ার মূল দুটি শর্ত বর্তমান : (ক) সামাজিক সংস্পর্শ (খ) সামাজিক যোগাযোগ।

যেহেতু মানবসমাজ হলো আন্ত:মানবিক সম্পর্কের এক বিন্যাস বিশেষ, তাই এই সম্পর্ক প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত হয় বিভিন্ন ধরণের কার্যপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে, যার মধ্যে মূল প্রকারভেদ গুলো হলো :

প্রকারভেদ

- প্রতিযোগিতা (Competition)
- দ্বন্দ্ব (Conflict)
- উপযোজন (Accommodation)
- আত্তীকরণ (Assimilation)
- সহযোগিতা (Co-operation)

(১) প্রতিযোগিতা (Competition) - সমাজবদ্ধ মানুষের কার্যপ্রক্রিয়ার একটি অপরিহার্য অংশ হল প্রতিযোগীতা, প্রতিযোগিতা হল সমাজের মধ্যে প্রতিটি ব্যক্তির বেঁচে থাকার তাগিদ এবং সংগ্রামের এক মৌলিক রূপ, পারস্পরিক নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য সামঞ্জস্য ব্যক্তিবর্গ প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। সমাজে প্রতিযোগিতার ফলেই সমাজ বহমান। সমাজ জীবনে সুস্থ প্রতিযোগিতার দ্বারাই ক্রমবির্বতনের পথে এগিয়ে যায়।

(২) দ্বন্দ্ব (Conflict) - মানবসমাজের কার্যপ্রক্রিয়া একটি গুরত্বপূর্ণ দিক হল দ্বন্দ্ব। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্ম প্রক্রিয়ায় দ্বন্দ্ব বর্ণিত হয়। বেঁচে থাকার তাগিদেই মানুষের গোষ্ঠীজীবনের গুরত্ব ও তাৎপর্যপূর্ণ দিক হল দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্ব মানেই সংহতি বা ঐক্যের বিরোধ। আরো স্পষ্ট ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় কোন লক্ষ্যের বা উদ্দেশ্যের প্রতি মতানৈক্য যখন সুপ্ত অবস্থায় থাকে তখন তাকে বিরোধ বলে পরিগণিত করা যায়, যেখানে দ্বন্দ্ব হল বিরোধের এক চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ।

(৩) উপযোজন (Accommodation)- সমাজজীবন সুস্থ ও শান্তিপূর্ণ অবস্থাকে অব্যহত রাখার জন্য উপযোজনই হল একমাত্র মাধ্যম। বিবাদ বা বিরোধকে দুরে সরিয়ে সামাজিক মিথস্ক্রিয়া অক্ষুন্ন রাখার স্বচ্ছ প্রক্রিয়াই হল উপযোজন। এককথায় বলা যায় গোষ্ঠীজীবনে দ্বন্দ্ব আছে বলেই উপযোজনের গুরত্ব অনস্বীকার্য। উপযোজন মানেই হল আলোচনা বা বোঝাপড়ার মাধ্যমে দ্বন্দ্বের দূরীকরণ বা অব্যাহতি দেওয়া। পাশাপাশি উপযোজনের মাধ্যমেই সম্ভব নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে সংগতিবিধান ঘটানো, সহজভাবে বলতে গেলে উপযোজন হল সমাজস্থ বিভিন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে পারস্পরিক সহাবস্থান।

(৪) আত্তীকরণ (Assimilation) - সমাজস্থ বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক সংস্পর্শ ক্রমশই বিভিন্ন আচার-আচরণ, মনোভাব, রীতি-নীতি, মূল্যবোধ, ইত্যাদির সংমিশ্রণ ঘটে। আত্তীকরণ হল এমন একটি কার্যপ্রক্রিয়া যার দ্বারা বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের মধ্যে একটি সুসংহত সামঞ্জস্যকরণ সম্ভব হয়।আত্তীকরণের মূল কার্যপ্রক্রিয়ার বিষয় হল অন্য সংস্কৃতি থেকে সাংস্কৃতিক উপাদান গ্রহণের ধারা (Acculturation)। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতি সম্প্রদায়ের প্রধান উৎসব খারচী পূজা এবং বাঙ্গালীদের প্রধান উৎসব দুর্গাপূজা। আত্তীকরণ মাধ্যমেই একে অপরের সংস্কৃতির মধ্যে মেলবন্ধন ঘটায়।

(৫) সহযোগিতা (Co-operation)- মূলত:প্রতিযোগিতার বিপরীত অবস্থাকে সহযোগিতা বলে গণ্য করা হয়। কোন লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য যখন নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তিবর্গ একত্রিত হয় এবং পারস্পরিক কার্যপ্রক্রিয়ায় লিপ্ত হয় তখন ইহাকে সহযোগিতা বলে পরিগণিত করা হয়। সহযোগিতা হল একটি অভিন্ন আদর্শের অনুভূতি এবং ইহাকে কেন্দ্র করে এক গভীর একাত্তবোধ জাগ্রত হয়। সহযোগীতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে ‘অনুরূপ স্বার্থ’ (Like Interest) বাঞ্ছনীয়। সহযোগিতা ব্যতীত সুষ্ঠ সমাজ অকল্পনীয়। সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার প্রকারভেদগুলোর মধ্যে সহযোগিতাই অন্যতম মাধ্যম যা সমাজের উন্থান পতনের হাতিয়ার।

আলোচনায় বলা যায় সামাজিক আদান- প্রদানে বিবেকানন্দের উক্তিটিই প্রণিধানযোগ্য। বিবেকানন্দের মতে ‘Education is the manifestation of perfection already in man’. শিক্ষাই সমাজের ব্যক্তিবর্গের মানসিকতার পরিবর্তন এবং পরিমার্জন করে। পাশাপাশি সুষ্ঠ সুন্দর কলুষিত মুক্ত সমাজ গড়তে সাহায্য করে।

শিক্ষা এবং সমাজের সম্পর্ক (Relation between Education and Society)

প্রতিটি ব্যক্তি সমাজবদ্ধ। ব্যক্তির আচরণের সঠিক বহি:প্রকাশ শিক্ষা দ্বারা সার্থক ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং শিক্ষা ও সমাজ পরস্পর সহগতির সম্পর্কে আবদ্ধ (যেমন, সমাজে শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে সমাজের বিকাশ ও পরিলক্ষিত হয়)। কারণ শিক্ষা ব্যতীত কোনো সমাজই তাহার সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন সাধন করতে পারে না।

সমাজের প্রধান দুটি বিভাগ হল- মুক্ত সমাজ (Open Society) এবং রুদ্ধ সমাজ (Close Society)। মুক্ত সমাজ হল গতিশীল এবং পরিবর্তনশীল। এই সমাজে কর্মসংস্থান, শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশা বা বৃত্তি নির্বাচন, আয়ের সংস্থানের পরিবর্তন, বৈবাহিক অবস্থানের পরিবর্তন, সন্তান সংখ্যার পরিবর্তন, ইত্যাদি গতিশীলতার আবহে আবহমান। কিন্তু পাশাপাশি রুদ্ধ সমাজে ব্যক্তির মানসিকতা অপরিবর্তনীয় থাকে। ফলে সামাজিক পরিকাঠামো উন্নয়ন সামাজিক গতিধারায় তাল মিলিয়ে চলতে পারে না। সমাজ একই জায়গায় থেমে থাকে।

শিক্ষা সম্পর্কে সঠিক ধারণা সমাজস্থ প্রতিটি ব্যক্তির কাছে সুস্পষ্ট হলে সমাজ ক্রমবির্বতনের দিকে স্বত:স্ফুর্তভাবে এগিয়ে যায়, অর্থাৎ শিক্ষা সমাজে অনুঘটকের কাজ করে। শিক্ষা ব্যক্তির মধ্যে কাঙ্খিত পরিবর্তন আনে এবং এই ব্যক্তি সমাজব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে। ফলে শিক্ষা-ব্যক্তি-সমাজ এই তিনটি ধারণা চক্রাকার সম্পর্কে (Cyclic Order) এ সম্পর্কযুক্ত। পারস্পরিক সম্পর্কটি নিম্নে প্রদত্ত করা হল (Diagram) রেখাচিত্রের মাধ্যমেঃ

শিক্ষার সাথে ব্যক্তি সমাজ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত তা নিম্নে আলোচনা করা হল -

- শিক্ষা সমাজের মনোভাব এবং বিশ্বাসের পরিবর্তন ঘটাতে সহায়তা করে। শিক্ষার দ্বারা সমাজের ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সংকীর্ণ মানসিকতা দূর হয়ে একটি উন্নত সমাজ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে।
- সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তন সাধিত হয় শিক্ষার স্পর্শে। সমাজের মধ্যে কুসংস্কার,অন্ধবিশ্বাস, রীতি-নীতি ইত্যাদির পরিবর্তন হচ্ছে শিক্ষার দ্বারা।
- শিক্ষা ব্যক্তির আচরণধারার পরিবর্তন ঘটায় এবং প্রতিটি ব্যক্তিকে সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করতে নির্দেশ দেয়।
- পূর্ববতী প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য জ্ঞান ও ঐতিহ্যের সংরক্ষণ ও সঞ্চালন একমাত্র শিক্ষার দ্বারাই সাধিত হয়।

- ❖ শিক্ষার দ্বারা সামাজিক শ্রেণীবিভাগ ও শ্রমবন্টন অনেকটাই গ্রহণযোগ্য এবং সংকীর্ণতার দোষ থেকে বহুলাংশে মুক্ত।
- ❖ সামাজিক কৃষ্টি ও সংস্কৃতিগত পরিবর্তন, সামাজিক বিবর্তন, ইত্যাদি শিক্ষার মাধ্যমেই সম্ভবপর হচ্ছে। এই প্রসঙ্গো পিটার ওরসলি মতে শিক্ষা সমাজের প্রতিফলন ঘটায় এবং শিক্ষার পরিবর্তন সমাজ পরিবর্তনকে অনুসরন করে। (Peter Worsley - " Education reflects society and educational change follows social change".)
- ❖ শিক্ষা সমাজের জ্ঞান অর্জনের স্পৃহা বাড়িয়ে দিয়েছে। ফলে শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন ধারণার হচ্ছে, যেমন- নাগরিকতার শিক্ষা, অবসর যাপনের শিক্ষা, মানবিকতার শিক্ষা, মূল্যবোধের শিক্ষা, গনতন্ত্রের জন্য শিক্ষা, ব্যক্তিত্বের জন্য শিক্ষা ইত্যাদি উন্মেষিত হয়েছে।
- ❖ শিক্ষা সমাজকে একটি সুসংগঠিত প্রতিষ্ঠানে (Organised Institution) পরিবর্তিত করতে সমর্থ হয়েছে, প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গোঁ বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার তুলনা করলেই এই ধারণাটুকু স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

❖ *সমাজের বিভিন্ন গুরত্বপূর্ণ উপাদানগুলি যেমন -*

- জৈব উপাদান (জনবসতির ঘনত্ব, জন্ম-মৃত্যুর হার ইত্যাদি)
- আদর্শগত উপাদান (সামাজিক আচার-আচরণ, রীতি নীতি ইত্যাদি)
- শিল্পগত উপাদান (শ্রমিক, মালিক, পুঁজি, উৎপাদন ইত্যাদি)
- অর্থনৈতিক উপাদান (আয়, ব্যয়, বণ্টন ইত্যাদি)
- ধর্মীয় উপাদান (ইন্দ্রিয়াতীত বিশ্বাস, অতিপ্রাকৃতিক ভাবনা ইত্যাদি)
- সাংস্কৃতিক উপাদান (মূল্যবোধ, খাদ্যাভাস, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি)
- মনস্তাত্বিক উপাদান (মানসিক ভাবনা-চিন্তা, দৃষ্টিভঙ্গীঁ, আবেগ ইত্যাদি)

শিক্ষার মেলবন্ধনেই সঠিকভাবে সংযুক্ত হয় সমাজ এই প্রসঙ্গোঁই ব্রাউন এর উক্তিটি না বললেই নয়, শিক্ষা হল এত প্রক্রিয়া যা সমাজের আচরনের ব্যবহারের পরিবর্তন ঘটায়। (Brown - "Education is process which brings about changes in the behaviour of society.")

পৃথিবীর আদিম সমাজ ছিল সহজ ও সরল, সমাজ প্রাক্-সভ্য (Primitive) প্রাচীন (Ancient) অবস্থায় জটিলতার সন্মুখীন হয় নি, কিন্তু সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে সমাজ বিভিন্ন জটিলতার ধারণার সাথে পরিচিত হয়েছে যেমন - পাশ্চাত্যকরণ (Westernisation), আধুনিকীকরণ (Modernisation), বিশ্বায়ন (Globalisation) ইত্যাদির ফলে মানুষে মানুষে যে ভেদাভেদ তা অনেকাংশেই পরিবর্তিত রুপ নিয়েছে প্রকৃত শিক্ষার দ্বারা যা সবাই উপলব্ধি করতে পেরেছে। আমরা এক পৃথিবী, এক মায়ের সন্তান এবং আমাদের বাসস্থান একটাই (Global Village) এই ধারণাটি একমাত্র শিক্ষার দ্বারাই সম্ভব হয়েছে। এই প্রসঙ্গো জ্যাঁক ডেলারস্ (Jacques Delors) কমিশন একুশ শতকের শিক্ষার উপর প্রকাশিত 'Learning: the treasure within' নামে প্রতিবেদনটিতে শিক্ষার যে চারটি স্তম্ভ বা উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন তা নিম্নে বর্ণিত হল—

শিক্ষার উদ্দেশ্য বা স্তম্ভ

১) জানার জন্য শিখা (Learning to Know)

২) কর্মের জন্য শিখা (Learning to Do)

৩) একত্রে বসবাসের জন্য শিখা (Learning to Live Together)

৪) মানুষ হতে শিখা (Learning to Be)

এই স্তম্ভগুলি সমাজের প্রতিটি নাগরিককে বিশ্ব-নাগরিক হিসেবে সমৃদ্ধ করতে পেরেছ যা রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভাষায় - ' নিজের সে, বিশ্বের সে, বিশ্বদেবতার' ।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সুস্পষ্ট যে, প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থা থেকে শুধু করে আধুনিক সমাজ ব্যবস্থা পর্যন্ত - ব্যক্তি ও সমাজের যে ক্রমবির্বতন তা মূলত: সম্ভবপর হয়েছে শিক্ষা ও সমাজের পারস্পরিক সহগতির সম্পর্কের ভিত্তিতে।

দ্বিতীয় একক শিক্ষা এবং সামাজিক পরিবর্তন

সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা (Concept of Social Change) :

সমাজ গতিশীল, পরিবর্তনের আর্বতে আর্বতিত। বেশিরভাগ সময়েই স্থিতীশীলতা (Stability) ও পরিবর্তন (Change) এর মধ্যবর্তী স্থানে সমাজের অবস্থান, সমাজ সম্পূর্ণরূপে কখনই ভেঙ্গো যায় না, ব্যক্তিরাও বেরিয়ে যায় না, শুধুমাত্র নতুন পরিবেশ (Milieu) তাদের সামনে আবির্ভূত হয়। স্থিতিশীলতা (Stability) যেমন প্রকৃতপক্ষে স্থিতীশীল (Stable) নয়, তেমনি পরিবর্তনও স্থিতীশীলতা, এটি হল একটি ভারসাম্য অবস্থান (Condition of Equilibrium)। স্থিতীশীলতা কখনই পরিবর্তনকে বহির্ভূত করে না, পরিবর্তন এর প্রকৃতির মধ্যেই বিরাজিত। কোন প্রক্রিয়ার নিরন্তরতার মধ্যেই সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়। সামাজিক কাঠামোর 'সংহিতায়ন' (Codification) ও সামাজিক পরিবর্তন রূপে গণ্য হয়। সুতরাং সামাজিক পরিবর্তন হলো একটি সমাজের ক্রমান্বয়ী বিকাশ কিন্তু অতীত থেকে সম্পূর্ণ বিশ্লিষ্ট নয়। সামাজিক পরিবর্তনের পেছনে যে ধারণা সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ তা হল গভীর সমষ্টিবদ্ধতার চেতনা (Deep Collective Sense)।

সমাজ মূলত: বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যে আন্ত:ব্যক্তিক মিথস্ক্রিয়া তার বন্ধন, যেহেতু এই মিথস্ক্রিয়া গতিশীল ও পরিবর্তনশীল তাই সমাজও গতিশীল ও পরিবর্তনশীল। এই প্রসঙ্গেঁ এল. ভন. ওয়সে এর উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য : সমাজ হল একটি প্রক্রিয়া, উৎপাদনমূখী নয়। (L.Von Wiese - "Society is a process, not product".) কখনও কখনও সমাজের পরিবর্তন অতি মন্থর, আবার কখনও অতি দ্রুত। সমাজের এই পরিবর্তন সামগ্রিক ও আংশিক এই দুই ভাগে বিভক্ত হলেও অনেক সময় সুস্পষ্ট করা গেলেও, সামগ্রিক পরিবর্তন অতীতের সাথেই স্বল্প হলেও যোগসূত্র বজায় রাখে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ই অক্টোবর(15th October 1949), ত্রিপুরা রাজন্য শাসিত সমাজ ব্যবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে ভারতের গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সাথে যুক্ত হয়। এই পরিবর্তন আপাত দৃষ্টিতে সামগ্রিক হলেও, মূলত: অতীতের হাত ধরেই এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল, ফলে সমাজের এই পরিবর্তন পরোক্ষভাবে আংশিকও বটে। কারণ রাজন্যশাসিত সমাজের প্রবাহ বর্তমান ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক সমাজকেও নানাভাবে প্রভাবিত করে আসছে তাহার কৃষ্টি , সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ইত্যাদির দ্বারা।

শিক্ষা এবং সমাজ (Education and Society) :

সংজ্ঞা : জি.ডি.এম.কোলে এর মতে সমাজ হল একটি সুসংবদ্ধ সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান যা সম্প্রদায়ের সাথে যুক্ত। (G.D.M. Cole-" Society is the complex of organised association and institution with a community.")

প্রফেসর গিডিংসর মতে সমাজ হল এমন একটি ঐক্যমূলক ব্যবস্থা বা সংঘ যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি বিধিবদ্ধ সম্পর্কের বন্ধনে পরস্পরের সাথে ঐক্যবদ্ধ হতে বাধ্য। (Prof. Giddings-" Society is the

union itself ; the organisation, the sum of formal relations in which associating individuals are bound together. ")

লেপিয়ার বলেছেন সমাজ শব্দটি শুধু কিছু ব্যক্তির দল বোঝায় না কিন্তু ইহা বোঝায় পারস্পরিক রীতিনীতি ও মিথস্ক্রিয়ার একটি জটিল প্রণালী যা তাদের থেকেই উৎপত্তি হয় এবং তাদের মধ্যেই নিহিত থাকে।(Lapiere-" The term society refers not to group of people, but to the complex pattern of the norms of interaction, that arise among and between them.")

ম্যাকাইভার এর মতে সমাজ হল সম্পর্কের জাল। ((Maciver- "Society is a web of social relationship.")

উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলির বিশ্লেষন করে বলা যায় যে সমাজ হল ঃ

- একটি সুসংবদ্ধ সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান
- একটি ঐক্যমূলক ব্যবস্থা
- পারস্পরিক রীতিনীতি ও মিথস্ক্রিয়ার একটি জটিল প্রণালী
- সম্পর্কের জাল।

সামাজিক পরিবর্তনের সংজ্ঞা (Definition of Social Change) :

কিনস্‌লে ডেভিসের (Kingsley Davis) মতে - সামাজিক পরিবর্তন দ্বারা বুঝায় সামাজিক সংঘের কিছু পরিবর্তন — যা হল সমাজের কাঠামোর এবং কার্যকারিতর পরিবর্তন। (Kingsley Davis - " By social change is meant only such alteration as occur in social organisation- that is the structure and functions of society".)

এম.ই.জোনস্‌-র মতে — সামাজিক পরিবর্তন হল এমন একটি কথা যা ব্যবহৃত হয় তারতম্য ব্যাখা করতে অথবা পরিমার্জন অথবা কোনো সামাজিক প্রক্রিয়া , সামাজিক কাঠামো, সামাজিক মিথস্ক্রিয়া বা সামাজিক সংঘের পরিবর্তন সূচীত করতে। (M.E. Jones - " Social change is a term used to describe variation in, or modifications of, any aspect of social process, social pattern, social interaction or social organisation".)

মজুমদার এইচ. টি. এর মতে সামাজিক পরিবর্তনকে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে এমন একটি ফ্যাসান অথবা ধারক হিসাবে যার দ্বারা বুঝানো হয় ব্যক্তি জীবনের মধ্যে অতীতের পরিমার্জন বা পুন:স্থাপন করার বিষয়কে অথবা সামাজিক সক্রিয়তার পরিবর্তনকে। (Majumder, H.T.- "Social change may be defined as a new fashion or mode, either modifying or replacing the old, in the life of a people- or in the operation of society".)

ম্যাকাইভার বলেছেন সামাজিক পরিবর্তন হল মানব-সম্পর্কের এক সহজ বা সরল পরিবর্তন। (Maciver-Social change " as simply a change in the human relationships".)

এইচ.এম.জনসন বলেছেন সামাজিকীকরণ হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা কোনো একক ব্যক্তি গোষ্ঠীর প্রচলিত রীতিনীতিগুলির সাথে অনুরুপতা ঘটাতে সম্ভবপর হয়। (H.M. Jhonson- "Socialization is a learning that enables the learner to perform social roles".)

ম্যাকাইভার এর মতে সামাজিক পরিবর্তন হল মানুষের সম্পর্কের পরিবর্তন। (Maciver - “Society is a web of social relationship”.)

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলির আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় সামাজিক পরিবর্তন হল-

- সমাজের কাঠামোর পরিবর্তন,
- সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার ফল,
- সামাজিক কার্যধারার পরিমার্জন,
- সামাজিক সক্রিয়তার ফল।

সামাজিক পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Social Change) :

সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা সঠিক ভাবে উপলব্ধি করতে হলে এর কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্যের সাথে অবগত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। নিম্নে মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা করা হল—

(১) সামাজিক পরিবর্তন একটি চিরন্তন প্রক্রিয়া। যে কোনো সমাজই একটি নির্দিষ্ট মৌলিক কাঠামোতে বহুকাল ধরে স্থির থাকতে পারে না।

(২) সামাজিক পরিবর্তন কখনও সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায় আবার কখনও আংশিকভাবেও চিহ্নিত করা যায়।

(৩) সামাজিক পরিবর্তন মূলত : একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যকে কেন্দ্র করেও আবর্তিত হয় এবং এই আবর্তন প্রক্রিয়া সামাজিক পরিবর্তনকে সুনিশ্চিত করতে সহায়তা করে।

(৪) সামাজিক পরিবর্তন কখনও সমষ্টিবদ্ধতার চেতনার (Collective Sense) কারণে পরিকল্পনা মাফিক হতে পারে আবার কখনও অপরিকল্পনা মাফিক ও হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় রাজনৈতিক কারণে সামাজিক পরিবর্তন পরিকল্পনামাফিক পাশাপাশি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে সামাজিক পরিবর্তন হয় পরিকল্পনা বিহীনভাবে।

(৫) সামাজিক পরিবর্তনের পেছনে একটি কারণ সুনির্দিষ্টভাবে থাকে না বরং বিভিন্ন কারণ সমূহ এর সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে।

(৬) বৈচিত্র্যতার ভিত্তিতে ও সামাজিক পরিবর্তন হয়ে থাকে। তবে সেই পরিবর্তন দীর্ঘস্থায়ী ও হতে পারে আবার ক্ষণস্থায়ী ও হতে পারে।

(৭) সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক পরিবর্তন দ্রুতগতিতে ঘটে থাকে। আগাম বার্তা না দিয়েও হঠাৎ-ই সামাজিক পরিবর্তন ঘটতে পারে। উদাহরণ স্বরুপ বলা যায় যে দেশ বিভাগের পর ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গঁ এবং বাংলাদেশের ব্যক্তিদের মধ্যে যে সামাজিক পরিবর্তন ঘটে ছিল তা।

(৮) নির্দিষ্ট একজন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে সামাজিক পরিবর্তন অসম্ভব। গোষ্ঠীবদ্ধতাই সামাজিক পরিবর্তনের মূল চাবিকাঠি।

(৯) সমাজ এক জায়গায় থেমে থাকে না, গতিশীল। তাই গতিশীলতার আবর্তে আর্বতিত হয়ে দ্রুত কিংবা মন্থর গতিতে সমাজের পরিবর্তন হয়ে থাকে।

(১০) সামাজিক উন্নয়নতা সামাজিক পরিবর্তনের ভিত্তি হয়ে থাকে। সামাজিক নাগরিক হিসেবে প্রত্যেকেই

দাবী করতে পারে উন্নয়নশীল সমাজ। চিন্তন, মনন, চাহিদা কেন্দ্র করে ঐক্যবদ্ধতার মাধ্যমেই সামাজিক পরিবর্তন সম্ভব হয়ে থাকে।

সামাজিক পরিবর্তনের উপাদানসমূহ (Factors of Social Change) :

সামাজিক পরিবর্তনের উপাদান:

- জৈবিক উপাদান (Biological Factors) - জন্ম মৃত্যুর হার, গড় আয়ু,
- মনস্তাত্ত্বিক উপাদান (Psychological Factors) - আদর্শ, চিন্তাধারা,
- অর্থনৈতিক উপাদান (Economic Factors) - চাহিদা, উৎপাদন, যোগান,
- সাংস্কৃতিক উপাদান (Cultural Factors) - ধর্ম-বিশ্বাস, মূল্যবোধ,
- প্রযুক্তিগত উপাদান (Technological Factors) - আবিস্কার, উৎভাবন।

সামাজিক পরিবর্তন ও সামাজিকীকরণের বাস্তব গ্রাহ্যতা (Rationale of Socialisation in Keeping with Social Change)

যে কোনো একটি সমাজ যখন তার কাঠামোর সম্পূর্ণ বা আংশিক পরিবর্তন ঘটায়, তখন তাকে সামাজিক পরিবর্তন হিসেবে পরিগণিত করা যায়। মহান দার্শনিক অ্যরিস্টটলের (Aristotle) ভাষায় : মানুষ সামাজিক জীব। সমাজের পরিবর্তন মানেই তার মধ্যস্থ ব্যক্তিবর্গের পরিবর্তন কারণ সমাজ বা Society হলো : A web of human inter-relation. অর্থাৎ ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পারস্পরিক সম্পর্কের শাখা বা জাল। এই শাখা বা জাল যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সর্বাপেক্ষা প্রভাবিত হয় বা একজন ব্যক্তি একজন সামাজিক ব্যক্তিতে পর্যবসিত হয় তা হল সামাজিকীকরণ বা Socialisation .

তাই একজন শিশুর একজন ব্যক্তিতে (Person) পরিণত হওয়ার জন্য দরকার অতীতের জ্ঞাণ, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, অভিজ্ঞতা ইত্যদি। আরো সহজ ভাবে বলা যায় একটি শিশু যা চিন্তা করে, সেটা তার বাইরের আচার-আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ করা যা সম্ভবপর হয় সামাজিক দীক্ষিত করণ বা Social Indoctrination এর মাধ্যমে। ইহা আর কিছুই নয়, পারপার্শ্বিক সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিদের আচার-ব্যবহার অনুসরণ করা যা মূলত: হল অভ্যস্তকরণ বা Habituation যাকে আরো সহজ ভাষায় বলতে গেলে বলা যায় একটি শিশু যখন তার নিজের আচার-আচরণের পরিমার্জন ঘটাতে সক্ষম হয়। এই প্রসঙ্গে W.F Ogburn -র উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য - " Socialisation is the process by which the individual learns to conform to the norms of the group". অর্থাৎ সামাজিকীকরণ হল সেই প্রক্রিয়া যার দ্বারা ব্যক্তি তার গোষ্ঠীর নিয়মনীতির সাথে পরিচিত হতে পারে।

সামাজিকীকরণ হল মূলত: এমন একটি ক্রমসামঞ্জস্যবিধান মূলক নিরন্তর ও বিরামহীন প্রক্রিয়া যার উৎস আছে কিন্তু শেষ বিন্দুটুকু নেই। তাই বলা হয় জন্মের সাথে সাথে সামাজিকীকরণের সূচনা হয় এবং মৃত্যুর সাথে সাথে সামাজিকীকরণের সমাপ্তি ঘটে অর্থাৎ শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণদেবের ভাষায়- যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি। সামাজিকীকরণ হল সমাজের অর্ন্তভূক্ত ব্যক্তি কিভাবে তার সামাজিক ভূমিকা সমূহ সঠিকভাবে পালনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ। এই প্রসঙ্গে এইচ. এম. জনসন বলেছেন - সামাজিকীকরণ হল একটি শিখন যা শিক্ষার্থীকে সামাজিক ভূমিকা প্রদর্শন করতে সহায়তা করে। (H.M. Jhonson -" Socialization is a

learning that enables the learner to perform social roles".) সামাজিকীকরণ হল একটি প্রণালী যার দ্বারা একজন ব্যক্তি তার গোষ্ঠির প্রচলিত ধারা অনুসারে বিভিন্ন নিয়ম-নীতি, আচার-আচরণ, মূল্যবোধ ইত্যদিতে নিজেকে সমৃদ্ধ করণের মাধ্যমে একজন সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বে পর্যবসিত হতে পারে। আরনল্ড গ্রিণ এর উক্তিটি যথোপযুক্ত, উক্তিটি হল - সামাজিকীকরণ হল একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে শিশু সাংস্কৃতিক ভাবধারা আয়ত্ত করে এবং এর সাথে যুক্ত থাকে স্বধীয়তাবোধ ও ব্যক্তিত্ব। (Arnold Green- "Socialization is the process by which the child acquires a cultural content, along with selfhood and personality".) পিটার ওয়াস্‌লি এর মতে শিক্ষা সমাজকে প্রতিফলিত করে এবং শিক্ষামূলক পরিবর্তন অনুসরণ করে সামাজিক পরিবর্তনকে (Peter worsely - " Education reflects society and educational change follows social change".)

সামাজিকীকরণের পদ্ধতি (Process of Socialisation) :

সামাজিকীকরণ হল একটি দীর্ঘসময় ব্যাপী পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া। একজন ব্যক্তি সমাজের রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, ধ্যান-ধারণা, বাধা-নিষেধ ইত্যাদি ক্রম অভ্যাস ও অনুশীলনের মাধ্যমে আয়ত্ত করতে সম্ভবপর হয়। সামাজিকীকরণের জন্য বিভিন্ন উপাদান দায়ী। যেমন- অনুকরণ, সহানুভূতি, সাঙ্গীকরণ, ভাষা, ইত্যাদি। সামাজিকীকরণে বিভিন্ন মাধ্যম যথা - পরিবার, বিদ্যালয়, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম, ইত্যাদির ভূমিকা অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ। সামাজিকীকরণের মাধ্যমে সংরক্ষণ (Conserve), প্রগতি (Progress), গঠন (Construct), বির্বতন (Evolution) ঘটে।

সামাজিকীকরণের পদ্ধতির ধারণাটি নিম্নে আলোচনা করা হল -

সামাজিকীকরণ→ বির্বতন— গঠন — প্রগতি — সংরক্ষণ

- সামাজিকীকরণ হল একজন ব্যক্তির পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে প্রাপ্ত সহজাত ও ধারাবাহিক ধারণা।
- একজন মানুষের একজন ব্যক্তিতে রূপান্তরিত হওয়া এবং সমাজ-শৃঙ্খল বজায় রাখার একটি ব্যবস্থা।
- ব্যক্তির সাথে সামাজিক- সাংস্কৃতিক- অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-নান্দনিক ইত্যাদির মিথস্ক্রিয়া।
- সামাজিকীকরণ সময়ের সাথে সাথে পরিণমন (Maturation) লাভ করে, অর্থাৎ একই ব্যক্তির বয়স ভেদে আচরণের বহি:প্রকাশ একই সমাজে ভিন্ন মাত্রিক হয়ে থাকে।
- কোনো ব্যক্তির মানসিক ব্যবহারে বাস্তবিক সঠিক প্রতিফলন সম্ভবপর হয় সামাজিকীকরণের মাধ্যমে।
- আত্মধারণার বিকাশ ঘটে সামাজিকীকরণের মাধ্যমে অর্থাৎ আমি, আমরা ইত্যাদি ধারণা সামাজিকীকরণের মাধ্যমেই বিকশিত হয়।
- মানসিক সুস্থতার কেন্দ্রস্থ হয় সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়ার দ্বারা। উদাহরণস্বরূপ, বলা যায় অংকন প্রতিযোগিতা, বির্তক প্রতিযোগিতা, রক্তদান শিবির ইত্যাদির মাধ্যমে মানবিক গুনাবলীগুলি সামাজিকীকরণের যোগসূত্র বলা যায়।

সামাজিকীকরণের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি নিম্নে একটি নক্শা (Diagram)- এর মাধ্যমে উদ্ধৃত করা হল -

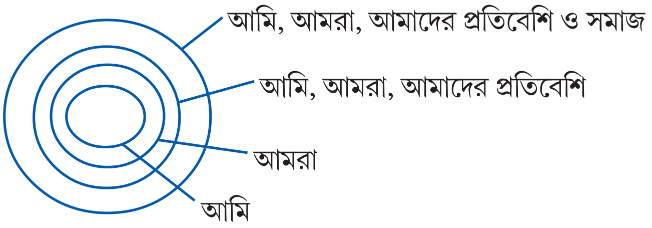

স্পষ্টতই উল্লেখ করতে হয় যে আমি — আমরা— আমাদের প্রতিবেশী—সমাজ এই আন্তসম্পর্ক সম্ভব হয়েছে একমাত্র সামাজিকীকরণের মাধ্যমে। নির্দ্বিধায় বলা যায় আত্ম উপলব্ধি বোধ (Self-realization) ও সামাজিকীকরণ ব্যতীত কোনদিনই সম্ভব নয়।

সামাজিকীকরণ একজন সমাজস্থ ব্যক্তিকে সেই সমাজের অর্ন্তগত আদব-কায়দা, রীতি-নীতি, ধ্যান-ধারণার সাথে পরিচিতি ঘটায় এবং ব্যক্তি তার অবস্থান সেই সমাজে কোথায় বুঝতে পারে। সমাজব্যবস্থায় কোন ব্যক্তির অবস্থান কিরূপ হবে তা মূলত নির্ভর করে বিভিন্ন বিষয়ের উপর। যার মধ্যে অন্যতম হল শিক্ষা কারণ ব্যতীত সমাজের উন্নয়নশীলতা ভাবাই যায় না। একটি সমাজের মধ্যস্থ ব্যক্তিসমূহের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির সংর্কীণতা এবং ব্যাপকতা নির্ধারণ করে শিক্ষা তাই শিক্ষাকে বলা হয় তৃতীয় চক্ষু এবং ইহা আমাদের অন্ধকার থেকে আলোর পথে উন্মীলিত করে।

শিক্ষা ও সামাজিক পরিবর্তন (Education and Social Change) :

সমাজস্থ ব্যক্তি কোনো যন্ত্র (Machine) নয়, সে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে সক্ষম, এই চিন্তা সংকীর্ণ অথবা ব্যাপক— তার নির্ণয়ে শিক্ষার ভূমিকা অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ। সমাজ নির্ধারিত পন্থা থেকে বিচ্যুতি (Deviance) এবং বিভিন্নতা (Variation) মূলত: শিক্ষার দ্বারাই সার্থকভাবে হয়ে থাকে। অভিযোজন (Adaptation), উপযোজন (Accommodation), আত্তীকরণ (Assimilation), ইত্যাদি ধারণাগুলির সাথে শিক্ষা সঠিকভাবে অর্থবহু আন্তক্রিয়া (Meaningful Interaction) ঘটাতে সহায়তা করে।

এই আন্তক্রিয়া মূলত : দু ভাগে ভাগ করা যায় —

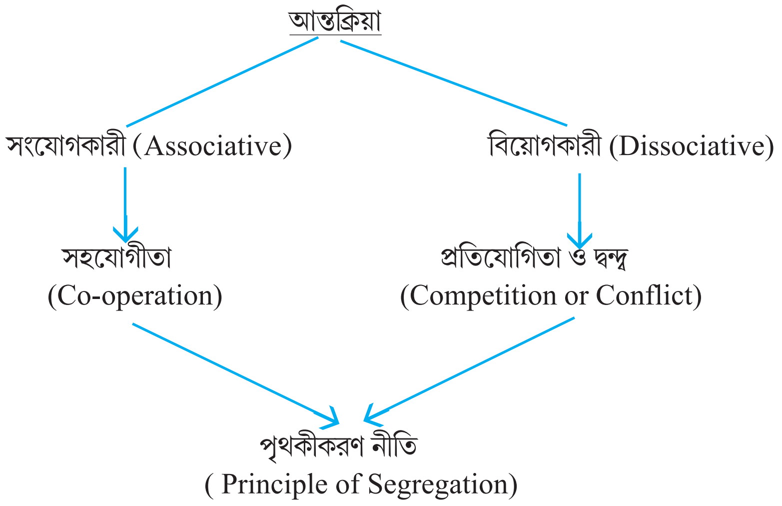

সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা এবং দ্বন্দ্ব মূলত: সংযোগকারী আন্তপ্রক্রিয়া এবং বিয়োগকারীর আন্ত:প্রক্রিয়ার দুইটি মূল বিষয় এবং এদের সাথে সাযুজ্য রেখে সমাজ ক্রমশ বিভিন্ন ভাবে গতিপ্রবাহের ধারা পরিবর্তন করে, যার মূলে থাকে পৃথকীকরণ নীতি (Principle of Segregation)। এর উদাহরণ স্বরুপ বলা যায়, সমাজস্থ ব্যক্তির শ্রেণীবিভাগের স্তর (Hierarchical Stage), সমাজস্থ ব্যক্তির আয়ের স্তর (Stratum of Income), সামাজিক সচলতা (Social Mobility) ইত্যাদি।

সমাজ পরিবর্তনের কিছু গুরত্বপূর্ণ বিষয় যেমন সামাজিক অনুমোদন (Social Acceptance), নির্বাচনধর্মী পরিহার (Selective Elimination), পরিব্যপ্ত করণ (Diffusion) অর্থাৎ অন্য কোনো সংস্কৃতি নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করা, সংস্কৃতি ধার করা (Cultural Borrowing)। সমন্বয়করণ (Integration) করা ইত্যাদি।

সমাজে মূলত: বিভিন্ন বিষয় গ্রহণ ও বর্জনের বিষয় অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ এবং সমাজের একটি সংস্কৃতি থেকে অন্য সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয়সমূহ নির্বাচন—বর্জন—সমন্বয় ঘটানো সম্ভবপর হয় এবং এই ধারণাটিকে William F.Ogburn বলেছেন ‘Cultural lag’ অর্থাৎ ‘মাঝখানের সময়’ বা ‘সাংস্কৃতিক পশ্চাদপসরণ’।

সমাজের উৎপত্তির প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করলে সাধারণত: তিন ধরণের সমাজের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

সমাজ

আদিবাসী সমাজ (Tribal society)	*কৃষি সমাজ (Agrarian society)*	*শিল্প সমাজ (Industrial society)*
■ প্রকৃতি নির্ভর, ■ শিকারই খাদ্য,বাসস্থান ও পোশাকের মূল অবলম্বন।	■ প্রকৃতি ও মানুষ নির্ভর ■ চাষবাস, পশুপালন, যৌথ পরিবার নির্ভর।	■ মানুষ ও যন্ত্র নির্ভর ■ শ্রমবিভাজন, উৎপাদন ও সামাজিক স্তর বিন্যাস ইত্যাদি।

■ উপরিউক্ত নক্সা বা Diagram থেকে সমাজের বিবর্তনের তিনটি মৌলিক শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। আদিম সমাজ ছিল অত্যন্ত সহজ ও সরল, জীবনধারণ নির্ভর ছিল শিকারের উপর, স্থায়ী কোন বাসস্থান ছিল না, খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ ও আচ্ছাদনের ছাউনি মূলত: ছিল শিকার নির্ভর।

■ কৃষিসমাজে মানুষ চাষাবাস ও পশুপালনের ব্যবহার শিখল, সমাজব্যবস্থা স্বল্প জটিল হল এবং স্বল্প শ্রমবিভাজন শুরু হল। প্রকৃতির সঙ্গেঁ সাযুজ্য রেখে কৃষির ফসল লাভ করার জন্য যৌথ পরিবার ও নির্দিষ্ট জায়গায় বসবাস করার প্রবণতা বৃদ্ধি পেল।

■ শিল্পসমাজে মানুষ প্রকৃতির উপর নির্ভর করা অনেকাংশে কমিয়ে দিল, মানুষ হয়ে উঠল যন্ত্র নির্ভর। উৎপাদনের ফসল পরিমানগত না কি গুনগত সে নিয়েও পার্থক্য করা শিখল, সমাজব্যবস্থা ক্রমশ আরো জটিল হল কারণ চাহিদা—উৎপাদন—যোগান ইত্যাদি অর্থনির্ভর হয়ে পড়ল, ফলে সমাজে শ্রমবিভাজন ও স্তর ক্রমশ: সুস্পষ্ট অবয়ব (Structure) ধারণ করল।

সমাজের এই ক্রমবির্বতনের ধারা সম্ভবপর হয়েছে মানুষের বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে এবং এই বুদ্ধিমত্তাকে সঠিক দিশা (Direction) প্রদান করার ক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকা অনস্বীকার্য। কারণ আদিবাসী সমাজ থেকে কৃষিসমাজ, কৃষিসমাজ থেকে শিল্প সমাজ যার মূল ভিত্তি ছিল বিজ্ঞান-সম্পর্কিত দর্শন (Scientific-philosophy), সুতরাং শিল্প সমাজই শিক্ষার হাত ধরে বিভিন্ন ধরনের দিক। যেমন- চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যামিতি বিদ্যা, অর্থনীতি, কারীগরি ও প্রযুক্তি অনেকটাই বিধিবদ্ধ (Formal) হয়ে উঠল। ফলে সমাজে শিক্ষার গুরত্ব অত্যন্ত অপরিসীম হয়ে উঠল।

সমাজ বির্বতনের ধারাকে বিশ্লেষণ করলে চারটি মূল ধারার সাথে পরিচিত হওয়া যায়—

ক) সংস্কৃতায়ন (Sanskritisation)
খ) পাশ্চাত্যকরণ (Westernization)
গ) আধুনিকীকরণ (Modernisation)
ঘ) বিশ্বায়ন (Globalisation)

ক) সংস্কৃতায়ন সাধারণত : M.N. Srinivas (বিশিষ্ট সমাজতত্ত্ববিদ) - এর ধারণা এবং ইহা ভারতবর্ষে অবস্থিত সমাজে নিম্নবর্গের শ্রেণীদের উচ্চবর্ণের শ্রেণীদের জীবনযাত্রা প্রণালী, রীতিনীতি ইত্যাদি অনুসরণ ও অনুকরণ করা সংস্কৃতায়ন ব্যাখা করে।

খ) পাশ্চাত্যকরণ হল পাশ্চাত্য নয় এমন দেশগুলো পাশ্চাত্যের দেশসমূহের ভাষা, পোশাক, অভ্যাস, রীতিনীতি, মূল্যবোধ, জীবনযাত্রা ইত্যাদি সম্পূর্ণরুপে অনুসরণ করা।

গ) আধুনিকীকরণ বলতে বোঝায় চিরাচরিত বা সনাতন প্রাচীনধর্মী গ্রাম্য, কৃষিনির্ভর সমাজের শিল্প-সমৃদ্ধ নগরকেন্দ্রীক সমাজে উত্তরণ।

ঘ) বিশ্বায়নের অর্থ হল সমগ্র বিশ্বকে আপন গন্ডীর মধ্যে নিয়ে আসা, এর মাধ্যমে বিশ্বের সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, চিন্তাধারা ইত্যাদির সার্থক সেতুবন্ধন ঘটে এবং সমগ্র পৃথিবীর বাসস্থান একটাই (Global Village) এর রুপ নেয় ফলে প্রতিটি দেশের নাগরিক বিশ্ব-নাগরিকে (Cosmopolitan) এ পরিগণিত হয়।

আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় সমাজের বিবর্তন, গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা লাভ করা গেছে যার মূল চাবিকাঠি হল শিক্ষা। এখানে বিবেচ্য বিষয় হল এই যে সমাজের মত শিক্ষারও কি বিবর্তন ও এর গতি প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটেছে? উত্তর অবশ্যই সদার্থক (Affirmative) বা হ্যাঁ বোধক। শিক্ষা যেখানে ছিল অবিধিবদ্ধ (Informal), ক্রমশই তা বিধিবদ্ধ (Formal) ও বিধিমুক্ত (Non formal) হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটিয়েছে। সুতরাং সমাজ যেখানে পরিবর্তনশীল শিক্ষাও সেখানে একই আবহে বহমান। শিক্ষার দ্বারাই সমাজে আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, মূল্যবোধ, ভাষা ও বাচনভঙ্গিঁ, নান্দনিকবোধ, সংস্কৃতি ইত্যাদির আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। কুসংস্কার, জাতিভেদপ্রথা, বর্ণাশ্রম ইত্যাদির মত সমাজের নেতিবাচক দিকগুলি শিক্ষার দ্বারাই লোপ পেয়েছে একদিকে, অপরদিকে অপরাধপ্রবণতা, যুদ্ধ, সামাজিক অবক্ষয় ইত্যাদি শিক্ষার প্রসারের ফলেই ক্রমবৃদ্ধিমান। সুতরাং শিক্ষার প্রভাব কি সমাজে ইতিবাচক না নেতিবাচক তা আজ প্রশ্নের মুখে। বর্তমান বিশ্ব অর্থনৈতিক মাপকাঠির ভিত্তিতে উন্নত (Developed), উন্নয়নশীল (Developing), অনুন্নত (Under Developed)— এই মূল তিনটি বিভাগে বিভাজিত। শিক্ষা উন্নত দেশগুলোতে তার সদর্থক (Positive) ভূমিকা সুদৃঢ়ভাবে প্রোথিত করতে পেরেছে যেখানে শিক্ষার ভূমিকা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ততটা মূখ্য নয় এবং অনুন্নয়নশীল দেশগুলোতে শিক্ষার ভূমিকা অনেকটাই গৌণ। উন্নত দেশগুলিতে সমাজের ব্যক্তিবর্গ হল সত্যিকারের অর্থেই (In a True Sense) মানব সম্পদ (Human Resource) কিন্তু এই মানবসম্পদ উন্নয়নশীল দেশগুলিতে কম এবং অনুন্নত দেশগুলিতে অত্যন্ত কম। ফলে শিক্ষার ভূমিকা একটি সমগ্র সুন্দর সমাজ এবং তার মধ্যস্থ ব্যক্তিবর্গের মিথস্ক্রিয়া (Interaction) কে প্রভাবিত করে। শিক্ষার হাত ধরেই সমাজের উন্থান-পতন-বিবর্তন সম্ভব হয়। শিক্ষা যেহেতু নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া (Continuous Process) তাই গতিশীল সমাজের সঠিক রুপায়ণে কান্ডারীর ভূমিকা নেয় শিক্ষা।

তৃতীয় একক

শিক্ষা এবং বিকাশ

শিক্ষা (Education) :

'শিক্ষা' বা 'Education' শব্দটি খুবই প্রচলিত এবং সবসময়ই ব্যবহৃত হয়। তবে 'শিক্ষা' শবদটির অর্থ খুবই ব্যাপক এবং বিভিন্ন ধরণের অর্থ রয়েছে। পূর্বের অধ্যায়ে শিক্ষা শব্দটির ব্যৎপত্তিগত অর্থ বিস্তৃতভাবে রয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষাবিদ ও দার্শনিকগণ বিকাশের প্রক্রিয়া হিসেবেই 'শিক্ষা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এই প্রসঙ্গো ফ্রয়বেল বলেছেন- 'শিক্ষা' হল একটি শিশুর বর্হিজগতের মত অর্ন্তজগৎ তৈরী করার প্রক্রিয়া (Frobel - "Education is the process by which a child makes his internal as well as external".)
এম.কে. গান্ধী বলেছেন- একটি শিশুর শরীর, মন ও আত্মার সঠিক সর্বাঙ্গীন সাজানো সম্ভব শিক্ষার দ্বারা। (M.K. Gandhi -"By Education of means all arround drawing the best in child's and body, mind and soul".)
গান্ধী 'শিক্ষা' বলতে ব্যাখা করেছেন-

- শিক্ষা হল 3 H'S (Head, Hand, Heart) (Education is for 3 H'S- Head, Hand and Heart.)
- শিক্ষা হল গতিশীল প্রক্রিয়া। (Education is dynamic process.)
- শিক্ষা হল গতিশীল জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। (Education is continuous process or life long process.)
- শিক্ষা হল ত্রিমুখী প্রক্রিয়া- শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিখন কৌশল এবং আচরণের পরিবর্তন। (Education is a tripolar process- Educational objective, Learning experience and change of behaviour.)
- শিক্ষা 3 R'S - Education is for 3 R'S (Reading, Writing and Arithmatic.)
- শিক্ষা হল উদ্দেশ্যমুখী। (Education is a purposeful or objective oriented process.) এই প্রসঙ্গো 'শিক্ষা' হল বিকাশের জন্য একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা একটি শিশু জ্ঞান ও প্রশিক্ষনের দ্বারাই ক্ষমতা অর্জন করে।

এখানে 'শিক্ষা' বলতে বুঝায়- একটা ছোট্ট শিশু যখন জন্মগ্রহন করে তখন সে থাকে অপরিণত, অক্ষম ও কর্মশক্তিহীন, এই ছোট্ট শিশুই ধীরে ধীরে পূর্ণাঙ্গা মানুষে পরিণত হয়। ছোট্ট শিশুটি দেহ ও মনের সর্বাঙ্গীন বৃদ্ধি ও বিকাশের মাধ্যমেই পূর্ণাঙ্গা মানুষে পরিণত হয়। এই বৃদ্ধি ও বিকাশের সঙ্গোঁ সঙ্গোঁ নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ জ্ঞাণ, কৌশলের আহরণ এবং নানা আচরণের শিখন হয়। এই যে জ্ঞাণ, কৌশলের আহরণ এবং নানা আচরণের শিখন- তাই হল 'শিক্ষা' আর এই 'শিক্ষা'-ই পরিণত জীবনে সুস্থ, সবল, অন্যান্য ব্যক্তিমত্তাসম্পন্ন মানুষ তৈরি করে।

শিক্ষা এবং বিকাশ (Education and Developement)

বিকাশ হল একটি শিশুর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নিরবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিক গুনগত এবং ক্রিয়াগত পরিবর্তনের ফল, এক কথায় বলা যায়, বংশগতি ও পরিবেশের সঙ্গোঁ মিথস্ক্রিয়ার ফলেই বিকাশ ঘটে। তবে

বিকাশ নিরন্তর ব্যক্তিগত প্রক্রিয়া, সামগ্রিক থেকে বিশেষের দিকে ঘটে এবং বিভিন্ন বিকাশগুলি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। সবশেষে বলা যায়, ব্যক্তির কাঠামোগত এবং কর্মসম্পাদন মূলক পরিবর্তনই হল বিকাশ তবে এই বিকাশ সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া, পিছিয়ে যাওয়া নয়। ব্রেকেনরিজ এবং ভিন্সেন্ট এর মতে - ব্যক্তির কার্যসম্পাদনের উৎকর্ষতা ক্রমশ উন্নত করার জন্য ব্যক্তির মধ্যে যে ক্ষমতার আর্বিভাব এবং সম্প্রসারণ ঘটে তাকে বিকাশ বলে। (Breekenridge and Vincent- "Developement can be defined as the emerging and expending capacities of the individual for providing progressively greater facility in functioning".)

মানুষের জীবনে পরিবর্তন একটি নির্দিষ্ট ক্রম অনুসারে আসে এবং সেই পরিবর্তন বেশ কিছুটা সময় ধরে স্থায়ী হয়, সেই ধরণের পরিবর্তনগুলিকে বিকাশ বলা হয়। বার্ক (Berk) তার 'Child Development' বইয়ে ব্যক্তির বিকাশ (Human Developement) বলতে বলেছেন- সারাজীবনব্যাপী আমাদের জীবনে যে সমস্ত পরিবর্তন আসে, তাই হল মানুষের বিকাশ। ("Development is that which includes all changes we experience throughout the life span".) এক কথায় বলা যায় মানুষের বিভিন্ন ধরণের পরিবর্তন অর্থাৎ শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, নান্দনিক, - এ সবই বিকাশের অংশ।

বিকাশের বৈশিষ্ট্য (Characteristic of Developement)

বিকাশের নানাবিধ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নিম্নে কিছু বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হল-

ক্রমসংযোজনশীল প্রক্রিয়া - ব্যক্তি জীবনে বিকাশ হঠাৎ করে আসে না, বরং ইহা পূর্ববর্তী পর্যায়ের সাথে যুক্ত।

সামাঞ্জস্যপূর্ণ প্রক্রিয়া - কোন ব্যক্তির কোন আচরণ অপর কোনো আচরণের পরে হবে, তা নির্দিষ্ট থাকে। যেমন, শিশু শব্দ বলার পর বাক্য গঠন করতে পারবে।

জটিল প্রক্রিয়া - বিকাশ বিভিন্ন ধরণের যে বিকাশ হয় তাতে একটি প্রক্রিয়া সাথে অন্য প্রক্রিয়া যুক্ত থাকতে পারে আবার না ও থাকতে পারে। যেমন- দৈহিক বিকাশের সাথে মানসিক বিকাশ জড়িত নাও থাকতে পারে, সামাজিক ও নান্দনিক বিকাশ পরস্পরের সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকতে পারে, আবার স্বাধীনভাবে বিকশিত হতে পারে।

ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যমূলক প্রক্রিয়া - পৃথিবীতে দুটি ব্যক্তি কখনও এক রকম হতে পারে না অর্থাৎ ব্যাক্তি স্বাতন্ত্র্য বা Individual Difference বর্তমান। বিকাশের ক্ষেত্রেও সেই কথা প্রযোজ্য, কারণ- দুটি ব্যক্তির বিকাশ কখনই একই রকম হতে পারে না।

বিকাশ সংহতিমূলক - একটি শিশুর জীবনে বিকাশ সমন্বয় পূর্ণ প্রক্রিয়া হিসেবেই ঘটে থাকে ফলে বিকাশ কখনই ভারসাম্যহীনভাবে দেখা যায় না।

বংশগতি ও পরিবেশের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফল হল বিকাশ - বংশগতি ধারায় প্রাপ্ত শিশু স্বাভাবিক ক্ষমতা ও সম্ভাবনা নিয়ে জন্মায় এবং যে পরিবেশে লালিত পালিত হয় - বংশগতির ধারায় প্রাপ্ত সম্ভাবনা ও লালন-পালনময় পরিবেশের পারস্পরিক ক্রিয়া স্থির করে ব্যক্তির বিকাশ কি রুপ হবে সেই ব্যপারটি।

বিকাশ অগ্রমূখী - Kuppuswamy বলেছিলেন "Cephalic Caudal as well as Proximodistal". অর্থাৎ শিশুর বিকাশ ঘটে প্রধানত: দুটি দিক থেকে, একটি হল দেহের অগ্রভাগ থেকে পশ্চাৎ ভাগের দিকে

(মস্তক থেকে পায়ের দিকে), অপরটি হল কেন্দ্রীয় অংশ থেকে পরিধির দিকে বা প্রান্তীয় অংশের দিকে।

বিকাশ রৈখিক নয়, সর্পিল - বিকাশের ধারা সমগ্রতি নয়, কোনো একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে তার বিকাশ অগ্রবর্তী হয় এবং ঠিক তার পরবর্তী পর্যায়ে বিকাশ কিছুটা ধীরগতিতে চলে। এতে শিশুর বিকাশ সংহতি লাভ করে। এরপর পুনরায় শিশুর বিকাশের হার বৃদ্ধি পায় ও অগ্রবর্তী হতে থাকে। বিকাশের এই ধরণটিকে বলা হয় বিকাশ রৈখিক নয়, সর্পিল। নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে বিকাশের সর্পিল প্রকৃতি দেখানো হল।

> বিকাশের পথে অগ্রবর্তিতা

> সংহতির জন্য বিকাশের পথে পশ্চাদবর্তিতা

> শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশের সূত্রপাত বা সুচনা

শিশুর বিকাশের বিভিন্ন স্তর (Stages of Development)

বিকাশের এর স্তর বয়স অনুযায়ীই হয়, বিভিন্ন মনোবিজ্ঞাণীরা বিকাশের যে স্তরভেদ করেছেন তাও বয়স অনুযায়ী। স্তরভেদ ধারণাগত তারতম্য না থাকলেও সূক্ষ্মতার দিক থেকে তারতম্য রয়েছে। যেমন- এরিকসন বিকাশকে আটটি স্তরে, পিকুনাস দশটি স্তরে এবং জোনস্ চারটি স্তরে। নিম্নে বিভিন্ন মনোবিদ্‌দের মতের একই সঙ্গে বিকাশের স্তরভেদগুলো দেখানো হল।

স্তর	সময়সীমা	বিকাশের দিক
প্রাক জন্ম (Pre-natal)	নিষেক থেকে 280 দিন	প্রধানত শারীরিক ও সঞ্চালকমূলক
জন্মকালীন (Peri-natal)	প্রসবের সময়	কোনো বিকাশ হয় না
জন্মেত্তর (Post-natal)	প্রথম দুই বছর	শারীরিক ও সঞ্চালকমূলক
• শৈশব (Infancy)		
• প্রথম বাল্যকাল (Early Childhood)	2-6 বছর	জ্ঞ্যানমূলক,ভাষা,প্রক্ষোভ নৈতিক ও সামাজিক
• উত্তর বাল্যকাল (Late Childhood)	6-11 বছর	একই
• কৈশোর (Adolesence)	11/12-20 বছর	একই

	বিকাশের ভাগ	
এরিকসনের ভাগ	পিকুনাসের ভাগ	জোনসের ভাগ
পরিণত স্তর	70 বছর পরবর্তী	প্রাপ্ত বয়স্ক কাল (18 বছর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত)
প্রাপ্ত বয়স্ক স্তর যৌবণাগম স্তর 11-18 বছর পর্যন্ত	21-70 বছর পর্যন্ত 12-21 বছর পর্যন্ত 9-12 বছর পর্যন্ত	বয়:সন্ধিকাল(12-18বছর পর্যন্ত)

5-11 বছর পর্যন্ত 3-5 বছর পর্যন্ত 1-3 বছর পর্যন্ত	5 - 9 বছর পর্যন্ত 2.5 - 5 বছর পর্যন্ত 1.5 - 2.5 বছর পর্যন্ত	বাল্যকাল (5 - 12 বছর পর্যন্ত)
জন্ম থেকে 1 বছর পর্যন্ত	জন্মের সময় থেকে 4 সপ্তাহ পর্যন্ত গর্ভসঞ্চার থেকে জন্মের আগে পর্যন্ত	শৈশবকাল (জন্ম থেকে 5 বছর পর্যন্ত)

বিকাশের বিভিন্ন ক্ষেত্র বা দিকসমূহ (Dimensions of Development)

বিকাশের যেমন স্তরভেদ রয়েছে ঠিক তেমনি বিভিন্ন ক্ষেত্র বা দিকও রয়েছে। বিকাশের এই ক্ষেত্র বা দিকগুলিকে বলা হয় বিকাশের মাত্রা। বয়সের যে স্তরভেদ রয়েছে প্রতিটি স্তরেই বিকাশগত পরিবর্তন এর বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। বিকাশগত বৈশিষ্ট্যগুলির মূল চারটি দিকে একই ছকে নিম্নে আলোচনা করা হল।

প্রথম স্তর শৈশব কাল (জন্ম থেকে 5 বছর পর্যন্ত)

দৈহিক (Physical)	মানসিক (Mental)	সামাজিক (Social)	প্রাক্ষোভিক (Emotional)
• দৈহিক বিকাশ দ্রুত হয়।	• 2 বছর বয়স থেকে দ্রুত হয়।	•লিঙ্গাগতভেদাভেদ একইভাবে বুঝতে পারে না।	• প্রক্ষোভের ঘন ঘন প্রকাশ হয়।
• মস্তিস্কের গঠন প্রায় ৯০ শতাংশ হয়ে থাকে।	• পরিবেশ সম্পর্কে নানাবিধ প্রশ্ন করার প্রবণতা বিকাশ পায়।	• গৃহের বাইরের পরিবেশের সাথে পরিচয় ঘটে।	• প্রক্ষোভ স্থায়ী নয়।
• বালকদের উচ্চতা ও ওজন বালিকাদের থেকে বেশী হয়।	• স্মৃতি দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পায়।	• বয়স্কদের থেকে বাধা পেয়ে আচরণ নেতিবাচকের মনোভাব গড়ে ওঠে।	• প্রক্ষোভ নিয়ন্ত্রনাধীন নয়।।

দ্বিতীয় স্তর - বাল্যকাল (5-12 বছর পর্যন্ত)

দৈহিক (Physical)	মানসিক (Mental)	সামাজিক (Social)	প্রাক্ষোভিক (Emotional)
• বালিকারা দৈহিক বিকাশে দু বছর এগিয়ে থাকে।	• মনোযোগ এবং বাইরের জগৎ সম্পর্কে ধারণা অনেকটা পরিস্কার হয়।	• দলগঠনের মানসিকতা তৈরি হয়।	• আরো দীর্ঘস্থায়ী হয়, আগে নিয়ন্ত্রন করে।
• শৈশবের দাঁত পড়ে গিয়ে নতুন দাঁত উঠে।	• শিখন ও স্মৃতির উৎকর্ষ বৃদ্ধি ঘটে।	•সমলিঙ্গের প্রতি আকর্ষনবোধ করে।	• প্রক্ষোভের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে।
• কায়িক শ্রমের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।	• সাহস আনুগত্য, পরোপকার ও আত্ম ত্যাগের মানসিকতা বৃদ্ধি পায়।	• অনুকরণ প্রবণতা দেখা যায়।	• অবহেলা, পরিহাস, কৌতুক ক্রোধের জন্ম দেয়।

তৃতীয় স্তর - বয়:সন্ধিকাল (12-18 বছর পর্যন্ত)

দৈহিক (Physical)	মানসিক (Mental)	সামাজিক (Social)	প্রাক্ষোভিক (Emotional)
• ওজন ও উচ্চতা বৃদ্ধি পায়।	• চিন্তনের বিকাশ ঘটে ।	• বন্ধুত্বের গভীরতা বৃদ্ধি পায়।	• ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা করতে শুরু করে।
• গলার স্বরের পরিবর্তন ঘটে, কিশোরদের গলার স্বরভারী হয় ও কিশোরীদের মিস্ট হয়।	• স্বাধীনভাবে সমস্যার সমাধান করতে চায়।	• সামাজিককাজে অংশগ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।	• দু:সাহসিক কাজে লিপ্ত হয়।
• হরমোন এর উৎপাদন অন্ত:ক্ষরা গ্রন্থি থেকে শুরু হয় এবং যৌন পরিবর্তন সুস্পষ্ট হয়।	• যুক্তি ও বিচার ক্ষমতার বৃদ্ধি পায়।	• বয়োজোষ্ঠদের ভূমিকা পালন করতে চায়।	• অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে দেখা যায়

চতুর্থ স্তর - প্রাপ্ত বয়স্ক কাল (18 বছর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত)

- সদ্য প্রাপ্ত বয়স্ক (18-40 বছর)
- মধ্য প্রাপ্ত বয়স্ক (40-65 বছর)
- বয়স্ক প্রাপ্ত বয়স্ক (65 বছর এবং তার বেশি)

দৈহিক (Physical)	মানসিক (Mental)	সামাজিক (Social)	প্রাক্ষোভিক (Emotional)
• বৃদ্ধি মূলত: বন্ধ হয়ে যায়।	• মানসিক বিকাশের পূর্ণতা ও পরিনমন লাভ করে।	• সমাজ কল্যাণের জন্য কিছু করার প্রবণতা জাগে।	• প্রক্ষোভমূলক আচরণের বহি:প্রকাশ কখনও খুব তীব্র হয়, আবার কখনও একেবারেই হয় না।
• মানবদেহের কাঠামোর বিকাশ পূর্ণতা লাভ করে।	• ঘনিষ্ঠতা ও বিচ্ছেদের মধ্যে চূড়ান্ত তারতম্যবোধ বিকশিত হয়।	• নিজ স্বার্থ রক্ষার পরিবর্তে অন্য স্বার্থ রক্ষায় এগিয়ে যায়। পাশাপাশি নিজের স্বার্থ বিঘ্নিত হলে বৃহত্তর সমাজের ক্ষতিসাধনের মানসিকতাও সর্বাধিক বিকাশ লাভ করে।	• প্রক্ষোভের অভিব্যক্তিগুলি ধীরে ধীরে সুসংগত সুনির্দিষ্ট ও লক্ষ্য উপযোগী হয়।
• নির্দিস্ট সময়ের পর রোগ ও ব্যাধির প্রভাব বৃদ্ধি পেতে শুরু করে।	• সঙ্গপ্রিয়তা, একাকীত্ব, হতাশা, স্থবিরতা ইত্যাদি ধারনাগুলির পর্যাপ্ত বিকাশ হয়।	• ইতিবাচক দৃস্টিভঙ্গির কারণে সামাজিক উন্নয়নের চিন্তাবোধ জাগ্রত হয়।	• দুশ্চিন্তা- উদ্‌বেগ, উচ্চাকাঙ্খা-তৎপরতা, অসন্তোষ ইত্যাদি বোধগুলো লক্ষ্য করা যায়।

ইহা ছাড়া ও বিকাশের বিভিন্ন ক্ষেত্র রয়েছে এবং এর মধ্যে ভাষাগত বিকাশ (Language Developement), নৈতিক বিকাশ (Moral Development), নান্দনিক বিকাশ (Aesthetic Development), প্রজ্ঞামূলক বিকাশ (Cognitive Developement) ইত্যাদি অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ। এদের সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল ঃ

ভাষাগত বিকাশ (Language Developement)

ভাষাতত্ত্ববিদদের মতে ভাষার চারটি উপাদান রয়েছে।
ভাষার উপাদান -

- ধ্বণি - শিশু প্রথম ধ্বণি উচ্চারণ করে, পরে তা অর্থযুক্ত শব্দে রুপ পায়।
- বাক্যবিন্যাস - শিশুদের বাক্যবিন্যাস করার নিয়ম শিখনের মাধ্যমে ভাষার বিকাশ ঘটে।
- শব্দার্থ - শিশু চিন্তার সাথে শব্দের সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে।
- প্রয়োগ - পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী শিশু ভাষা প্রয়োগ করতে পারে।

ভাষা বিকাশের বৈশিষ্ট্য :

(১) ২ থেকে ৪ মাস পর্যন্ত উচ্চারিত শব্দকে ‘Cooing’ বলে, ৪-৬ মাস অব্দি আধো আধো স্তরে (Babbling) কথা বলা, ১২-২ বছর অব্দি একক ও দুই শব্দের গঠন, ২-৩ বছর অব্দি সরল বাক্যের গঠন, ৩-৪ বছর অব্দি ক্রম জটিল বাক্য গঠন, ৪-৮ বছর অব্দি একাধিক শব্দের অর্থ বুঝতে পারে। ৯-১০ বছর বয়সে ব্যকরণের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। নিজের চাহিদাকে ও পরিস্থিতির কার্যকরণ সঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারে।
(২) শিশুর ভাষার বিকাশ আর্থ- সামাজিক সাপেক্ষে হয়।
(৩) বয়স বৃদ্ধির সাথে ভাষা প্রকাশের বৈচিত্র্যও বাড়তে থাকে।
(৪) অন্যের সাথে ভাব-বিনিময় কথাবার্তা ইত্যদিতে ভাষার অনেকটাই সঠিক নির্বাচনের বোধ বিকশিত হয়।
(৫) শব্দ গ্রহণ ও অর্থবোধে যথেষ্ট সচেতন হয় এবং অনুকরণ প্রবণতা অনেকটা হ্রাস পায়।

নৈতিক বিকাশ (Moral Development)

নৈতিক বিকাশ বলতে বুঝায় যে কোনো একটি পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ঠিক বা ভুল এই ব্যাপারে যুক্তিকতার ধারণার বিকাশ, জীবনে সততা, ন্যায়-পরায়ণতা, পরোপকার করার প্রবণতা ইত্যাদি সুস্থ ধারণাগুলির সঠিক উন্মেষ ও ব্যবহারযোগ্য করার প্রবণতার বিকাশ উন্মোচিত হয়।

নৈতিক বিকাশ সর্বাপেক্ষা কোহেলবার্গ- এর তত্ত্বের দ্বারা সহজভাবে ব্যাখা করা যায়। উনার তত্ত্বটি নিম্নে বর্ণিত হল ঃ

নৈতিক বিকাশ

প্রথম পর্যায় প্রাক প্রথাগত স্তর (4 বছর- 10 বছর)		দ্বিতীয় পর্যায় প্রথাগত স্তর (10 বছর - 13 বছর)		তৃতীয় পর্যায় উত্তর প্রথাগত স্তর (13 বছরের উপরে)	
১ম স্তর শাস্তি ও পুরস্কারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।	২য় স্তর আত্মকেন্দ্রিকতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।	৩য় স্তর অন্যদের অনুমোদন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।	৪র্থ স্তর আইন (যা সমস্ত সমাজ দ্বারা স্বীকৃত) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।	৫ম স্তর যুক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।	৬ষ্ঠ স্তর বিবেকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত

প্রজ্ঞামূলক বিকাশ (Cognitive Development)

শিশুর চিন্তাধারা, যুক্তিকরণ, কল্পণা, প্রত্যক্ষণ, ধারণাগঠন, স্মরণ ইত্যাদির ক্রমপরিণতির ধারা হল প্রজ্ঞামূলক বিকাশ। এই বিকাশ হল মূলত: কোন বস্তু সম্পর্কে শিশুর জ্ঞাণ সংঘটিত হয় জ্ঞাণের একক (যা পিঁয়াজের ভাষায় Schema) হিসেবে এবং এই এককের সমসাময়িক পরিস্থিতির সাথে সংশ্লেষিত হয়ে ক্রমিক পরিবর্তন সাধিত হয়।

প্রজ্ঞামূলক বিকাশের ধারণাটিকে সর্বাপেক্ষা ভাল ব্যাখা করা যায় জা পিঁয়াজের প্রজ্ঞামূলক মতবাদের দ্বারা, এর মূল বক্তব্য নিম্নে বিবৃত হল :

প্রজ্ঞামূলক

পিঁয়াজের জ্ঞাণমূলক বিকাশের স্তর

সংবেদন সঞ্চালন স্তর (Senrory-motor Stage)	ব্যপ্তিকাল-জন্ম থেকে ২ বছর পর্যন্ত	বর্হিজগতের সম্পর্কে ধারণা গঠনের জন্য হাত, পা, ও ইন্দ্রিয়গুলি প্রধান ভুমিকা গ্রহন করে।
প্রাক্ সাময়িক স্তর (Pre-operational Stage)	স্থায়িত্ব- ২ থেকে ৭ বছর পর্যন্ত	খেলার মাধ্যমে জগৎকে বুঝতে চায় নিজস্ব ধারণা গড়ে নেয়, সমাজের সমাজের সম্পর্কগুলি সম্পর্কে।
মূর্ত সক্রিয়তার স্তর (Concrete operational Stage)	স্থায়িত্ব- ৭ থেকে ১১ বছর পর্যন্ত	ধারণার শ্রেণীবিভাগ করতে পারে,চিন্তা মূর্ত থেকে বিমূর্ত হয়ে উঠতে পারে না।
নিয়মতান্ত্রিক সক্রিয়তার স্তর (Formal operational Stage)	১১বছর থেকে পরবর্তী সময়ে, যা কৈশোরকালের সমসাময়িক।	বিমূর্ত চিন্তার ক্ষমতার পরিপূর্ণতা লাভ করে। সামাজিক সম্পর্কের রীতিনীতির মূল ভিত্তি উপলব্ধি করতে পারে।

নান্দনিক বিকাশ (Aesthetic Development)

নান্দনিক বিকাশ বলতে বুঝায় রুচিবোধ- এর বহিঃপ্রকাশ বাহ্যিক আচার আচরণের মাধ্যমে। বর্তমানকালে বিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থায় যেই দূষনটি সর্বাপেক্ষা মর্ম:পীড়ার কারণ তা হল দৃশ্যদূষণ (বিভিন্ন দেয়ালে বিভিন্ন অশ্লীল চিত্র ও ভাষার প্রয়োগ)। আর্থ-সামাজিক পরিবেশ নান্দনিক বিকাশের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বয়:সন্ধিকালে নান্দনিক বিকাশ সর্বোচ্চ হয় এবং জ্ঞাণমূলক বিকাশের সাথে নান্দনিক বিকাশ ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। সঠিক ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তি হতে গেলে সঠিক নান্দনিক বিকাশের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

বিকাশের ক্ষেত্রে সামাজিক প্রভাবকারী উপাদানসমূহ (Development and Its Associative Social Factors)

বয়স বাড়ার সাথে সাথে ব্যক্তির জীবনে পরিমাণগত ও গুনগত পরিবর্তন সাধিত হয় এবং ব্যক্তির বিকাশে একটি স্তর অন্য স্তরের সাথে অঙ্গাঁঅঙ্গীঁকভাবে জড়িত। ব্যক্তি সহজাত ও অর্জিত (বংশগতি ও পরিবেশ) অভিজ্ঞতার দ্বারা এগিয়ে যায়। সুতরাং একজন ব্যক্তির বিকাশ একটি চিরন্তন প্রক্রিয়া (জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত), যা সমাজে মধ্যস্থ বিভিন্ন উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই সমস্ত প্রভাবকারী উপাদানগুলির মধ্যে গুরত্বপূর্ণ কিছু হল নিম্নরূপ-

- দারিদ্র্য (Poverty)- দারিদ্র্যতা ব্যক্তির প্রাক্ষোভিক, মানসিক, সামাজিক বিকাশের উপর নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। ফলে হতাশা, হীনমন্যতা, আত্মবিশ্বাসের অভাব ইত্যাদি প্রবল ভাবে বিকশিত হয়।
- সুযোগের অভাব (Lack of Oppurtunities)- একজন ব্যক্তি তার ক্ষমতা, প্রবণতা, সক্ষমতা ইত্যদি সঠিকভাবে যখন বিকাশের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় এখন তা মূলত: সুযোগের অভাব হিসেবে সূচিত হয়। এই অভাবের মধ্যে প্রধান হল আর্থিক সুবিধার অভাব, পুষ্টির অভাব, বাসস্থানের অভাব, যত্ন ও ভালবাসার অভাব, সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের অভাব, শিক্ষার অভাব ইত্যাদি।
- বঞ্চনা (Deprivation)- মানুষের জীবনধারনের জন্য যা প্রয়োজন তা না পাওয়ার অবস্থাকে বলা হয় বঞ্চনা। এই বঞ্চনার মূলত অর্ন্তভূক্ত থাকে মা-বাবার স্নেহ ভালবাসা, আর্থিক ও সামাজিক সুযোগ সুবিধা ইত্যাদি। এই বঞ্চনার ফলে ব্যক্তির দৈহিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক, সামাজিক বিকাশ ব্যহত হয়।
- বির্পযস্ত পরিবার (Disrupted Family)- বিচ্ছিন্ন পরিবার বলতে বুঝায় যেসব পরিবারে মা-বাবা প্রায়শই ঝগড়া করে এবং তাদের মধ্যে বোঝাপড়া নেই। পরিবারে শিশু অল্প বয়সে বাবা, মা কে হারিয়েছে এমন। এমন পরিবারের অর্ন্তভূক্ত ব্যক্তির প্রায়শই আবেগের নিয়ন্ত্রণ থাকে না এবং অসামাজিক কাজে প্রায়শই লিপ্ত হয়ে পড়ে। ফলে বিকাশ এর গতিধারা ব্যহত হয়।
- নিম্নমানের গৃহ পরিবেশ (Poor Housing) - অসাস্থ্যকর গৃহ পরিবেশ, গৃহে স্থানাভাব, অপরিচ্ছন্ন গৃহপরিবেশ ইত্যাদির ব্যক্তির মনোভাব গৃহের প্রতি বিরুপ করে তোলে, ব্যক্তির মধ্যে দেখা দেয় অন্ত:দ্বন্দ্ব, অসন্তোষ , অতৃপ্তি ইত্যাদি। ফলে ব্যক্তির সার্বিক বিকাশ সম্ভব হয় না।
- সামাজিক প্রথা (Custom)- জন্মদিন পালন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি অনুষ্ঠান পালন একপ্রকার সামাজিক কার্যাবলী ও সময়ের ধারায় তা সামাজিক প্রথাতে পরিণত হয়। এই সমস্ত প্রথাসমূহ মানতে পারলেই

মূলত সমাজের অস্তিত্ব বজায় থাকে এবং সমাজের প্রতিটি সদস্যের আচরণধারা নিয়ন্ত্রণ করে ও সামাজিক বিচ্যুতি থেকে ব্যক্তিদের রক্ষা করে। ফলে প্রতিটি সমাজে তার নিজস্ব ধারায় বিকশিত হতে পারে ।

❖ লোকাচার ও লোকপ্রথা - **(Folkways and Mores)**- প্রতি ব্যক্তিই সমাজে কিছু আচার-আচারণ সম্পাদন করতে হয়। সমাজে যখন এই সমস্ত আচার-আচরণকে স্বীকৃতি প্রদান করে তখন তাকে বলা হয় লোকাচার এবং এই সমস্ত লোকাচার সমাজ জীবনের পক্ষে গুরত্বপূর্ণ ও কল্যাণকর হলে তা লোকপ্রথায় পরিণত হয়। এই সমস্ত কল্যাণকারী সামাজিক আচরণসমূহ সমাজকে সার্বিক বিকাশে সহায়তা করে।

❖ধর্ম **(Religion)**- ধর্মের কাজ হল একসূত্রে গ্রথিত করা, বিচ্ছিন্ন করা নয়। ধর্ম মানুষকে সৎ ও নৈতিক জীবন যাপন করার পথ নির্দেশ করে এবং মানুষের মনে এই ভাবধারার সৃষ্টি করে যে মানুষের সমস্ত আচরণ এক আলৌকিক শক্তি লক্ষ্য রাখছে। ফলে মানুষ যাতে তার সুস্থ কার্যাবলীর দ্বারা সবার কল্যাণ করে, ধর্ম সেই মানসিকতা বিকশিত করে।

❖ বিশ্বাস**(Belief)** - প্রতিটি সমাজে মানুষের মধ্যে নানা প্রকার বিশ্বাস লক্ষ্য করা যায় এবং এর দ্বারা মানুষের আচরণধারা ও নিয়ন্ত্রিত হয়। বিশ্বাস সমাজস্থ ব্যক্তিদের পরিণত হবার ক্ষেত্রে বিশ্বাসের ভূমিকা অত্যন্ত প্রভাবদায়ী হয়ে থাকে।

❖আদর্শ **(Ideology)** - প্রতিটি সমাজেই একটি বিশেষ আদর্শ বা মতাদর্শ থাকে এবং এর উপর ভিত্তি করেই সমাজে প্রচলিত হয়। এই মতাদর্শ সমাজে পরিবর্তনশীল। এই আদর্শ বা মতাদর্শকে ভিত্তি করেই সমাজস্থ ব্যক্তিদের বিকাশ সৃষ্টিকরণ করা যায়।

সবশেষে বলা যায়, বিকাশকে প্রভাবিত যে বিষয় সর্বাপেক্ষা করতে পারে তা হল শিক্ষার কারণ কোন বিকাশই শিক্ষা ছাড়া সম্পূর্ণ হয় না। শিক্ষা কিভাবে বিকাশকে প্রভাবিত করে তা আলোচনা করা হল। আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় শিক্ষা ও বিকাশ একে অপরের পরিপূরক।

শিক্ষা ও বিকাশ (Education and Developement)

বিকাশ একটি জীবনব্যাপী, আমৃত্যু প্রক্রিয়া এবং বিকাশের বিভিন্ন মাত্রা (Dimensions) রয়েছে। এই সমস্ত নানাবিধ মাত্রা বা দিকগুলির সুস্থ ও সার্থক বিকাশ হলে সমাজে প্রগতি ও বির্বতনের দিকে এগিয়ে যায়। শিক্ষা ও বিকাশের মত একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া (ব্যাপক অর্থে)। তাই শিক্ষা ও বিকাশের মধ্যে সহগতির সম্পর্ক বিদ্যমান।

বিকাশের যে সমস্ত দিক রয়েছে তার মধ্যে দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, প্রাক্ষোভিক, ভাষাগত, নৈতিক , প্রজ্ঞামূলক, নান্দনিক দিকগুলো সর্বাপেক্ষা গুরত্বপূর্ণ। ইহা ছাড়া ও বিকাশের ক্ষেত্রে প্রভাবকারী বিভিন্ন উপাদানসমূহ রয়েছে যার মধ্যে দারিদ্র্য , সুযোগের অভাব, বঞ্চনা, বিপর্যস্ত পরিবার, নিম্নমানের গৃহপরিবেশ, সামাজিক প্রথা, লোকাচার ও লোকপ্রথা , ধর্ম, বিশ্বাস, আদর্শ অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ। এই সমস্ত ক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকা অনস্বীকার্য কারণ মানব সভ্যতার সূচনা থেকে বর্তমান সময় অবাধ বিকাশ এবং একে প্রভাবিত করার উপাদানগুলো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিদ্যমান। এই বিদ্যমানতাকে শিক্ষা তার স্পর্শে প্রানবন্ত ও সজীব রাখতে পেরেছে।

একজন ব্যক্তি তার জীবনে নানাধরণের বিকাশ লক্ষ্য করা যায় এবং এই বিকাশের বহুমাত্রিকতার পার্থক্যই সমাজে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য সুস্পষ্ট ও সুনিদিষ্ট করে দেয়। যেমন সামাজিক অবস্থান , আয়, বাসস্থান, পোশাক পরিচ্ছদ, ভাষার ব্যবহার, যুক্তি, ও চিন্তনের প্রয়োগ, স্বাস্থ্য ইত্যাদি সমাজে প্রতিটি ব্যক্তির অবস্থানকে সুচিহ্নিত করতে একজন নিরক্ষর অথচ ধনী এবং দারিদ্র্য কিন্তু শিক্ষিত - এই দুই ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য সহজেই নির্ণয় করা যায় কারণ তাদের মধ্যে আচার-আচরণ ভাষার ব্যবহার, চিন্তনের প্রয়োগ ইত্যাদির যুক্তি গ্রাহ্যতা ইত্যদি শিক্ষার যৌক্তিকতা বিকাশের ক্ষেত্রে কিরূপ রয়েছে তার স্বরূপে উন্মোচন সহায়তা করে।

প্রাচীন সমাজে কৃষি নির্ভর সমাজে, শিল্পভিত্তিক সমাজে, বর্তমান সমাজে— এই সমস্ত সমাজে ক্রমবির্বতনের ধারায় এগিয়ে এসেছে যেহেতু সমাজের মধ্যে অবস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বহুমাত্রিক বিকাশ সাধিত হয়েছে। যদি আমরা বর্তমান সমাজ ও তার মধ্যস্থ ব্যক্তিকে পর্যবেক্ষণ করি এবং এর সাথে শিল্পভিত্তিক সমাজ ও ব্যক্তি, কৃষিনির্ভর সমাজ ও ব্যক্তি, প্রাচীন সমাজ ও ব্যক্তি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করি তাহলে দেখা যাবে যে, শিক্ষাই হল এমন একটি মাধ্যম যার দ্বারা ব্যক্তি তার বহুমাত্রিক বিকাশকে উন্নত করতে পেরেছে এবং বিকাশের উপর প্রভাবকারী সামাজিক বিষয়গুলিকে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছে। ফলে বর্তমান সমাজে যে রকম বিকাশ ও উন্নত ঠিক তেমনি শিক্ষা ও অনেক বেশী উন্নত।

বিকাশ যেরকম পরিমাণগত এবং গুনগত হয় তেমনি সমাজের ইতিবাচক ও নেতিবাচক অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। বিকাশ যদি শিক্ষার প্রকৃত অর্থের দ্বারা বিকশিত হয় তবে ব্যক্তির বিকাশ সমাজের জন্য কল্যাণকারী হয়। যদি শিক্ষা ব্যক্তির জীবনে অনুপস্থিত থাকে তবো নানাবিধ বিকাশ ব্যাহত হয় এবং বিকাশকে প্রভাবিত করার উপাদানসমূহ ব্যক্তির উপর নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে ফলে সে নিজেকে ও পারিপার্শ্বিক সমাজকে ধ্বংস করে দিতে চায়। যার উদাহরণ সামাজিক অবক্ষয়ের বিভিন্ন ক্ষুদ্র ও ব্যপক ঘটনাসমূহ।

কিন্তু প্রশ্ন স্বভাবতই আসে পর্যাপ্ত শিক্ষা থাকলেই কি বিকাশ সর্বাত্মক ও ইতিবাচক হবে? তাহলে যারা সমাজের অনিষ্টসাধনে যুক্ত তারা সবাই কি অশিক্ষিত? উত্তর অবশ্যই না অর্থাৎ অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি নিজস্ব ও সমাজের ধ্বংসে নিজেকে উৎসর্গ করেছে; তাহলে শিক্ষার ভূমিকা কোথায় এক্ষেত্রে? এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করতে হলে মূলত অবগত হতে হবে আব্রাহাম মার্শালের চাহিদার ক্রমপর্যায় তত্ত্ব (Need of Hierachy Theory) সম্পর্কে, যা নিম্নে বর্ণিত হল ঃ—

এই তত্ত্বে মূলত ব্যক্তির চাহিদা পাঁচটি উর্দ্ধমূখী স্তর দেখানো হয়েছে অর্থাৎ একটি স্তর সম্পূর্ণ হলেই অপর স্তরে ব্যক্তি প্রবেশ করে এবং এই চাহিদাগুলির নিবৃত্তি সাধনের জন্যই ব্যক্তি আমৃত্যু কাজ করে যায়।

শিক্ষাই হল এমন একটি বিষয় যার দ্বারা এই সমস্ত চাহিদাগুলির নিবৃত্তি সম্ভব; কিন্তু বর্তমানে শিক্ষার যে ধারা অর্থাৎ শিক্ষা বর্তমানে একটি প্রক্রিয়া হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে- ইনপুট (Input), প্রসেস (Process), আউটপুট (Output) । এখানে শিক্ষা তার প্রকৃত লক্ষ্য অর্থাৎ Man Making Education বা মনুষ্য তৈরির শিক্ষা থেকে অনেকটাই দূরে বরং শিক্ষা হয়ে উঠেছে উৎপাদনরূপী প্রতিষ্ঠান (Production Oriented Institution) এবং ব্যক্তি অনেকটাই বৃহৎ ব্যক্তিস্বার্থ পরিত্যাগ করে নিজস্ব চিন্তাভাবনার গন্ডীতে Machine বা যন্ত্রের মতো আবদ্ধ। ফলে মূল্যবোধ, আদর্শ, নৈতিকতা, মনুষ্যবোধ ইত্যাদি বিষয়গুলি ব্যক্তির মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে অনুপস্থিত। যদি মানুষকে সমাজে সুস্থ ও সুন্দরভাবে বাঁচতে হয় তবে বিকাশ ও বিকাশকে প্রভাবিত করে এই সমস্ত উপাদানগুলির সর্বাত্মক বিকাশ প্রয়োজন এবং শিক্ষার মূল লক্ষ্য তাতে প্রোথিত থাকতে হবে এবং তা হতে হবে মানুষ তৈরির শিক্ষা এবং তা সম্ভবপর হবে যখন ব্যক্তির অর্ন্তনিহিত সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটবে শিক্ষার দ্বারা। সুতরাং, একথা বলা যায় শিক্ষা ও বিকাশ একে অপরের পরিপূরক অথার্ৎ একে অপরকে ছাড়া সার্থক হতে পারে না অর্থাৎ Two sides of the same coin.

চতুর্থ একক সামাজিকস্তর বিন্যাসের অর্থ ও ধারণা

সামাজিক স্তর বিন্যাস : সামাজিক স্তর বিন্যাস হল একটি বিশ্বজনীন ঘটনা। সেখানেই সমাজ আছে, সেখানেই সামাজিক স্তরবিন্যাস বিদ্যমান। সামাজিক স্তর বিন্যাস হল একটি সার্বজনীন সামাজিক পরিস্থিতি যার মধ্যে দিয়ে মানুষের সম্পত্তি, ক্ষমতা, মর্যাদা, যোগ্যতা, পেশা ইত্যাদির পার্থক্যকে সূচিত করা যায়। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে আর্থ-সামাজিক, শ্রমিক-মালিক, শিল্পপতি, কৃষিজীবি আয়ের পার্থক্য, শিক্ষাগত যোগ্যতা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে প্রতিটি সমাজে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পর্যায়ে বিদ্যমান। এই সময়ে (উচ্চ-নীচ) অনেকটা সিঁড়ির মত যা হল সামাজিক স্তর। সমাজে যে ব্যক্তি সিঁড়ির মত উচ্চ ধাপে অবস্থিত,তার মান মর্যাদা, প্রতিপত্তি, সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি অনেক বেশী, সামাজিক স্তরবিন্যাস হল সমাজস্থ (সমাজের মধ্যে বসবাসকারী) ব্যক্তিদের মধ্যে কিছু বিষয়কে কেন্দ্র করে প্রভেদমূলক পদ-বিন্যাস।

সামাজিক স্তর বিন্যাস হল :-

- একটি আবশ্যিক সামাজিক পরিস্থিতি।
- একটি চিরন্তন ও সার্বজনীন প্রক্রিয়া।
- সম্পত্তি, ক্ষমতা, পদমর্যাদা ইত্যাদির নির্দেশক।
- সামাজিক মিথস্ক্রিয়া (Interaction) এর নির্দেশক।
- সমাজস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে মর্যাদার নিয়ন্ত্রক।
- সমাজের বৈসাম্যের প্রকৃতি গভীরতার নির্দেশক ইত্যাদি।

সুতরাং বলা যায় একটি সমাজের মধ্যে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ক্ষমতা, পদমর্যাদা, অর্থনৈতিক ক্ষমতা ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্নস্তরে বিন্যস্ত করার একটি বিষয় হল সামাজিক স্তরবিন্যাস। সেহেতু যে কোন সমাজব্যবস্থায় সমাজস্থ ব্যক্তিরা সবাই অভিন্ন পর্যায়ভুক্ত নয় সুতরাং সামাজিক স্তরবিন্যাস সমাজে একটি স্বাভাবিক বিষয়। সামাজিক স্তরভেদের দুটি ধরন হল ঃ বংশগত (আরোপিত) এবং অর্জিত। সুতরাং সামাজিক স্তরবিন্যাস যেমন জন্মগত বা বংশগত কারণে হতে পারে, ঠিক তেমনি ব্যাক্তি নিজস্ব উদ্যোগে অর্জিত গুনগত যোগ্যতার দ্বারাও তার সামাজিক স্তর পরিবর্তন ঘটতে পারে।

সামাজিক স্তর বিন্যাসের সংজ্ঞা (Definition of Social Stratification)

সামাজিক স্তরবিন্যাসের কিছু সংজ্ঞা হল নিম্নরুপ -

অগবার্ন ও নিমকফের মতে যে প্রক্রিয়ার দ্বারা ব্যক্তি এর দলের উর্দ্ধক্রমের অবস্থান সম্পর্কে জানা যায় তাই হল সামাজিক স্তরবিন্যাস। (Ogburn and Nimkoff- "The process by which individuals and groups are ranked in a more or less enduring hierarchy of status is known as stratification".)

- জিসবার্টের মতে সামাজিক স্তর বিন্যাস হল একটি সমাজে অবস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে স্থায়ীভাবে শ্রেণী বিভাগ করা যায় এবং এই ব্যক্তিগত উর্দ্ধতন ও অধঃস্তন সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। (Gisbert-

" Social Stratification is the division of society into permanent groups of categories linked with each other by the relationship of superiority and subordination".)

- ল্যান্ডবার্গের মতে সামাজিক স্তর বিভক্ত সমাজকে চিহ্নিত করা যায় যখন ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য মূল্যায়নকরন ঘটে অর্থাৎ ব্যক্তিত্বে নীচ এবং উচ্চ এই পার্থক্যকরন। (Lundberg-" A stratified society is one marked by inequality by differences among people that are evaluated by them as being lower and higher".)

- র‍্যামন্ড ডব্লিউ ম্যারির মতে সামাজিক স্তর বিন্যাস হল সমাজের আনুভূমিক স্তরবিন্যাস যেখানে উচ্চ এবং নিম্ন একক বিভক্ত থাকে। (Raymond W. Murray- " Social Stratification is a horizontal division of society into 'high' and 'lower' social units".)

বিভিন্ন সমাজতত্ত্ববিদ্‌দের সংজ্ঞার পরিপ্রেক্ষিতে সংক্ষেপে বলা যায় যে, সামাজিক স্তর বিন্যাস হল ঃ

- একটি প্রক্রিয়া,
- একটি শ্রেণীবিভাগ,
- ব্যক্তি এবং দলের সামাজিক অবস্থান,
- সামাজিক উচ্চ ও নিম্ন একক,
- উর্দ্ধতন ও অধঃস্তন সম্পর্কের বন্ধন।

সামাজিক স্তরবিন্যাসের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Social Stratification)

সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সামাজিক অবস্থান জানা যায় সামাজিক স্তর বিন্যাস থেকে; ইহা হল কতগুলি গুরত্বপূর্ণ বিষয়ের (অর্থ, সম্পত্তি, মান, পদমর্যাদা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, বর্ণ ইত্যাদি) উপর নির্ভর করে সমাজের ব্যক্তিবর্গকে পর্যায়ক্রমে শ্রেণীবিন্যাস করার একটি নির্দেশক। সামাজিক স্তর বিন্যাসের কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য (Characteristic) হল নিম্নরূপ ঃ

- সামাজিক স্তরবিন্যাস একটি সার্বজনীন ঘটনা। সামাজিক স্তরবিন্যাস প্রাচীন সমাজের যেমন বর্তমান ছিল ঠিক তেমনি বর্তমানকালের সমাজে ও বর্তমান এবং ভবিষ্যতে ও থাকবে; অর্থাৎ সমাজ যতদিন তার অস্তিত্ব বজায় রাখবে ততদিন সামাজিক স্তরবিন্যাস ও থাকবে।
- সামাজিক স্তরবিন্যাস মূলত সম্পত্তি, মর্যাদা, বর্ণ ইত্যাদির পার্থক্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। কখনো ও কখনো এই সামাজিক স্তর বিন্যাস অত্যন্ত সুস্পষ্ট আবার কখনো ততটা সুস্পষ্ট নয়।
- সামাজিক স্তর বিন্যাস সমাজের সকল ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে। এই প্রভাবের গভীরতা মতো কারোও বেশী অনুভব করতে পারে। আবার কেউ ততটা অনুভব করতে পারে না।
- সামাজিকীকরনের সাথে সামাজিক স্তর বিন্যাস গুরত্বপূর্ণভাবে জড়িত। সামাজিকীকরনের মাধ্যমে ব্যাক্তিবর্গের সমাজ ভাবনার পরিনমন (Maturation) যত বৃদ্ধি পাবে তার উপর নির্ভর করো সামাজিক স্তর বিন্যাসের চরিত্রগত পরিবর্তনও ততই লক্ষ্যনীয় হয়ে উঠবে।
- সামাজিক স্তর বিন্যাস সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসকে বুঝতে সহায়তা করে। একটি সমাজে সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস

কি অত্যন্ত সরল না জটিল, তা অনুধাবনে সামাজিক স্তরবিন্যাস সহায়তা করে।

- সামাজিক স্তরবিন্যাস চরিত্রগতভাবে আরোপিত ও হতে পারে, আবার অর্জিত ও হতে পারে। বংশ বা জন্মসূত্রে প্রাপ্ত সামাজিক স্তরবিন্যাস কেউ নিজস্ব যোগ্যতার দ্বারা ও (অর্জিত) পরিবর্তন করতে পারে।
- প্রতিটি সামাজিক স্তরে নিজেদের মধ্যে যেমন সহযোগিতা, সহবস্থান, প্রতিযোগিতা ইত্যাদি রয়েছে; ঠিক তেমনি রয়েছে অন্যান্য স্তরের সাথে ও সহযোগিতা, সহবস্থান ও প্রতিযোগীতার সম্পর্ক। এর ফলেই সামাজিক স্তর তারা নিজস্ব রূপ ও কাঠামো পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়।
- সামাজিক স্তর বিন্যাস সামাজিক সুযোগ সুবিধার অসম ব্যবহারের ফলে মূলত হয়ে থাকে। সম্পদ সুযোগ সুবিধা ইত্যাদির যদি সমবণ্টন হয়ে থাকতো তবে সামাজিক স্তরবিন্যাসের ব্যাপ্তি প্রসার কম লাভ করত।
- সামাজিক স্তর বিন্যাস বন্ধসমাজে (Close Society) বেশী পরিলক্ষিত হয় মুক্ত সমাজের (Open Society) তুলনায়; বন্ধ সমাজে সামাজিক স্তর বিন্যাস প্রকট এর তীব্র হয়, কারণ বন্ধ সমাজে সামাজিক রীতি-নীতি, নিয়ম-কানুন, কুসংস্কার ইত্যাদির প্রাধান্য অনেক বেশী হয় এবং পরিবর্তন সচরাচর হয় না।
- সামাজিক স্তরবিন্যাস সমগ্র সমাজ ব্যবস্থার একটি চিত্র প্রতিফলনে সহায়তা করে। একটি সমাজব্যবস্থায় সামাজিক স্তরে বিভক্ত ব্যক্তিদের মিথস্ক্রিয়ার পূর্ণ চিত্র অনুধাবনে সামাজিক স্তর বিন্যাস সহায়তা করে।

সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তিবর্গের সংখ্যাবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের সম্পর্ক ও ক্রমশ জটিল হতে থাকে এবং ফলস্বরুপ সামাজিক স্তরবিন্যাস ও বৃদ্ধি পেতে থাকে। সামাজিক স্বার্থে যে সব কাজ অধিক গুরত্বপূর্ণ সেইসব কাজ অধিক মর্যাদা যুক্ত থাকে। আবার যে সব কার্য সকলের পক্ষেই সহজসাধ্য, তাতে সামাজিক মর্যাদা ও কম থাকে। কার্যের গুরুত্বের উপর ভিত্তি করেই মেধা, বৃদ্ধি বৃত্তি, কর্মকুশলতা, আয়, সম্মান ইত্যাদি নির্ধারিত হয় এবং এইসব বিষয়ের উপর নির্ভর করেই সমাজে ব্যাক্তির ভূমিকা নির্ধারিত হয় এবং উচ্চ-নীচ এই ধারণার সৃষ্টি হয় এবং যাকে ইংরেজী বলা হয় 'Hierarchy' বা ক্রমপর্যায়। সামাজিক স্তরবিন্যাসের ধারনা অত্যন্ত জটিল এবং সমাজ ব্যবস্থার অগ্রগতি ও বির্বতনের সাথে সাথে সমাজে স্তর বিন্যাস ও তারা গতি-প্রকৃতি ক্রমঃপরিবর্তন ঘটিয়ে থাকে।

সামাজিক স্তরের শ্রেণীবিন্যাস (Classification of Social Stratification)

সামাজিক স্তর বিন্যাস একটি চিরন্তন বিষয় এবং সময়ের সাথে সাথে সামাজিক স্তরবিন্যাসের ও প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটেছে। যদিও বন্ধ সমাজে সামাজিক স্তর বিন্যাস অনেকটা সুস্পষ্ট মুক্ত সমাজের তুলনায়, তথাপি সামাজিক স্তরবিন্যাসের অবস্থান প্রতিটি সমাজেই পরিলক্ষিত হয়। সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে সামাজিক স্তর বিন্যাসের ও প্রকৃতিগত পরিবর্তন ঘটে এবং সমাজে যে মূল তিন প্রকার সামাজিক স্তর বিন্যাস পরিলক্ষিত হয় তা হল নিম্নরুপ -

ক) দাস প্রথা (Slave System)
খ) ভূমি সত্ত্ব প্রথা (Estates)
গ) শ্রেণী প্রথা (Class System)

ক) দাস প্রথা (Slave System)

সামাজিক স্তর বিন্যাসের একটি প্রাচীনতম ব্যবস্থা হল দাস প্রথা। এই প্রথায় একজন ব্যক্তি (দাস হিসাবে) অন্যের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিনত হয় এবং আমৃত্যু দাস হিসাবে একজন ব্যক্তি তারা মালিকের কাছে কেন একটি বস্তু হিসাবে প্রতিপন্ন হয়। এই প্রথা অত্যন্ত বৈষম্যমূলক এবং মানবজাতির পক্ষে এক লজ্জাজনক ও কলঙ্কময় বিষয়।

খ) ভূমিসত্ত্ব প্রথা (Estates)

'Estates' কথাটির অর্থ হল মালিকানাধীন শ্রেণী বা ভূমিসত্ত্ব প্রথা। এটি মূলত একটি প্রথা এবং যারা এই ব্যবস্থায় ভূমির সত্ত্বা ভোগ করেন তারা ভূ-পতি (ভূমির অধিপতি বা মালিক) হিসাবে গন্য হন। 'Estates' শব্দটির প্রাথমিক ব্যবহার জমিদারের মালিকানাধীন জমি বুঝাতে ব্যবহার হলে ও পরবর্তীকালে এর দ্বারা একটি বিশেষ স্তর ব্যবস্থা বুঝানো শুরু হয়েছিল, যেমন যাজক সম্প্রদায়, অভিজাত সম্প্রদায় ইত্যাদি। এই স্তর বিন্যাসের শীর্ষে থাকতেন রাজা ও জমিদার শ্রেণী। উত্তরাধিকভিত্তিক ভূমিসত্ত্বের ক্ষেত্রে উত্তারাধিকার প্রথার মাধ্যমে ভূমির মালিকানা হস্তান্তর হত। কোন ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারী না থাকলে রাজারা এই সত্ত্বের অধিকারী হতেন। প্রজারা ছিল অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে দিনযাপন করত ও তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল শোচনীয়। ফলে সমাজে এই প্রথা মর্মপীড়াদায়ী উচ্চ ও নিম্নস্তর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অবস্থান সুনির্দিষ্ট করে আসছে।

গ) শ্রেণি প্রথা (Class System)

সামাজিক মর্যাদার ভিত্তিতে উচ্চ-নীচ অবস্থান বা তারতম্যের ভিত্তিতে সামাজিক শ্রেণী নির্ধারিত হয়। শ্রেণী হল একটি মানব গোষ্ঠী বা অন্যান্য গোষ্ঠী থেকে স্বতন্ত্র এবং নিজস্ব গোষ্ঠীর মধ্যে একান্তবোধ এবং অন্যান্য গোষ্ঠী থেকে স্বাতন্ত্র্যবোধ বজায় রাখে। সামাজিক শ্রেণী নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যে একাত্মবোধের দ্বারা আবদ্ধ থাকে। ফলে অন্যান্য গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিদের সাথে সামাজিক দূরত্ববোধ সৃষ্টি হয় এবং এর থেকে সৃষ্টি হয় শ্রেণীর নির্দিস্ট করনীয় ও বর্জনীয় কাজ। এর দ্বারা সমাজে বিভিন্ন বিভাগ ও উপবিভাগ সৃষ্টি হয় এবং ব্যক্তিতে দূরত্ব বৃদ্ধি পায়। প্রত্যেক শ্রেণীই নিজেদেরকে অন্যান্য শ্রেণী থেকে উন্নত ও পৃথক ভাবতে শুরু করে এবং সমাজস্থ অন্যান্য ব্যক্তিদের থেকে সম দূরত্ব বজায় রাখার ব্যাপারে সচেস্ট হয়। ফলে সমাজে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পাথর্ক্য শ্রেণীপ্রথার জন্য সুস্পস্ট হয়ে উঠে।

এই তিনপ্রকার সামাজিক স্তর বিন্যাস ছাড়াও গায়ের রং এর দ্বারা — শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ, উৎপাদন ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে মালিক ও শ্রমিক, বর্ণপ্রথা (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র) অনার্য ও আর্য, উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত (আয়ের ভিত্তিতে) ইত্যাদি সামাজিক স্তরের বির্বতিত রূপ। প্রতিটি সমাজ ব্যবস্থায় সামাজিক স্তর বিদ্যমান এবং প্রত্যেক সামাজিক স্তরের অর্ন্তগত ব্যক্তিরা নিজস্ব গোষ্ঠীভাবনায় বিরাজমান হয়ে অন্যস্তরের ব্যক্তিদের থেকে নিজেদের স্তর স্বাতন্ত্র্য রাখে ফলে সমাজে সামাজিক স্তর বিন্যাস চিরন্তন ব্যাপার/বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে।

সামাজিক স্তর কি সমাজের পক্ষে ইতিবাচক (Possitive) না নেতিবাচক (Negative) তা প্রশ্ন সাপেক্ষ ব্যাপার। কারণ ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে আয়, মেধা, পেশা, বৃত্তি, চিন্তন, মতাদর্শ, মর্যাদা ইত্যাদির ভিত্তিতে

পাথর্ক্য থাকবেই কারণ সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির অবস্থান কখনোই সমান হতে পারে না— তাই সমাজের স্তর থাকবে না বা স্তরহীন সমস্যা কল্পনা করা সম্ভব নয়। যেহেতু সামাজিক স্তর-আরোপিত এবং অর্জিত; সুতরাং ব্যক্তি তার ক্ষমতার দ্বারা স্তর পরিবর্তন ঘটাতে পারে। সামাজিক স্তর সংকীর্ণ অর্থে নেতিবাচক হলেও ব্যাপক অর্থে ইতিবাচক কারণ বৈচিত্র্যই সমাজের মূল চালিকা শক্তি। তাই সামাজিক স্তরের যেমন নেতিবাচক দিক রয়েছে ঠিক তেমনি রয়েছে ইতিবাচক দিকও।

সামাজিক স্তর বিন্যাস এবং শিক্ষার ভূমিকা
(Social Stratification and Role of Education)

সমাজ হল মানবীয় সম্পর্কের আন্তঃজাল (Web of Human Inter-relationship)। মানুষে মানুষে সম্পর্কে ক্রম পরিবর্তনশীল; ফলে সমাজ ও ক্রম পরিবর্তনশীল, কারণ ব্যক্তি ছাড়া সমাজের কল্পনাও সম্ভবপর নয়। মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধতার (Gregariousness) জন্যই সমাজ গঠন করেছিল। সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধিত হয়েছে বিভিন্ন কারণে এবং অর্থনৈতিক বিষয়, সামাজিক বিষয়, রাজনৈতিক বিষয় ইত্যাদি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা পালন করেছে সমাজের পরিবর্তনের জন্য। সমাজ পরিবর্তনের সাথে সামাজিক স্তরেরও পরিবর্তন ও পরিমার্জন সাধিত হয়েছে। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে আন্তঃব্যক্তিমূলক সম্পর্ক (Inter-personal Relation) তা ও পরিবর্তন হয়েছে। সামাজিক স্তরের পরিবর্তনের পেছনে যে সমস্ত উপাদান দায়ী তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরত্বপূর্ণ হল শিক্ষা।

সামাজিক স্তর মূলত আরোপিত (জন্মসূত্রে প্রাপ্ত) এবং অর্জিত এই দুই প্রকারের হয়ে থাকে। আরোপিত বা জন্মসূত্রে প্রাপ্ত সামাজিক স্তর পরিবর্তন করা যায় এবং এই পরিবর্তনের সর্বাপেক্ষা গুরত্বপূর্ণ হাতিয়ার (Tool) শিক্ষা অর্জিত সামাজিক স্তর পরিবর্তন করা যায় অর্জিত গুন, কর্মক্ষমতা, দক্ষতা, ইত্যাদির সুষ্ঠ ও সার্বিক বিকাশ ঘটাতে পারে শিক্ষার দ্বারা।

প্রথা বর্হিভূত শিক্ষা (Informal Education), বিধিবদ্ধ শিক্ষা (Formal Education), বিধি মুক্ত শিক্ষা (Non Formal Education)। এই তিনটি ধারাতেই শিক্ষা লাভ করা যায়। শিক্ষার মূল চারটি মৌলিক উপাদান রয়েছে: শিক্ষার্থী (Learner), শিক্ষক/শিক্ষিকা (Teacher), পাঠ্যক্রম (Curriculam), শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (Educational Institution), প্রথামুক্ত শিক্ষায় এই চারটি উপাদান সুনির্দিস্ট নয় এবং পরস্পরের সাথে সুসঙ্গাবদ্ধ নয়, ঠিক তেমনি বিধিবদ্ধ শিক্ষায় এই চারটি উপাদান অত্যন্ত সুস্পস্ট এবং পরস্পর পরস্পরের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত। কিন্তু বিধিমুক্ত শিক্ষায় এই চারটি উপাদান বর্তমান কিন্তু এদের অবস্থান অকেটাই নমনীয়। সুতরাং সামাজিক স্তর পরিবর্তনে শিক্ষার ভূমিকা অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ এবং এই তিন প্রকার শিক্ষার অবদান অনস্বীকার্য।

প্রথা-বহির্ভূত বা প্রথামুক্ত, বিধিবদ্ধ এবং বিধিমুক্ত শিক্ষার মধ্যে বিধিবদ্ধ শিক্ষাই সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কারণ এই শিক্ষার দ্বারাই একজন শিক্ষার্থী শিক্ষার পরবর্তী স্তরে যেতে পারে এবং প্রতিটি স্তরের শেষে শিক্ষার্থী একটি শংসাপত্র (Certificate/Marksheet) পায়। এই শিক্ষার দ্বারাই বৃত্তি, পেশা, আয়, মর্যাদা প্রভৃত পরিমানে সম্ভবপর হয়। মূলত বিধিবদ্ধ শিক্ষার দ্বারা একজন ব্যক্তি তার আরোপিত সামাজিক স্তর পরিবর্তন করতে পারে অর্জিত ক্ষমতা দ্বারা। একজন ব্যক্তি তার সামাজিক স্তরের পরিবর্তন ঘটাতে পারে

বিধিমুক্ত শিক্ষার দ্বারাও। কিন্তু বিধিমুক্ত এবং বিধিমুক্ত শিক্ষা একটি ব্যক্তি তখনই পূর্ণ করতে পারবে যখন সেই ব্যক্তির বিদ্যালয়ে প্রবেশের পূর্বে (বিধিবদ্ধ শিক্ষা গ্রহণ করার পূর্বে) পর্যাপ্ত পরিমানে তার শিক্ষা হয়েছে (পিতা-মাতা, পরিবারের অন্যান্যরা ও প্রতিবেশীদের থেকে)

সুতরাং সামাজিক স্তর এর সংহতি সাধনে সাথে শিক্ষার সম্পর্ক অতন্ত গুরত্বপূর্ণ। কিন্তু শিক্ষার ধারণা হতে হবে ব্যাপক (অর্থাৎ পুথিগত শিক্ষা গ্রহণ ও সমাপ্তকরনের সাথে যুক্ত নয়) যেহেতু সামাজিক স্তর দূরীকরন একটি জটিল এবং দীর্ঘ প্রক্রিয়া তাই শিক্ষার ধারণা ও হতে হবে ব্যাপক। একজন ব্যক্তির (শিশুর) পিতামাতা যদি নিরক্ষর এবং অপরদিকে একজন ব্যক্তির (শিশুর) পিতামাতা যদি হয় শিক্ষিত তবে এই দুই ব্যক্তির (শিশুর) পক্ষে সামাজিক স্তর প্রভেদ হ্রাস করার বিষয় একইরকমের হবে না।

সামাজিক স্তর শিক্ষার দ্বারা পরিবর্তন করা সম্ভব যদি শিক্ষার তিনটি মূলরূপ (কাঠামো): প্রথামুক্ত, বিধিবদ্ধ এবং বিধিমুক্ত শিক্ষা পরস্পর পরস্পরের সাথে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে যুক্ত থাকে; মূলত প্রথামুক্ত ও বিধিবদ্ধ শিক্ষা। এদের পারস্পরিক সুদূড় সম্পর্ক ছাড়া শিক্ষার দ্বারা সামাজিক স্তর এর বিস্তর ফারাক দূর করা সম্ভব হবে না।

পঞ্চম একক সামাজিক সচলতা এবং শিক্ষা, শিক্ষা সুযোগের সমতা বিধান

সামাজিক সচলতা, ধারণা এবং প্রকারভেদ (Social Mobility: Concept, Types)

সামাজিক সচলতা (Mobility) বলতে বুঝায় ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টির সমাজের একটি স্তর থেকে অন্য স্তর থেকে পৌঁছানো। সামাজিক সচলতা হল একটি সমাজের মধ্যস্থ একটি সামাজিক স্তরের অর্ন্তগত ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহের অবস্থানগত পরিবর্তন, ফলে এই পরিবর্তন দ্বারা সামজিক স্তরের ও পরিবর্তন ঘটে। প্রতিটি সমাজে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য বিদ্যমান। এই পার্থক্য আয়, পদমর্যাদা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, কর্মক্ষমতা ইত্যাদির ভিত্তিতে হয়ে থাকে। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সামাজিক অবস্থানগত পার্থক্য জন্মসূত্রে যেমন হতে পারে (একজন অত্যন্ত ধনী ব্যক্তির সন্তান এবং একজন অত্যন্ত দরিদ্র ব্যক্তির সন্তানের সামাজিক অবস্থান) আবার অর্জিতও হতে পারে (যেমন একজন অত্যন্ত ধনী ব্যক্তির সন্তান নিরক্ষর এবং একজন অত্যন্ত দরিদ্র ব্যক্তির সন্তান সমাজে প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক)। সামাজিক সচলতা অর্থাৎ সামাজিক অবস্থানগত পরিবর্তন মূলত নির্ভর করে সমাজের প্রকৃতি কিরূপ তার উপর।

সমাজে যদি বন্ধ সমাজ (Close Society) হয় তবে সে সমাজে সামাজিক সচলতা খুব বেশী লক্ষ্য করা যায় না কিন্তু যদি সমাজ হয় মুক্ত সমাজ (Open Society) তবে সেই সমাজে সামাজিক সচলতা বেশী লক্ষ্য করা যায় কারণ মুক্ত সমাজ হল সেই সমাজ যেখানে সামাজিক নিয়ম শৃঙ্খলা, সামাজিক রীতি নীতি, সামাজিক বিধি-নিষেধ ইত্যাদি অনেকটাই নমনীয়; কিন্তু বন্ধ সমাজ (Close Society) সামাজিক নিয়ম শৃঙ্খলা, সামাজিক রীতি নীতি, সামাজিক বিধি-নিষেধ ইত্যাদি অনেকটাই অনমনীয়। সুতরাং মুক্ত সমাজে, ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টি তার/তাদের অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহ যদি তার/তাহার পিতামাতার বৃত্তি, পেশা ইত্যাদি অনুসরণ না করে স্বতন্ত্র জীবনধারণ প্রণালী অবলম্বণ করে তবে সে ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহ তার/তাহার পূর্বতন বয়োগোষ্ঠীর থেকে পৃথক জীবন-যাপন করতে শুরু করে এবং এর দ্বারা অবস্থানগত পরিবর্তন করতে পারে। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক পি.এ. সরোকিন (P.A.Sorokin) এর মন্তব্য সামাজিক সচলতা সম্পর্কে প্রনিধানযোগ্য "নিজের চেষ্টায় কোন ব্যক্তি যদি তার সামাজিক মর্যাদার পরিবর্তন সাধনে সক্ষম হয়, তা হলে সেই পরিবর্তিত সামাজিক স্তরই হল সামাজিক সচলতার উদাহরণ।" By social mobility it is understood any Fransition of an individual or social object or value that has been created or modified by human activity from one position to another".

ওয়ালস এবং ওয়লেস (Wallance and Wallace) এর মতে সামাজিক সচলতা হল কোন একক ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহের একটি সামাজিক অবস্থান থেকে অন্য অবস্থানে পরিবর্তন। (According to Wallance and Wallace, " Social mobility is the movement of a person or persons from one social status to another".)

ডব্লিউ পি. স্কটের মতে সামাজিক সচলতা বলতে বুঝায় যখন একক ব্যক্তি বা একটি গোষ্ঠী এক সামাজিক শ্রেণী বা স্তর হতে অন্য স্তরে গমন করে। (W.P. Scott- " Social mobility refers the

movement of an individual or group from one social class or social startum to another".)

কে ইয়ং এবং ডব্লিউ ম্যাক এর মতে সামাজিক সচলতা হল কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টির প্রতিষ্ঠিত সামাজিক মর্যাদার পরিবর্তন, একটি নির্দিষ্ট সমাজ কাঠামোর ভিতরেই মানুষের শ্রেণী বা সামাজিক স্তর গত অবস্থানের পরিবর্তন। (K. Young and .W. Mack " Social mobility refers to a change in the structural status of an individual or a group of category".)

উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলিকে বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হয় যে সামাজিক সচলতা হল মূলত ঃ

- সামাজিক মর্যাদার পরিবর্তন,
- ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহের অবস্থানের পরিবর্তন,
- ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর এক স্তর হতে অন্য স্তরে গমন,

সামাজিক সচলতার প্রকারভেদ (Types of Social Mobility)

সামাজিক সচলতার দুটি মূল প্রকারভেদ হল :

ক) অনুভূমিক সচলতা (Horizontal Mobility)

খ) উল্লম্বী সচলতা (Vertical Mobility)

ক) অনুভূমিক সচলতা

অনুভূমিক সচলতা বলতে বুঝায় সম-সামাজিক স্তরের মধ্যেই সম-মর্যাদার একটি পেশা বা পদ থেকে অন্য একটি পেশা বা পদে যাওয়া। একই সামাজিক স্তরে ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহ অবস্থান করে এবং সমাজের কাঠামোর মধ্যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহ একই অবস্থান বজায় রাখে। যেমন: একজন শিক্ষক/শিক্ষিকা একটি বিদ্যালয় থেকে বদলি হয়ে অন্য বিদ্যালয়ে যোগদান করার ঘটনা। — এই প্রকার সচলতায় ভৌগলিক স্থানান্তর ঘটে থাকে মাত্রা, মর্যাদগত অবস্থানন্তর ঘটে না, ফলে ব্যক্তি/ব্যক্তিসমূহের অবস্থান সমাজে একই থাকে।

খ) উল্লম্বী সচলতা

কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহের যদি পেশা, বৃত্তি, কর্মক্ষেত্র ইত্যাদির পরিবর্তনের ফলে যদি সামাজিক মর্যাদার হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে তাহলে তাকে বলে উলম্বী সচলতা। এই প্রকার সচলতার দ্বারা ব্যক্তি একটি সামাজিক স্তর থেকে অন্য একটি সামাজিক স্তরে উন্নীত হয় এবং এর দ্বারা ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহের সামাজিক অবস্থান ও তারতম্য ঘটে।

উল্লম্বী সচলতা ঃ কিছু প্রকারভেদ রয়েছে এবং এগুলি হল নিম্নরুপ :

১) উর্দ্ধমূখী উল্লম্বী সচলতা (Upward Vertical Mobility)

২) অধোমূখী উল্লম্বী সচলতা (Downward Vertical Mobility)

৩) আন্ত:প্রজন্মিক সচলতা (Inter - Generational Mobility)

৪) অন্ত: প্রাজন্মিক সচলতা (Intra - Generational Mobility)

৫) কাঠামোমূলক সচলতা (Structural Mobility)

১) উর্দ্ধমূখী উল্লম্বী সচলতা

সামাজিক সচলতার দ্বারা যদি ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহের সামাজিক মর্যাদার উন্নতি ঘটে তা হলে তাকে

উর্দ্ধমূখী উল্লম্বী সচলতা বলে। এই প্রকার সচলতার দ্বারা ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহের সামাজিক মান-সন্মান, যশ- প্রতিপত্তি ইত্যাদির বৃদ্ধি ঘটে এবং সামাজিক উচ্চস্তরে ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহ উপনীত হতে পারে। যেমন, কোন একজন অশিক্ষক কর্মচারী (কেরানী বা Clerk) এর সন্তান উচ্চশিক্ষিত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মক্ষেত্রে যোগদান করে অধ্যাপক হিসাবে। ফলে এর দ্বারা সন্তানের সাথে সেই ব্যক্তির ও সামাজিক স্তরের উর্দ্ধমূখী অবস্থানের প্রবেশ করতে পারল।

২) অধোমূখী উল্লম্বী সচলতা

ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহের সামাজিক অবস্থান যদি তার পিতামাতার অথবা তার পূর্বপুরুষের সামাজিক অবস্থান থেকে নিম্নগামী হয় তবে তা হল অধোমুখী উল্লম্বী সচলতা অথার্ৎ যদি পিতামাতা অথবা পূর্বপুরুষের তুলনায় ব্যক্তি পেশা, বৃত্তি, আয়, পদমর্যাদা সামাজিক স্তরে নিম্নমুখী হয় তা অধোমুখী উলম্বী সামাজিক সচলতা। যেমন, একজন চিকিৎসকের সন্তান মাধ্যমিক পাশও করতে পারল না এবং সে দিনমজুরের জীবিকা গ্রহণ করল; এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে সেই সন্তানের এবং পরোক্ষভাবে তার পিতা-মাতার সামাজিক স্তর নিম্নমূখী হল।

৩) আন্ত:প্রাজন্মিক সচলতা

সময়ের ব্যবধানে একটি প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মের মধ্যে অনেক বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়; এই বৈশাদৃশ্য হয় পেশা, বৃত্তি, শিক্ষার হার ও ধরন, পরিবারের বাসস্থানের পরিবর্তন, বিভিন্ন সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-আচরণ ইত্যাদির পরিবর্তন। এর ফলে একটি প্রজন্মের সাথে অন্য প্রজন্মের মধ্যে যে পার্থক্য সূচিত হয় তাকে বলে আন্ত:প্রাজন্মিক সচলতা। যেমন, ছোট ছোট অনেকগুলি গৃহে একটি প্রজন্মের লোকেরা থাকত কিন্তু পরবর্তী প্রজন্মের ব্যক্তিরা বৃহৎ অট্টালিকা (Flat) করে একই ছাদের তলে বসবাস শুরু করল এবং এর দ্বারা তারা পূর্ববতী প্রজন্ম থেকে বাসস্থানের পরিবর্তন ঘটাল।

৪) অন্ত: প্রাজন্মিক সচলতা

একটি প্রজন্ম তার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই সামাজিক স্তরের পরিবর্তন লক্ষ্য করে থাকে; অর্থাৎ একটি প্রজন্মের ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহের মধ্যে পেশাগত দিক কে কেন্দ্র করে যে সচলতা ঘটে তাকে বলে অন্ত:প্রাজন্মিক সচলতা। যেমন, একটি প্রজন্মের সন্তান - সন্তানিরা পেশার পরিবর্তন করে বিভিন্ন প্রতিযোগীতার মাধ্যমে এবং তারা তাদের নিজের প্রজন্মের অন্যান্য ভাই-বোনদের পেশা বা বৃত্তি গ্রহণ করে না।

৫) কাঠামোমূলক সচলতা

সামাজিক সচলতা একটি সামাজিক স্তর নির্দিষ্টকরনে সহায়তা করে ফলে ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহের সামাজিক অবস্থান চিহ্নিতকরণ সম্ভবপর হয়। কিন্তু দেখা যায় বিভিন্ন সময়ে আকস্মিক কিছু ঘটনার জন্য সমাজের পূর্বতন কাঠামোর অনেক পরিবর্তন সাধিত হয় এবং একে কেন্দ্র করে সমাজের স্তরের বিন্যাস (Hierarchy) পরিবর্তন হয় ফলে ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহের ও সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হয়। যেমন, হঠাৎ করে একটি বেসরকারী সংস্থা আর্থিক মন্দার ফলে বন্ধ হয়ে গেল এবং এর সাথে যুক্ত ব্যক্তিবর্গের কর্মের বিলুপ্তি ঘটল; অথবা একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান অপর একটি বেসরকারী সংস্থা ক্রয় করল এবং এর সাথে যুক্ত সমস্ত ব্যক্তিদের বহুলাংশে মর্যাদাগত পরিবর্তন সাধন করল।

শিক্ষা এবং সামাজিক সচলতা (Education and Social Mobility)

সামাজিক সচলতা হল কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহের একটি নির্দিষ্ট সামাজিক স্তরের পরিবর্তন এবং অন্য স্তরে উপনীত হওয়া। সামাজিক স্তরের পরিবর্তন হতে পারে উচ্চ বা নীচ বা অনুভূমিক। প্রতিটি সামাজিক স্তরের সাথেই জড়িয়ে রয়েছে সামাজিক রীতি-নীতি, নিয়ম-কানুন, বাধা-নিষেধ, মান-মর্যাদা ইত্যাদি। ফলে সামাজিক স্তরের পরিবর্তনের সাথে সাথে এই সমস্ত বিষয়গুলোর ও পরিবর্তন ঘটে। সামাজিক স্তরের পরিবর্তন কখনো দ্রুত হতে পারে আবার দ্রুত না ও হতে পারে, যেমন বলা যায় একজন দরিদ্র ব্যক্তি স্নাতক (Graduate) হবার কিছু দিনের মধ্যেই উচ্চ মাইনের একটি চাকুরী পেল অথবা দীর্ঘ অনেক বছর চাকুরী পেল না। সামাজিক এই সচলতা আকস্মিক ও হতে পারে। যেমন হঠাৎ কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর বহুসংখ্যক ব্যক্তি গৃহহীন ও সম্পদহীন হয়ে পড়ল— এই কারণে তারা সমাজের একটি নির্দিষ্ট স্তরে আর পূর্বের মত অবস্থান করতে পারবে না, তাই এই ক্ষেত্রে সামাজিক সচলতা অধোমুখী। আবার দেখা গেল অত্যন্ত কম মূল্যের কোন জায়গা কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠান তার ব্যবসায়ের জন্য অনেক বেশী মূল্যে ক্রয় করে নিল, ফলে এই জায়গার সাথে জড়িত ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহরা পূর্বের তুলনায় তাদের সামাজিক অবস্থানে আর আবদ্ধ না থেকে উর্দ্ধমূখী করবে। সুতরাং সামাজিক সচলতা হল একটি সমাজের মধ্যে চিরন্তন প্রক্রিয়া এবং বদ্ধসমাজে সামাজিক সচলতার হার শ্লথ কিন্তু মুক্ত সমাজে এর হাত দ্রুত গতিসম্পন্ন।

সামাজিক সচলতা শিক্ষার হাত ধরে কিভাবে সম্ভব তা উপলব্ধি করতে হলে পূর্বে বর্ণিত সমাজের বিভাগগুলি (আদিবাসী সমাজের কৃষিজীবি সমাজ, শিল্পসমাজ, বর্তমান যান্ত্রিক সমাজ) খেয়াল রাখতে হবে, খেয়াল রাখতে হবে সংস্কৃতায়ণ, পাশ্চাত্যকরণ, আধুনিকীকরণ,বিশ্বায়ণ ইত্যাদি বিষয়গুলির সাথে। কারণ তাহলে উপলব্ধিকরণ সম্ভব হবে বর্তমান সমাজ সম্পর্কে; বর্তমানে সমাজ আর নির্দিষ্ট কোন একক সমাজে আবদ্ধ নয় বরং বর্তমান সমাজ পরিণত হয়েছে একটি ‘Gloval Village’ এ। এই পরিবর্তন সম্ভবপর হয়েছে অনেক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বিষয়কে কেন্দ্র করে যার মধ্যে পূর্বে‘ বর্ণিত বিভিন্ন উপাদানসমূহ (জৈবিক উপাদান, মনস্তাত্বিক উপাদান, অর্থনৈতিক উপাদান, সাংস্কৃতিক উপাদান, প্রযুক্তিগত উপাদান) উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। সমাজের এই পরিবর্তন সম্ভবপর হয়েছে সামাজিক সচলতার কারণে; যদি সমাজের অন্তর্গত ব্যক্তিরা নির্দিষ্ট স্তরের সর্বদা অবস্থান করত তবে সমাজ কখনোও পরিবর্তনের স্বাক্ষী হতে পারত না। তাই সামাজিক সচলতার গুরত্ব সমাজে এবং সমাজস্থ ব্যক্তিসমূহের মধ্যে অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ।

সামাজিক সচলতা বিভিন্ন বিষয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে হতে পারে যেমন বৃত্তি ও পেশা নির্বাচন। বিবাহ, যে কোন বিশিষ্ট মতাদর্শের ব্যক্তিদের সাথে যুক্ত হওয়া, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে ইত্যাদি। এই বিষয়গুলি ছাড়াও যে বিষয় দ্বারা সামাজিক সচলতা সর্বাপেক্ষা বেশী প্রভাবিত হয় তা হল শিক্ষা। এই প্রসঙ্গে ইহা বলা বাঞ্ছনীয় যে পূর্বে শিক্ষার তিনটি রূপ: প্রথামুক্ত (Informal), বিধিবদ্ধ (Formal) এবং বিধিমুক্ত (Non-formal) এর সাথে পরিচয় ঘটেছে, এছাড়াও পরিচয় ঘটেছে বিকাশের বিভিন্ন দিকসমূহ সম্পর্কে। তাই পূর্বের আলোচনা থেকে এই সম্পর্কে ধারণা পাওয়া গেছে যে শিক্ষা ব্যতীত সমাজ ব্যবস্থা ও সমাজস্থ ব্যক্তি বা ব্যক্তি সম্পর্কের দিক নিদির্ষ্ট পথে ধাবিত হতে পারে না।

পূর্বের আলোচনা থেকে সামাজিক সচলতার বিভিন্ন প্রকারভেদ সম্পর্কে অবগত হওয়া গেছে; কিন্তু

তার সাথে শিক্ষার কিরূপ সম্পর্ক তা স্বল্পবিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। ধরা যাক, একজন কৃষকের (নিরক্ষর) সন্তান উচ্চশিক্ষিত হয়ে চিকিৎসকের পেশায় যুক্ত হল— এখানে সামাজিক সচলতা হল উল্লম্বী অথাৎ উর্দ্ধমূখী উল্লম্বী সচলতা । এক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকা সামাজিক সচলতার ক্ষেত্রে সর্দাথক (Positive) আবার আন্ত:প্রাজন্মিক সচলতার শিক্ষার ভূমিকা যদি বিশ্লেষন করা যায় তবে উদাহরণস্বরুপ বলা যায় পিতা যদি প্রশাসনিক ক্ষেত্রকে জীবিকা হিসাবে নির্বাচন করেছে। সে ক্ষেত্রে উনার সন্তানগন কেউ প্রশাসন, কেউ শিক্ষকতা, কেউ স্থাপত্যবিদ্যাকে জীবিকা হিসাবে নির্বাচন করেছে। এক্ষেত্রে ও বলা যায় সামাজিক সচলতার ক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকা সর্দাথক। আবার, অন্ত: প্রাজন্মিক সচলতায় শিক্ষার ভূমিকা সদার্থক হতে পারে যেমন, একই পিতামাতার তিনজন সন্তান: আইন, চিকিৎসা, স্থাপত্য নিয়ে অধ্যয়ন করে পেশা ও জীবিকা নির্বাচন করতে পারে। এমনকি অনুভূমিক সচলতার ক্ষেত্রে ও শিক্ষার ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না, যেমন, একজন চিকিৎসক একটি হাসপাতাল থেকে অন্য হাসপাতালে যোগদান করলেন। — উপরিউক্ত সমস্ত প্রকার সামাজিক সচলতার ক্ষেত্রেই শিক্ষার ভূমিকা সদার্থক (Positive) কারণ শিক্ষার দ্বারাই ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ তার বা তাদের সামাজিক স্তরের উর্দ্ধমূখী পরিবর্তন করতে পেরেছে অথবা একই স্তর বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছে।

যদি উল্লম্বী সচলতার একটি প্রকারভেদ যথা অধোমুখী সচলতা সম্পর্কে উদাহরণস্বরুপ বলা যায় যে, একজন শ্রমিকের সন্তান উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করল কিন্তু দীর্ঘসময় সে কোন পেশায় যুক্ত হতে পারল না তার অর্জিত শিক্ষা দ্বারা এবং সে আবার পিতার মত শ্রমিকের জীবিকায় ফিরে গেল। তাহলে এক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকা ইতিবাচক (Positive), নেতিবাচক (Negative), শুন্য (Zero)— কি ? আবার কাঠামোমূলক সচলতায় যেমন স্তরবিন্যাসের (Hierarchy) এর পরিবর্তন ঘটে, তাতে সামাজিক স্তর নিম্নগামী ও হতে পারে আবার উর্দ্ধগামী হতে পারে। যদি উদাহরণস্বরুপ বলা যায় যে, কোন একটি বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেল এবং ইহার সাথে জড়িত ব্যক্তিরা কর্মহীন হয়ে পড়ল এবং দীর্ঘদিন ধরে যদি এই ব্যক্তিরা কর্মহীন থাকে তবে তাদের সামাজিক স্তর ক্রমশ নিম্নগামী হবে আবার যদি এই বেসরকারী প্রতিষ্ঠানচির মালিকানা অন্য একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান নিয়ে নেয়, প্রত্যেক ব্যক্তির পারিশ্রমিক দ্বিগুন করে দেয় তাহলেও সামাজিক স্তর ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের ক্রমশ উর্দ্ধগামী হবে,— এ সমস্ত ক্ষেত্রে একথা খেয়াল রাখতে হবে একজন শিক্ষিত ব্যক্তির কাছে কর্মক্ষেত্র অনেকটাই উন্মুক্ত এবং সারা পৃথিবী সত্যিকারের অর্থেই তার কাছে একটি ‘Global Village’। কিন্তু একজন নিরক্ষর ব্যক্তির কাছে তার কর্মক্ষেত্র অনেকটাই সংকুচিত। সুতরাং একজন নিরক্ষর ও শিক্ষিত ব্যক্তি (দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে কম না পেয়ে) একই কাজ করতে পারবে, হঠাৎ করে কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা বিপর্যয় (বিধ্বংসী বন্যা বা দেশ বিভাগ) ঘটলে একজন শিক্ষিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহ তার বা তাহার অবস্থান পরিবর্তন করতে পারবে তার বা তাহার অর্জিত শিক্ষাকে ব্যবহার করে। ফলে সামাজিক সচলতা শিক্ষার দ্বারা সর্বদায় ইতিবাচক (Positive) কিন্তু শিক্ষা ছাড়া সামাজিক সচলতা ইতিবাচক হতে পারে না। তাই সামাজিক সচলতার ক্ষেত্রে শিক্ষার গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না।

শিক্ষা - সুযোগের সমতা বিধান (Equalisation of Educational Oppurtunity)

শিক্ষাগত সুযোগের সমতাবিধান এর ধারণা - শিক্ষার সমসুযোগ মানেই শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের নিজস্ব প্রবণতা ও ক্ষমতানুসারে আত্মবিশ্বাসের সুযোগ সৃষ্টি করা। গণতান্ত্রিক দেশ হল ভারতবর্ষ। সামাজিক লক্ষ্যই হল শিক্ষায় সমসুযোগ সৃষ্টি করা। সমাজ সাধারণ মানুষ, পশ্চাৎপদ অথবা সুযোগ-বঞ্চিত শ্রেণী অর্থাৎ জাতি-বর্ণ- ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের সম্ভাব্য প্রতিভার বা সুপ্ত সম্ভাবনার বিকাশ সাধন করে সেই সুযোগ সৃষ্টি করে তাই স্বাধীনতার পর নির্দেশমূলক নীতিসমূহের 45 নং ধারায় সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি সকল স্তরের শিক্ষাকে অবৈতনিক করে তোলার কথা বলেছে কোঠারী কমিশন। উন্নয়নশীল দেশ শিক্ষার লক্ষ্যই স্থির করে - অসাম্য দূর করে শিক্ষায় সমতা আনা। তবে ভারতবর্ষে শিক্ষাক্ষেত্রে নানা কারণে সমতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। এই অসমতার কারণেই সকলের জীবনমান উন্নত নয়। জীবনমান উন্নত করার একমাত্র উপায় হল শিক্ষাক্ষেত্রে সমতা আনা।

সমসুযোগ সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা

১) গণতন্ত্রের উন্নতির জন্য এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য সামাজিক ও আর্থিক বৈষম্যতা নির্বিশেষে শিক্ষায় সমতা আনা একান্ত প্রয়োজন।

২) জাতি- ধর্ম- বর্ণ নির্বিশেষে সামাজিক সংহতি বজায় রাখার জন্য অর্থাৎ সামাজিক মতভেদ, অনৈক্য এবং পৃথকীকরণের সৃষ্টি না করার জন্যই শিক্ষায় সমসুযোগের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

৩) শিক্ষায় সমসুযোগের মাধ্যমেই বৈষম্যহীন সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব, নয়ত দেখা দেবে শ্রেণী-বিভাজন এবং বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি।

৪) সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য প্রয়োজন শিক্ষাক্ষেত্রে সমসুযোগের। লক্ষ্য রাখতে হবে শিক্ষার সুযোগ কেবল অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নত নাগরিকের মধ্যেই যেন সীমাবদ্ধ না থাকে।

৫) সমাজের মানব-সম্পদ ও দক্ষ নাগরিক গড়ে তোলার জন্যই প্রয়োজন শিক্ষায় সমসুযোগ সৃষ্টি করা।

৬) মানবিক মূল্যবোধ, ভাবধারা ও গণতান্ত্রিক চেতনা বজায় রাখা এবং বিস্তৃত করার জন্য শিক্ষায় সমসুযোগ প্রয়োজন একান্তভাবে।

৭) শিক্ষায় সকলকে সমান সুযোগ দিতে হবে যাতে তাদের মধ্যে শারীরিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক, অনুভূতিমূলক এবং প্রজ্ঞামূলক বিকাশ যথাযথ হয়।

৮) ব্যক্তির সুপ্ত সম্ভাবনার বিকাশ ঘটিয়ে বৃহত্তর সমাজের সমৃদ্ধি সাধনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজন শিক্ষায় সমসুযোগের।

৯) ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের মাধ্যমে যাতে নিজ নিজ ক্ষমতা ও প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে নিজের প্রয়োজন, ইচ্ছা ও ক্ষমতানুযায়ী শিক্ষালাভ সম্ভব হয় সমসুযোগের মাধ্যমে কেননা ব্যক্তি বিশেষই হল গণতন্ত্রের ভিত্তি।

শিক্ষা সুযোগে অসমতায় কারণ

নানা কারণে শিক্ষা- সুযোগের অসমতা পরিলক্ষিত হয়, কারণগুলো হল-

১) অসম বণ্টন - শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অসম বণ্টন দেখা যায়। শহরে ঘন ঘন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে, পাশাপাশি গ্রামগঞ্জে মাইলের পর মাইল অতিক্রম করে রয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। গ্রামগঞ্জে

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি করে, স্কলারশিপ ও হোস্টেলের যথাযথ ব্যবস্থা করে এরূপ অসম অবস্থা দূর করা সম্ভব।

২) দারিদ্র্য - শিক্ষা-সুযোগের অসমতার জন্য দারিদ্র্য দায়ী। সমাজের ধনী ও মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তানের সংখ্যা বৃহত্তর জনসংখ্যার অনেক কম, যদিও তারা শিক্ষায় অগ্রসর হতে থাকে। জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশই দারিদ্র্য। দারিদ্র্যতাই বাধা হয়ে দাঁড়ায় শিক্ষার জন্য। তাই শিক্ষার সর্বক্ষেত্রে বিনামূল্যের ব্যবস্থা এবং বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করে এই অসমতা দূর করা প্রয়োজন। অশিক্ষিত পিতামাতা অনুকূল শিক্ষা পরিবেশ এবং শিক্ষাক্ষেত্রে সঠিক অর্থনৈতিক ব্যয়সংকুল করা সম্ভব হয় না যা সমতা বিধানের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

৩) গৃহ পরিবেশ- গৃহের পরিবেশ শিক্ষায় অসমতার কারণ। পিতামাতা অশিক্ষিত হলে অনূকুল শিক্ষা-পরিবেশ পায় না। এছাড়া শিশুর শিক্ষা ভারতবর্ষে নির্ভর করে পিতামাতার অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর।

৪) শিক্ষা-মানের অসমতা - শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলের সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান সমান থাকে না। উচ্চশিক্ষায় প্রবেশ এমনকি বৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে নম্বরের উপরই ভিত্তি করা হয়। বিদ্যালয়ের মান সমান না থাকায় পরীক্ষার ফলাফলও সমান হয় না, তাই পরীক্ষার নম্বরের উপর ভিত্তি না করে সমতা আনয়নের অনুকূল বিশ্বাসযোগ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করাই যুক্তিযুক্ত।

৫) অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ প্রথা - অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ প্রথার কারণে শিক্ষা সুযোগের অসমতা পরিলক্ষিত হয়। নানা ভাষা, নানা জাতির দেশ ভারতবর্ষ। সমাজ উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ প্রথা এখনও অবলুপ্ত হয় নি।

শিক্ষা-সুযোগে অসমতার সমাধান বা সমতা বিধানের উপায়

শিক্ষা-সুযোগের অসমতার সমাধানের বা সমতা বিধানের মৌলিক বিষয় হল তিনটি -

ক) সংখ্যাগত সম্প্রসারণ - সাক্ষরতার জন্য বিদ্যালয় এর যে সংখ্যাগত সম্প্রসারণ প্রতিটি জেলায় বা রাজ্যে হওয়া প্রয়োজন, ব্যবধান দুস্তর রয়ে গেছে এবং ব্যবধান বেড়েই চলেছে। তাই বিদ্যালয় শিক্ষার সম্প্রসারণ হল গুরত্বপূর্ণ কর্মসূচী সমতা বিধানের জন্য।

খ) সামাজিক সুযোগ সুবিধার সম্প্রসারণ - এখনও কোনও কোনও ক্ষেত্রে সামাজিক দিক থেকে শিক্ষা সুযোগের ব্যবধান রয়ে গেছে। তপশিলী-জাতি, উপজাতি ও আদিবাসীরা সাধারণ নাগরিক শ্রেণী থেকে অনেক পিছিয়ে আছে যদিও সরকারী প্রচেস্টা জারী রয়েছে এই অসাম্য দূর করার জন্য।

গ) সুযোগের গুনগত সম্প্রসারণ - স্থানীয় ধনী, সম্পদশালী, মধ্যবিত্ত শিক্ষা সুযোগ লাভ করছে কিন্তু যারা অশিক্ষিত ও পশ্চাৎপদ তারা পশ্চাতেই রয়ে গেছে। শিক্ষায় গুনগত উন্নয়ন এদের মোটেই হয় নি। বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত বিদ্যমান রয়েছে এই বৈষ্যমের। বৈষম্য বর্জনের সুপারিশ কার্যকর হলেই সমতা বিধান সম্ভব।

উপরিউক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও সমতা বিধানের অন্য উপায়গুলো হল -

১) শিক্ষা হবে অবৈতনিক, বাধ্যতামূলক।

২) শিক্ষার সমসুযোগের জন্য, শিক্ষার জাতীয়করণ প্রয়োজন।

৩) সমস্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান সমান হবে।

৪) অঞ্চল ভেদে শিক্ষালাভের সুযোগের বৈষম্য দূর করতে হবে।

৫) শিক্ষার্থীদের মেধার উপর ভিত্তি করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশাধিকারের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৬) শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় শিক্ষার শেষ স্তর পর্যন্ত বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষাসামগ্রী, বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭) দূর্বল, অনগ্রসর এবং বালিকাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে ইহা স্পষ্ট হল যে 'Equality' বা সমতা হল সমাজের কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীকে কোন বিশেষ সুবিধা প্রদান না করা এবং সমাজের প্রতিটি ব্যক্তিকে একই ধরনের সুবিধা প্রদান করা। ভারতের সংবিধানে লিপিবদ্ধ আছে ভারতের সমস্ত নাগরিককে সমান সুবিধা যাতে লাভ করতে পারে তার নিশ্চয়তার ব্যবস্থা করা। তাই সমতা বা Equality হল প্রত্যেক ব্যক্তিতে সমান সুযোগ প্রদান করা যাতে সেই ব্যক্তি তার সম্পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়। সমাজে সমতা বিধানের কথা ড:সর্বপল্লী রাধাকৃষ্নন অনেক পূর্বেই বলে গিয়েছিলেন। গণতন্ত্র শুধুমাত্র সেই সুবিধা প্রদান করে যাতে সকল ব্যক্তি সমান সুযোগ লাভ করে যাতে তাদের অসম বন্টিত প্রতিভার বিকাশসাধন সম্ভবপর হয়। (Dr. Savapalli Radhakrishnan - "Democracy only provides that all men should have equal opportunities for the development of their unequal talents".)

ভারতবর্ষ হল একটি গনতান্ত্রিক দেশ এবং এই দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এই দেশের নাগরিকদের শিক্ষার উপর। সুতরাং শিক্ষায় সমতা (Equality) এর জন্য ভারতের সংবিধান সুস্পষ্ট করে দিয়েছে যে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, জন্মস্থান ইত্যাদির ভিত্তিতে শিক্ষাগত কোন পার্থক্যকরন করা যাবে না। তাই এই বিষয়ে সংবিধান বিভিন্ন বিদ্যমান অসাম্যসমূহ দূর করার কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যার কিছু হল নিম্নরূপ:

- সংবিধানের 21 (A) ধারা শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসাবে বলেছে।
- সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতি সমূহ ও শিক্ষাকে শিশুদের জন্য মুক্ত এবং বাধ্যতামূলক করার কথা বলেছে।
- সংবিধানের 29 (1) / ২৯ (১) ধারা রাজ্যের অর্ন্তগত সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যাতে ধর্ম, বর্ণ, জাতি, ভাষা ইত্যাদির ভিত্তিতে কোন বৈষম্য না হয় তার কথা বলেছে।
- সংবিধানের 30 (৩০) নং ধারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরীর কথা বলেছে।

নারীদের শিক্ষাব্যতীত শিক্ষার সমতা (Equality) সম্ভবপর হবে না, তাই জাতীয় শিক্ষানাতি ১৯৮৬ (National Policy of Education- 1986) নারীদের শিক্ষার ব্যাপার গুরত্ব প্রদান করেছিল। ভারতবর্ষে শিক্ষায় সমতাবিধানের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প (Project / Scheme) গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে, যেমন সর্বশিক্ষা অভিযান, রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান ইত্যাদি। ইহা ছাড়াও গ্রামীন মেধা উন্মেষের জন্য নবোদয় বিদ্যালয় স্থাপন, অপারেশন ব্ল্যাকবোর্ড, Right to Education Act 2009 (R.T.E 2009), মিড ডে মিল প্রকল্প, বৃত্তির ব্যবস্থা, আবাসিক শিক্ষার ব্যবস্থা, অর্ন্তভূক্তিমূলক শিক্ষা, বিভিন্ন গবেষনাধর্মী বৃত্তি ইত্যাদির ভূমিকা অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ।

শিক্ষায় সমতা বিধান এর বর্তমান চিত্র ভারতে অনেকটাই সম্ভবপর হয়েছে যদি ভারতবর্ষের শিক্ষার গতি প্রকৃতি ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট এর সাথে তুলনা করা যায়। শিক্ষাকে প্রতিটি ঘরে পৌঁছে দেবার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য যৌথভাবে প্রচেস্টা করে আসছে, ফলে শিক্ষায় সমতা বিধান অনেকটাই সম্ভবপর হচ্ছে।

কিন্তু লিঙ্গা বৈষম্য, আঞ্চলিক বৈষম্য, আয়ের বৈষম্য ইত্যাদি এখন ও শিক্ষায় সমতা বিধানের ক্ষেত্রে বিরাট অন্তরায় হিসাবে দেখা দিচ্ছে।

তথাপি বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন এবং বিভিন্ন শিক্ষা কমিটিগুলি শিক্ষাক্ষেত্রে সমতা বিধানের ক্ষেত্রগুলোকে বিশেষ গুরত্ব সহকারে বিবেচনায় আনতে পেরেছে যার ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে সমতাবিধানের গতি দিনে দিনে ক্রমউন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে।

সারসংক্ষেপ

প্রথম একক : শিক্ষা ও সমাজের সম্পর্ক

◆ 'Society'- শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে ল্যাটিন শব্দ 'Socius' যার মানে হচ্ছে সাহচার্য্যতা বা বন্ধুত্ব।

◆ সমাজ হল - সুসংবদ্ধ সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান, বিধিবদ্ধ সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ, ঐক্যবদ্ধতাই মূল চাবিকাঠি, সম্পর্কের জাল।

◆ সমাজের মূল্য বৈশিষ্ট্যগুলো হল -

ক) সমাজব্যক্তি নির্ভর, (খ) সমাজ পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া ও পারস্পরিক সচেতনতার সমন্বয় (গ) সমাজ পছন্দ নির্ভর (ঘ) সমাজ অপছন্দ নির্ভর (ঙ) শ্রম বিভাজন (চ) সমাজ পরস্পর নির্ভর (ছ) সমাজ গতিশীল (জ) সামাজিক নিয়ন্ত্রণ।

◆ সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার প্রকারভেদ : প্রতিযোগিতা, দ্বন্দ্ব, উপযোজন, আত্তীকরণ, সহযোগিতা।

◆ শিক্ষার সাথে ব্যক্তি, সমাজ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জড়িত, শিক্ষার পরিবর্তন সমাজ পরিবর্তনকে অনুসরণ করে এবং শিক্ষার দ্বারাই সমাজ একটি সুসংগঠিত রূপ নেয়।

◆ শিক্ষার চারটি স্তম্ভ হল- জানার জন্য শিখা, কর্মের জন্য শিখা, একত্রে বসবাসের জন্য শিখা এবং মানুষ হওয়ার জন্য শিখা।

দ্বিতীয় একক : শিক্ষা ও সামাজিক পরিবর্তন

◆ সামাজিক পরিবর্তন হল : সমাজের কাঠামোর পরিবর্তন, সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার ফল, সামাজিক কার্যধারার পরিমার্জন, সামাজিক সক্রিয়তার ফল।

◆ সামাজিক পরিবর্তনের উপাদান সমূহ : জৈবিক উপাদান, মনস্তাত্ত্বিক উপাদান, অর্থনৈতিক উপাদান, সাংস্কৃতিক উপাদান এবং প্রযুক্তিগত উপাদান।

◆ সামাজিকীকরণের পদ্ধতি হল : সামাজিকীকরণ — সংরক্ষণ — প্রগতি — গঠন — বিবর্তন।

◆ মূল তিনধরনের সমাজ। আদিবাসী সমাজ, কৃষি সমাজ এবং শিল্প সমাজ।

◆ সমাজ বিবর্তনে মূল ধারা চারটি। সেগুলো হলো -

(ক) সংস্কৃতায়ন (খ) পাশ্চাত্যকরণ (গ) আধুনিকীকরণ (ঘ) বিশ্বায়ন।

◆ নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া শিক্ষা হওয়ায় গতিশীল সমাজের সঠিক রূপায়নেও কাণ্ডারীর ভূমিকা নেয় শিক্ষা।

তৃতীয় একক : শিক্ষা এবং বিকাশ

♦ একটি শিশুর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিক গুণগত এবং ক্রিয়াগত পরিবর্তনের ফল হল বিকাশ।

♦ বিকাশের স্তর বয়স অনুযায়ী হয়। মনোবিজ্ঞানীরাও বিকাশের স্তরভেদ করেছেন বয়স অনুযায়ী। যেমন- এরিকসন বিকাশকে আটটি স্তরে, পিকুনাস দশটি স্তরে এবং জোনস্ চারটি স্তরে।

♦ বিকাশের বিভিন্ন দিক সমূহ - দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, প্রাক্ষোভিক, ভাষাগত, নৈতিক, প্রজ্ঞামূলক, নান্দনিক।

♦ বিকাশের ক্ষেত্রে সামাজিক প্রভাবকারী উপাদানসমূহগুলো হল- দারিদ্র্য, সুযোগের অভাব, বঞ্চনা, বিপর্যস্ত পরিবার, নিম্নমানের গৃহপরিবেশ, সামাজিক প্রথা, লোকাচার ও লোকপ্রথা, ধর্ম, বিশ্বাস, আদর্শ।

♦ শিক্ষা এবং বিকাশ একে অপরের পরিপূরক অর্থাৎ একে অপরকে ছাড়া সার্থক হতে পারে না।

চতুর্থ একক : সামাজিক স্তর বিন্যাসের অর্থ ও ধারণা

♦ সামাজিক স্তর বিন্যাস হল :

- একটি আবশ্যিক সামাজিক পরিস্থিতি,
- একটি চিরন্তন ও সার্বজনীন প্রক্রিয়া,
- সম্পত্তি, ক্ষমতা, পদমর্যাদা ইত্যাদির নির্দেশক,
- সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার নির্দেশক,
- সমাজস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে মর্যাদার নিয়ন্ত্রক,
- সমাজের বৈসাম্যের প্রকৃতি গভীরতার নির্দেশক ইত্যাদি।

♦ সামাজিক স্তর বিন্যাসের বৈশিষ্ট্যগুলো হল -
(ক) একটি সার্বজনীন ঘটনা (খ) সম্পত্তি, মর্যাদা, বর্ণ ইত্যাদির পার্থক্যের ভিত্তিতে গড়ে উঠে (গ) প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সকল ব্যক্তিকে প্রভাবিত করে (ঘ) সামাজিকীকরণের সাথে সামাজিক স্তর বিন্যাস জড়িত। (ঙ) সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসকে বুঝতে সহায়তা করে (চ) চরিত্রগতভাবে আরোপিত হয় (ছ) সামাজিক সুযোগ সুবিধার অসম ব্যবহারের ফল।

♦ সামাজিক স্তরের শ্রেণিবিন্যাসগুলো হল - ক) দাসপ্রথা (খ) ভূমিসত্ত্ব প্রথা (গ) শ্রেণি প্রথা।

♦ সামাজিক স্তর শিক্ষার দ্বারা পরিবর্তন করা সম্ভব যদি শিক্ষার কাঠামোগুলো পারস্পরিক নিবিড়ভাবে যুক্ত থাকে।

পঞ্চম একক : সামাজিক সচলতা এবং শিক্ষা, শিক্ষা সুযোগের সমতাবিধান

♦ সামাজিক সচলতা হল : সামাজিক মর্যাদার পরিবর্তন,
ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহের অবস্থানের পরিবর্তন,
ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর একস্তর হতে অন্যস্তরে গমন।

◆ সামাজিক সচলতার দুটি মূল প্রকারভেদ :
- অনুভূমিক সচলতা,
- উল্লম্বী সচলতা।

◆ উল্লম্বী সচলতার প্রকারভেদ হল :
- উর্দ্ধমুখী উল্লম্বী সচলতা,
- অধোমুখী উল্লম্বী সচলতা।
- আন্ত:প্রাজন্মিক সচলতা
- অন্ত:প্রাজন্মিক সচলতা
- কাঠামোমূলক সচলতা

◆ শিক্ষিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহ তার বা তাহার অবস্থান পরিবর্তন করতে পারবে তার অর্জিত শিক্ষাকে ব্যবহারের দ্বারা, ফলে সামাজিক সচলতার ক্ষেত্রে শিক্ষার গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না।

◆ শিক্ষা সুযোগের অসমতার কারন : অসম বন্টন, দারিদ্র, গৃহপরিবেশ, শিক্ষামানের অসমতা, অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ প্রথা।

◆ শিক্ষা সুযোগে সমতা বিধানের মূল উপায় : সংখ্যাগত সম্প্রসারণ, সামাজিক সুযোগসুবিধার সম্প্রসারণ, সুযোগের গুণগত সম্প্রসারণ।

◆ লিঙ্গ বৈষম্য, আঞ্চলিক বৈষম্য, আয়ের বৈষম্য ইত্যাদি শিক্ষায় সমতা বিধানের কিছু অন্তরায়।

◆ সর্বশিক্ষা অভিমান, রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিমান, নবোদয় বিদ্যালয়, অপারেশন ব্ল্যাকবোর্ড, মিড ডে মিল, RTE-2009, বৃত্তি ইত্যাদি শিক্ষায় সমতা বিধানের লক্ষ্যে কাজ করছে।

অনুশীলনী

ক) ১ মানের প্রশ্ন : সর্বাধিক শব্দসংখ্যা ২০

১) 'Society' শব্দটির উৎপত্তি কোন শব্দ থেকে হয়েছে?

২) সমাজ হল সম্পর্কের জাল — একথাটি কে বলেছেন?

৩) বিকাশ বলতে কি বুঝায়?

৪) সামাজিক স্তরবিন্যাস বলতে কি বুঝ ?

৫) সামাজিক সচলতা কত প্রকার ও কি কি ?

খ) ২ মানের প্রশ্ন : সর্বাধিক শব্দসংখ্যা ৪০

১) সমাজের ধারণা ব্যক্ত কর।

২) সমাজ পরিবর্তন মূলত কি বুঝায়?

৩) শিক্ষা বলতে কি বোঝায়?

৪) সামাজিক স্তরের শ্রেণিবিন্যাস কি কি ?

৫) শিক্ষা সুযোগের সমতাবিধান বলতে কি বুঝায়?

গ) ৪ মানের প্রশ্ন : সর্বাধিক শব্দসংখ্যা ১০০

১) সমাজের বৈশিষ্ট্য উদাহরণ সহকারে লেখো।

২) সামাজিক পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্য লিখ।

৩) ভাষাগত বিকাশ ও নৈতিক বিকাশের ধারণা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৪) সামাজিক স্তরবিন্যাসের বৈশিষ্ট্য লেখো।

৫) শিক্ষা ও সামাজিক সচলতার আন্ত:সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর।

ঘ) ৫ মানের প্রশ্ন : সর্বাধিক শব্দসংখ্যা ১৫০

১) সামাজিক মিথস্ক্রিয়া প্রকারভেদগুলো শিক্ষা দ্বারা কিভাবে প্রভাবিত হতে পারে— সে ধারণা উপযুক্ত উদাহরণসহকারে বিশ্লেষণ কর।

২) শিক্ষা সামাজিক পরিবর্তনের সহায়ক — এই ধারণা কতটুকু বাস্তবগ্রাহ্য সমাজ পরিবর্তনের সাথে? এই বিষয়টির স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

৩) বিকাশের ক্ষেত্রে সামাজিক প্রভাবকারী উপাদানগুলোর ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।

৪) সামাজিক স্তরবিন্যাস ও শিক্ষা কি পরস্পরের সাথে জড়িত? উত্তরের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে মতামত বিবৃত কর।

৫) শিক্ষায় সুযোগের সমতাবিধানের কি কি উপায়সমূহ রয়েছে? তা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর।

ঙ) ৬ মানের প্রশ্ন : সর্বাধিক শব্দসংখ্যা ২০০

বোধপরীক্ষণমূলক

সামাজিকীকরণ একজন সমাজস্থ ব্যক্তিকে সেই সমাজের অন্তর্গত আদব কায়দা রীতি-নীতি, ধ্যান-ধারণার সাথে পরিচিতি ঘটায় এবং তার অবস্থান সেই সমাজে কোথায় বুঝতে পারে। সমাজব্যবস্থায় কোন ব্যক্তি কিরূপ হবে তা মূলত নির্ভর করে বিভিন্ন বিষয়ের উপর। যার মধ্যে অন্যতম হল শিক্ষা কারণ শিক্ষা ব্যতিত সমাজের উন্নয়নশীলতা ভাবাই যায় না। একটি সমাজের মধ্যস্থ ব্যক্তিসমূহের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির সংকীর্ণতা এবং ব্যাপকতা নির্ধারণ করে শিক্ষা । তাই শিক্ষাকে বলা হয় তৃতীয় চক্ষু এবং ইহা আমাদের অন্ধকার থেকে আলোর পথে উন্মীলিত করে।

— সামাজিকীকরণ বলতে কি বোঝায়? শিক্ষা কিভাবে সমাজের উন্নয়নশীলতায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়— তা ব্যাখ্যা কর। ২ + ৪ = ৬

চতুর্থ অধ্যায় : প্রাচীনযুগ, মধ্যযুগ এবং প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে ভারতের শিক্ষা

- ❖ প্রথম একক : প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা, বৌদ্ধ শিক্ষা
- ❖ দ্বিতীয় একক : মধ্যযুগে ভারতের শিক্ষা
- ❖ তৃতীয় একক : সনদ আইন (১৮১৩), উডের ডেসপ্যাচ (১৮৫৪)
- ❖ চতুর্থ একক : হান্টার কমিশন (১৮৮২-৮৩)
- ❖ পঞ্চম একক : স্যাডলার কমিশন (১৯১৭-১৯), ওয়ার্ধা পরিকল্পনা (১৯৩৭)

চতুর্থ অধ্যায় : প্রাচীনযুগ, মধ্যযুগ এবং প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে ভারতের শিক্ষা

উদ্দেশ্য (Objectives) :

- শিক্ষার্থীরা প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবে।
- শিক্ষার্থীরা বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবে।
- শিক্ষার্থীরা ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ও বৌদ্ধ শিক্ষার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য সম্পর্কে অবগত হবে।
- শিক্ষার্থীরা মধ্যযুগের শিক্ষাব্যবস্থা এবং ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে বিস্তৃত ধারণা লাভ করবে।
- শিক্ষার্থীরা ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দের সনদ আইন এবং ভারতীয় শিক্ষায় এর প্রভাব সম্পর্কে জানতে পারবে।
- শিক্ষার্থীরা ১৯৮৪ খ্রীস্টাব্দের উডের শিক্ষার দলিলের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে জানতে পারবে।
- শিক্ষার্থীরা প্রথম ভারতীয় শিক্ষা কমিশন সম্পর্কে অবগত হতে পারবে।
- শিক্ষার্থীরা স্যাডলার কমিশনের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে বিস্তৃত ধারণা লাভ করবে।
- শিক্ষার্থীরা ওয়ার্ধা পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে পারবে।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস

প্রাক্ কথন :

একটি সমাজের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার কেবলমাত্র তাৎক্ষনিক ঘটমান তথ্যের ভিত্তিতে আলোচনা করলে বিবর্তন ও অগ্রগতির ধারা বিশ্লেষনের প্রশ্নে অনেক কিছু অমীমাংসিত থেকে যায়। তাই একটি বহমান সমাজের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার নিজস্বতা ও ঐতিহ্যময়তার প্রতিষ্ঠা ঘটে তার ঐতিহাসিক পটভূমির ভিত্তিতে। তা না হলে বর্তমান অস্তিত্ব ও অনাগত ভবিষ্যতে এমন কিছু মৌলিক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় যা তার ভিত্তিকে দুর্বল করে দেয়। আমাদের বর্তমান শিক্ষার রূপ ও সমস্যাকে বুঝবার জন্য এবং তার ভবিষ্যতকে গড়বার রূপ ও সমস্যাকে বুঝবার জন্য এবং তার ভবিষ্যতকে গড়বার জন্য তাই অতীতের বিশ্লেষণ প্রয়োজন। ভারতের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় একদিকে একটি স্বাধীন উন্নতিকামী জাতির ভাব মানস প্রতিফলিত। তেমনি অন্যদিকে সুদীর্ঘ ইংজে শাসন ও ঔপনিবেশিক জীবনের রাশিকৃত বিজাতীয় প্রভাব আজও আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্তি হয়ে আছে। বর্তমান ভুবনায়নের ফলে যে শিক্ষা সংস্কৃতির দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে সেখানে আমাদের সুপ্রাচীন ও সুমহান সভ্যতার ঐতিহ্যকে তুলে ধরতে হবে। বর্তমানে যথার্থভাবে জানতে গেলে প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার কথা আমাদের জানতেই হবে। তাই ভারতের শিক্ষার ইতিহাস আলোচনাকে শুরু করতে হবে প্রাচীন ভারতের শিক্ষার সূচনাকাল থেকে।

ভারতীয় শিক্ষার সূচনা কাল :

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা বলতে বোঝায় আর্যরা যে সভ্যতাকে এদেশে বহন করে এনেছিলেন। সেই সভ্যতা নানা ভাবে পুষ্ট হয়ে নানা ধারায় প্রবাহিত হয়ে ভারতের জনজীবন ও সমাজকে গঠন ও নিয়ন্ত্রণ করেছে। ভারতীয় আর্য সভ্যতা আনুমানিক খ্রি. পূ. দু'হাজার বছরের পুরোনো। কিন্তু হরপ্পা মহেঞ্জোদারো

সভ্যতা আবিষ্কারের ফলে এটা প্রমাণিত হল আর্য সভ্যতাই ভারতীয় সভ্যতার একমাত্র উৎস নয়। সিন্ধু সভ্যতার এই নির্দশনকে বলা হয় ভারতীয় সভ্যতা খ্রি. পূ. তিন হাজার বছরের চেয়েও প্রাচীন। ভারতীয় সভ্যতা মিশর, ব্যাবিলন ও আসিরীয় সভ্যতার সমকালীন সভ্যতা। আর্যরা ভারতবর্ষে এসে প্রথমে সপ্তসিন্ধু অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। সপ্তসিন্ধু বলতে ইরান, আফগানিস্তানের কিছু অংশ, ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রবেশ ও পাঞ্জাব অঞ্চলকে বোঝায়। আর্যরা ছিল যাযাবর। এর পর ধীরে ধীরে গঙ্গা, যমুনা, সরযু নদীর বিধৌত অববাহিকা অঞ্চলে তাদের বসতি স্থাপন করে। তাদের আগমনের পথও সুগম ছিল না, ভারতে অনার্যদের সঙ্গে তাদের প্রতিনিয়ত সংঘর্ষ হয়েছে। অবশেষে আর্যরা অনার্যদের জয় করলে ও অনার্যদের সংস্কৃতিকে নিশ্চিহ্ন করা যায়নি। আর্যরা প্রচলিত একটি ভারতীয় সংস্কৃতিতে অবগাহন করেছে এবং তৎকালীন ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে যুক্ত হয়ে এক নতুন ধারার জন্ম দিয়েছিল। প্রাচীন ভারতের জাতীয় চরিত্র আর্য ও অনার্য উভয়েরই জাতীয় বৈশিষ্ট্য দিয়ে তৈরি হয়েছিল। আর্যরা ছিল প্রকৃতির উপাসক। প্রাকৃতিক শক্তিকে দেবদেবী রূপে কল্পনা করে যে পূজাপাঠ শুরু করেছিলেন তাই পরবর্তী সময়ে পুরোহিত শ্রেণির উদ্ভব হয়েছিল। পূজা পরিচালনা, মন্ত্রাদি রচনা বৈদিক নিয়মরীতির বিকাশ, বৈদিক সাহিত্যের বৈচিত্র্যময় নানা দিগন্ত উন্মোচন ইত্যাদি সকল কাজের জন্য পুরোহিতদের ভূমিকা হয়ে উঠল অত্যাবশ্যকীয়। এদের মধ্যে যারা বেদ মন্ত্রের স্রষ্টা, তারা ঋষি বলে পরিচিত হলেন। ঋষিরা ধ্যান মগ্ন হয়ে যে সত্য দৃষ্টা হয়েছেন, সেই অনন্তের বার্তা সকল বিশ্ববাসীকে ডাক দিয়ে অমৃতের জ্ঞানকে বিতরণ করতে চাইলেন। এই আর্য ঋষি পরিবার থেকেই প্রাচীন ভারতের শিক্ষার সূত্রপাত হয়।

শিক্ষা বিকাশের ধারা ও স্তর বিন্যাস :

ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের সাথে সংগতি রেখেই আমরা ভারতের শিক্ষার ইতিহাসকে মূল তিনটি ভাগে বা স্তরে বিন্যস্ত করব। প্রাচীন যুগ, মধ্য যুগ ও আধুনিক যুগ। আমরা আমাদের বর্তমান আলোচনাকে বিস্তারিত করব প্রাচীন ও মধ্যযুগ পর্যন্ত। ইউরোপীয় ঔপনেবেশিকদের আগমন কালের পূর্ব পর্যন্ত ভারতবর্ষে ইসলামিক শাসন ও শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত ছিল। আর্যদের আগমন কাল থেকে অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিক পর্যন্ত ভারতবর্ষের শিক্ষাধারাকে আবার এভাবে বিন্যাস করা যায়—বৈদিক ব্রাহ্মন্য শিক্ষা, বৌদ্ধ শিক্ষা ও ইসলামিক শিক্ষা। আমাদের আলোচনকে এইরূপ স্তর বিন্যাসের ভিত্তিতেই প্রসারিত করব।

প্রথম একক প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণ্যশিক্ষা, বৌদ্ধশিক্ষা

সূচনা : আদি বৈদিক ও পরবর্তী বৈদিক যুগে ও প্রাচীন ঋষিদের মূল কথা ছিল— 'সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে'— বিদ্যা মানুষকে মুক্তির সন্ধান দেয়। জীবনের লক্ষ্য সাধনে অগ্রসর হতে প্রেরণা দেয়। 'নাস্তি বিদ্যাসমং চক্ষুঃ নাস্তি সত্যসমং তপঃ।' অর্থাৎ জ্ঞানমূলক তৃতীয় নেত্রদান করে তাই সত্য অনুশীলনই হবে জীবনের পরম তপস্যা। এই শ্লোকগুলোর মমার্থ থেকে বোঝা যায় যে তৎকালীন ঋষিগণ সমাজের কোন মানুষকে জন্মগত নয়, শিক্ষার পথেই শ্রেষ্ঠ আসনের অধিকারি বলে স্বীকার করেছেন। শিক্ষার প্রয়োজন সম্পর্কে এই সচেতনতাই প্রাচীন ভারতে এক সুসংবন্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল।

শিক্ষার লক্ষ্য : প্রাচীন ভারতের বৈদিক বা ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার লক্ষ্য ছিল 'আত্মজ্ঞান ও আত্মোপলব্ধি'। আমাদের চিরন্তন সত্যকে জানতে হবে, সত্য হল পরম ব্রহ্ম। জীবাত্ম এই পরমসত্ত্বারই অংশ। আত্মজ্ঞান ও আত্মোপলদ্ধির মধ্য দিয়েই সেই পরমসত্ত্বাকে জানা যায়। তাই নিজেকে জানা ভীষনভাবে প্রয়োজন। তাই বলা হয়েছে, 'আত্মানং বিদ্ধ' (নিজেকে জানা)। এই নিজেকে জানার মাধ্যমে জড় জগতের সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্তি লাভই শিক্ষার চরম লক্ষ্য। এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করাকে বলা হয়েছে 'পরাবিদ্যা' আর ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ করাকে বলা হয়েছে 'অপরাবিদ্যা'। এই দুটোকে পরিপূরক হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ শিক্ষার্থীর চরম আত্মবিকাশ ঘটিয়ে ব্যবহারিক জীবন যাপনের উপযোগী করে গড়ে তোলাই প্রাচীন বৈদিক ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার জন্য।

পাঠক্রম : বৈদিক যুগে পাঠক্রম ছিল মূলত বেদ অধ্যয়ন। বেদের অপর নাম শ্রুতি। বেদ চার প্রকার — ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ববেদ। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য যুগে এসে শিক্ষার পাঠক্রম হল বহুমুখী। ব্রাহ্মণ্য সমাজে বর্ণভেদ প্রথা চালু হওয়ায় গুন ও কর্ম অনুসারে পাঠক্রমও আলাদা ছিল। আদি বৈদিক যুগে এই বর্ণভেদ ছিল না। সমাজে চার বর্ণ হল-ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র। চতুর্বর্ণে বিভক্ত সমাজে যাগ যজ্ঞ, অধ্যয়ন, অধ্যাপনার অধিকার ছিল ব্রাহ্মণদের, রাষ্ট্রনীতি ও যুদ্ধ বিদ্যা তথা দেশ শাসনের অধিকারী হলে ক্ষত্রিয়রা, কৃষিকাজ, পশুপালন ও ব্যবসা বাণিজ্য করার অধিকার ছিল বৈশ্যদের আর শুদ্রদের শিক্ষার অধিকার ছিল না। তিন বর্ণের সেবা করাই ছিল শূদ্রের কাজ অর্থাৎ শূদ্রের ছিল কায়িক শ্রম দান করা।

বর্ণভিত্তিক এই পাঠক্রমের তালিকায় ব্রাহ্মণ সন্তানদের জন্য ছিল— বেদ, বেদাঙ্গ, ভূতবিদ্যা, তর্কশাস্ত্র, ইতিহাস, পুরান, সর্ববিদ্যা, ক্ষত্রবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, দেবজ্ঞান ইত্যাদি।

ক্ষত্রিয়দের এক সময়ে বেদ পাঠের অধিকার ছিল। কিন্তু খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকে বেদ বিদ্যা পরিহার করা হয়। তারা মূলত অপরাবিদ্যা, যুদ্ধ পরিচালনার কৌশল, শাসন পরিচালনার জন্য রাজনীতি ও ধর্মনীতি, শব্দ বিদ্যা, আয়ুর্বেদ, যুক্তি, পুরান, ইতিহাস, নাটক কাব্য কলা প্রভৃতি বহু বিষয় জানতে হত।

বৈশ্যদের কৌলিক বৃত্তি ছিল মুলত কৃষি ও বাণিজ্য। এছাড়া গো-পালন, কৃষি, শস্য বপন, জমির গুণাগুন নির্ণয়, পরিমাণ ব্যবস্থা, ক্রয়বিক্রয়ের নিয়ম, দ্রব্য সংরক্ষণের নিয়ম, বিভিন্ন প্রকার ঋতু ও রত্নের মূল্য নিরূপন পদ্ধতি, ব্যবসায়িক প্রয়োজনে ভিন্ন দেশের ভাষা, মুদ্রামূল্য ও ভৌগোলিক অবস্থান প্রভৃতি বিষয়ে

তাদের জানতে হত। পরিবার পরিবেশে তাদের শিক্ষা শুরু হলেও এই বিষয় সংক্রান্ত উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। প্রাচীন তক্ষশীলায় চিকিৎসা বিদ্যা, শল্য বিদ্যা, কৃষি, বাণিজ্য, হিসাব সংরক্ষণ প্রভৃতি বৈশ্যদের পড়ানোর ব্যবস্থা ছিল।

ব্রাহ্মণ্য সমাজে শূদ্রত্ব নির্ধারিত হত বংশ ও গাত্র বর্ণের নিরিখে। কৃষিকাজ এবং তিনটি বর্ণের সেবাই ছিল শূদ্রের বৃত্তি। তাই তাদের জন্য কোনো সুগঠিত এবং সমাজস্বীকৃত শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু বর্ণ এবং বৃত্তি সমার্থক হওয়ায় বংশগত পারিবারিক বৃত্তিতে হাতে কলমে ব্যবহারিক শিক্ষার ব্যবস্থা এদেরও ছিল। কুম্ভকার, ক্ষৌরকার, রজক, চর্মকার প্রভৃতি বংশগত বৃত্তির শিক্ষা পিতার কাছে পরিবারেই হত।

বিদ্যারম্ভ বা উপনয়ন : প্রাচীনকালে প্রাথমিক শিক্ষা বাড়িতে পাঁচ বছর বসয়ে দেব দেবী এবং ঋষিদের উদ্দেশ্যে পুজো দিয়ে হত বিদ্যারম্ভ। বর্ণপরিচয়ের এই সূচনা সকল বর্ণের শিশুর কাছেই খোলা ছিল। এই বিদ্যারম্ভের পরে হত মস্তক মুন্ডল ও চূড়াকর্ম।

পরবর্তী পর্যায়ে উপনয়ন দিয়ে শুরু হত আনুষ্ঠানিক ও নিয়মিত পড়াশুনা। অপরাধী এবং শূদ্র ছাড়া সকল বর্ণের কাছে এই অনুষ্ঠান উন্মুক্ত ছিল। বর্নভেদে উপনয়নের বয়স, সময় নির্দন্ট এবং বিধি ছিল পৃথক। ব্রাহ্মণ শিশুরা আট বছরে, ক্ষত্রিয়ের এগার এবং বৈশ্যের বারো বছর বয়সে সাধারণ উপনয়ন হত। ব্রাহ্মণের জন্য বসন্তকাল, ক্ষত্রিয়ের জন্য গ্রীস্মকাল আর বৈশ্যের জন্য শরৎকালে অনুষ্ঠান হওয়ার বিধি ছিল। এই তিন উচ্চবর্ণের জন্য উপনয়ন হচ্ছে সর্বজনীন এবং আবশ্যিক শিক্ষা। এই উপনয়ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিশু বিদ্যালাভের জন্য গুরুর কাছে প্রার্থনা করত, গুরু নানা রকম তথ্য সংগ্রহ করে যোগ্যতা নিরূপনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরূপে গ্রহণ করতেন। উপনয়নের পরেই শুরু হত ব্রাহ্মচর্য। প্রাচীনকালে ব্যক্তির জীবনকে চারটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়। যথা — ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। ব্রহ্মচর্যশ্রমই ছিল প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকাল। তবে এক সময় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যরা তাদের বৃত্তির সাথে সম্পর্ক না থাকায় বেদ পাঠের বদলে অন্যান্য বৃত্তি সম্বন্ধীয় শিক্ষায় আগ্রহী হয় এবং তাদের মধ্য থেকে উপনয়ন উঠে যায়। নারীদের ও উপনয়ন ছিল, কুমারী শিষ্যা ও ব্রহ্মচর্য পালন করত।

শিক্ষালয় বা গুরুকুল : প্রাচীন ভারতে আদি গুরু ছিলেন ঋষিগণ, তাই তারাই ছিলেন শিক্ষক এবং শিক্ষালয় বলতে বোঝাতো তাদের তপোবনস্থিত কুটির গুলোকে। জ্ঞানের স্রষ্টা বৈদিক ঋষিগণ তাদের কাছে যে অনন্তের বার্তা এসে পৌঁছেছিল, সেই জ্ঞানকে ঋষিরা বিতরণ করতে চাইতেন। বৈদিক ঋষিদের আহ্বানে দলে দলে ছাত্ররা সমবেত হতেন গুরুর কাছে। এইভাবে একজন গুরুকে কেন্দ্র করে এক একটি আবাসিক গৃহ বিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল। এই গুলিই প্রাচীন ভারতের গুরুকুল। এই গুরুকুলই ছিল বৈদিক ভারতের মৌলিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। উপনয়নের পর শিক্ষার্থী গুরুগৃহে গমন করত। এখানে কঠোর সংযম, ত্যাগ ও নিয়মপালনের মধ্য দিয়ে জীবন ধারণ করতে হত। গো-ধন রক্ষণাবেক্ষন, সমিধ আহরণ, ভিক্ষা সংগ্রহ, চলাচলের প্রতিটি পদক্ষেপে গুরুর প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন ছিল শিক্ষার্থী বা শিষ্যগণের একান্ত পালনীয় কর্তব্য। গুরুকুলের শিক্ষা ছিল অবৈতনিক। গুরু সেবাই ছিল শিষ্যের প্রতিদান। গুরুগৃহে শিষ্য পরিবারের সদস্য হিসাবে পারিবারিক জীবনের স্নেহ মাধুর্য থেকে বঞ্চিত হত না।

শিক্ষাকাল : প্রাচীন বৈদিক ব্রাহ্মণ্য যুগে বেদের জ্ঞান লাভ করার জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হত। এমনকি আমৃত্যু ও বেদ অধ্যায়নের জন্য গুরুগৃহে থাকতে হত। কিন্তু তা সমাজের পক্ষে কল্যানকর ছিল না। সামাজিক প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে শিক্ষান্তে গৃহাশ্রমে ফিরে আসাটা উচিত বলে বেদ পাঠের সময়কালকে বারো বছর বা ষোল বছর নির্ধারণ করা হয়। তাই আদি বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাকালে আট বছর বয়সে শিক্ষা শুরু করে চব্বিশ বছর বয়সে বেশির ভাগ শিক্ষার্থীই গৃহে ফিরে যেত।

বাৎসরিক অবকাশ : বৈদিক ব্রাহ্মণ্য যুগে শিক্ষালয়ের অভ্যন্তরীণ জীবন সারা বৎসরের জন্য নিখুঁতভাবে সংগঠিত ছিল। তবে বছরের সবসময় পঠন পাঠন চলত না। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার সময়কাল মূলত প্রতিবছর শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষ বা পূর্ণিমার দিন থেকে মাঘের শুক্ল পক্ষের প্রথম দিন পযন্ত। শ্রাবণ পূর্ণিমাতে ‘উপকর্ম’ ছিল বর্ষ সূচনার অনুষ্ঠান দিয়ে শুরু হত আর পৌষ-পূর্ণিমাতে ‘উৎসর্জন’ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাৎসরিক শিক্ষা লাভ সমাপ্ত হত। তবে পাঠাভ্যাসকালে কোনো কোনো দিন ছুটি থাকত। ‘নিত্য’ ও ‘নৈমিত্তিক’ অনধ্যায় নামে দু’ধরণের ছুটি থাকত। এই ছুটি গুলোকে ‘অনধ্যায়’ বলে অভিহিত করা হত। কতগুলো তিথিতে নিয়মিত পাঠ থাকত তাকে বলা হয় ‘নিত্য অনধ্যায়’ দিবস যেমন— চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণ, কোন কোন আমাবস্যা, পূর্ণিমা ও অষ্টমী তিথি। কিন্তু রাজ পরিবারের জন্ম-মৃত্যু, যুদ্ধে পরাজয়, অশৌচ, শিষ্যের মৃত্যু, প্রাকৃতিক কতগুলো নির্দিষ্ট বিপর্যয়ের দিন, বাদ্যযন্ত্রের শব্দ, কুকুর, শেয়াল ও বানরের ডাক ইত্যাদি নানা সংস্কারের ভিত্তিতে ‘নৈমিত্তিক অনধ্যায়’ দিবস নির্ধারিত হত। তবে নৈমিত্তিক অনধ্যায় দিবসে বেদ ছাড়া অন্যান্য পাঠ চলত। পরে অবশ্য নৈমিত্তিক অনধ্যায় দিবস কমিয়ে দেওয়া হয়।

শিক্ষন পদ্ধতি : শিক্ষাদান পদ্ধতির মধ্যে ব্যক্তিগত ও সমষ্ঠিগত উভয় পদ্ধতিই ছিল। ছাত্র সংখ্যা সাধারণত পাঁচ জন থাকত প্রতি গুরু, তবে এর বেশিও থাকত অনেক সময়। গুরু ব্যক্তি শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশে গুরুত্ব দিতেন তাই সমষ্ঠিগত হয়েও পরে তা ব্যক্তিগত রূপ নিত। শিক্ষাদান পদ্ধতি ছিল মূলত আবৃত্তি বা মৌখিক পদ্ধতি। দিনের শুরু ‘উপক্রম’ বা ‘প্রস্তুতি’ অর্থাৎ গুরু বন্দনা দিয়ে অধ্যয়ন কর্ম শুরু হত। গুরুর মুখে শুনে শিক্ষার্থীরা তা আবৃত্তি করত (শ্রবন)। আবৃত্তির পর শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তুটি নিয়ে আলোচনা করত এবং এর অর্থ উপলব্ধি (মনন) করত। এরপর তারা একাগ্র চিত্তে ধ্যান করে বিষয় বস্তুটির স্বরূপ উপলব্ধি (নিদিধ্যাসন) করত। এছাড়া শিক্ষার্থীদের প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হত। গুরুছাড়া গুরুপত্র ও অপেক্ষাকৃত অগ্রবর্তী ও কৃতি শিক্ষার্থীরা পাঠদান কজে গুরুকে সাহায্য করত, ‘সমাদিষ্ট’ নামে এই সব শিক্ষার্থী শিক্ষকরাও সম্মান লাভ করত।

গুরু শিষ্যের সম্পর্ক : প্রাচীন বৈদিক ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থায় গুরুর স্থান ছিল সবার উপরে। গভীরজ্ঞান, উন্নত চরিত্র, ব্যক্তিত্ব জীবনাদর্শ, ত্যাগ কর্মে, ধর্মে ঐকান্তিক অনুরাগ, কর্মে নিষ্ঠা প্রভৃতির জন্য গুরু ছিলেন সকলের পূজ্য বা শ্রদ্ধার পাত্র। মাতা-পিতা সন্তানের জন্ম দিতেন কিন্তু শিক্ষার দ্বারা পরমজ্ঞান অর্জন, শিক্ষার্থীর জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করতেন গুরু। গুরু শিক্ষার্থীর দ্বিতীয় জন্মদান করতেন। তাই শিশুর প্রথম গুরু মা, দ্বিতীয় জন্ম দান করতেন। তাই শিশুর প্রথম গুরু মা, দ্বিতীয় গুরু তার পিতা আর তৃতীয় গুরু হচ্ছেন শিক্ষক বা আচার্য যিনি শিশুকে জ্ঞানের কাজল পড়িয়ে দিয়ে অন্ধকার থেকে আলোর পথ দেখাতেন। তাই বলা হত—

মাতৃদেব ভব।
পিতৃদেব ভব।
আচার্যদেব ভব

গুরু ও শিষ্যের মধ্যে পিতাপুত্রের আত্মিক প্রাণময় মধুর সম্পর্ক ছিল। নিঃস্বার্থভাবে গুরু শিষ্যের জীবনের দায়ভার গ্রহণ করতেন। রোগে শোকে ঋষিমাতা মাতৃস্নেহে শিষ্যকে সযত্নে লালন পালন করতেন। বিনা পারিশ্রমিকে ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও নির্লোভের প্রতীক এইসব ঋষিগণ পক্ষপাত শূণ্যভাবে বিদ্যার্থীকে সার্বিক বিকাশের পথে নিয়ে যেতেন। গুরু নিজের সকল জ্ঞান উজার করে দিয়ে প্রয়োজনে শিষ্যের নিকট পরাজয়ে অকুণ্ঠ চিত্ত থাকতেন। রাজসম্মান, অর্থ, যশ কোনো কিছুই গুরু স্পর্শ করত না। বেতন ভোগ শিক্ষক 'বৃত্তিক' বলে নিন্দিত হতেন। সমগ্র শিক্ষাজীবনে শিষ্য গুরুর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করত। শিষ্যকে ব্রহ্মচর্য পালনের মাধ্যমে শিষ্যের কামনা, ক্রোধ, লোভ, হিংসা থেকে মুক্ত হয়ে বিনয়ী ও আত্মসংযমী হতে হত। তবে গুরুর অধর্ম আচরণ এবং শিষ্যকে অন্যায় কাজে লাগানোর চেস্টা হলে গুরু শিষ্যের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করাও ছিল বিধিসম্মত। তাই বলা যায় প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষায় ছিল দুটি আত্মার ব্যক্তিগত ও জীবন্ত মিলনের সম্পর্ক। জ্ঞানের ধারক ও প্রসারক হিসাবে গুরু ছিলেন সামাজিক সম্মানের শীর্ষে।

শিক্ষার ব্যয়ভার : প্রাচীন ভারতে শিক্ষা ছিল অবৈতনিক। অর্থের বিনিময়ে বিদ্যাদানকারী শিক্ষক তথা গুরু কোনো রূপ ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনে অযোগ্য বলে বিবেচিত হতেন। শিক্ষার্থী ভিক্ষাবৃত্তির মাধ্যমে গুরুর দান বা ব্যয় নির্বাহ করত। একমাত্র শিক্ষান্তে শিক্ষার্থী গুরুদক্ষিণা দিত। সমাবর্তনের আগে কোনো রূপ দান গ্রহণের রীতি ছিল না। প্রথমদিকে শিক্ষকদের শ্রম বিভাগ ছিল না। কিন্তু পাঠ্য বিষয়ের জটিলতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকের শ্রেণি বিভাগ হল। দ্বিজত্ব দান করে যাঁরা বেদ, কল্প ও রহস্য শিক্ষা দিতেন তাকে বলা হত অতি গুরু বা আচার্য্য। আর যাঁরা বেদের অংশ বিশেষ কিংবা বেদান্ত শিক্ষাদান করতেন, তাকে বলা হত উপাধ্যায়। উপাধ্যায়গণ পারিশ্রমিক নিতেন।

পরীক্ষা ব্যবস্থা : প্রাচীন বৈদিক ব্রাহ্মন্য শিক্ষা ব্যবস্থায় পরীক্ষা ব্যবস্থা ছিল না। তপোবন, রাজসভা বা যজ্ঞস্থলে বিতর্কসভা, বিদ্বান সম্মেলন ইত্যাদির আয়োজন করা হত। যেখানে বিদগ্ধ বিচারকগণ বিদ্যার্থীদের যোগ্যতা নির্ণয় করতেন। সর্বোপরি থাকত তাদের গুরু। এই মাপকাঠিতেই তাদের যোগ্যতা নির্ণয় করে উপাধি দানের ঘোষণা করা হত।

সমাবর্তন : সমাবর্তন হল একটি জাঁকজমক পূর্ণ শিক্ষা সমাপ্তির অনুষ্ঠান। যে শিক্ষা একদিন উপনয়নের মাধ্যমে শুরু হত, সমাবর্তনের মাধ্যমে শেষ হত দীর্ঘকাল ও গুরুগৃহ বাস। স্নান করে, নতুন কাপড় পরে, গলায় মালা দুলিয়ে রথে কিংবা হাতিতে চেপে বিদ্যার্থীগণ উপস্থিত হত পন্ডিত মন্ডলীর সামনে। সবার সামনে গুরু শিষ্যের নানা রকম জ্ঞান ও কর্মঅভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিদ্যাস্নাতক, ব্রতস্নাতক ও বিদ্যাব্রত স্নাতক এই তিন শ্রেণির স্নাতক হিসাবে ঘোষণা দিতেন। বিদ্যাস্নাতক হচ্ছে- যে বেদ অধ্যয়ন করেছে, কিন্তু সমস্ত ব্রত পালন করেনি। ব্রতস্নাতক হচ্ছে- যে সমস্ত ব্রত পালন করেছে কিন্তু সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করেনি। বিদ্যাব্রত স্নাতক হচ্ছে- যে সমস্ত বেদ অধ্যয়ন ও সমস্ত ব্রতপালন করেছে। শিক্ষার্থী গৃহে ফিরে যাবার কালে সামান্য গুরু দক্ষিণা দান করে গৃহে ফেরার অনুমতি প্রার্থনা করতেন। গুরু তখন আশীর্বাদ করতেন এই বলে- "সত্য

কথা বলবে, ন্যায় আচরণ করবে। বিদ্যাচর্চার পথ ত্যাগ করবে না। সত্য থেকে বিচ্যুতি হয়ো না। সৎ ভিন্ন অন্য পথে যেও না। পিতা, মাতা ও গুরুকে দেবজ্ঞান করবে। পর্বতের মতো স্থির হও। কুঠারের মতো তীক্ষ্ণ ধার হও। স্বর্ণের মতো মূল্যবান হও। হে সৌম্য তুমি শতজীবী হও।” এই বাণী ভারতীয় শিক্ষার চরম উদ্দেশ্যের গভীরতাকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে আবার মানুষের গার্হস্থ্য জীবন যে কী মহান আদর্শকে সামনে রেখে শুরু হয় তার পথ দেখায়।

নারী শিক্ষা : বৈদিক ব্রাহ্মণ্য যুগে মেয়েদের শিক্ষার অধিকার ছিল। মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া ছিল বাবা মায়ের কর্তব্য। যজ্ঞে আহুতি দানের অধিকার ছিল বলে সমাজে মেয়েদের স্থান ছিল উঁচুতে। নারীদের বেদ পাঠের অধিকার ছিল। মেয়েরা শুধু বেদ পাঠ করতেন না বেদ অধ্যাপনাও করতেন। মেয়ের ব্রহ্ম সম্পর্কীয় বিতর্ক অনুষ্ঠানেও যোগদান করতেন। প্রাচীন বৈদিক যুগে মেয়েদের উপনয়ন ও বাধ্যতামূলক ছিল। মেয়েদের সামাজিক ও ধর্মীয় অধিকারের সঙ্গো শিক্ষার অধিকারও ছিল। প্রাচীন ভারতে বহু বিদুষী মহিলারা ছিলেন যেমন— গার্গী, মৈত্রেয়ী, আত্রেয়ী, লোপামুদ্রা, সুলভা, ঘোষা, বিশ্ববারা, দেবযানী, সাবিত্রী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। তবে পরবর্তী সময়ে মেয়েদের শিক্ষা সংকুচিত হয়ে যায় মনুর যুগে।

পরিশেষে বলা যায় যে, আধুনিক ভারতীয় শিক্ষার রূপরেখা পাশ্চাত্য শিক্ষাধারায় পুস্ট হয়েও তারা পূর্ব স্রোতেই এসে মিশেছে। তাই বলা হয় প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থার উপাদানগুলি একটা বৃত্তীয় চক্র সম্পূর্ণ করে একাত্মতা ভারতীয়ত্ব লাভ করেছে এবং বর্তমানের ধারাও তারই ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে। যদিও এই শিক্ষা সর্বজনীনতার প্রশ্নে সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। শৃঙ্খলার প্রশ্নে পীড়নের দায় দিতে হয়, তবুও গুরু শিষ্য পরম্পরা এ এক কল্যাণকামী সমাজ মনকেই তুলে ধরে। যুগ পরম্পরা এবং বিবর্তনের ধারায় আজও এই শিক্ষা আমাদের কাছে হয়তো অর্থহীন মনে হবে। আসলে আধুনিকতার বিচারে এই তাৎপর্যহীনতা প্রাচীন ব্যবস্থার সৃষ্টি নয়, এটাই স্বাভাবিক পরিনতি।

প্রাচীন বৈদিক ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার বৈশিষ্ট্য :

১। বর্তমান যুগের মতো প্রশাসনিক বন্ধনে প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত না হলেও প্রাচীন হিন্দু জীবন প্রবাহ এক সুসমন্বিত সামাজিক পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে নিয়ন্ত্রিক হত।

২। ভারতের প্রাচীনতম শিক্ষা ব্যবস্থা আর্য ও অনার্যদের পারস্পরিক প্রভাবে গড়ে উঠেছিল। বহি:ভারত থেকে আগত আর্যদের এই বর্হিভারতীয় প্রভাব থাকলেও ভারতের মৃত্তিকাস্পর্শে নতুন শিক্ষা ব্যবস্থায় ভারতীয় স্বকীয়তা অক্ষুন্ন ছিল। প্রাচীণ ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থা ছিল সুসংগঠিত ও একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য পথে।

৩। যে কোনো সময়ে যে কোনো দেশের শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারিত হয় সমাজ ও জাতীয় জীবনের প্রয়োজন অনুসারে তাই প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার লক্ষ্যের বৈশিষ্ট্য ছিল তৎকালীন জীবনাদর্শ ও সমাজজীবনের প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা। ভারতের ঐতিহ্যময় শ্যামল তপোবনচ্ছায়ায় ধ্যানমগ্ন হয়ে ঋষিরাই শুনেছিলেন অন্তরের বানী অসীমের বার্তা। সেই পরমজ্ঞান লাভ করাই ছিল শিক্ষার লক্ষ্য। এই পরমজ্ঞানই মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে যাবে এতে ব্যক্তি জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করবে। তাই প্রাচীন বৈদিক ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার লক্ষ্য ছিল মুক্তি বা মোক্ষ লাভ করা।

৪। শিক্ষার উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য পাঠক্রমে পরাবিদ্যা ও অপরা বিদ্যার সমন্বয় সাধিত হয়েছিল।

কারণ ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা মূলতঃ ধর্ম ভিত্তিক হলেও ব্যবহারিক শিক্ষাকে অস্বীকার করেনি। ব্যবহারিক শিক্ষা ও ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থায় গুরুত্ব লাভ করেছিল।

৫। শিক্ষন পদ্ধতি ছিল মৌখিক। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন এই তিনটি উপায়ই ছিল শ্রেষ্ঠ জ্ঞান লাভের ক্রমিক ধাপ। প্রথমত গুরু বাক্য মনোযোগ সহকারে শ্রবন করা, দ্বিতীয়ত যুক্তি সহকারে সেগুলি সম্পর্কে গভীর চিন্তা করা ও তৃতীয়ত একাগ্রচিত্তে ধ্যানের মাধ্যমে সত্য উপলব্ধি করা।

৬। প্রাচীন বৈদিক ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল। আধুনিক যুগের ন্যায় গল্প ও আলোচনা পদ্ধতি। 'সংবাদাভিজয়' অনুষ্ঠান এরূপ বিতর্ক সভার বিশেষ দৃষ্টান্ত। বিতর্ক হত প্রতিযোগিতা মূলক। জয় পরাজয়ের প্রশ্নও জড়িতে ছিল। এক অর্থে সংবাদাভিজয়' অনুষ্ঠান প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থার পরীক্ষা পদ্ধতির নামান্তর। যদিও প্রাচীন বৈদিক ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল না।

৭। প্রাচীন বৈদিক ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থায় ঋষিরাই হলেন আদিগুরু বা আচার্য। গুরুগৃহেই শিক্ষাকার্য সংগঠিত হত তাই গুরুকুল ছিল প্রাচীন ভারতের মৌলিক শিক্ষাকেন্দ্র। শিষ্যকে জ্ঞানরাজ্যের সর্বস্ব দান করাই ছিল গুরু মানসিক উদারতা। অর্থ ও সম্মানের আশা ত্যাগ করে নিষ্ঠার সঙ্গে আত্মোৎসর্গী প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে শিক্ষাদানের জন্য গুরু ছিলেন সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বশ্রেষ্ঠ পূজনীয় ব্যক্তি। গুরুর প্রধান কর্তব্য ছিল তাঁর গৃহে শিষ্যকে পুত্রবৎ স্নেহে প্রতিপালন করা। গুরু শিষ্যের সম্পর্ক ছিল পিতাপুত্রের ন্যায় মধুরতম সম্পর্ক। গুরু শিষ্যের ভরনপোষন এবং অসুস্থ শিষ্যের পরিচর্চা করতেন। বেতন ভুক্ত গুরু সমাজে নিন্দিত হতেন।

৮। শিক্ষক শিক্ষার্থীর সম্পর্ক ছিল আদর্শ স্থানীয়। শিক্ষার্থীকে ও নানাবিধ নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চলতে হত। এখানে শিক্ষার্থীর মস্তিস্ক, হৃদয়, দৈহিক অঙ্গ সঞ্চালনে নিজেকে নিয়োগ করত। গুরুগৃহে জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ, গো-পালন ভিক্ষা সংগ্রহ করা, গুরু সেবা, পঠন-পাঠন ইত্যাদি দায়িত্ব কর্তব্যের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ সাধন করে তাদের নাগরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে উপযোগী করে গড়ে তুলতে সহায়ক ছিল।

৯। প্রাচীন বৈদিক ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থায় 'পড়ুয়া শিক্ষক' এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। গুরুপুত্র শিক্ষকতা কর্মে পিতাকে সাহায্য করত। পরবর্তীকালে গুরুকে অগ্রবর্তী শিষ্য শিক্ষকতা কাজে সাহায্য করত। একেই 'সর্দার পড়ো' প্রথা হিসাবে গন্য করা হয়।

১০। বর্তমানের ন্যায় প্রাচীন বৈদিক ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থায় ছুটির প্রথা ছিল। সাধারণত প্রাকৃতিক দুর্যোগ, চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ, যাগ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের বিশেষ তিথি, বিশেষ জনের মৃত্যুতে পাঠচর্চা বন্ধ থাকত।

১১। উপনয়ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষার শুরু হত আর সমাবর্তন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষার সমাপ্তি ছিল প্রাচীন বৈদিক ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

১২। প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থায় মেয়েদের শিক্ষার অধিকার ছিল। গুরুগৃহে ঋষি কন্যাদের উপনয়নের মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার সমন্বয়ী ও আত্মরক্ষা মূলক ক্ষমতা অনস্বীকার্য। তাই দেখা যায় বৈদেশিক শক্তি, মুসলিম আক্রমণ ভারতীয় এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে পারেনি। বিবর্তনের ঘাত প্রতিঘাতে ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থা আরও বলিষ্ঠ এবং দৃঢ়মূল হয়েছে।

বৌদ্ধ শিক্ষা

খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকে ভারতবর্ষে বৈদিক ধর্মের নানা সংকীর্ণ আচরণের প্রতিবাদে যে সকল ধর্মমতের উদ্ভব হয়েছিল তার মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মমত সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। বৌদ্ধ ধর্মের সৃষ্টি ও প্রসার এক নতুন সমাজদর্শকে তুলে ধরে, ধর্মীয় আচার আচরণ ও রীতি নীতিকে মানুষের কাছে তুলে ধরতেই প্রয়োজন অনুভূত হয় এক নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার। হিন্দু ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ও সমাজব্যবস্থার কঠোর নিয়ম বিধি, বর্ণবৈষম্য, উঁচু ও নীচু ইত্যাদির প্রতিবাদ স্বরূপ এক বৈষম্যহীন সামাজিক চিন্তার পরিায়ক হিসাবে বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব এর উদ্যোক্তা ছিলেন গৌতম বুদ্ধ। তাঁরই নামানুসারে আমরা পাই, বৌদ্ধ ধর্ম ও সমাজাদর্শ। তবে তাঁর চিন্তার গতি প্রকৃতি মূলত উপনিষদের ধারাতেই পরিচালিত হয়। বুদ্ধদেবের জীবনাদর্শই বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করেছিল। বুদ্ধদেব নতুন পুরাতন সত্যের বাণীকে সকলের সামনে তুলে ধরলেন, সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিলেন অমৃতত্বের বার্তা। পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিপূরক রূপে একেই সাথে রয়েছে দুটি শিক্ষাব্যবস্থা। এই সহাবস্থানের ফলে পারস্পারি প্রক্রিয়া হয়েছে বহু। হিন্দু ধর্মের বহুতত্ত্ব বৌদ্ধ ধর্মে স্থান পেয়েছিল। তাই বৌদ্ধ ধর্ম সম্পূর্ণ পথ বিচ্ছেদ নয়, হিন্দু ধর্ম থেকে অদ্ভুত নতুন পথ নির্দেশ মাত্র। ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য ও আচার অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে বুদ্ধদেবই প্রথম বিদ্রোহী বলা হয়।

বৌদ্ধধর্মের মূলনীতি : *জীবনের একটি মূল রহস্যকে নিয়েই তুলে ধরা হয় আর তা হল "জীবন দু:খময়।" এই তাৎপর্য বিশ্লেষনে তিনি চারটি সত্যের কথা উল্লেখ করেছিলেন তা হল—*

১। সংসার দুঃখময়
২। দুঃখের কারণ আছে
৩। দুঃখ নিবারন সম্ভব
৪। দুঃখ নিবারনের পথ আছে

বুদ্ধদেব বলেছেন, মানুষের অজ্ঞানতাই হচ্ছে দুঃখের কারণ। আর এই অজ্ঞানতা দূর হলেই মানুষ নিজের স্বরূপ জানতে পারবে এবং দুঃখ থেকে মুক্তি পাবে। তাই বৌদ্ধ শাস্ত্রে দুঃখ নিবারণের জন্য আটটি পথের নির্দেশ করা হয়েছে। এই আটটি আচরণ বিধি "অষ্টাঙ্গিক মার্গ" নামে পরিচিত। এই অষ্টাঙ্গিক মার্গ গুলো হল— ১। সম্যক দৃষ্টি, ২। সম্যক বাক্য, ৩। সম্যক সংকল্প, ৪। সম্যক কর্ম, ৫। সম্যক জীবিকা, ৬। সম্যক ব্যায়াম, ৭। সম্যক দান, ৮। সম্যক সমাধি বা ধ্যান।

বাহ্মণ্য ধর্ম ও শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিবাদ স্বরূপ বৌদ্ধ ধর্ম জন্ম নিলেও দুই ব্যবস্থার মধ্যে অনেক সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য ছিল। এর কিছু হল নিম্নরূপ —

বৌদ্ধ শিক্ষার লক্ষ্য : বৌদ্ধ ধর্মের মূলকথা হল নির্বান। বৌদ্ধ শিক্ষার পরম উদ্দেশ্য ছিল জাগতিক সকল সন্ধন থেকে চূড়ান্ত মুক্তি বা পরিনির্বান। অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু বন্ধনের হাত থেকে মুক্তি লাভ করা। এই বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে হলে অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করতে হবে। তাই শিক্ষাব্যবস্থা ব্যক্তিকে এই অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলনের মাধ্যমে পরম লক্ষ্য তথা নির্বান লাভের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। এছাড়া পঞ্চশীলনীতি অনুশীলণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে নীতি পরায়ন ও চারিত্রিক দৃঢ়তা সৃষ্টি করাও ছিল শিক্ষার লক্ষ্য। এই পঞ্চশীল হচ্ছে— অসত্য, অন্যায়, অসৎ আচরণ, চৌর্য ও জীব হিংসা পরিত্যাগ করা।

পাঠক্রম : বৌদ্ধ যুগের প্রথম দিকে শিক্ষার পাঠক্রম ছিল ধর্ম-ভিত্তিক। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার জটিল তাত্ত্বিক আলোচনা থেকে অনেক সহজও সরল ছিল বৌদ্ধ শিক্ষার পাঠক্রম। বৌদ্ধ শিক্ষার পাঠ্যসূচিতে ত্রিপিটক, যথা— ১) সূত্র পিটক, ২। বিনয় পিটক এবং ৩। অভিধর্ম পিটক শ্রমন ও ভিক্ষুদের আবশ্যিক পাঠ্য বিষয় ছিল। প্রথম দিকে বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থার লৌকিক শিক্ষার স্থান ছিল না। পরবর্তীকালে বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থায় হিন্দু ও জৈন দর্শন, বেদ, বেদান্ত, ন্যায়, সাংখ্য, ব্যাকরণ, তর্ক বিদ্যা, জোতিষী বিদ্যা। এছাড়া লোকায়ত অনেক বিষয়— ভেষজ, রসায়ন, স্থাপত্য, শিল্প, চিকিৎসাবিদ্যা প্রভৃতি পাঠক্রম অন্তর্ভূক্ত হয়েছিল। চিকিৎসা বিদ্যাক্ষেত্রে তত্ত্ব ও ব্যবহারিক শিক্ষার সমন্বয়ে ৭ বৎসরের পাঠ্যক্রম ছিল। চিকিৎসার বিখ্যাত কেন্দ্র ছিল তক্ষশীলা, রাজগৃহ ও রারানসী। পাঠক্রমে বিভিন্ন বিষয় স্থান পাওয়ার শিক্ষার্থীদের বিষয় নির্বাচনে ও স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়। বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রথম সূচনা ভিক্ষুর শিক্ষা হিসাবে। কিন্তু সেবা ধর্মের আদর্শ থাকায় ক্রমে ক্রমে ব্যবহারিক শিক্ষারও দরকার হল। ধর্ম যখন গণজীবনে প্রবেশ করলো তখন গণ শিক্ষার দরকার হল। সুতরাং বৌদ্ধশিক্ষা ব্যবস্থার ভিক্ষুর শিক্ষা, ও গণশিক্ষা এই তিনটি পর্যায় প্রতিষ্ঠিত হল। বৌদ্ধ শিক্ষা কেবল ভিক্ষুর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। গৃহী শিক্ষার্থীরা ধর্মতত্ত্ব শিক্ষার জন্য নির্ভর করতে মঠের বাইরে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার উপর। বিহার গুলিতে উচ্চ শিক্ষার জন্য দরকার হত উপযুক্ত প্রস্তুতির। সেই জন্য স্তরে স্তরে পাঠ্যক্রম তৈরি হয়েছিল। বস্তুতঃ ধর্ম শিক্ষা ও ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষা, দার্শনিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার সমন্বয়ে বৌদ্ধ শিক্ষার চরম উৎকর্ষ এসেছিল।

শিক্ষারম্ভ : বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষাজীবনে প্রবেশ করতে হত। শিক্ষালাভের জন্য সংঘে প্রবেশের এই অনুষ্ঠানকে বলা হয় 'প্রব্রজ্যা' বা 'পব্বজ্যা'। এই প্রব্রজ্যা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বৌদ্ধ শিক্ষার যাত্রা শুরু হত। আট বছর বয়সে অভিভাবকদের অনুমতি নিয়ে সংঘে প্রবেশ করতে হত। এই সময় তাকে গৃহজীবনের সকল চিহ্ন ত্যাগ করে আসতে হত। শিক্ষার্থীকে মস্তক মুণ্ডন করে, পীতবস্ত্র পরিধান করে, ভিক্ষা পাত্র হাতে নিয়ে ভিক্ষু পরিষদের সামনে গুরু প্রণাম করে ত্রিশরণ মন্ত্র আবৃত্তি করতে হত। ত্রিশরণ মন্ত্রটি হল—

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।
ধর্মং শরণং গচ্ছামি।
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।

এরপর তাকে দশটি অনুজ্ঞা পালনের প্রতিশ্রুতি দিতে হত, তখন তাকে শ্রমণ উপাধি দেওয়া হত এবং শিক্ষা কার্য শুরু হত। ক্রীতদাস, চোর, ডাকাত, বিকলাঙ্গ, রাজকর্মচারী, ঘাতক প্রভৃতি ব্যক্তিরা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে পারত না। এছাড়া সকল বর্ণের মানুষ বৌদ্ধ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারত। প্রব্রজ্যার তাৎপর্য হচ্ছে- ক্ষুদ্র পরিবার জীবন থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে বৃহত্তর মুক্ত জীবনের পথে সম্পূর্ণ সংসার ত্যাগের মন নিয়ে সংঘ জীবনে প্রবেশের জন্য আত্মসমর্পণ।

শ্রমণ : প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর শিক্ষার্থীকে বলা হত 'শ্রবণ'। শ্রমণের শিক্ষাকাল ছিল ১২ বছর অর্থাৎ ২০ বছর বয়সে শ্রমণ হিসাবে শিক্ষা শেষ হত। বিহার জীবনে শ্রমণকে কঠোর অনুশাসন মেনে চলতে হত। মিথ্যা কথা, সুরাপান, দানবহির্ভূত দ্রব্যগ্রহণ, অপবিত্র আচরণ, অসময়ে আহার গ্রহণ, নৃত্যগীতে অংশগ্রহণ,

মালা, পাদুকা, সুগন্ধি ও অলংকার, উচ্চাসনে বসা এবং স্বর্ণ রৌপ্য গ্রহণ এই দশটি কাজ সর্বদা পরিত্যাগ করতে হত।

উপসম্পদা : ১২ বছর সময় কাল পর্যন্ত শ্রমণে আবাসিক শিক্ষা শেষ হবার পর তাদের মধ্যে যারা আরো পাঠলাভে ইচ্ছুক তাদেরকে শ্রমণের যোগ্যতা বিচার করে তবেই তাদের 'উপসম্পদা' দান করা হত। এই উপসম্পদা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত সন্ন্যাসের সূচনা হত। প্রব্রজ্যার সময় উপাধ্যায় আচার্য্যেরই মূখ্য ভূমিকা ছিল। কিন্তু উপসম্পদা অনুষ্ঠান হত সমগ্র সংঘের সামনে। একজন প্রবীণ ভিক্ষু স্নাতককে সভায় উপস্থিত করে উপসম্পদা প্রার্থনা করতেন। তাঁর যোগ্যতা যাচাই করে সভার অভিমত নিয়ে তাঁকে স্নাতক ঘোষণা করা হত। উপসম্পদার সময় থেকেই তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের বয়স হিসাব করা হত। ১০ বছর শিক্ষালাভের পর তারার উপাধ্যায় হওয়ার অধিকার লাভ করতে পারত।

বাৎসরিক শিক্ষার সময় : বিহার জীবনে সকলকেই ভিক্ষা করতে হত। বৌদ্ধ বিহারে সাধারণ কায়িক পরিশ্রমের কাজ শ্রমণরা করত। আর প্রধান উপাধ্যায়রা ধ্যান, অধ্যয়ন, অধ্যাপনার কাজ করতেন। ভিক্ষুরা বছরের বেশিরভাগ সময় ধর্ম প্রচারে বিভিন্ন স্থানে গমন করতেন। কিন্তু বর্ষার সময় সবাই সংঘে এসে মিলিত হতেন এই সময়কে 'বর্ষাবাস' বলা হত এবং শিক্ষার কাজ চলতো। পরবর্তী সময়ে তা বৎসরব্যাপীও চলতে থাকে।

বৌদ্ধ বিহারের জীবনযাত্রা ও শৃঙ্খলা : বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থায় বিহার বা মঠই ছিল শিক্ষালয়। এই বিহারগুলো ছিল আবাসিক শিক্ষাকেন্দ্র। পঞ্চশীল এবং সংঘের অন্যান্য নিয়মকানুন কঠোরভাবে পালনের মাধ্যমে নবীন দীক্ষিতরা সংঘ জীবনে বসবাস করত। বিহারের জীবনযাত্রা ছিল সুনিয়ন্ত্রিত ও সুনির্ধারিত । ভোরবেলা শয্যাত্যাগ করে রাত্রে নিদ্রাযাপনের আগে পর্যন্ত নিয়মবিধি পালন করা ছিল আবশ্যিক। শিক্ষার্থীদের ভিক্ষায় যাওয়া ছিল বাধ্যতামূলক। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার ন্যায় বিহার জীবনে গুরু শিষ্যের সম্পর্ক ছিল পিতাপুত্রের ন্যায়। গুরু অথবা শিষ্য বিহারের শৃঙ্খলা ভঙ্গ করলে শাস্তি পেতে হত। এমনকি গুরুতর অপরাধ করলে বিহার থেকে বের করে দেওয়া হত।

গুরু শিষ্যের সম্পর্ক : বৌদ্ধ বিহারে শিক্ষক ছিলেন দুই প্রকারের। ধর্মতত্ত্বের শিক্ষক ছিলেন 'উপাধ্যায়' আর নৈতিক জীবনের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন 'আচার্য' বা 'কর্মাচার্য'। বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রব্রজ্যা অনুষ্ঠানের সময় শ্রমণকে তার গুরু নির্বাচন করতে হত। তাঁর নির্বাচিত গুরু বা উপাধ্যায় সম্মতিদান করলেই তারা গুরু শিষ্যের সম্পর্কে আবদ্ধ হতেন। শিক্ষক বিদ্যার্থীর জ্ঞান, চরিত্র, ধর্মীয় ও নৈতিক সকল প্রকার বিকাশের দায়ভার গ্রহণ করতেন। গুরু শিষ্যকে সন্তান বাৎসল্যে স্নেহ করতেন। তবে শিষ্য সংঘের নিয়মভঙ্গ করলে এর উপযুক্ত কারণ যাচাই করে তিনি শিষ্যকে সংঘ থেকে বের করে দেবার অধিকারী ছিলেন। তেমনি উপাধ্যায় ও আচার্য্যের জীবন যাপনে কোন স্খলন দেখলে শিষ্য সংঘ কর্তৃপক্ষের নজরে এনে উনাকে সংশোধন ও শাস্তির হাত থেকে বাঁচাবার জন্য উপযুক্ত ভূমিকা গ্রহণ করার অধিকারী ছিলেন। গুরু এবং শিক্ষার্থীর সম্পর্ক ছিল পরস্পর নির্ভরশীল।

শিক্ষাদান পদ্ধতি : প্রথম দিকে বিহারের শিক্ষাদান পদ্ধতি ছিল ব্যক্তিকেন্দ্রিক। প্রত্যেক শ্রমণকে একজন আচার্য্যের অধীনে থাকতে হত। পরবর্তীকালে বৌদ্ধ বিহারগুলোতে শ্রমণদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় (নালন্দা, তক্ষশীলা, বিক্রমশীলা ইত্যাদি) শ্রেণি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থায় মৌখিক

পদ্ধতিতে পাঠদান করা হত। মুখস্থ করা ও আবৃত্তি করা এই দুটি ছিল শিক্ষার প্রধান উপায়। সে সময়ে লিপি ছিল, বৌদ্ধ শাস্ত্র এবং ধর্মগ্রন্থ লিপিবদ্ধও ছিল। কিন্তু শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে মাতৃভাষা ও আঞ্চলিক ভাষার (প্রাকৃতভাষা) মাধ্যমে মৌখিক ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়। এর ফলে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাকৃত বা আঞ্চলিক ভাষাগুলোই গুরুত্ব পায়। প্রাকৃত ভাষা হল গণশিক্ষার মাধ্যম। উচ্চশিক্ষা কেন্দ্রগুলোতে সংস্কৃত ভাষাও স্থান পেয়েছিল।

মূল্যায়ণ ও উপাধিদান : বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রব্রজ্যা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষার্থী 'শ্রমণ' উপাধি লাভ করতো। ১২ বছরের শিক্ষা ও কর্তব্যনিষ্ঠা পালনের মাধ্যমে ভিক্ষুগণ সংঘের সামনে তাদের জ্ঞানের পরিচয় দিতে পারলেই তারা 'উপসম্পদা' উপাধি লাভ করত। উপসম্পদা ছিল চূড়ান্ত সন্ন্যাসের সূচনা পর্ব। তবে বৌদ্ধ শিক্ষায় শিক্ষান্তে গৃহীজীবন যাপনের অধিকার ছিল।

নারীশিক্ষা : বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রথম পর্বে নারী শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। বৌদ্ধ সংঘে নারীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। পরবর্তী সময়ে মহাপ্রজাপতি গৌতমী ও শিষ্য আনন্দের অনুরোধে বুদ্ধদেব নারীদের বৌদ্ধ সংঘে প্রবেশের অনুমতি দেন। এরফলে বৌদ্ধ যুগে নারীদের শিক্ষার প্রসার ঘটে। নারী শিক্ষার্থীদের বলা হত ভিক্ষুনী। বুদ্ধদেবের অন্যতমা শিষ্যা থেরী ধর্মদীনা ধর্মশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুনীদের মধ্যে সুজাতা, শুভা, অনুপমা, সুমেধার নাম উল্লেখযোগ্য।

ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ শিক্ষার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য :

যাগযজ্ঞ বহুল ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ রূপে বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব হয়েছিল। সেই সময়ে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিপত্তি সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়লে এই ধর্ম ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে পড়ে। তা হলেও ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা সুদীর্ঘকাল সহনশীলতার সঙ্গে সহাবস্থান করেছে। উভয় শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে অনেক সাদৃশ্য। আবার বৌদ্ধ ধর্ম মূলত সংস্কার আন্দোলন ছিল বলে বৈসাদৃশ্যও অনেক রয়েছে। যেহেতু বৌদ্ধ শিক্ষা ব্রাহ্মণ্যশিক্ষার নবরূপায়ন মাত্র সেহেতু বৌদ্ধ শিক্ষার সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার সাদৃশ্যও আছে।

এই দুই শিক্ষাব্যববস্থার সাদৃশ্যগুলো হল—

১) উভয় শিক্ষা ব্যবস্থাই ধর্মভিত্তিক।

২) দুই শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য ছিল জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করা, অর্থাৎ 'মোক্ষ' বা 'নির্বাণ' লাভ করা।

৩) উভয় শিক্ষার পাঠক্রমে লৌকিক বিদ্যাকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার না করলেও অগ্রাধিকার দেওয়া হয়নি। জীবনের মূখ্য অভিজ্ঞতা হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে পরাজ্ঞান অথবা দু:খ থেকে মুক্তি বা নির্বান।

৪) উভয় শিক্ষাব্যবস্থাই শিক্ষাকে জীবনের সর্বক্ষনের সঙ্গী হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। কোন অবকাশ বা বিরাম তার মূল সুরকে ক্ষতি করবে না।

৫) ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ শিক্ষা শুরু হত একটি নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থায় বিদ্যারম্ভ অনুষ্ঠান ছিল 'উপনয়ন' আর বৌদ্ধ শিক্ষায় ছিল 'প্রব্রজ্যা'। শিক্ষা সমাপ্তিও হত একটি নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার সমাপ্তি অনুষ্ঠান ছিল 'সমাবর্তন' আর বৌদ্ধ শিক্ষার 'উপসম্পদা'।

৬) উভয় শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল অবৈতনিক ও আবাসিক। দুটি শিক্ষা ব্যবস্থা সমাজ ও রাষ্ট্রের আর্থিক আনুকূল্যের উপর নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু শিক্ষা ছিল রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের বাইরে।

৭) ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থায় গুরু ও শিষ্য পিতা পুত্রের ন্যায় নিবিড় সম্পর্কে আবদ্ধ থাকতেন। এটা অত্যন্ত লক্ষনীয় বিষয়।

৮) উভয় শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষাদানের পদ্ধতি ছিল মৌখিক।

৯) সংযমী জীবনযাপন ছিল প্রাচীন ভারতের সকল ধর্মের মূল কথা। তাই ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের কঠোর নিয়মপালনের মধ্য দিয়ে সংযমের বিধি আয়ত্ত করতে হত। সংযম ও নিয়মানুবর্তিতা ছিল উভয় শিক্ষার মূল সুর। উভয় শিক্ষা ব্যবস্থায় এই সব সাদৃশ্যের মধ্যেই প্রাচীন ভারতীয় চিন্তার মৌলিক ঐক্য প্রতিফলিত হয়েছে।

ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে অনেক সাদৃশ্য থাকলেও কিছু কিছু বৈসাদৃশ্য ও লক্ষণীয় ছিল —

১) ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ছিল সম্পূর্ণ বেদ নির্ভর। কিন্তু পরোক্ষে বৌদ্ধ শিক্ষা ছিল বেদ বিরোধী।

২) ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থায় বর্ণাশ্রম প্রথায় সকলের জন্য শিক্ষার অধিকার উন্মুক্ত ছিল না। উচ্চ তিনটি বর্ণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের শুধু শিক্ষার অধিকার ছিল। শূদ্রের শিক্ষার অধিকার ছিলনা। কিন্তু বৌদ্ধ শিক্ষার দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল। তাই বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল সর্বজনীন ও গণতান্ত্রিক।

৩) ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থায় শুধু ব্রাহ্মণরাই শিক্ষাদানের অধিকারী হতেন কিন্তু বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থায় অব্রাহ্মণদেরও যোগ্যতা অনুসারে 'আচার্য্য' বা 'উপাধ্যায়' হবার অধিকার ছিল।

৪) ব্রাহ্মণ্য শিক্ষায় শিক্ষার্থীর গুরুগৃহ ছিল শিক্ষাকেন্দ্র। বৌদ্ধশিক্ষার প্রতিষ্ঠান ছিল সংঘ বা মঠকেন্দ্রিক।

৫) ব্রাহ্মণ্য শিক্ষায় ভাষার মাধ্যম ছিল সংস্কৃত ভাষা। বৌদ্ধ শিক্ষার ভাষার মাধ্যম ছিল আঞ্চলিক ভাষা বা প্রাকৃত ভাষা।

৬) ব্রাহ্মণ্য শিক্ষায় গুরুগৃহ ছিল গুরুর সম্পত্তি আর বৌদ্ধ বিহারগুলো ছিল সংঘের সম্পত্তি।

৭) ব্রাহ্মণ্য শিক্ষায় নারীর শিক্ষার অধিকার ছিল। বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রথম দিকে নারীদের শিক্ষার অধিকার অস্বীকার করা হলেও পরবর্তী সময়ে নারীদের সংঘে শিক্ষাদানের মাধ্যমে বৌদ্ধ শিক্ষার উদারতা প্রকাশ পায়।

৮) ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার সমাপনী অনুষ্ঠান 'সমাবর্তন' ও বৌদ্ধ শিক্ষার সমাপনী অনুষ্ঠান 'উপসম্পদা-র' মধ্যে পার্থক্য ছিল। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থায় গুরুর বিবেচনা ছিল শেষ কথা। সমাবর্ত অনুষ্ঠান ছিল শিক্ষার্থীর গৃহে প্রত্যাবর্তনের অনুষ্ঠান। বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থায় উপসম্পদা অর্থাৎ ভিক্ষুত্বদানের অধিকার ছিল কেবলমাত্র সংঘের। উপসম্পদা ছিল গৃহত্যাগের অনুষ্ঠান যা চূড়ান্ত সন্ন্যাস জীবনের সূচনাপর্ব।

৯) ব্রাহ্মণ্য শিক্ষায় বিদ্যারম্ভে শিক্ষার্থীকে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে হতনা। কিন্তু বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থায় শ্রমণ হওয়া মানেই সন্ন্যাস গ্রহণ কিন্তু পরবর্তী কাকে প্রয়োজনে তারাও গৃহী হতে পারত।

১০) ব্রাহ্মণ্য শিক্ষায় গুরুর বিরোধীতা করা যেত না। বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থায় উপাধ্যায় বা আচার্য্য সংঘের আদর্শ বিরোধী কাজ করলে, শ্রমণরা তাঁদের বিরুদ্ধে সংঘের কাছে নালিশ করতে পারত।

১১) ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা গুরুগৃহকেন্দ্রিক হওয়ায় তা সর্বজনীন রূপ নিয়ে বৃহৎ প্রাতিষ্ঠানিক রূপলাভ করেনি। কিন্তু বৌদ্ধ শিক্ষা প্রথম থেকেই সম্পূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক ছিল। বহির্ভারতে বৌদ্ধধর্ম প্রসারের ফলে এই বৌদ্ধ

বিহারগুলো আন্তর্জাতিক মানের প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য হয়েছিল। বহু বহির্ভারতের শিক্ষার্থীর সমাবেশ ঘটেছিল এই বৌদ্ধ বিহারগুলোতে।

দুটি শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকা সত্বেও ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ শিক্ষা একে অপরের পরিপূরক হিসাবে কাজ করেছে এবং উভয়েই শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করেছে। তবে একটা সময়ে বৌদ্ধ শিক্ষায় বহু শিক্ষকের যৌথ পরিচালনাধীন বৃহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা বিহারগুলো অনেকটাই ঢিলেঢালা হয়ে পড়েছিল। তাই তুর্কি-আফগান আক্রমণ থেকে এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে রক্ষা করা যায়নি। এই তুর্কি-আফগান আক্রমণেই ভারতে বৌদ্ধ শিক্ষা চূড়ান্ত ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় । তাই এক সময় প্রাচীন ভারতে হিন্দুধর্মের নানা পরিবর্তন এবং রূপান্তরের মধ্য দিয়ে এক সমন্বয়ী চরিত্র, উদারনৈতিক সংস্কার এবং শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ বৌদ্ধ ধর্মের পৃথক অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তোলে। বৌদ্ধ শিক্ষা ভারতীয় শিক্ষার মূল উৎসে স্থাপন করেছিল ধর্মনিরপেক্ষতা ও সর্বজনীন শিক্ষার মন্ত্র। বর্তমান সময়ে ও উভয় ধর্মমত এবং তাদের নীতি ও আদর্শ অনুসরণকারী শিক্ষা ব্যবস্থাপনার ধারা ভারতীয় সমাজজীবনে পারস্পরিক সহাবস্থানের নীতিতে বিরাজমান রয়েছে।

দ্বিতীয় একক মধ্যযুগে ভারতের শিক্ষা

খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দীতে গজনীর সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়। তাঁর ভারত আক্রমণের ফলে হিন্দু মন্দিরগুলো এবং ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্রগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভারতের ইতিহাসে তিনি দুর্ধর্ষ লুণ্ঠনকারী হিসাবে পরিচিত। তিনি ভারতবর্ষে স্থায়ীভাবে রাজত্ব করতে আসেনি। তাঁর ভারত আক্রমণের উদ্দেশ্যই ছিল ভারতের ধনসম্পদ লুঠ করে নিয়ে যাওয়া। তাঁর এই ধ্বংসাত্মক আক্রমণে ভারতে ইসলামি যুগের পথ সুগম হয়েছিল। সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণের বহু বছর পরে ভারতবর্ষে মুসলিম সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন মহম্মদ ঘোরী। তিনি আজমীরে হিন্দু মন্দির ধ্বংস করে সেখানে মসজিদ ও শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেন। তিনি ক্রীতদাসদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। তাঁর বিশ্বস্ত সেনাপতি কুতুবুদ্দিন আইবক বহু হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেন। মহম্মদ ঘোরীর অন্যতম ক্রীতদাস কুতুবুদ্দিন আইবক ১২০৬ খ্রি: ভারতে দাস বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। কুতুবুদ্দিনের সুযোগ্য সেনাপতি বখ্‌তিয়ার খিলজী নালন্দা ও বিক্রমশীলা প্রভৃতি বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্রগুলো ধ্বংস করে। তবে বিজয়ী মুসলমান শাসকগণ বিজিত রাজ্যগুলোর মন্দির ধ্বংস করে বহু মসজিদ নির্মাণ করেন। এইসব মন্দিরকে কেন্দ্র করে মুসলিম শিক্ষার প্রসার ঘটে।

দাস বংশের পর যথাক্রমে খিলজী বংশ, তুঘলক বংশ এবং মোগল শাসকরা ভারতবর্ষের শাসনকার্য পরিচালনা করেন। এই বিজয়ী মুসলমানগন নিয়ে এলেন নতুন ভাষা, লিপি ও নতুন ধর্ম। তারা বহন করে এনেছেন আরবীয় সভ্যতা। রাষ্ট্রীয় উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে গজনী ও কাবুলের এই সংস্কৃতি ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছে। তাদের বদান্যতায় কখনো শিক্ষায় এসেছে প্রাণচাঞ্চল্য, আবার তাদের অবহেলায় শিক্ষাব্যবস্থা হয়েছে জরাজীর্ণ। তুর্কি-আফগান সাম্রাজ্য স্থাপনের পর থেকেই ভারতে ইসলামি শিক্ষার সূচনা হয়। মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবার পর স্বাভাবিকভাবেই ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা রাজানুকূল্য থেকে বঞ্চিত হয়। মুসলিম ধর্মের পবিত্রগ্রন্থ কোরাণের শিক্ষাই প্রাধান্য পায়। এই কোরাণের প্রভাবেই দীর্ঘ বছর ভারতের মুসলিম শাসকগন যে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলেন এই শিক্ষা ব্যবস্থাই ভারতবর্ষে ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থা নামে পরিচিত। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত মুসলিম যুগ বিস্তৃত ছিল।

মধ্যযুগে ইসলামি শিক্ষার বৈশিষ্ট্য :

১) ইসলামি শিক্ষার লক্ষ্য — প্রাচীন ভারতের বৈদিক ও বৌদ্ধ শিক্ষার ন্যায় ইসলামিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল ধর্মভিত্তিক। পবিত্র ধর্মগ্রন্থ 'কোরাণ' পাঠে অভিজ্ঞ, ধার্মিক চরিত্রবান মানুষ তৈরি করাই ছিল মুসলিম শিক্ষার উদ্দেশ্য। যদিও মুসলিম যুগের শুরুতে শিক্ষার লক্ষ্য ছিল ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসার এবং রাজনৈতিকভাবে এক ঐক্যবন্ধ জনগোষ্ঠি গড়ে তোলা।

২) শিক্ষারম্ভ — ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থাপনার মাত্র চার বছর চার মাস চার দিন বয়সে একটি দিনে রঙিন বস্ত্র পরিধান করে শিক্ষার্থীকে মক্তবের আখেনজীর (শিক্ষক) সামনে বসানো হত। শিক্ষার্থীর হাতে দেওয়া হতো রৌপ্যনির্মিত ফলক। তার উপর লেখা থাকত কোরাণের বাণী 'সুরা-ই-ইক্‌য়া'। আখেনজী বার বার

উচ্চারণ করে শিক্ষার্থীকে মুখস্থ করাতেন। এই অনুষ্ঠানকে বলা হতো ‘মক্তব অনুষ্ঠান’ বা ‘বিসমিল্লাহ্ অনুষ্ঠান’। সাত বছর বয়সে শিক্ষার্থীকে শিক্ষালয়ে পাঠানো হত প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণের জন্য।

৩) ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান — ইসলামিয় শিক্ষায় প্রথমত: গৃহই ছিল শিক্ষাগ্রহণের কেন্দ্র হিসাবে স্বীকৃত। বিত্তবান বা সুলতানরা তাদের সন্তানদের গৃহে ও হারেমে গৃহশিক্ষক নিয়োগ করতেন এবং সন্তানের সার্বিক জ্ঞান অর্জনের জন্য গৃহশিক্ষককেই দায়িত্ব দেওয়া হত। মুসলিম শিক্ষাব্যবস্থায় নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে ‘মক্তব’ ও ‘মাদ্রাসা’। মসজিদ বা দরগা সংলগ্ন স্থানে মৌলভিদের পরিচালনায় শিক্ষাদান করা হত।

‘মক্তব’ হচ্ছে মূলত প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে কোরাণের বাণী মুখস্থ করানো হত, ধর্ম শিক্ষা ও অক্ষর জ্ঞানের সাথে শিক্ষার্থী পরিচিত হত। এছাড়া মক্তব ছিল মুসলিম যুগের জনসাধারণের মধ্যে গণশিক্ষা বিস্তারের মাধ্যম। ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থায় মাধ্যমিক ও উচ্চতর স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হল ‘মাদ্রাসা’। মাদ্রাসাগুলো মসজিদ এলাকায় না হলেও এখানে ধর্মাচারণের জন্য থাকতো প্রার্থনা গৃহ। মাদ্রাসা পরিচালনায় থাকত কোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন। তবে মাদ্রাসাগুলো সরকারি আর্থিক অনুদানও লাভ করত। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলো বেশিরভাগই থাকত মসজিদ অথবা দরগার (সমাধিস্থল) সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। মাদ্রাসাগুলো বেশিরভাগই ছিল শহরে, বিশেষত কেন্দ্রিয় কিংবা প্রাদেশিক রাজধানীতে। উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্ররূপে জৌনপুর, দিল্লি, বিজাপুর, বিদর, ফতেপুর সিক্রি, দৌলতাবাদ, বদাউনি, ফিরোজাবাদ, হায়দরাবাদ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মাদ্রাসাগুলো ছিল আবাসিক শিক্ষাকেন্দ্র।

৪) পাঠ্যক্রম : ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থায় স্তর ভিত্তিক সময়োপোযোগী পাঠক্রম গ্রহণ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। মক্তব ছিল মূলত পরবর্তী শিক্ষা গ্রহণের জন্য প্রস্তুতির ক্ষেত্র। এখানে লেখা ও পড়া শেখানো হত। বিষয়বস্তু ছিল কোরাণের অংশ বিশেষ মুখস্থ করা, ফতিমার বাণীগুলো শুদ্ধ উচ্চারণ করা, অল্প পরিমাণে ফার্সি ব্যাকরণ পাঠ ও হাতের লেখা অভ্যাস করা। শিক্ষার মাধ্যম ছিল আরবি। দরবেশ ও পয়গম্বরদের জীবনী আলোচনা করা হত। কিছু গণিত, আবেদনপত্র লেখা এবং কথোপকথনের কৌশল ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হত। কোরাণের বাণী বিশেষত দিনে পাঁচবার নামাজ সম্বন্ধে কোরাণের নির্দেশ বিশেষভাবে লেখা ও শেখানো হত। মক্তব্যের উদ্দেশ্য ছিল ইহজগত ও পরবর্তী জগতের জন্য শিক্ষার্থীর নৈতিক ও বৌদ্ধিক উন্নতি ঘটানো।

মাদ্রাসা বা মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ এই দুই ধরনের পাঠক্রমের ব্যবস্থা ছিল। এই পাঠক্রমের মেয়াদ ছিল ১২ বছর। ধর্মীয় পাঠক্রমের অন্তর্গত ছিল — কোরাণ পাঠ, কোরাণের ব্যাখ্যা সম্পর্কে বিস্তারিত জানা ও আলোচনা করা। অন্যদিকে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার পাঠক্রমে ছিল— সাহিত্য, নীতিবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, পাটীগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, প্রশাসনিক বিজ্ঞান, ভৌতবিজ্ঞান, দর্শন, চিকিৎসাশাস্ত্র, কৃষিবিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি বিষয়। এছাড়া বৃত্তি শিক্ষার জন্য আলাদা পাঠক্রম ও বিদ্যালয় গঠন করা হয়েছিল। তবে যারা সংস্কৃত পড়তে আগ্রহী তাদের জন্য ব্যাকরণ, ন্যায়শাস্ত্র, বেদান্ত ও পতঞ্জলির ভাষ্য ইত্যাদি পাঠের ব্যবস্থা ছিল।

৫) শিক্ষাদান পদ্ধতি — প্রথম দিকে বুঝে না বুঝে মুখস্থ করাই ছিল প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাদান পদ্ধতি। কিন্তু সম্রাট আকবরের পরামর্শে আগে লেখা ও পড়ে পড়া এই পদ্ধতি চালু হয়। লেখা ও পড়া শেখানোর পর শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে পড়াশেখার সুযোগ দেওয়া হত। শিক্ষক প্রয়োজনী সাহায্য করতেন।

মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষাদান পদ্ধতি ছিল মূলত মৌখিক ও আলোচনা চক্রের মাধ্যমে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা আত্মশিখনে উৎসাহী হত। শরীর বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতিষশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়গুলো সক্রিয়তাভিত্তিক পদ্ধতিতে শেখানো হত। 'সর্দার পড়ো' ব্যবস্থায় শিক্ষকের পর্যবেক্ষণে উঁচু ক্লাশের ছাত্ররা নীচু ক্লাশের পড়ানোর দায়িত্ব নিত।

৬) শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পক — ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থাতে শিক্ষক ছিলেন অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি। সাধারণের চেয়ে তারা আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক দিকে ছিলেন অনেক উপরের স্তরের। আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিষয়ে তারাই সর্বাগ্রে গৃহীত হতেন। শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত মধুর। মক্তবের প্রাথমিক শিক্ষা ছিল অবৈতনিক। শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষক বা মৌলভিগণ মুসলিম রাজন্যবর্গ থেকে নিয়মিত ভাতা পেতেন। উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসাগুলো ছিল আবাসিক শিক্ষাকেন্দ্র। আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক শিক্ষার্থী একত্রে থাকার ফলে প্রতিনিয়ত পারস্পরিক সান্নিধ্যে শিক্ষার্থীর জীবনধারার উপর শিক্ষকের প্রভাব প্রতিফলিত হত। শিক্ষকের সাথে পিতাপুত্রের সম্পর্কের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর নৈতিক জীবন উন্নত হত। হিন্দু শিক্ষার মতো গুরু সেবা শিষ্যের অবশ্য কর্তব্য ছিল। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে বৈষয়িক সম্পর্ক ছিলনা, কারণ মুসলিম রাজন্যবর্গ বা বিত্তশালীদের আনুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত মাদ্রাসার শিক্ষা ছিল অবৈতনিক। সাধারণ বিষয় শিক্ষক ছাড়া ও ব্যবহারিক শিক্ষার জন্য ও আলাদা শ্রেণির শিক্ষক ছিল। উনারা নির্দিষ্ট শিক্ষা কেন্দ্র ছাড়াও নিজগৃহে শিক্ষাদান করতেন। এক্ষেত্রে তাদের জ্ঞান, দক্ষতা ও চারিত্রিক গুণাবলির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হত। শিক্ষক মহাশয়রা তাদের সেবা প্রবণতার এই বৃত্তি গ্রহণ করতেন এথেকে বোঝা যায় যে প্রাচীন ভারতীয় বৈদিক ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার অনুশীলিত নীতিই মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থায় গ্রহণ করা হয়েছিল।

৭) শৃঙ্খলা — ইসলামি শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য ছিল শিক্ষার্থীর নৈতিক বিকাশ সাধন করা। তাই মক্তব ও মাদ্রাসায় কঠোরভাবে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা রক্ষা করা হত। শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় রীতিনীতি পালন করা, নির্দিষ্ট নিয়ম নির্ঘন্ট মেনে নামাজ পড়া, পড়াশোনা করা, ধর্মীয় ও সামাজিক কর্তব্য পালনের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হত। তবে কোনো রকম অনৈতিক কাজ করলে শাস্তি দেওয়া হত।

৮) মূল্যায়ন ও উপাধি প্রদান — বিদ্যালয় ও শিক্ষাভেদে ভিন্ন ভিন্ন মূল্যায়ন পদ্ধতি ছিল। দৈনন্দিন নানা কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যোগ্যতা নিরূপণ করে পরবর্তী কাজের জন্য নির্বাচন করা হত। অক্ষমতা ধরা পড়লে আগের বিষয়ে আলোচনা করা হত। সামগ্রিক মূল্যায়নের ব্যবস্থাও ছিল। অর্থাৎ বিভিন্ন শিক্ষালয় থেকে শিক্ষার্থীদের নিয়ে নানা কর্মসূচির (বিতর্ক, প্রবন্ধ পাঠ, আলোচনা ইত্যাদি) মাধ্যমে সর্বজনীন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হত এবং যোগ্য বিবেচনার পর নানা সরকারী কাজের জন্য তাদের নির্বাচন করে পঠনপাঠনে উৎসাহ দানের ব্যবস্থা করা হত। কৃতি শিক্ষার্থীদের সনদ (Certificate), ইনাম (Prize) এবং পদক (Medals) পুরস্কার হিসাবে দেওয়া হত। এছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শিতার জন্য উপাধি প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। তর্কবিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্রে পারদর্শিতার জন্য 'ফাজিল', ধর্মতত্বে পাণ্ডিত্যের জন্য 'আলিম' এবং সাহিত্য পারদর্শিতার জন্য 'কাবিল' উপাধি প্রদান করা হত।

৯) নারী শিক্ষা — ইসলামি অনুশাসনে নারীশিক্ষা অবৈধ ছিলনা। মুসলিম যুগে মেয়েদের বিদ্যালয়ে গিয়ে শিক্ষাগ্রহণ করার ব্যবস্থা ছিল না। তবে মক্তবে বালিকারা সাত বছর বয়স পর্যন্ত পড়তে পারত, তারপর অন্তপুরে আবদ্ধ হত। মেয়েরা অধিকাংশই ঘরে বসে কোরাণের সুরা আবৃত্তি করতে শিখত। পর্দা প্রথা প্রচলন হওয়ায় সাধারণ নারী শিক্ষার সুযোগ সংকীর্ণ হয়। উচ্চবংশ ও রাজপরিারের অন্দরমহলে মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। হারেমের শিক্ষার জন্য বিশেষ 'উলেমা' এবং চারু কলা শিক্ষার জন্য 'ওস্তাদ' নিয়োগ করা হত। মুসলিম শিক্ষিতা নারী রাজিয়া সুলতানা রাজকার্যে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন এছাড়া মুসলিম মহীয়সী নারীর মধ্যে বাবরকন্যা গুলবদন বেগম, আকবরের ধাত্রীমাতা মোহম আনাগা, নূরজাহান, মমতাজ, জাহানারা, জেবুন্নিসা, বদরুন্নেসা, জিনতুন্নিসা প্রভৃতি নাম উল্লেখযোগ্য। অবশ্য এরা সকলেই ছিলেন রাজপরিবারের নারী। মধ্যযুগে আরেক উল্লেখযোগ্য নারী ছিলেন, চাঁদবিবি। এই সময়কালে হিন্দু নারীদের শিক্ষার ঐতিহ্য অনেকটা সংকুচিত হলেও একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়নি, দূর্গাবতী এবং মীরাবাঈ উল্লেখযোগ্য হিন্দুনারী রাজস্থানের মুখ উজ্জ্বল করেছিল। যদিও মধ্যযুগে হিন্দুনারী শিক্ষা যথেষ্ট বাধাপ্রাপ্ত হয়। এরফলে হিন্দুধর্ম ও সমাজ রক্ষণশীল হয়ে পড়ল, তার প্রধান বলি হল নারী স্বাধীনতা ও নারী শিক্ষা।

পরিশেষে বলা যায় মধ্যযুগে বিজয়ী তুর্কি-আফগান শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলিম শিক্ষার সূচনা হয়েছিল কিন্তু এই ইসলাম ধর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা কখনো সাধারণ জনগণের কাছে পৌঁছে এক সামগ্রিকতা বা জাতীয় শিক্ষার রূপ গ্রহণ করতে পারেনি। এছাড়া মুসলিম শিক্ষা দেশের শাসকদের উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল হওয়ার জন্য বিভিন্ন সুলতানদের আমলে তাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর শিক্ষার গতিপ্রকৃতি নির্ভর করত। সুলতানরা নিয়তই যুদ্ধে বিগ্রহে লিপ্ত থাকায় শিক্ষার প্রসার নানা সময়েই ব্যাহত হয়েছে।

মধ্যযুগের শিক্ষা সম্পর্কে একটি বিষয় বিশেষভাবে জানা দরকার যে কেবল মুসলিম শিক্ষাই মধ্য যুগের শিক্ষা নয়। সেই সময় রাষ্ট্রীয় আনুকূল্যে মুসলিম শিক্ষা ব্যাপক প্রসার লাভ করে কিন্তু আর্থিক আনুকূল্যে বঞ্চিত হয়েও প্রাচীন ভারতীয় হিন্দু শিক্ষা কেন্দ্রগুলো সগৌরবে তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিল। বারাণসী, কাঞ্চি, মিথিলা, নবদ্বীপের সংস্কৃত শিক্ষাকেন্দ্র 'টোল' ও 'চতুষ্পাঠী' গুলোর খ্যাতি অক্ষুন্ন রইল সমগ্র মধ্যযুগব্যাপী। এছাড়া জন জীবনের সাথে জড়িয়ে রইল অসংখ্য পাঠশালা। এই পাঠশালাগুলো সাধারণ জনগণের প্রাথমিক শিক্ষার চাহিদা মিটিয়েছেন। এইসব পাঠশালায় "সর্দার পড়ো ব্যবস্থা" (Monitorial System) আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌দেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রাজানুকূল্য থেকে বঞ্চিত হয়েও এগুলো ছাত্রদের স্বেচ্ছাবেতন ও জনসাধারণের দানে স্বকীয়তা বজায় রেখেছিল। ভারতে মুসলিম শাসনকালে মুসলিমরা বহুদিন এদেশে থাকার ফলে হিন্দু-মুসলমানের একটি সংমিশ্রিত সাংস্কৃতিক ধারার সৃষ্টি হয়। এরফলে আরবী, ফার্সি ও হিন্দি ভাষার সংমিশ্রণে এক নতুন মিশ্রিত ভাষা রূপে 'উর্দু' ভাষার সৃষ্টি হয়। উর্দু ভাষা সৃষ্টির ফলে হিন্দু মুসলমান উভয়ের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান সহজ হয়। এছাড়া ভারতের নানা আঞ্চলিক ভাষাগুলো এই সময় বিকশিত হয়।

মধ্যযুগের শেষার্ধে মুসলিম সংস্কৃতি ও ভারতীয় সংস্কৃতি পরস্পরকে প্রভাবিত করেছে ফলে সৃষ্টি হয়েছে ধর্ম সমন্বয়ের ধারা। কবীর, নানক ও শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী সবার উপর প্রভাব ফেলেছে। লক্ষনীয় সুফিবাদ, বৈষ্ণববাদ এবং অন্যান্য জনপ্রিয় এবং সহনশীল ধর্মভাবনার উদ্ভব হয়েছে। রাষ্ট্র পরিচালনার

ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতা অবলম্বন করে আকবার "দীন-ই-ইলাহী" ধর্মমতের মধ্য দিয়ে সর্বধর্ম সমন্বয়ের প্রচার করেন। তিনি বর্ণবৈষম্যকে দূর করে হিন্দু মুসলমানকে কাছে এনেছেন। কিন্তু ঔরঙ্গজেবের জীবদ্দশায় যে অবক্ষয়ের সূচনা হয়েছিল তা অপ্রতিরোধ্যভাবে অগ্রসর হয়েছে তাঁর উত্তরকালে। নাদির শাহ'র ভারত আক্রমণে দিল্লির রাজশক্তির শেষ শক্তিটুকুও নি:শেষ হয়েছে। তারপর ক্ষমতাহীন উচ্ছৃঙ্খল সম্রাটরা হয়েছেন ক্ষমতা প্রিয় আমীরদের ক্রীড়নক। সমগ্র সাম্রাজ্যে এসেছে অরাজকতা। এই সময়ে অনুপ্রবেশ করল এক নতুন শক্তি। ইউরোপীয় বণিকদলের সঙ্গে ভারতবর্ষে অবতীর্ণ হলো ইউরোপীয় খ্রিস্টান মিশনারীর দল। যুগের অবক্ষয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষা চেতনা হিন্দু এবং মুসলিম উভয় শিক্ষাব্যবস্থাকেই কোণঠাসা করেছে। ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে সূচনা হল এক নতুন অধ্যায়ের। এই আবহেই খ্রিস্টান মিশনারি, ইউরোপীয় বণিক সম্প্রদায় এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্ম পরিসরে শিক্ষা ব্যবস্থাপনার এক নতুন চরিত্র তৈরি হল।

তৃতীয় একক সনদ আইন (১৮১৩), উডের ডেসপ্যাচ (১৮৫৪)

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভিক পর্যায়ে ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষে এক সুবিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু ভারতীয়দের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের দায়িত্বকে তাঁরা সুকৌশলে এড়িয়ে যান। সেজন্য এই সময়ে ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পক্ষে শিক্ষার প্রসারের জন্য কিছু বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হলেও কোন সুনির্দিষ্ট শিক্ষানীতি ছিল না। ভারতবর্ষের শিক্ষাক্ষেত্রে এই সরকারি উদাসীনতার বিরুদ্ধে ক্রমশই জনমত গড়ে উঠতে থাকে। ক্রমাগত জনমতের চাপে ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সনদ আইনে ভারতে শিক্ষা বিস্তার বিষয়ে কয়েকটি শর্ত লিপিবন্ধ করা হয়।

১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের সনদ আইনের শিক্ষা বিষয়ক ধারা :

১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের সনদ আইনের ১৩নং ধারা ও ৪৩ নং ধারা আধুনিক ভারতের শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সনদ আইনের ১৩নং ধারায় বলা হয়, ভারতীয়দের মধ্যে প্রয়োজনীয় জ্ঞানের প্রচার ও নৈতিক উন্নতির জন্য শিক্ষা প্রবর্তনে ইচ্ছুক যে-কোনো ব্যক্তি ভারতবর্ষে আসতে ও থাকতে পারবে এবং এবিষয়ে কোম্পানির পক্ষ থেকে তাদের সবরকম সুবিধা দেওয়া হবে।

সনদ আইনের ৪৩নং ধারায় ভারতে শিক্ষা বিস্তার বিষয়ে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংযোজিত হয়। এই ধারায় বলা হয়— “A sum of not less then one lac of rupees in each year shall be set apart and applied to the revival and improvement of literature and the encouragement of the improvement of literature and for the introduction and promotion of a knowledge of the science among the inhabitants of the British territories in India”. অর্থাৎ সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন ও উন্নতিবিধান দেশীয় পণ্ডিতদের উৎসাহদান এবং ব্রিটিশ ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রবর্তনের জন্য কোম্পানিকে প্রতিবছর কমপক্ষে এক লক্ষ টাকা খরচ করতে হবে।

১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের সনদ আইনের তাৎপর্য ও গুরুত্ব —

১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের সনদ আইন ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করে। যেসব কারণে এই আইনটি ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলো হল

ক) ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে ভারতীয়দের শিক্ষার দায়িত্ব নিতে এবং শিক্ষার খাতে প্রতি বছর এক লক্ষ টাকা খরচ করতে প্রথম নির্দেশ দেওয়া হল। এর আগে কোম্পানি শিক্ষা বিস্তারে আর্থিক সাহায্য করলেও শিক্ষাবিস্তার যে রাষ্ট্রের দায়িত্ব একথা স্বীকার করেনি।

খ) এই আইনের ১৩নং ধারা অনুযায়ী পরোক্ষভাবে মিশনারিদের জয় ঘোষিত হয়। তারা বিনা বাধায় ভারতে প্রবেশের এবং বসবাসের অধিকার লাভ করে এবং ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন করে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার বুনিয়াদ দৃঢ় করে।

গ) মিশনারিদের দাবি অনুযায়ী খ্রিস্টান ধর্মের ভিত্তিতে শিক্ষাদানের বিষয়টি এই আইনের স্বীকৃত হয়নি। শিক্ষাকে ধর্মনিরপেক্ষ রাখার বিষয়টি প্রাধান্য পায়। আজও ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্মনিরপেক্ষতার এই নীতিটি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

ঘ) শিক্ষা প্রসারে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগকেও স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আজও স্বাধীন ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে এই উভয় উদ্যোগই বর্তমান।

শিক্ষা ধারার ব্যাখ্যা নিয়ে জটিলতা : ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের সনদ আইনের শিক্ষা ধারায় সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন ও উন্নতি বলতে ভারতীয় অথবা পাশ্চাত্য সাহিত্য এর কোন্‌টিকে বোঝায় তা পরিষ্কার করে বলা হয়নি। সনদ আইনের বিজ্ঞান শিক্ষার প্রবর্তনও করতে বলা হয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞান বলতে প্রাচ্য বিজ্ঞান নাকি পাশ্চাত্য বিজ্ঞান তাও স্পস্ট করে বলা হয়নি। ফলে, শিক্ষা ধারার ব্যাখ্যা নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষা সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের দ্বিধাগ্রস্ত নীতি এই জটিলতাকে তীব্রতর করে তোলে।

সরকারি উদ্যোগ GCPI গঠন : ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের সনদ আইনের শিক্ষা ধারা গৃহীত হবার পর সরকারি কোষাগার থেকে শিক্ষার প্রসারের জন্য বার্ষিক এক লক্ষ টাকা ব্যয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে পরবর্তী দশ বছর অর্থাৎ ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কোম্পানি এদেশের শিক্ষার জন্য কিছুই করেনি। শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের এই নিষ্ক্রিয়তা দূর করলেন অস্থায়ী গভর্নর জেনারেল মি: এডম। ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দের ৩১ জুলাই সপরিষদ বড়োলাট দশজন সভ্য নিয়ে General Committee of Public Instruction (GCPI) গঠন করেন। ভারতীয়দের জন্য উন্নত ও প্রয়োজনীয় শিক্ষার প্রবর্তন এবং তাদের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি সাধনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে এই শিক্ষা সভা গঠন করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে GCPI নামক শিক্ষা সভায় প্রাচ্য বিদ্যানুরাগীদের প্রাধান্য থাকায় প্রাচ্যবিদ্যার পোশকতার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে।

শিক্ষাসভার প্রাচ্য পাশ্চাত্য বিরোধ : GCPI গঠনের প্রারম্ভিক পর্যায়ে প্রাচ্যবিদ্যাদের প্রাধান্য থাকায় শিক্ষাসভা প্রাচ্যবিদ্যার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়। কিন্তু ধীরে ধীরে অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে। শিক্ষাসভায় প্রাচ্যবাদী দলের বিরোধিতার পাশ্চাত্যবাদী সদস্যরাও সক্রিয় হতে শুরু করে। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে GCPI এর দশ জন সদস্যের মধ্যে প্রাচ্যবাদী ও পাশ্চাত্যবাদী সদস্যের সংখ্যা সমান সমান হয়ে যায়। প্রাচ্যবাদীরা সনদ আইনের ব্যাখ্যায় সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন ও উন্নয়ন বলতে প্রাচ্য সাহিত্যকে বোঝানো হয়েছে বলে দাবি করেন এবং বিজ্ঞান শিক্ষা বলতে প্রাচ্য জগতের বিজ্ঞানকে বোঝানো হয়েছে বলে দাবি জানান। অন্যদিকে GCPIএর পাশ্চাত্যবাদী সদস্যরা বলেন সাহিত্যের উন্নয়ন ও পুনরুজ্জীবন বলতে শুধুমাত্র পাশ্চাত্য ভাষা অর্থাৎ ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যকেই বোঝানো হয়েছে এবং সনদ আইনে বিজ্ঞান শিক্ষা বলতে একমাত্র পাশ্চাত্য বিজ্ঞান অর্থাৎ ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞানকেই বোঝানো হয়েছে। এইভাবে সনদ আইনের শিক্ষা ধারার ব্যাখ্যা নিয়ে প্রাচ্যবাদী ও পাশ্চাত্যবাদী এই দুই দলের বিবাদের ফলে দেশের সরকারি শিক্ষাব্যবস্থায় এক অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়।

মেকলে মিনিট : উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল প্রাচ্যবাদী ও পাশ্চাত্যবাদীদের মধ্যে শিক্ষার মাধ্যম ও শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্ধারণ সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের প্রেক্ষিতে ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে ১০ জুন কাউন্সিলের আইন সদস্য হিসাবে লর্ড মেকলে ভারতে পদার্পণ করলে তাঁকে শিক্ষা কমিটির সভাপতি পদে নিযুক্ত দেওয়া হয়। তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল লর্ড বেন্টিঙ্ক ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দেই প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দ্বন্দ্বের বিষয়টি লর্ড মেকলের কাছে পেশ করেন। এখানে উল্লেখ্য যে মেকলে

দেশের সামগ্রিক শিক্ষানীতি নির্ধারণের জন্য বলা হয়নি। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে সনদ আইনে বরাদ্দ এক লক্ষ টাকা কোন্ শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হবে সে বিষয়ে আইনগত ব্যাখ্যা দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের ২ ফেব্রুয়ারি লর্ড মেকলে তার মন্তব্য সরকারের কাছে পেশ করেন যা 'মেকলে মিনিট' হিসাবে ইতিহাস প্রসিদ্ধ। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের সনদ আইনের উল্লেখিত 'সাহিত্যের উন্নয়ন' বলতে মেকলে বলেন এটি শুধু সংস্কৃত ও আরবি সাহিত্যের উন্নয়নই বোঝায় না, এর দ্বারা ইংরেজি সাহিত্যের উন্নয়নকেও বোঝানো হয়েছে। সনদ আইনে উল্লেখিত 'শিক্ষিত ভারতীয়' বলতে শুধু প্রাচ্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয়কেই বোঝায় না। মিলটনের কাব্য, লক-এর দর্শন ও নিউটনের পদার্থ বিজ্ঞান প্রভৃতিতে শিক্ষিত ভারতীয়গণও একই শ্রেণিভুক্ত। সনদ আইনে বরাদ্দ অর্থ সম্পর্কে যুক্তি দেখানো হল যে, শুধু প্রাচ্য সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন ও ভারতীয় পন্ডিতদের উৎসাহ প্রদানের জন্য এই টাকা খরচ করা হবে, তা নয়। ব্রিটিশ প্রজাদের মধ্যে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্প্রসারণের জন্যও ওই অর্থ খরচ করা হবে। অর্থাৎ মেকলে তার সুপ্রসিদ্ধ মন্তব্যে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষার বিস্তারের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। পাশাপাশি দেশজ ভাষা সম্পর্কে তিনি বলেন দেশীয় ভাষাগুলো দীন ও অমার্জিত। তাঁর মতে প্রাচ্য ভাষা যথা সংস্কৃত ও আরবি ইংরেজি ভাষা অপেক্ষা নিকৃষ্টতর তাছাড়া প্রাচ্যের জ্ঞান বিজ্ঞান কুসংস্কার ও যুক্তিহীনতায় ভরা। ইংরেজির পক্ষে মেকলের যুক্তি হল ইংরেজি হল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষা। ইংরেজি ভাষা থেকে শক্তি আহরণ করে দেশীয় ভাষাগুলোও ভবিষ্যতে সাহিত্যের স্বাভাবিক মাধ্যম হতে পারবে। মেকলে মনে করেন 'ইউরোপের যে কোনো একটি ভাল গ্রন্থাগারের আলমারির একটি মাত্র তাকে যে সাহিত্য সম্পদ রয়েছে তা সমস্ত ভারত ও আরব দেশের সাহিত্য ভাণ্ডারের সমান (A single shelf of a good European library is worth the whole native literature of India and Arabia). কাজেই মেকলের সিদ্ধান্ত হল, ইংরেজিকেই শিক্ষার একমাত্র মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা উচিৎ। তাই তিনি চেয়েছিলেন এমন একটি শিক্ষিত সম্প্রদায় সৃষ্টি করতে যা রক্ত ও বর্ণের দিক থেকে ভারতীয় হলেও রুচি, মতাদর্শ, নীতি ও বুদ্ধির দিক থেকে হবে খাঁটি ইংরেজ।

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের জন্য অনেকে মেকলেকে নতুন যুগের 'আলোক বর্তিকাবাহী' বলে অভিনন্দিত করলেও এটি নেহাৎই অতিশয়োক্তি। কারণ তিনি ভারতে আসার অনেক আগে থেকেই এদেশে পাশ্চাত্যে যা কিছু ভাল তার গ্রহণের দাবি উঠেছিল। রাম মোহনও ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের দাবী করেছিলেন। তাছাড়া খ্রিস্টান মিশনারিরাও ভারতে ইংরেজি শিক্ষার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেই রেখেছিল। আবার জনসাধারণও সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও সরকারি চাকুরির লোভে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণে বিশেষ আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। মেকলে কেবল তার বীজটি বপন করেছিলেন। লর্ড বেন্টিঙ্ক শুরু থেকেই ভারতে ইংরেজি শিক্ষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। তাই মেকলের সুপারিশ সমূহ তিনি পুরোপুরি গ্রহণ করে ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের ৭ মার্চ ভারতবর্ষে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষাদানের সরকারি নীতির কথা ঘোষণা করেন।

উডের ডেসপ্যাচ (১৮৫৪)

১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের মেকলের মন্তব্য ও বেন্টিংয়ের শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাবের মধ্যে একটা সুনির্দিষ্ট শিক্ষানীতির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এরপর থেকে কুড়ি বছর শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক বিতর্ক এবং পরীক্ষা নীরিক্ষা চলেছে। সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষানীতির মধ্যেও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়েছে। চুঁইয়ে নামা নীতির (Downward Filtration Theory) ব্যর্থতা ও মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দেশের শিক্ষাবিদ্গন অবহিত হয়েছেন। জনশিক্ষার গুরুত্ব সরকার দিন দিন উপলব্ধি করতে পেরেছেন। এই পটভূমিকার ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানীর সনদ নবীকরণের সময় আসে। এই উপলক্ষ্যে দেশের শিক্ষার ব্যবস্থার সামগ্রিক পর্যালোচনা হয়। বিভিন্ন নীতির পরিবর্তে সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট কেন্দ্রীয় নীতি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়। কোম্পানি কর্তৃপক্ষ বুঝতে পেরেছিলেন, শিক্ষার মতো একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পুরোপুরি বেসরকারি উদ্যোগে ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়। শিক্ষানীতি ও বিদ্যালয়গুলোর নিয়ন্ত্রণে সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত। হাউস অব কমন্সের একটি নির্বাচিত কমিটির সামনে ডা: ডাফ্ স্যার চার্লস ট্রেভেলিয়ন, মি: উইলসন তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করেন। এতদিন কর্তৃপক্ষের মনে ভারতে শিক্ষাবিস্তার সম্পর্কে একটা সংশয়ের ভাব ছিল। তাঁরা সবাই একসুরে বলেন— ভারতে শিক্ষাবিস্তার হলে সরকারের আশঙ্কার কোনো কারণ নেই, বরং শিক্ষিত সম্প্রদায়ই ইংরেজ রাজত্ব স্থায়িত্বের সহায়ক হবে। এই মতামতের উপর ভিত্তি করে বোর্ড অব কন্ট্রোলের সভাপতি স্যার চার্লস উডের নির্দেশে এক মূল্যবান শিক্ষা দলিল রচিত হয়। উডের নির্দেশে রচিত হয়েছিল বলে একে 'উডের ডেস্প্যাচ' বলা হয়। উডের ডেস্প্যাচ ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয়ে প্রকাশিত হয়।

শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্য : —

এই দলিলের মুখবন্ধে কোম্পানি কি উদ্দেশে এদেশে শিক্ষা বিস্তারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে তার উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে —

ক) এ দেশবাসীর মধ্যে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান এর প্রসার করাই হবে এদেশের শিক্ষার উদ্দেশ্য। এই পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান হবে ভারতবাসীর কাছে আশীর্বাদস্বরূপ।

খ) পাশ্চাত্য শিক্ষা শুধু উচ্চ পর্যায়ের বুদ্ধি বিকাশের সহায়ক হবে তা নয়, এই শিক্ষা ভারতবাসীর নৈতিক চরিত্র গঠনের সহায়কও হবে।

গ) এই শিক্ষা কোম্পানিকে বিশ্বস্ত ও দক্ষ ভারতীয় কর্মচারি সরবরাহ করবে।

ঘ) এই শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে ইউরোপীয় ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে ভারতীয়দের অবহিত করা এবং ইংল্যান্ডের কল কারখানা সমূহের জন্য প্রয়োজনীয় ভারতীয় কাঁচামালের সরবরাহ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়াও ব্রিটেনে উৎপন্ন পণ্যের যাতে ভারতের বাজারে অফুরন্ত চাহিদার সৃষ্টি হয় সেই ব্যবস্থা করা।

উডের ডেসপ্যাচের সুপারিশসমূহ :

উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলোর বাস্তবায়নের জন্য দলিলে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব লিপিবদ্ধ করা হয়। সেগুলো হলো —

১) শিক্ষা বিভাগ স্থাপন : উডের দলিলে বলা হয় ভারতবর্ষের প্রতিটি প্রদেশের শিক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব, শিক্ষায় আগ্রহী কয়েকজন মনোনীত সদস্যের দ্বারা গঠিত 'বোর্ড অব এডুকেশন' অথবা 'কাউন্সিল অব এডুকেশন' থেকে তুলে পৃথক শিক্ষাবিভাগের উপর ন্যস্ত করা। এই বিভাগের নাম হবে "Department of Public Instruction" বা শিক্ষা বিভাগ। এই শিক্ষা বিভাগ পরিচালনার মূল দায়িত্বে থাকবেন একজন অধিকর্তা। যার উপাধি হবে Director of Public Instruction বা সংক্ষেপে D.P.I.। এর অধীনে একটি সরকারি পরিদর্শন বিভাগ থাকবে। এই পরিদর্শন বিভাগ বিদ্যালয় পরিদর্শন করে শিক্ষা সংক্রান্ত রিপোর্ট সরকারের কাছে পেশ করবে।

২) বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা : দলিলের দ্বিতীয় সুপারিশে বলা হল দেশের তিনটি অধিক জনবহুল শহর অর্থাৎ কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবে। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন একজন আচার্য, একজন উপাচার্য এবং কয়েকজন সরকার মনোনীত সদস্যের দ্বারা গঠিত সিনেট। পাঠক্রম ও শিক্ষার মান নির্ধারণ, পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষাগত যোগ্যতার পরিমাপ এবং তদঅনুযায়ী সার্টিফিকেট প্রদানই হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কাজ।

৩) বিভিন্ন পর্যায়ে বিদ্যালয় স্থাপন ও সমন্বয় সাধন : উডের দলিলের তৃতীয় সুপারিশ ছিল দেশব্যাপী স্তর বিন্যস্ত শিক্ষা কাঠামো গড়ে তোলা। এই স্তর বিন্যস্ত শিক্ষা ব্যবস্থার সর্বোচ্চ স্তরে থাকবে বিশ্ববিদ্যালয় ও তার অধীনস্থ কলেজ সমূহ, তার নিচে থাকবে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার প্রতিষ্ঠান এবং সর্বনিম্নস্তরে থাকবে প্রাথমিক ও দেশজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো।

৪) চুঁইয়ে পড়া নীতির সমালোচনা ও জনশিক্ষার ব্যবস্থা : উডের দলিলে চুঁইয়ে পড়া নীতির সমালোচনা করা হয় এবং সরকার যাতে আরো অধিক পরিমাণে জনশিক্ষার প্রসারের দায়িত্ব গ্রহণ করে, তার উদ্যোগ নিতে বলা হয়। উপরের স্তরগুলোতে শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজি হলেও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষাকে গ্রহণ করার কথা বলা হয়।

৫) গ্রান্ট-ইন-এইড প্রথা প্রবর্তন : ডেসপ্যাচে বলা হয় সরকারি অনুদান পেলে বেসরকারি সংস্থাগুলো নতুন নতুন বিদ্যালয় স্থাপনে উৎসাহী হবে এবং তাতে করে শিক্ষার দ্রুত প্রসার ঘটবে। এই বিষয়ে উৎসাহ প্রদানের জন্য দলিলে গ্রান্ট-ইন-এইড বা 'অনুদান' প্রথা প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয়। তবে এই অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে কতকগুলো শর্ত বা বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। সেগুলো হল-

ক) বিদ্যালয়ে ধর্ম নিরপেক্ষতা বজায় রাখা। (খ) বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে সুব্যবস্থা (গ) বিদ্যালয় পরিদর্শকের নির্দেশাবলি মেনে চলা (ঘ) ছাত্রদের জন্য ন্যূনতম বেতন ধার্য করা।

৬) শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা : বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য ইংল্যান্ডে প্রবর্তিত শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থার অনুরূপ ব্যবস্থা ভারতে প্রবর্তনের কথা বলা হয়। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য পৃথক শিক্ষক শিক্ষণ বিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশও করা হয়। এই শিক্ষক শিক্ষণ বিদ্যালয় বা নর্মাল স্কুলগুলোতে ভরতি হওয়ার জন্য উৎসাহ প্রদানের জন্য শিক্ষণকালে বৃত্তিদানের ব্যবস্থার কথাও বলা হয়।

৭) বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা : উডের দলিলে এদেশে সাধারণ শিক্ষার প্রসারের পাশাপাশি বৃত্তি শিক্ষার

প্রবর্তনের সুপারিশও করা হয়। আর এই উদ্দেশ্যে চিকিৎসা, আইন ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সুপারিশ করা হয়।

৮) নারী শিক্ষা : এই দলিলে বলা হয় জনশিক্ষার প্রসার ঘটাতে গেলে নারী শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকাও দরকার। মধ্যযুগে পর্দাপ্রথা চালু থাকার ফলে নারী শিক্ষা অনেক পিছিয়ে রয়েছে। নারী শিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনে পৃথক নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়। দলিলে আরো বলা হয়েছিল, বালিকাদের চারিত্রিক মাধুর্য এবং ব্যক্তিত্বের বিশেষ দিকগুলো বিকাশের জন্য প্রয়োজনে পৃথক পাঠ্যক্রমের প্রবর্তন করা দরকার। বেসরকারি উদ্যোগে যাতে বেশি পরিমাণে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তার জন্য গ্রান্ট-ইন-প্রথার শর্তাবলিকে কিছুটা নমনীয় করার কথা বলা হয়।

৯) সংখ্যালঘুদের শিক্ষা : মুসলমান রাজশক্তিকে পরাস্ত করে ভারতে ব্রিটিস শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাই এদেশে মুসলমান সম্প্রদায়ের ইংরেজি বিদ্বেষ ছিল প্রবল। এই বিদ্বেষের কারণে মুসলমানরা ইংরেজি শিক্ষার থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছিল। এই অবস্থার উন্নতি ঘটানোর জন্য দলিলে মুসলমানদের জন্য পৃথক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার সুপারিশ করা হয়। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবেশকে বিনষ্ট করার জন্য সুপরিকল্পিতভাবে মুসলমানদের জন্য পৃথক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার সুপারিশ করা হয়।

মূল্যায়ন : ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসে উডের দলিল নি:সন্দেহে শিক্ষা প্রশাসন ও শিক্ষা সংগঠনের আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে প্রথম উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ রূপে গণ্য হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ ভারতে শিক্ষা সংক্রান্ত যে সমস্ত দলিল প্রকাশিত হয়েছে তারমধ্যে এটি যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। জেমস্ দলিলটিকে ভারতে ইংরেজি শিক্ষার ম্যাগনাকার্টা বলে অভিহিত করেছেন। (Magna charta of English Education in India) অবশ্য এই অভিমত সর্বাংশে সমর্থনযোগ্য না হলেও এর ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে কোনোভাবে অস্বীকার করা যায় না। কারণ—

- প্রথমত, এই দলিলেই সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে ইংরেজ সরকারের শিক্ষানীতি ঘোষণা করা হয়েছিল।
- দ্বিতীয়ত, এর মধ্য থেকেই আধুনিক ভারতীয় শিক্ষা কাঠামোটি গড়ে উঠেছিল অর্থাৎ, শিক্ষায় প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার স্তর বিন্যাস কার্যকর হয়েছিল।
- তৃতীয়ত, এই দলিল ভারতীয় শিক্ষা প্রশাসনের আধুনিক রূপটিকে গড়ে তুলেছিল।
- চতুর্থত, এই দলিলের প্রভাবে সর্ব প্রথম ভারতীয় শিক্ষা জগৎ থেকে মিশনারি একাধিপত্যের অবসান হয়েছিল এবং শিক্ষায় বেসরকারি ভারতীয় উদ্যোগের সৃষ্টি হয়েছিল।
- পঞ্চমত, এই দলিলের ফলেই শিক্ষাক্ষেত্রে Grant in Aid System বা বেসরকারি স্কুলগুলোকে সরকারি অনুদান প্রদানের নীতিটি জন্মলাভ করেছিল।
- ষষ্ঠত, এই দলিল ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার ধারণাটিকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

উপরে উল্লেখিত অবদানগুলোর জন্য উডের দলিল ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসে নি:সন্দেহে একটি ইতিবাচক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিল। যার সুদূর প্রসারী প্রভাব শুধু ইংরেজ শাসনকালেই নয় স্বাধীনোত্তর যুগের শিক্ষাকেও প্রভাবিত করতে দেখা যায়।

উপরোক্ত ইতিবাচক দিকগুলো থাকলেও এই দলিলের কতকগুলো সীমাবদ্ধতাও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সেগুলো হল-

- প্রথমত উডের দলিলের মতো একটি মূল্যবান দলিলে শিক্ষার লক্ষ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কোম্পানির যে বণিক সুলভ মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে তা অতি নিন্দনীয়। ভারতীয়দের পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের উপযুক্ত জ্ঞান সরবরাহ করে শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে একটি উন্নত জাতিরূপে গড়ে তোলার পরিবর্তে এই শিক্ষা পরিকল্পনার ভিত্তি ছিল ঔপনিবেশিক শোষণের মানসিকতা।

- দ্বিতীয়ত শিক্ষার দায়িত্ব না নিয়েও বিদ্যালয়গুলোকে সরকারি নিয়ন্ত্রণে রাখার একটি পরিকল্পনা নিয়ে অনুদান প্রথাকে ব্যবহার করা হয়েছে।

- তৃতীয়ত গ্রান্ট-ইন-এইড প্রথায় শর্ত আরোপ করে পরোক্ষভাবে মিশনারীদেরই সাহায্য করা হয়েছিল, দেশিয় বিদ্যালয়গুলোকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়ার জন্য। কারণ মিশনারিরাই এই ব্যবস্থায় বেশি উপকৃত হয়েছিল।

- চতুর্থত ডেসপ্যাচের নির্দেশ অনুযায়ী স্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে গঠিত হয়েছিল, ফলে ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি কোনো গুরুত্ব পায়নি।

- পঞ্চমত এই ডেসপ্যাচ স্বদেশ প্রেম অথবা স্বদেশ রক্ষার মনোভাব গঠনের পরিবর্তে ইংরেজ প্রীতি জাগিয়ে বিদেশি স্বার্থরক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিল।

উপরোক্ত সমালোচনা সত্বেও বলা যায় ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে এই দলিলের গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষার ব্যাপারে এর আগে পর্যন্ত কোন সুস্পষ্ট কেন্দ্রীয় নীতি ছিল না, উডের ডেসপ্যাচ সকল দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে ভারতীয় শিক্ষাকে একটি বলিষ্ঠ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছিল। কতকগুলো সুনির্দিষ্ট নীতি গ্রহণের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে একটি রাষ্ট্রীয় শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিল।

চতুর্থ একক হান্টার কমিশন (১৮৮২-৮৩)

১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের উডের 'ডেসপ্যাচ চুঁইয়ে পড়ার নীতিকে ভ্রান্ত বলে ঘোষণা করা হলেও সরকার এই নীতির মোহ ত্যাগ করতে পারেনি। উচ্চশিক্ষা বিস্তারের নেশায়, সরকার প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়টিকে পূর্বের মতো অবহেলা না করলেও, সামান্য যে অর্থ বরাদ্দ করছিল, তা দেশের জনশিক্ষা বিস্তারের পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক ছিল না। দেশের শিক্ষার জন্য যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হত, সেই তুলনায় প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রটি খুবই দুর্বল হয়ে পরেছিল। উডের ডেসপ্যাচ বেসরকারি প্রচেস্টাকে উৎসাহদানের কথা বলা হলেও কার্যক্ষেত্রে মিশনারিদের প্রচেস্টা বাধাপ্রাপ্ত হয়। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অনেকগুলোই সরকারি সাহায্য থেকে বঞ্চিত ছিল। এরকম পরিস্থিতিতে ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে সরকারি নির্দেশ শিক্ষাক্ষেত্রে কতটা কার্যকর হয়েছে তা খতিয়ে দেখার প্রয়োজন অনুভূত হয়।

প্রথম ভারতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন : ভারতীয় তৎকালীন বড়োলাট লর্ড রিপন ১৮৮২ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি তাঁর এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সভ্য উইলিয়াম হান্টারের সভাপতিত্বে প্রথম ভারতীয় শিক্ষা কমিশন নিয়োগ করেন। কমিশনের মোট কুড়িজন সদস্যের মধ্যে অনেকেই ছিলেন ভারতীয়। ভারতীয়দের মধ্যে অন্যতম সদস্যরা হলেন— আনন্দমোহন বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, কে টি তেলাং, মহারাজ যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর প্রমুখ। কমিশনের সভাপতি উইলিয়াম হান্টারের নাম অনুসারে এই কমিশন 'হান্টার কমিশন' নামে পরিচিত লাভ করে।

কমিশনের উপর প্রদত্ত দায়িত্ব : কমিশনকে ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের ডেসপ্যাচের সুপারিশ কতটা কার্যকর করা হয় সে সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ খতিয়ে দেখার নির্দেশ দানের পাশাপাশি দেশের প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, নারী শিক্ষা, মুসলিম শিক্ষা ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের শিক্ষা এবং উন্নয়ন সম্পর্কে পর্যালোচনা করে বিভিন্ন সুপারিশ করা ছাড়াও জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর স্থান নিরূপন, বেসরকারি প্রচেস্টার প্রতি সরকারি নীতি সম্পর্কে বিচার বিবেচনা, ধর্মশিক্ষা সম্পর্কে সরকারি দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি বিষয়ে অনুসন্ধান করে মতামত ব্যক্ত করার কথা বলা হয়। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে কমিশনকে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে বিশেষভাবে বিবেচনা করতে বলা হয়।

প্রদত্ত দায়িত্বানুসারে কমিশন প্রথমে কয়েক সপ্তাহ ধরে কলকাতায় পরে প্রায় দীর্ঘ আটমাস ধরে ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে কাজ করার পর ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে ২২২টি প্রস্তাব সম্বলিত ৬০০ পৃষ্ঠার এক বিরাট রিপোর্ট সরকারের কাছে পেশ করেন। এতে দেশের প্রাথমিক ও দেশজ শিক্ষার বিষয়টি খুবই গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা হয়। কমিশন তার সুপারিশে যে বিভিন্ন দিকগুলোর উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন তা হল—

দেশজ শিক্ষা : কমিশনের মতে যদিও প্রচলিত দেশীয় লোকেদের স্থাপিত বিদ্যালয়গুলোর অনেক ত্রুটি রয়েছে, তথাপি এর জীবনী শক্তি ও জনপ্রিয়তার কারণে এই শিক্ষাধারাকে উৎসাহিত করা দরকার। এই

উদ্দেশ্যে পাঠশালাগুলোকে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসাবে বিবেচনা করার কথা বলা হয়। কমিশন দেশজ বিদ্যালয়গুলোর উন্নয়নের জন্য যে সকল সুপারিশ করেছিলেন তা হল—

- প্রথমত, জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে পাঠশালার দ্বার সকল শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত রাখতে হবে।
- দ্বিতীয়ত, এই বিদ্যালয়গুলোতে অবশ্যই ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাদান করতে হবে।
- তৃতীয়ত, এই সকল বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, উন্নয়ন ও পরিদর্শনের দায়িত্ব মিউনিসিপ্যাল বোর্ড ও লোকাল বোর্ডের উপর অর্পন করতে হবে। তবে সরকারি শিক্ষা বিভাগেও এই সকল বিদ্যালয়গুলোর একটি তালিকা থাকবে।
- চতুর্থত, দেশজ বিদ্যালয়গুলোতে যাতে উন্নত পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করা হয় তার জন্য শিক্ষকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- পঞ্চমত, দেশজ বিদ্যালয়গুলোর ক্ষেত্রে 'ফলাফলের ভিত্তিতে সাহায্যদান' নীতিকে অনুসরণ করার কথা বলা হয়।
- ষষ্ঠত, কমিশন পরীক্ষার মান, পরিদর্শন ব্যবস্থা, সাহায্যের নিয়মকানুন প্রভৃতি স্থানীয় অবস্থা বিবেচনা করে স্থির করার সুপারিশ করেন।

প্রাথমিক শিক্ষা : কমিশন এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে দেশীয় বিদ্যালয়গুলোর সরকারের প্রতি সর্বাধিক ব্যবস্থা অবলম্বন করার পরও তা দেশীয় শিক্ষার সকল প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হবে না। কিন্তু দেশের নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য সর্বশ্রেণির লোকের শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। তাই প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য কমিশন অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেন। সেইগুলো হল—

১) **স্বয়ং সম্পূর্ণ স্তর :** কমিশন তার সুপারিশ এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে প্রাথমিক শিক্ষাকে শিক্ষার্থীর জীবনের প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের, নিজ ভাষার জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের সম্পূর্ণ শিক্ষা হিসাবেই বিবেচনা করতে হবে।

২) **প্রশাসন ও পরিচালনা :** ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের ইংল্যান্ডের শিক্ষানীতির অনুকরণে এই দেশের প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ, সংগঠন ও পরিচালনার দায়িত্ব জেলাবোর্ড বা মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের হাতে ছেড়ে দিতে হবে। এর জন্য স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান সকল সদস্য বা কয়েকজন সদস্য নিয়ে স্কুল বোর্ড গঠন করতে পারে। এই স্কুল বোর্ড বা স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান নিজে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কমিশন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর দায়িত্বও ধীরে ধীরে এই স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের উপর অর্পণ করার কথা বলেন। বিদ্যালয় শুরু ও শেষ হওয়ার কোন সাধারণ নিয়ম থাকবে না। স্থানীয় প্রয়োজন অনুসারে তা স্থির হবে। প্রয়োজনবোধে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।

৩) **শিক্ষার মাধ্যম :** সকল শ্রেণির মানুষ যাতে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে তার জন্য শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা।

৪) **অর্থ ব্যবস্থা :** প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করার জন্য স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলো একটি পৃথক তহবিল গঠন করবে। শিক্ষার জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের বেশির ভাগ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রাথমিক শিক্ষার জন্যই ব্যয় করতে হবে। এছাড়া প্রাদেশিক সরকার প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে মোট ব্যয়ের এক তৃতীয়াংশ

বহন করবে। কমিশন আরো বলেন প্রয়োজনে প্রাদেশিক সরকার প্রাথমিক শিক্ষার জন্য শিক্ষা কর বা সেস আদায় করতে পারবে।

৫) পাঠ্যক্রম : পাঠ্যক্রম হবে জীবন কেন্দ্রিক এবং স্থানীয় প্রয়োজন ভিত্তিক। গ্রামীণ বিদ্যালয়গুলোর পাঠ্যসূচিতে দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাবার মতো বিষয়গুলো রাখতে হবে। তাই পাঠ্যক্রমে থাকবে দেশীয় গণিত, হিসাব শিক্ষা, পরিমিতি, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, কৃষি, শিল্প, শারীর শিক্ষা ইত্যাদি।

৬) পাঠ্যপুস্তক : পাঠ্যপুস্তক রচনা ও পাঠ্যসূচি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের স্বাধীন মতামতকে প্রাধান্য দিতে হবে।

৭) বেতন ব্যবস্থা : প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রদের কাছ থেকে বেতন আদায়ের ব্যবস্থা থাকবে। তবে দরিদ্র ছাত্রছাত্রীগণ যাতে অর্থের অভাবে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয় এজন্য বিনা বেতনে পড়াশোনা করারও সুযোগ থাকবে। মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য স্কলারশিপের ব্যবস্থা রাখারও সুপারিশ করা হয়।

৮) পরিদর্শন ব্যবস্থা : বিদ্যালয়ের পরিদর্শনের ব্যবস্থা কার্যকর করারও সুপারিশ করা হয়। পরিদর্শকগণ বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা রক্ষা ও ছাত্রদের চরিত্র গঠনের দিকে দৃষ্টি রাখবেন। পরিদর্শকগণ নিজেরাই পরীক্ষা গ্রহণ করবেন। দেশীয় শিক্ষারীতির দিকে দৃষ্টি রেখেই পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

৯) আর্থিক অনুদান : আর্থিক অনুদানের ক্ষেত্রে কমিশন সুপারিশ করেন যে বিদ্যালয়গুলোর জন্য ফলাফলের ভিত্তিতে সাহায্য দান নীতি অনুসরণ করতে হবে।

১০) শিক্ষক-শিক্ষণ : শিক্ষাদানের কাজটিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য শিক্ষকদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষণের ব্যবস্থা করার সুপারিশ করেন। প্রদেশের প্রতিটি বিভাগে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য নর্মাল স্কুল স্থাপনের সুপারিশ করেন।

এছাড়াও কমিশন সুপারিশ করেন যে স্কুল বোর্ডগুলোর উপর শিক্ষক নিয়োগ এবং তাঁদের বেতন নির্ধারণের ক্ষমতা থাকবে। তবে তারা সরকারের কাছে বিদ্যালয়ের বার্ষিক বিবরণী ও হিসাবসংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য পেশ করতে বাধ্য থাকবে।

মাধ্যমিক শিক্ষা : *মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে কমিশনের উল্লেখযোগ্য সুপারিশগুলো হল —*

১) মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিচালনায় সরকার কোনো সক্রিয় ভূমিকা নেবেন না।

২) মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্র থেকে সরকারি নিয়ন্ত্রণ ক্রমশ প্রত্যাহার করে নিতে হবে। আর্থিক অনুদানের সাহায্যে সুদক্ষ বেসরকারি উদ্যোগকে মাধ্যমিক শিক্ষা বিস্তারে উৎসাহি করে তুলতে হবে।

৩) কমিশনের মতে শিক্ষাক্ষেত্র থেকে সরকার একেবারে সরে এলে শিক্ষার মান নিম্নমুখী হতে পারে, তাই সরকার প্রতিটি জেলায় একটি করে আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করবে।

৪) বেসরকারি প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করার জন্য স্থানীয় পরিচালন সমিতিকে বিদ্যালয়ের বেতন হার নির্ধারণের স্বাধীনতা দেওয়া হবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে তা যেন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বেতনের তুলনায় কম হয়।

৫) এতদিন পর্যন্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রস্তুতি হিসাবে শুধু একমুখী, সংকীর্ণ ও বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন বিষয় পঠন পাঠনের ব্যবস্থা ছিল। কমিশন বৃত্তিমূলক বিষয়গুলোকে

পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশকরেন। সেই অনুযায়ী শিক্ষার্থী অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সাধারণ পাঠ্যক্রম অনুসরণ করবে। এরপর পাঠ্যক্রমকে দুটি সমান্তরাল ভাগে বিভক্ত করা হবে। এর একটি হল A কোর্স যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশের পরীক্ষার বিষয়গুলো থাকবে। অন্যটি হল B কোর্স। এতে থাকতে সাহিত্য বর্জিত বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষার জন্য ব্যবহারিক পাঠ্যবিষয়। অষ্টম শ্রেণি পাশ করার পর শিক্ষার্থীরা তাদের সামর্থ ও যোগ্যতা অনুযায়ী A কোর্স অথবা B কোর্স বেছে নিতে পারবে।

উচ্চশিক্ষা : কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার বিষয়টি কমিশনের এক্তিয়ারভুক্ত ছিলনা। তবুও কমিশন উচ্চ শিক্ষা সম্পর্কে কয়েকটি সুপারিশ করেছিলেন। সেগুলো হল—

১) কলেজীয় শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করার কথা বলা হয়।

২) উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে বেসরকারি প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করার জন্য অনুদান নীতির সরলীকরণ করতে হবে।

৩) কলেজগুলোকে আর্থিক সাহায্য প্রদানের ক্ষেত্রে অধ্যাপক সংখ্যা, পরিচালনার ব্যয়, কলেজের শিক্ষার মান, স্থানীয় উপযোগিতা, গ্রন্থাগার, ছাত্রসংখ্যা বিচার করা হবে।

৪) দরিদ্র কিন্তু মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য স্কলারশিপের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫) বহুমুখী পাঠ্যক্রম প্রবর্তনের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

শিক্ষক-শিক্ষণ : শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য কমিশন শিক্ষক-শিক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এজন্য প্রত্যেক মহকুমায় একটি করে নর্মাল স্কুল স্থাপনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। নর্মাল স্কুলে অন্যদের অপেক্ষা গ্র্যাজুয়েট শিক্ষকদের শিক্ষাকাল হবে স্বল্পতর। শিক্ষকদের শিক্ষানীতি জানার প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে শিক্ষানীতির ব্যবহারিক প্রয়োগ শেখাবার নির্দেশ দেওয়া হয়।

বিশেষ শিক্ষা : কমিশন উল্লেখ করেন, আমাদের দেশের মুসলমান সম্প্রদায় শিক্ষার ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে। তাই মুসলমান সম্প্রদায়কে উৎসাহিত করতে বিশেষ সুবিধা দেবার সুপারিশ করা হয়। সুপারিশে বলা হয় যে, সরকার থেকে মুসলিমদের বিদ্যালয়কে সাহায্য, ছাত্রদের বৃত্তি ও বিনা বেতনে পড়াশোনার সুযোগ দিতে হবে। মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য অধিক পরিমাণে মক্তব ও মাদ্রাসা স্থাপন ও মুসলমান পরিদর্শক নিয়োগের সুপারিশ করা হয়।

নারী শিক্ষা : হান্টার কমিশন দেশে নারী শিক্ষা প্রসারের জন্য সুপারিশ করেন। নারী শিক্ষার প্রসারের জন্য বেসরকারি বালিকা বিদ্যালয়গুলোকে উদারভাবে আর্থিক সাহায্য দানের সুপারিশ করা হয়। শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণের জন্য যথেষ্ট নর্মাল স্কুল স্থাপন এবং পরিদর্শক নিয়োগের সুপারিশ করা হয়। মেয়েদের পাঠ্যক্রমকে ছেলেদের থেকে কিছু সহজতর করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। মেয়েদের পাঠ্যক্রমকে ব্যবহারিক জীবনের উপযোগী করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

উত্তরকালীন প্রভাব : প্রথম ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের সুপারিশগুলোকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে কমিশনের সুপারিশে প্রকৃতপক্ষে নতুন কোনো শিক্ষানীতির ঘোষণা করা হয়নি। উডের দলিলের শিক্ষানীতিকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই মূলত বিভিন্ন সুপারিশগুলো করা হয়েছিল। তবে একথা ঠিক যে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে এই কমিশন সর্বপ্রথম একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিল। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত সরকার দেশের প্রাথমিক শিক্ষা সম্পকে উদাসিন ছিল এবং প্রাথমিক শিক্ষার প্রশাসন সম্পর্কেও

সুস্পষ্ট চিন্তাভাবনার অভাব ছিল। যারফলে বেসরকারি প্রচেষ্টার বিদ্যালয়ের সংখ্যা এই সময় মাত্রাতিরিক্তভাবে বেড়ে গিয়েছিল। প্রাথমিক শিক্ষায় স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের অংশ গ্রহণ করার ঐতিহ্যটিও এই কমিশন থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল। কমিশনের সুপারিশের ফলেই শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমে A কোর্স ও B কোর্স কার্যকরী হয। মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ধর্ম নিরপেক্ষতার নীতি গৃহীত হওয়ার ফলে মিশনারীগণ এই শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে ধীরে ধীরে সরে দাঁড়ায়। অনুন্নত অঞ্চলে মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়।

সমালোচনা : হান্টার কমিশন শিক্ষার উন্নয়নে অনেক ইতিবাচক সুপারিশ করলেও তার অনেক সীমাবদ্ধতাও পরিলক্ষিত হয়।

- প্রথমত প্রাথমিক শিক্ষাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিলেও তাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার কথা বলা হয়নি।
- দ্বিতীয়ত স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব অর্পন করার সিদ্ধান্তটি খুব একটা ভালো ফলদান করতে পারেনি। কারণ উপযুক্ত শক্তি ও অভিজ্ঞতার অভাবে এই প্রতিষ্ঠানগুলো সবসময় পরিকল্পনামতো কাজে অগ্রসর হতে পারেনি।
- তৃতীয়ত ফলাফলের উপর সাহায্যদানের নির্দেশ শিক্ষার মানকে উন্নত করার পরিবর্তে পরীক্ষাকেন্দ্রিক করে তোলার পাশাপাশি শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে নানা অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল।
- চতুর্থত কমিশনের সুপারিশে দ্বি-মুখী পাঠ্যক্রমের কথা বলা হলেও কার্যত পূর্ব ধারাই বজায় রইল। B কোর্স প্রবর্তনের ক্ষেত্রে সরকারি উদাসীনতাই পরিলক্ষিত হয়।
- পঞ্চমত সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বিশেষ সুযোগ সুবিধা দানের সুপারিশ শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতা সুস্পষ্ট করে তুলেছিল।

তা সত্বেও একথা নি:সন্দেহে বলা যায় জাতীয় শিক্ষার দায়িত্ব ভারতীয়রাই গ্রহণ করবে কমিশনের এই স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে দেশীয় শিক্ষা প্রসারের প্রচেষ্টা বিশেষভাবে উৎসাহিত হয়েছিল। যা পরবর্তীকালে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের ভিত্তি রচনার সহায়ক হয়েছিল। সর্বোপরি প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে কমিশনের সুচিন্তিত সুপারিশগুলো আমাদের বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি রচনা করেছিল।

পঞ্চম একক স্যাডলার কমিশন (১৯১৭-১৯), ওয়ার্ধা পরিকল্পনা (১৯৩৭)

কমিশন গঠন : লর্ড কার্জন ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ করেন। এই আইনে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার দেওয়া হলেও সামগ্রিকভাবে তা শিক্ষিত ভারতীয়দের মনে সন্তুষ্টি আনতে ব্যর্থ হয়। শিক্ষণধর্মী বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার প্রচেষ্টাও সরকারের দিক থেকে ঐ সময় দেখা যায় নি। তাছাড়া নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তাও গভীরভাবে অনুভূত হচ্ছিল। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের ভারত সরকারের শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাবেও বলা হয় সমগ্র ভারতে পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় ও ১৮৫টি কলেজ দেশের উচ্চ শিক্ষা প্রসারের পক্ষে যথেষ্ট নয়। যুগের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নতুন নতুন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থাপনের প্রয়োজন অনুভূত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে পরীক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষণ এই দুই ধরনের কাজের দায়িত্ব নেওয়ার প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হয়। এছাড়াও এই শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাবে আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ ছিল। এই অবস্থায় সরকার ঠিক করেন, বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ না নিয়ে ঐ প্রস্তাবগুলো কার্যকর করা যাবে না। অন্যদিকে যে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে রয়েল কমিশনের সুপারিশ অনুসারে তার সংস্কার সাধন করা হয়। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে লর্ড হলডেনের নেতৃত্বে ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সংস্কারের জন্য একটি কমিশন গঠনের প্রস্তাব করা হয়। লর্ড হলডেন ভারতে আসতে রাজী না হওয়ায় ও ইউরোপে মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ায় শিক্ষা সংস্কারের সব চেষ্টা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে মহাযুদ্ধের অবস্থা অনেকটা অনুকূলে আসায়, শিক্ষা সংস্কারের দিকে সরকারের দৃষ্টি দেওয়ার সুযোগ ঘটলো। এই বছরই (১৯১৭) ভারত সরকার ইংল্যান্ডের লিড্স বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার মাইকেল স্যাডলারকে সভাপতি করে 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন গঠন করেন। কমিশনের সভাপতির নাম অনুসারে এই কমিশন 'স্যাডলার কমিশন' নামেই বেশি পরিচিত। কমিশনের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, স্যার জিয়াউদ্দীন আহমদ, ডা: গ্রেগরী, স্যার ফিলিপ হার্টগ, অধ্যাপক রামজে মোর প্রমুখ। এই কমিশন স্যার আশুতোষের মতামতের দ্বারা বহুল পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছিল।

কমিশনের বিচার্য বিষয় : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন সমস্যা এবং তার ভবিষ্যৎ উন্নতির অর্থাৎ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষা সংস্কারের দিকেও নজর দেন। কমিশনের সদস্যরা ১৭ মাস ধরে সারা ভারত ঘুরে নানারূপ প্রতিষ্ঠান দেখে, শিক্ষাবিদদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে তাঁদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিক্ষা সংস্কারের পরিকল্পনা করেন। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে স্যাডলার কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই বলে প্রাথমিক শিক্ষা ছাড়া আর সবস্তরের শিক্ষার বিস্তৃত আলোচনা সুদীর্ঘ এই রিপোর্ট স্থান পেয়েছে।

স্যাডলার কমিশনের পর্যবেক্ষন ও সুপারিশ সমূহ

কমিশনের রিপোর্টে মাধ্যমিক শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষার ত্রুটি বা সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হয় এবং এইসব ত্রুটি নিরসনের বা সমস্যা সমাধানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করা হয়। এই বিষয়ে নিচে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

মাধ্যমিক শিক্ষার ত্রুটি : মাধ্যমিক শিক্ষার ত্রুটি বিষয়ে স্যাডলার কমিশনের বক্তব্য হল— (ক) সাধারণভাবে মাধ্যমিক শিক্ষার মান নিম্নমুখী। (খ) মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর উপর বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারি শিক্ষাবিভাগের দ্বৈত নিয়ন্ত্রণের ফলে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না। (গ) দারিদ্রতার কারণে বহু মেধাবী শিক্ষার্থী শিক্ষাগ্রহণে বঞ্চিত হয়। ঘ) অর্থনৈতিক দূরাবস্থার কারণে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো সঠিকভাবে শিক্ষা সম্প্রসারণের কাজ করতে পারে না। (ঙ) মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক শিক্ষিকাদের বেতন কাঠামো ভাল না হওয়ায় মেধাবী ব্যক্তিরা এই পেশায় আসতে চায় না। চ) মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা না থাকায় শিক্ষার মান ক্রমশ নিম্নমুখী হচ্ছে।

মাধ্যমিক শিক্ষা সংক্রান্ত সুপারিশ সমূহ : স্যাডলার কমিশনের রিপোর্টে মাধ্যমিক শিক্ষার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা হয়। কমিশন এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, যেহেতু কলেজের প্রথম দুই বছরের পাঠ মাধ্যমিক শিক্ষারই অনুরূপ, তাই এই অংশটুকু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাদ দিয়ে মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে জুড়ে দিতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষা দুটি পর্যায়ে হবে। প্রথমটি দশম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠের স্তর বা ম্যাট্রিকুলেশন এবং দ্বিতীয়টি হবে দুবছরের ইন্টারমেডিয়েট স্তর। কলেজে প্রবেশের মাপকাঠি হবে ইন্টারমেডিয়েট পরীক্ষা। ইন্টারমেডিয়েট শ্রেণিতে শিক্ষাদানের দায়িত্ব ইন্টারমেডিয়েট কলেজগুলোর উপর ন্যস্ত থাকবে। মাধ্যমিক শিক্ষা ও ইন্টারমেডিয়েট শিক্ষার জন্য পৃথক পৃথক বোর্ড গঠন করে এই বোর্ডের হাতে এই স্তরের শিক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব তুলে দিতে হবে। সরকার, বিশ্ববিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ইন্টারমেডিয়েট কলেজ ও সাধারণের প্রতিনিধি নিয়ে বোর্ড গঠিত হবে। বোর্ডের অধিকাংশ সদস্যই হবেন বেসরকারি ইন্টারমেডিয়েট স্তরে কলা, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, কারিগরি, শিল্প ও বাণিজ্য শিক্ষারও আয়োজন থাকবে। এই ইন্টারমেডিয়েট কলেজ স্বাধীনভাবে পরিচালিত হবে অথবা কোন উচ্চবিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবে। মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ইন্টারমেডিয়েট কলেজগুলোতে ইংরেজি ও গণিত ছাড়া অন্য সব বিষয়ের পঠনপাঠন মাতৃভাষার মাধ্যমে পরিচালিত হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার ত্রুটি :

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার ত্রুটি বিষয়ে স্যাডলার কমিশনের বক্তব্য হল— (ক) বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সবসময় কলেজগুলোকে অনুমোদন দেওয়া হয় সহ পরীক্ষা পরিচালনা ও অন্যান্য প্রশাসনিক কাজে ব্যস্ত থাকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পঠন পাঠনের ক্ষেত্রে এতটা মনোযোগী হতে পারে না আর সেই কারণে উচ্চ শিক্ষার মান নিম্নমুখী। (খ) কলেজগুলোকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীদের বেতনের উপর নির্ভর করতে হয়। ফলে কলেজগুলো আর্থিক দূরাবস্থায় ভোগে। (গ) বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি কোর্সে মূলত তত্ত্ব নির্ভর ও সাহিত্যধর্মী বিষয়ে পাঠদান করাহয়। কারিগরি ও বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিশ্ববিদ্যালয় কেরানি তৈরির কারখানাতে পরিণত হয়। (ঘ) কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকদের বেতন অল্প হওয়ার এবং চাকুরির নিরাপত্তা না থাকায় মেধাবী ও যোগ্য ব্যক্তিরা এই পেশায়

আসতে চায় না। (৬) কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ছাত্র কল্যাণের দিকেও সঠিকভাবে নজর রাখে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিষয়ে কমিশনের সুপারিশ :

স্যাডলার কমিশন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার নানান ত্রুটি ও সমস্যা অনুসন্ধান করে তা দূর করার জন্য যেসব সুপারিশ করেন সেগুলো হল —

১) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে এমনভাবে সংস্কার করতে হবে যাতে এটি একটি প্রকৃত শিক্ষণধর্মী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। গ্রামীণ কলেজগুলোকে এমনভাবে উন্নত করতে হবে, যাতে এগুলো ক্রমে এক একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় রূপে গড়ে উঠতে পারে।

২) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর থেকে কাজের চাপ কমানোর জন্য ঢাকার একটি শিক্ষণধর্মী আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।

৩) ইন্টারমেডিয়েটের পর স্নাতক শ্রেণির পাঠ্যসূচি হবে তিন বছর ব্যাপী।

৪) স্নাতক স্তরে পাশ কোর্সের পাশাপাশি অনার্স কোর্স চালু করতে হবে।

৫) ইন্টারমেডিয়েট, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে 'এডুকেশন' বিষয়টি পঠনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬) শিক্ষাকে কেবল বক্তৃতা না করে টিউটোরিয়াল প্রভৃতির ব্যবস্থা করে ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ককে অন্তরঙ্গ করে তুলতে হবে এবং এতে পঠন পাঠনের উন্নত পরিবেশ তৈরি হবে।

৭) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে সরকারি নিয়ন্ত্রণমুক্ত করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতিতে অধ্যাপকবৃন্দের প্রতিনিধি বাড়ানোর কথা বলা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাজের জটিলতা হ্রাস করার জন্য সিনেট ও সিন্ডিকেটের পরিবর্তে কোর্ট এর এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল (ছোটো আয়তনের কার্যকরি সমিতি) গঠন করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সবসময়ের জন্য সবেতন উপাচার্য নিয়োগ করতে হবে।

৮) পাঠ্যক্রম নির্ধারণ, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ, ডিগ্রি বিতরণ, শিক্ষক নিয়োগ প্রভৃতি কাজের জন্য একাডেমিক কাউন্সিল, বিভিন্ন বিষয়ের ফ্যাকাল্টি ও বোর্ড অব স্টাডিজ গঠন করতে হবে।

৯) শিক্ষক-শিক্ষণের জন্য শিক্ষা বিভাগ স্থাপন করতে হবে। ছাত্র কল্যাণের জন্য একটি ছাত্র কল্যাণ পরিষদ স্থাপন করতে হবে। শরীর চর্চা ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য একজন শারীর শিক্ষা অধিকর্তা নিয়োগ করতে হবে।

১০) শিক্ষকদের বেতন কাঠামো ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বিষয়েও পরামর্শ দিয়েছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে গবেষণাকে উৎসাহদানের সুপারিশ করেছেন।

নারী শিক্ষা : স্যাডলার কমিশন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের শিক্ষার তদারকির জন্য একটি বিশেষ বোর্ড গঠনের নির্দেশ দেন। কমিশন প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ১৫/১৬ বছরের হিন্দু ও মুসলিম মেয়েদের জন্য 'পর্দা স্কুল' স্থাপনের সুপারিশ করেন। মেয়েদের শিক্ষার জন্য একটি বিশেষ বোর্ড ও বিশেষ ধরণের পাঠ্যক্রম গঠনের সুপারিশও করা হয়।

বৃত্তিমূলক শিক্ষা : বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য কমিশন ব্যবহারিক বিজ্ঞান ও কারিগরি বিজ্ঞান পাঠ্যক্রমে স্থান দেওয়ার সুপারিশ করেন।

মন্তব্য : স্যাডলার কমিশনের রিপোর্ট এক মূল্যবান দলিল। ইতিপূর্বে এরকমভাবে উল্লেখযোগ্য কোনো

শিক্ষা দলিল ভারতবর্ষে প্রকাশিত হয়নি। পরবর্তীকালের শিক্ষার ক্রমবিকাশের উপর এর প্রভাব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কমিশনের সুপারিশ অনুসারে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। আমাদের দেশে দ্বাদশ শ্রেণির বিদ্যালয় শিক্ষা, উচ্চ মাধ্যমিক কাউন্সিল, তিন বছরের ডিগ্রি কোর্স, স্নাতক স্তরে অনার্স কোর্সের প্রস্তাব, বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বশাসিত করা, একাডেমিক কাউন্সিল, বোর্ড অব স্টাডিস গঠন, কোর্ট এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল গঠন, শরীর শিক্ষা, ছাত্র কল্যাণ, বৃত্তি শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে কমিশনের অভিমত আধুনিককালের শিক্ষা সংস্কারের চেষ্টাকে প্রভাবিত করেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে রিপোর্টটি তৈরি হলেও এই কারণে মি. মেহিউ এই কমিশনের সুপারিশগুলোকে তথ্য ও পরামর্শের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার বলে বর্ণনা করেছেন।

নঈতালিম বা ওয়ার্ধা পরিকল্পনা - ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ

পটভূমি : ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইন কার্যকরি হবার ফলে ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতের সাতটি প্রদেশে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রাদেশিক সরকারগুলোকে প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন ও অবৈতনিক করার বিষয়টি কার্যকরি করার বিষয়টি ভাবতে হল। কিন্তু প্রাদেশিক সরকারগুলো যখন জটিল অর্থনৈতিক সমস্যার কারণে প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব নিতে পারছিল না, তখন মহাত্মা গান্ধি এগিয়ে এলেন এক নতুন জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনা নিয়ে। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে হরিজন পত্রিকায় গান্ধীজী শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর বৈপ্লবিক পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। এটিই পরবর্তীকালে নঈতালিম বা বুনিয়াদি শিক্ষা বা ওয়ার্ধা পরিকল্পনা বা সেবাগ্রাম পদ্ধতি নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

গান্ধিজির পরিকল্পনা : গান্ধিজি তাঁর প্রস্তাবিত শিক্ষা পরিকল্পনা সম্পর্কে বলেন — ১) প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতি কোনো দিক দিয়েই দেশের প্রয়োজন মেটাবার উপযোগি নয়। ইংরেজি উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম করার জন্য, দেশের কিছু সংখ্যক উচ্চ শিক্ষিত মানুষের সঙ্গে বিরাট সংখ্যক অশিক্ষিতের একটা বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে। এই অবস্থা জনগণের কাছে শিক্ষা প্রসারের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায় মানসিক দিক থেকে দেশের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলেছে। ২) দেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার বৃত্তি শিক্ষার অভাবে শিক্ষিত সম্প্রদায় কর্মবিমুখ ও শ্রম বিমুখ হয়ে পড়েছে। এর ফলে জাতীয় অর্থনীতি দুর্বল হয়ে পড়েছে। শিক্ষার্থীর শারীরিক বিকাশও ব্যাহত হচ্ছে। ৩) গান্ধিজি বলেন, প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যে অর্থ ব্যয় হচ্ছে তা অপচয় বা অপব্যয় ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ, অল্প সময়ের প্রচলিত শক্ষা ব্যবস্থায় শিশুরা যা শেখে কিছুদিন পরেই তা তারা ভুলে যায়। ফলে এই শিক্ষা জীবনে তাদের কোনো কাজেই আসে। না। ৪) বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় দেশের কর ভারের প্রধান অংশ যারা বহন করেন, তারা কোন রকম উপকৃতই হন না। তাদের ছেলেমেয়ের সবচেয়ে কম শিক্ষার সুযোগ পায়। এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য গান্ধিজি তাঁর প্রকাশিত প্রবন্ধে কতকগুলো প্রস্তাব রাখেন। সেগুলো হল— ক) শিক্ষাকে সত্যান্বেষণ ও আত্মোপলব্ধির পন্থা হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষাকে শিক্ষার্থীর জীবনের সঙ্গে অর্থপূর্ণ করে তুলতে হবে। খ) শিক্ষা বলতে গান্ধিজি ব্যক্তির অন্তর্নিহিত দৈহিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক সবরকম সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশকে বোঝান। তাই শিক্ষার লক্ষ্য হবে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন করা।

গ) গান্ধিজি বলেছেন ভাষা যেন শিক্ষার পথে অন্তরায় হয়ে না দাঁড়ায়। ইংরেজ শিক্ষার চাপ, দেশের সাধারণ শিক্ষার্থীদের শিক্ষা থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। তিনি মাতৃভাষা শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেন এবং মাতৃভাষাকে পাঠদানর মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করার সুপারিশ করেন। ঘ) তিনি মনে করতেন হস্তশিল্পের মাধ্যমে গ্রামের আর্থিক উন্নয়নের পাশাপাশি গ্রামজীবনে সুস্থ সম্পর্ক গড়ে উঠার পরিবেশ দেখা যাবে, শিক্ষার্থীদের কর্মের প্রতি আগ্রহ ও শ্রদ্ধা জন্মাবে। এছাড়াও সহযোগিতামূলক মনোভাব এবং দায়িত্ববোধ জাগ্রত হবে। ঙ) শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের জন্য যে শিক্ষা, তা যতটা সম্ভব একটি লাভজনক বৃত্তির মাধ্যমে দেওয়া হবে। শিক্ষার্থী নিজেই শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করতে পারে একই সঙ্গে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটবে। এককথায় শিক্ষাকে তিনি শিল্পকেন্দ্রিক ও স্বনির্ভর করার প্রস্তাব করেন।

শিক্ষা সম্মেলন — জাকির হোসেন কমিটি : 'হরিজন' পত্রিকায় গান্ধিজি শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়টি প্রকাশিত হবার দেশের শিক্ষাবিদ্‌গণ তাঁর প্রস্তাবগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেন। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে ওয়ার্ধার মহাত্মাগান্ধির সভাপতিত্বে এক সর্বভারতীয় শিক্ষা সম্মেলন আহ্বান করা হয়। এই সম্মেলনে গান্ধিজির শিক্ষা চিন্তাকে কার্যকরি রূপ দেওয়ার জন্য কতকগুলো প্রস্তাব করা হয়। এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে — ১) সমগ্র জাতির জন্য সাত বছরের অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হওয়া উচিত। ২) শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা। ৩) এই শিক্ষায় শিক্ষার্থীকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হাতের কাজ শেখানো উচিত। শিশুর পরিবেশের দিকে লক্ষ্য রেখে, কোন একটি শিল্পকে কেন্দ্ররূপে গ্রহণ করে, ঐ কেন্দ্রীয় শিল্পের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে অন্যান্য বিষয়গুলো পড়ানো উচিত।

এই সম্মেলনেই সিদ্ধান্ত করা হয় কয়েকজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদকে রেখে জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়ার অধ্যক্ষ ড: জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করা হবে এবং এই কমিটি সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় শিক্ষার একটি পাঠক্রম রচনা করবে। এই কমিটিই জাকির হোসেন কমিটি নামে পরিচিত। এই কমিটি সামগ্রিকভাবে পরিকল্পনাটির ব্যাখ্যা দেন এবং একই সঙ্গে একটি পাঠ্যক্রমও প্রস্তাব করেন। গান্ধিজির প্রস্তাব অনুযায়ী যে শিক্ষা পরিকল্পনার রূপরেখা পেশ করা হয়, তাকে বলা হয় বুনিয়াদি শিক্ষা। কমিটি রিপোর্টের শুরুতেই বুনিয়াদি শিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্য আলোচনা করেন। কমিটি উল্লেখ করেন— এই শিক্ষাকে 'বুনিয়াদী' বলার কারণ, এই শিক্ষাই হবে শিক্ষার্থীর ভবিষ্যত জীবন গঠনের ভিত্তিভূমি। এই বুনিয়াদ বা ভিত্তির উপর গড়ে উঠবে শিক্ষার্থীর পূর্ণবিকশিত জীবনের সকল ইমারত।

বুনিয়াদি শিক্ষার বৈশিষ্ট্য : জাকির হোসেন কমিটির জাতীয় নতুন শিক্ষা পরিকল্পনাটি পর্যালোচনা করলে তার যে বৈশিষ্ট্যগুলো ফুঁটে উঠে, সেগুলো হল—

১) বুনিয়াদি শিক্ষা ৭-১৪ বছরের ছেলেমেয়েদের জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা।

২) বুনিয়াদি শিক্ষার মাধ্যম হল মাতৃভাষা।

৩) শিক্ষা হবে শিল্পকেন্দ্রিক। একটি শিল্পকে কেন্দ্র করে অনুবন্ধ পদ্ধতিতে পাঠদান করা হবে।

৪) বুনিয়াদি শিক্ষা অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বনির্ভর। শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে যে শিল্প বস্তু উৎপাদন করবে, তা বিক্রি করে শিক্ষকদের বেতন ও শিক্ষার অন্যান্য ব্যয়ভার বহন করা হবে।

৫) বুনিয়াদি শিক্ষার শিক্ষার্থীর দৈহিক শ্রম বা কায়িক শ্রমের যথাযথ মর্যাদা দেওয়া হয়। এই শিক্ষায়

শিক্ষার্থীর শ্রমের প্রতি যথাযথ মর্যাদা দেওয়া হয়। শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীরা নিজেরা স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারে।

৬) বুনিয়াদি শিক্ষা শিক্ষার্থীর গ্রাম্যজীবন পরিবেশ ও গ্রামের শিল্প পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

৭) এই শিক্ষা শিক্ষার্থীদের নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ সম্পর্কে সচেতন করে তুলবে। এই শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের সমবায়ভিত্তিক সমাজসেবার মাধ্যম নাগরিকতার শিক্ষা দেওয়া হয়।

৮) জাকির হোসেন কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে, বুনিয়াদি শিক্ষা ব্যবস্থার সার্থক রূপায়নের জন্য উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের প্রয়োজন। আর এজন্য শিক্ষকদের ক্রমাগত প্রশিক্ষণদানের ব্যবস্থা প্রবর্তন ও এই পরিকল্পনার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।

৯) এই পরিকল্পনা একটি পরীক্ষা বর্জিত স্বয়ং সংশোধনমূলক শিক্ষা পরিকল্পনা।

বুনিয়াদি শিক্ষার পাঠ্যক্রম : সর্বভারতীয় শিক্ষা সম্মেলনে জাকির হোসেন কমিটিকে মূলত নতুন শিক্ষা পরিকল্পনার জন্য একটি পাঠ্যক্রম রচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে কমিটি যে পাঠক্রম প্রস্তাব করেছিলেন তা হল—

১) একটি মূল শিল্প — যে-কোনো একটি হাতের কাজ ঠিক করে নিয়ে, তার পরিপ্রেক্ষিতে অন্যান্য বিষয় শিক্ষা দানের ব্যবস্থা। এখানে যে শিল্প বা কাজের কথা বলা হয় তার মধ্যে রয়েছে — ক) সুতোকাটা ও কাপর বোনা (খ) কাঠের কাজ (গ) চামড়ার কাজ (ঘ) কৃষি (ঙ) ফল ও সব্জি চাষ (চ) শিক্ষাগত মূল্য আছে, স্থানীয় অবস্থা অনুযায়ী যে-কোনো একটি উৎপাদনমূলক কাজ।

২) মাতৃভাষা (৩) গণিত (৪) সমাজবিজ্ঞান— ভারতের ইতিহাস, ভূগোল, পৌরবিজ্ঞান, গ্রামীণ অর্থনীতি ইত্যাদি।

৫) সাধারণ বিজ্ঞান — প্রকৃতি পাঠ, জীববিদ্যা, শারীর বিদ্যা, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ইত্যাদি।

৬) চারু শিল্প — সঙ্গীত ও অঙ্কন।

৭) হিন্দুস্থানী ভাষা — উর্দু বা দেবনাগরী হরফে।

জাকির হোসেন কমিটির রিপোর্টটি গান্ধিজি পর্যালোচনা করেন এবং তার সন্তুষ্টি প্রকাশ করে বলেন, The Scheme is a revolution in the education of the village children” গান্ধিজি উপলব্ধি করেছিলেন ভারতবর্ষের লুপ্ত গ্রামীণ গৌরবকে ফিরিয়ে আনতে হলে দেশের জন্য এরকমই এক নতুন শিক্ষা পরিকল্পনা দরকার।

বুনিয়াদি শিক্ষা পরিকল্পনার সমালোচনা :

জাকির হোসেন কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হবার পর কিছু শিক্ষাবিদ এই পরিকল্পনার কিছু সমালোচনা করেন।

১) বুনিয়াদি শিক্ষা পরিকল্পনার সবচেয়ে অধিক সমালোচনা হয়, শিক্ষাকে স্বনির্ভর করার প্রস্তাব সম্পর্কে। এই প্রস্তাব অনেকে অবাস্তব বলে বর্ণনা করেছেন। শিল্পের উৎপাদন থেকে শিক্ষার ব্যয় ও শিক্ষকের পারিশ্রমিক সংগ্রহ করতে হলে বিদ্যালয়কে কারখানায় পরিণত করতে হবে। সেক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের পঠন পাঠনের থেকেও শিল্পের উৎপাদন বুদ্ধি ও মুখ্য বিচার হয়ে উঠবে। তাছাড়া, একটি শিল্পকে কেন্দ্র করে সবসময়

অন্যান্য সব বিষয়গুলো শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রেও সমস্যা রয়েছে।

২) যে সমস্ত শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষা গ্রহণে ইচ্ছুক বা যাদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সামর্থ আছে, তাদের যথাযথ বিকাশের সুযোগ এই শিক্ষা পরিকল্পনার মধ্যে নেই।

৩) এই পরিকল্পনার রচনার সময় শুধুমাত্র পল্লি অঞ্চলের কথাই চিন্তা করা হয়েছে, শহরের পরিবেশ অনুযায়ী শিল্প নির্বাচনের কথা পাঠক্রমে উল্লেখ নেই।

৪) এই পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষা দিতে গেলে যে ধরনের শিক্ষকের প্রয়োজন, সেই রকমের শিক্ষক পাওয়া খুবই কষ্টসাধ্য। ফলে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবার সম্ভাবনা নেই।

৫) ইংরেজি ভাষা বর্জিত মাতৃভাষার শিক্ষাক্ষেত্রে অনেকে ভালভাবে মেনে নিতে পারেননি।

উপরিউক্ত সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে সেবাগ্রামে জাতীয় শিক্ষাকর্মীদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে বুনিয়াদি শিক্ষা পরিকল্পনার কয়েকটি সংস্কার করা হয়। বুনিয়াদি শিক্ষা ছিল ৭-১৪ বছরের ছেলেমেয়েদের জন্য। তার কম বা বেশি বয়সি ছেলেমেয়েদের শিক্ষার বিষয়ে কোনো উল্লেখ ছিল না। গান্ধিজির তাঁর শিক্ষা পরিকল্পনার এই ত্রুটি দূর করার জন্য 'নয়া তালিম' পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন 'বুনিয়াদি শিক্ষা হবে মানুষের জীবনের সর্বস্তরের শিক্ষা'। নয়া তালিম হল বুনিয়াদি শিক্ষা পরিকল্পনার সম্প্রসারণ । এতে চারটি স্তরের শিক্ষার কথা বলা হয়েছে।

১) প্রাক্ বুনিয়াদি শিক্ষা— ৭ বছরের কমবয়সি ছেলেমেয়েদের উপযোগি শিক্ষা।

২) বুনিয়াদি শিক্ষা — ৭ থেকে ১৪ বছরের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা।

৩) উত্তর বুনিয়াদি শিক্ষা — ১৫ বছরের অধিক বয়সের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা।

৪) প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষা।

উপরোক্ত চারটি স্তরের হাতেকলমে কাজের মাধ্যমে শিক্ষাদানের কথা বলা হয়েছে। প্রাক্ বুনিয়াদি স্তরে খেলাকে কাজের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি স্তরের শিক্ষার সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য বিস্তৃত পরিকল্পনাও রচনা করা হয়েছে। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে নতুন উদ্দীপনায় বুনিয়াদি শিক্ষা পরিকল্পনাকে কার্যকরি করে শিক্ষা প্রসারের কাজ শুরু হয়। প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনকালে বুনিয়াদি শিক্ষা ভারতে অনেকটাই জনপ্রিয়তা লাভ করে। কিন্তু আধুনিক যুগের সঙ্গে তার মিলিয়ে চলতে গেলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার জ্ঞান একান্তভাবে প্রয়োজন। কিন্তু মানুষকে ঐ জ্ঞান সরবরাহ করার জন্য বুনিয়াদি শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত কার্যাবলির মধ্যে যে পরিবর্তন আনার প্রয়োজন ছিল, তা না করে, তাকে গতানুগতিকভাবে পরিচালনার চেষ্টা করা হয়। ফলে তা কখনোই যুগের উপযোগি হয়ে উঠতে পারেনি।

গান্ধিজি পরাধীন ভারতের জনগণের মধ্যে শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের জন্য এবং জনগণের সার্বিক উন্নয়নের জন্য বুনিয়াদি শিক্ষা পরিকল্পনার প্রস্তাব করেছিলেন। গ্রামীণ ভারতবর্ষের আর্থিক স্বনির্ভরতা এবং গ্রামীন জীবনের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে গান্ধিজির যে নঈ-তালিম শিক্ষা পরিকল্পনা তা বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। নঈ-তালিম পরিকল্পনার মূল বিষয়টি যদি তৎকালিন শিক্ষিত সমাজ, রাজনীতিবিদ এবং সরকার সঠিকভাবে উপলব্ধি করত এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিবর্তন করে তা চালু করত তাহলে গ্রামীণ ভারতের চিত্র আজ অন্যরকম হত এবং বর্তমানের যে কর্মহীনতা তার অনেকটাই হয়তো হ্রাস পেত।

সারসংক্ষেপ

প্রথম একক : প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা, বৌদ্ধ শিক্ষা

প্রাচীন যুগের ভারতীয় শিক্ষার মূলত দুটি ভাগ- বৈদিক বা ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থা এবং বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা। বৈদিক বা ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার লক্ষ ছিল আত্মজ্ঞান বা আত্মোপলব্দি। পাঠ্যক্রমে পরাবিদ্যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ভাবজগত এবং অপরাবিদ্যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে বাস্তব জগতের জন্য প্রস্তুত করা হত। শিক্ষাদানের জন্য ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও দলগত উভয় পদ্ধতিই অবলম্বন করা হত। শিক্ষাদান পদ্ধতির মূল কথা হল শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গো বিদ্যারম্ভ, উপনয়ন ও সমাবর্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠান যুক্ত ছিল। শৃঙ্খল ছিল অত্যন্ত কঠোর তবে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক ছিল খুবই মধুর।

বৌদ্ধ শিক্ষার লক্ষ ছিল মোক্ষ বা নির্বাণ লাভ। অষ্টাঙ্গিকমার্গ ও পঞ্চশীল অনুশীলনের মাধ্যমে চারিদ্রিক দৃঢ়তা সৃষ্টি করাও ছিল শিক্ষার লক্ষ্য। বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রথমদিকে ত্রিপিটক পাঠের উপর গুরুত্ব দেওয়া হলেও পরবর্তী সময়ে বৌদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে হিন্দু ও জৈন দর্শন, বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, ব্যাকরণ, চিকিৎসাশাস্ত্র, তর্কবিদ্যা, জ্যোতিষশাস্ত্র প্রভৃতি পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়। শিক্ষাদান পদ্ধতি ছিল মৌখিক তবে আলোচনা ও বিতর্কেরও বিশেষ স্থান ছিল। বৌদ্ধ শিক্ষা ছিল ব্যক্তিকেন্দ্রিক। প্রব্রজ্জা, উপসম্পদা প্রভৃতি ধর্মীয় নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলতে হত। উপাধ্যায়গণ শ্রমণদের ধর্মীয় ও নৈতিক জীবন গঠনের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করতেন। উপাধ্যায় শ্রমণদের সম্পর্ক ছিল খুবই মধুর। বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল অনেক বেশি গণতান্ত্রিক। এই শিক্ষার দ্বার জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের কাছে উন্মুক্ত ছিল।

দ্বিতীয় একক : মধ্যযুগে ভারতের শিক্ষা

মধ্যযুগে ইসলামিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে দুইটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়— সুলতানি যুগের শিক্ষা ও বাদশাহী বা মোগল আমলের শিক্ষা। ইসলামিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীর সুপ্ত সম্ভাবনাগুলোর পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটানো। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে কোরাণের মূলনীতিগুলো পালন করতে উদ্‌বুদ্ধ করা হত। ইসলাম ধর্মের আদর্শ এবং পবিত্র কোরাণের নির্দেশ অনুযায়ী চরিত্রবান ও ধার্মিক মানুষ তৈরি করাই ইসলামিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য । এই শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠান ছিল মক্তব এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান ছিল মাদ্রাসা। মক্তবের পাঠক্রমে- লেখা, পড়া, গণিত এবং হজরত মহম্মদ ও অন্যান্য পিরদের জীবন কাহিনি পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মাদ্রাসার পাঠক্রমে ইসলাম ধর্মতত্ত্ব, কোরাণ, প্রকৃতি বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা, অর্থনীতি, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল। শিক্ষাদান পদ্ধতি ছিল মৌখিক ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক। শিক্ষকগণ বক্তৃতা পদ্ধতিও অনুসরণ করতেন। ইসলামিক শিক্ষায়ও শিক্ষক শিক্ষার্থীর সম্পর্ক ছিল মধুর। ইসলামিক শিক্ষার প্রসারের জন্য মক্তব ও মাদ্রাসার খরচ বহনে প্রধান পৃষ্ঠপোষকতা করতেন মুসলিম শাসকগণ।

তৃতীয় একক : সনদ আইন (১৮১৩), উডের ডেসপ্যাচ (১৮৫৪)

ইউরোপীয় মিশনারিরাই ভারতবর্ষে আধুনিক শিক্ষার সূচনা করেন। পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষের শাসন ক্ষমতা হস্তগত করলেও দীর্ঘদিন শিক্ষার বিষয়ে অনেকটাই উদাসীন

ছিলেন। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের সনদ আইনে প্রথম আংশিকভাবে হলেও একথা স্বীকার করা হয় যে, ভারতবাসীর শিক্ষার দায়িত্ব তৎকালীন ইস্টি ইন্ডিয়া কোম্পানি পরিচালিত সরকারের। সনদ আইনের ১৩নং এবং ৪৩নং ধারা দুটির মধ্য দিয়ে এদেশে শিক্ষা বিস্তারে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর তথা রাষ্ট্রের দায়িত্ব স্বীকার করা হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে সনদ আইনের ব্যাখ্যা নিয়ে জটিলতা দেখা দেওয়ায় বড়োলাট বেন্টিংক বিষয়টি সমাধানের জন্য তাঁর আইনসচিব লর্ড মেকলেকে দায়িত্ব দেন, সেই আইনের ব্যাখ্যা নিয়ে সমাধান দেওয়ার জন্য। মেকলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী লর্ড বেন্টিংক ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের ৭ মার্চ এদেশে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষাদানের সরকারি নীতি ঘোষণা করেন।

১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের উডের ডেসপ্যাচ বা উডের শিক্ষা দলিল ভারতবর্ষের শিক্ষার ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই দলিলে সরকারি শিক্ষা বিভাগ স্থাপন, শিক্ষা অধিকর্তাকে এই বিভাগের প্রধান হিসাবে গ্রহণ, আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, স্তর বিন্যস্ত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন, সরকারি অনুদানের ব্যবস্থা গ্রহণ ও বিদ্যালয় পরিদর্শনের ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয়। সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি চিকিৎসাশাস্ত্র, আইন, কারিগরি ও প্রযুক্তিবিদ্যা প্রভৃতি বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয়। এছাড়াও স্ত্রী শিক্ষার প্রসার, দেশের মুসলিমদের শিক্ষার প্রসার এবং শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য নর্মাল স্কুল স্থাপনের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে ডেসপ্যাচের প্রায় সব কয়টি সুপারিশই পরবর্তী চার বছরের মধ্যে কার্যকরি করার মধ্য দিয়ে উডের দলিল এদেশে একটি রাষ্ট্রীয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিল। এজন্যই জেমস উডের দলিলকে 'ম্যাগনাকার্টা' বলে আখ্যায়িত করেছেন। তবে এই দলিলও সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয়। এই দলিল ভারতীয়দ্রেদর আশা আকাঙ্খাপূর্ণ করার জন্য রচিত হয়নি, সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ভারতীয়দের অধিকারও স্বীকৃত হয়নি।

চতুর্থ একক : হান্টার কমিশন (১৮৮২-৮৩)

লর্ড রিপন ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার পর্যালোচনার জন্য স্যার উইলিয়াম হান্টারের নেতৃত্বে প্রথম ভারতীয় শিক্ষা কমিশন নিয়োগ করেন। এই কমিশন প্রাথমিক শিক্ষার পরিচালনার দায়িত্ব মিউনিসিপ্যাল বোর্ড ও জেলা বোর্ডগুলোর হাতে ছেড়ে দিতে বলেন। এছাড়াও, শিক্ষা ব্যয়ের এক তৃতীয়াংশ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় করা, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান, প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম ও শিক্ষা পরিচালনায় স্থানীয় প্রয়োজনকে গুরুত্ব দেওয়ার সুপারিশ করেন। মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যক্রমে 'A' কোর্স ও 'B' কোর্স প্রবর্তন। মাধ্যমিক শিক্ষার দায়িত্ব ধীরে ধীরে বেসরকারি কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার উপর ন্যস্ত করা এবং সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর মতো বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোকে সমান মর্যাদা দেওয়ার বিষয়ে সুপারিশ করেন। এছাড়াও নারী শিক্ষার প্রসার, শিক্ষক শিক্ষণের জন্য নর্মাল স্কুল স্থাপন ও বয়স্ক শিক্ষার প্রসারের জন্য নৈশ বিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ কারণ। তৎকালীন অবস্থা এবং কমিশনের সুপারিশগুলোর সীমাবদ্ধতার কারণে তা অনেকাংশেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তা সত্বেও বলা যায় এই কমিশনের সুপারিশগুলো পরবর্তীকালের শিক্ষাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল।

পঞ্চম একক : স্যাডলার কমিশন (১৯১৭-১৯), ওয়ার্ধা পরিকল্পনা (১৯৩৭)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন পরিস্থিতি ও ভবিষ্যতে কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে অনুসন্ধান করে সুপারিশ করার জন্য ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে স্যাডলার কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে থেকে আলাদা করে কলেজ স্তরের প্রথম দুই বছরের জন্য পৃথক ইন্টারমেডিয়েট কোর্স চালু করার সুপারিশ করেছিলেন। কমিশন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাপ কমানোর জন্য ঢাকায় আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় চালু করার এবং মফ:স্বলের কলেজগুলোর উন্নয়নের উপর জোর দিয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে অধিকতর কার্যকরী করার জন্য পূর্নসময়ের সবেতন উপাচার্য্য নিয়োগ, বোর্ড অব স্টাডিজ এবং ফ্যাকাল্টি গঠন করার সুপারিশ করেছিলেন। কমিশনের সুপারিশে বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্যধর্মী শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষার প্রসার, অনার্স কোর্স চালু, গবেষণা এবং ভারতীয় ভাষাচর্চার সুযোগ করার কথা বলা হয়েছে। ইন্টারমেডিয়েট স্তরে, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে শিক্ষাতত্ত্ব বিষয়টি চালু করা ও শারীর শিক্ষা অধিকর্তা নিয়োগ এবং নারী শিক্ষার প্রসার বিষয়েও কমিশন সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কমিশনের এই সুপারিশ সমূহ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য করা হলেও ভারতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও কমিশনের সুপারিশ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। ঐতিহাসিক মি: মেহিউ কমিশনের সুপারিশগুলোকে তথ্য ও পরামর্শের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার বলে প্রশংসা করেছেন।

১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে গান্ধিজি হরিজন পত্রিকায় প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও সর্বজনীন করার জন্য নঈতালিম বা বুনিয়াদি শিক্ষা পরিকল্পনাটি প্রথম প্রকাশ করেন। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে গুজরাটের ওয়ার্ধায় অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় শিক্ষা সম্মেলনে গান্ধিজির এই পরিকল্পনাটি গৃহীত হয়। এই শিক্ষা পরিকল্পনার মূল বিষয় হল— এটি ৭-১৪ বছরের প্রতিটি শিশুর জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাপরিকল্পনা, এখানে শিক্ষার মাধ্যম হল মাতৃভাষা, একটি উৎপানাত্মক শিল্পকে কেন্দ্র করে শিক্ষা পরিচালিত হয়। এই শিক্ষা অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর। ওয়ার্ধার সর্বভারতীয় শিক্ষা সম্মেলনে ড: জাকির হোসেনকে সভাপতি করে বুনিয়াদি শিক্ষার একটি পাঠ্যক্রম রচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই শিক্ষা পরিকল্পনাটি নানা দিক দিয়ে সমালোচিত হয়েছে। যেমন- এখানে শিশুর ৭ বছরে আগের অথবা ১৪ বছরের পরের বয়সের শিক্ষার বিষয়ে কোনো উল্লেখ নেই, এই শিল্পকে কেন্দ্র করে সব বিষয় শিক্ষা দেওয়া সবক্ষেত্রে সম্ভবপর নয়। অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার বিষয়টিও সমালোচিত হয়। এই সমস্ত সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে সেবাগ্রামে গান্ধিজি নঈ তালিম পরিকল্পনায় বুনিয়াদি শিক্ষাকে চারটি স্তরে বিভক্ত করে জাতীর জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। এখানে প্রত্যেকটি স্তরেই কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। বুনিয়াদি শিক্ষা পরিকল্পনাটি যদি যুগের পরিবর্তনের সাথে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত করে প্রবর্তন করা যেত তাহলে ভারতবর্ষের শিক্ষা সমস্যার অনেকটাই সমাধান হত এবং শিক্ষাকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ও জাতীয় উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত করা যেত বলে অনেক আধুনিক শিক্ষাবিদ মনে করেন।

অনুশীলনী

ক) ১ মানের প্রশ্ন : সর্বাধিক শব্দসংখ্যা ২০

১) প্রাচীন ভারতের বৈদিক শিক্ষার লক্ষ্য কি ছিল?

২) 'মক্তব' বলতে কি বুঝায়?

৩) General Committee of Public Instruction (GCPI) কবে গঠিত হয়েছিল?

৪) 'A' কোর্স এবং 'B' কোর্সের কথা কোন কমিশন বলেছিল?

৫) কত খ্রিষ্টাব্দে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ হয়েছিল?

খ) ২ মানের প্রশ্ন : সর্বাধিক শব্দসংখ্যা ৪০

১) প্রাচীন ভারতের বৈদিক শিক্ষার লক্ষ্য কি ছিল?

২) বৌদ্ধধর্মের চারটি সত্য কি কি ছিল?

৩) ইসলামি শিক্ষায়, শৃঙ্খলার ধারণা ব্যক্ত কর।

৪) 'Dowanar Filtration Theory' বা 'চুঁইয়ে নামা নীতি' বলতে কি বুঝায়?

৫) বুনিয়াদী শিক্ষার চারটি স্তরের কথা উল্লেখ কর।

গ) ৪ মানের প্রশ্ন : সর্বাধিক শব্দসংখ্যা ১০০

১) প্রাচীন ভারতের বৈদিক ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার বৈশিষ্ট্য লিখ।

২) মধ্যযুগের ইসলামি শিক্ষার বৈশিষ্ট্য লিখ।

৩) ১৮১৩ খ্রিষ্টাব্দের সনদ আইনের তাৎপর্য ও গুরুত্ব লিখ।

৪) প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে হাণ্টার কমিশন (১৮৮২-৮৩) এর সুপারিশগুলো লিখ।

৫) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্পর্কে স্যাডলার কমিশন (১৯১৭-১৯) এর সুপারিশসমূহ লিখ।

ঘ) ৫ মানের প্রশ্ন : সর্বাধিক শব্দসংখ্যা ১৫০

১) প্রাচীন ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থার একটি বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা লিখ।

২) মধ্যযুগের ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থায় নারীশিক্ষা সম্পর্কে ব্যাখ্যা কর।

৩) উডের ডেসপ্যাচের (১৮৫৪খ্রিষ্টাব্দের) সুপারিশসমূহ লিখ।

৪) মাধ্যমিক শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে হাণ্টার কমিশন (১৮৮২-৮৩) এর সুপারিশসমূহ লিখ।

৫) মহাত্মা গান্ধির বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কে ব্যাখ্যা কর।

ঙ) ৬ মানের প্রশ্ন : সর্বাধিক শব্দসংখ্যা ২০০

বোধপরীক্ষণমূলক

সত্য হল পরম ব্রহ্ম। জীবাত্ম এই পরমসত্ত্বারই অংশ। আত্মজ্ঞান ও আত্মোপলব্দির মধ্য দিয়েই সেই পরমসত্ত্বাকে জানা যায়। তাই নিজেকে জানা ভীষণভাবে প্রয়োজন। এই নিজেকে জানার মাধ্যমে জড় জগতের সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্তি লাভই শিক্ষার পরম লক্ষ। এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করাকে বলা হয়েছে 'পরাবিদ্যা' আর ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ করাকে বলা হয়েছে 'অপরাবিদ্যা' । এই দুটোকে পরিপূরক হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে।

— বৈদিক শিক্ষায় 'পরাবিদ্যা' এবং অপরাবিদ্যার পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর। ৬

পঞ্চম অধ্যায় : স্বাধীনোত্তর ভারতের শিক্ষা

- প্রথম একক : বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন (১৯৪৮-৪৯)
- দ্বিতীয় একক : মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (১৯৫২-৫৩)
- তৃতীয় একক : কোঠারি কমিশন (১৯৬৪-৬৬)
- চতুর্থ একক : জাতীয় শিক্ষানীতি-১৯৮৬ ও তার সংশোধিত খসড়া
- পঞ্চম একক : ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেম ওয়ার্ক, ২০০৫

পঞ্চম অধ্যায় : স্বাধীনোত্তর ভারতের শিক্ষা

উদ্দেশ্য (Objectives) :

- *শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন-এ বর্ণিত : সুপারিশ, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার পাঠ্যক্রম, শিক্ষার মান, শিক্ষার মাধ্যম, নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা, নারী শিক্ষা, পরীক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষক, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে।*
- *শিক্ষার্থীরা মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন-এ বর্ণিত: সুপারিশ, কাঠামো, পাঠ্যক্রম, পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার, শিক্ষক, নির্দেশনা ও পরামর্শদান, পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষণ পদ্ধতি, নারী শিক্ষা ও সহশিক্ষা, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিভিন্ন রূপ, ভাষাশিক্ষা ইত্যাদি সম্পর্কে অবগত হতে পারবে।*
- *শিক্ষার্থীরা কোঠারী কমিশন-এ বর্ণিত: শিক্ষার কাঠামো, পাঠ্যক্রম, প্রতিষ্ঠান, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, ত্রিভাষা সূত্র, বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষা, প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা, মূল্যায়ন, শিক্ষক শিক্ষণ, নারী শিক্ষা ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে পারবে।*
- *শিক্ষার্থীরা জাতীয় শিক্ষানীতি এবং তার সংশোধিত খসড়া-১৯৯২ সম্পর্কে অবগত হতে পারবে।*
- *ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক, ২০০৫ এর গঠনের পটভূমি এবং এর মধ্যে বর্ণিত অধ্যায় সমুহ সম্পর্কে জানতে পারবে।*

প্রাক্ কথন :

দীর্ঘদিন আমাদের দেশ ইংরেজ শাসনাধীন ছিল। ব্রিটিশ সরকার দেশে যে শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। তার পেছনে, ছিল সাম্রাজ্য রক্ষার প্রয়াস। জাতির কল্যাণসাধনের দিকটা ব্রিটিশ শাসনে উপেক্ষিত ছিল। ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় যে শিক্ষা আমরা পেয়েছি, তা আমাদের কোনো কল্যাণই করেনি, একথা বলা চলে না। কেননা আগের অধ্যায়ে আলোচিত শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন কমিটি ও কমিশন থেকে যে ধারণা আমরা পেয়েছি তাতে ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্তার একটি স্পষ্টরূপ প্রতিফলিত হয়েছে।

স্যাড্লার কমিশনের সময় থেকে বিভিন্ন কতৃত্বে, বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার জন্য যেসব সংস্কারের কথা বলা হয়েছিল সেগুলো সব কাজে রূপ না পেলেও সরকারী প্রশাসনের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। যুদ্ধ প্রচেস্টায় ভারতের সহযোগিতা পাওয়ার জন্য ইংল্যাণ্ডের মন্ত্রীসভা তখন উদগ্রীব। ক্রীপস্ মিশন ব্যর্থ হওয়ার পর বড়লাট লর্ড ওয়াভেল আবার আলাপ আলোচনা শুরু করলেন এবং পেশ করলেন “ওয়াভেল পরিকল্পনা”। এই পরিবেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেস্টা কমিটির উদ্যোগে ১৯৪৪ সালে একটি সামগ্রিক শিক্ষা সংস্কার পরিকল্পনা উপস্থাপিত হল। “যুদ্ধোত্তর ভারতে শিক্ষা উন্নয়ন” (Past War Educational Development in India) শিরোনামার এই পরিকল্পনা ‘সার্জেন্ট পরিকল্পনা’ নামে পরিচিত। এটি ছিল এমন একটি পরিকল্পনা যেটি কার্যকর হলে ১৯৪৪ সন

থেকে ৪০ বছর পরে অর্থাৎ ১৯৮৪ সনে শিক্ষার ক্ষেত্রে ভারত ১৯৪৪ সনের ইংল্যান্ডের সমকক্ষ হবে।

তবুও জাতীয় উন্নতি অথবা জাতীয়তাবাদের উন্মেষ, সেই শিক্ষার লক্ষ্য ছিল না। তাই বৈদেশিক শাসনকালে যে শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, স্বাধীনতালাভের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তার পরিবর্তন অত্যাবশ্যক হয়ে উঠে। জাতীয় জীবনের পুনর্গঠনের নতুন পরিকল্পনায় আমাদের নিজস্ব শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য শিক্ষার সর্বস্তরের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যম্ভাবীরূপে দেখা দেয়। জাতীয় সরকার তাই উপলব্ধি করলেন দেশের ভবিষ্যতকে যদি বলিষ্ঠ ভিত্তির উপর গড়ে তুলতে হয় তবে সর্বপ্রথম শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করতে হবে। তাই ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তিলাভের পর জাতীয় জীবনে আশা আকাঙ্খার কথা স্মরণ রেখে ভারত সরকার ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দের ৫ নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধান এবং তার উন্নতির জন্য স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষা কমিশন বা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন গঠন করে। এই কমিশনের সভাপতি ছিলেন ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ। তাঁর নাম অনুসারে এই কমিশন রাধাকৃষ্ণাণ কমিশন নামেও পরিচিত।

যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার পূর্বশর্ত হল মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠন। তাই স্বাধীনতার পর সর্বভারতীয় ভিত্তিতে মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কারের জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেস্টা পর্ষদ প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধান ও প্রচলিত ব্যবস্থার উপযোগিতা বিচারের জন্য একটি কমিশন গঠনের প্রস্তাব দেয়। ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর লক্ষণ স্বামী মুদালিয়র-এর নেতৃত্বে 'মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন' নামে একটি কমিশন গঠন করা হয়। মুদালিয়র-এর মান অনুসারে এই কমিশনকে 'মুদালিয়র কমিশন' নামে অভিহিত করা হয়।

১৯৪৮ সারে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের এবং ১৯৫২ সালের মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের সুপারিশসমূহ সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী করা হয়নি। যার ফলে অনেক ত্রুটিই থেকে গেছে। এইসব ত্রুটিপূর্ণ দূর করার অভিপ্রায়ে ভারত সরকার ১৯৬৪ সালের ড. ডি. এস. কোঠারীর নেতৃত্বে একটি শিক্ষা কমিশন নিয়োগ করেন। এটি ভারতীয় শিক্ষা কমিশন বা কোঠারী কমিশন নামে খ্যাত। কমিশনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার সর্বস্তরে সর্বদিকের উন্নয়নে সাধারণ নীতিসমূহ সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শ দান করা।

১৯৬৮ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে যে সাফল্য দেখা গেছে এবং বিভিন্ন কারণে যে নীতিগুলো কার্যকরী করতে গিয়ে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে, সমস্ত দিক বিবেচনা করার পর দেশের আভ্যন্তরীন এবং বাহ্যিক বিভিন্ন ধরনের সমস্যার মোকাবিলার জন্য নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার একটি রূপরেখা প্রস্তুত করা হয় তার ভিত্তিতে শিক্ষামন্ত্রক "চ্যালেঞ্জ অফ এডুকেশন - এ পলিসি পারস্‌পেক্‌টিভ" নামে একটি প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেন। প্রস্তাবনায় জাতির বিভিন্ন দিক ব্যাপক পরিবর্তনের সঙ্গে সংগতি রেখে এবং আগামী একুশ শতক যা বিজ্ঞানের শতক বলে পরিচিত হবে তার দিকে লক্ষ্য রেখে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠনের কথা উল্লেখ করা হয় এবং ১৯৮৬ সাল থেকে এটি চালু হয়। যা শিক্ষার ইতিহাসে জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP-1986) নামে পরিচিত।

১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতির মূল্যায়নের জন্য দুটি কমিটি গঠিত হয় — রামমূর্তি কমিটি (১৯৯০) এবং জনার্দন কমিটি (১৯৯২)। এই দুটি কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে জাতীয় শিক্ষানীতির (NEP-1986) কিছু পরিবর্তন করা হয়। এটিই হল শিক্ষানীতি ১৯৯২ বা প্রোগ্রাম অফ অ্যাকশন (POA-1992)।

বিদ্যালয়ের বাইরের জীবনের সঙ্গে জ্ঞানকে যুক্ত করা, অর্থহীন মুখস্থ পদ্ধতিকে বাতিল করা, পরীক্ষা পদ্ধতিকে আরোও নমনীয় করা ইত্যাদি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রণয়ন হয় National Curriculum Framework-2005।

উক্ত অধ্যায়ে আমরা উপরে উল্লেখিত কমিশন ও কমিটি শিক্ষা সংক্রান্ত যেসব সুপারিশ সমূহ প্রদান করেছে যেগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব।

প্রথম একক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন (১৯৪৮-৪৯)

পটভূমি : ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশকে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ও শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের প্রয়োজন দেখা দিল। তাছাড়া দেশের আর্থসামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের লক্ষ্যে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নতির কথা চিন্তা করে, বিজ্ঞান, কারিগরী বিদ্যা ও অন্যান্য পেশাগত ক্ষেত্রে উপযুক্ত দক্ষ নাগরিক গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন ধরনের বিশেষধর্মী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছিল। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে দেশের প্রচলিত উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য ও পাঠ্যক্রমের পুনর্বিন্যাসও অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার সময় ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ২১টি। কিন্তু দেশের ক্রমবর্ধমান উচ্চশিক্ষার চাহিদা মেটানোর পক্ষে এই সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য। প্রাক্ স্বাধীনতাযুগে ইংরেজ সরকার সুপরিকল্পিতভাবে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলেন নি। বিক্ষিপ্তভাবে যে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্থাপন করা হয়েছিল, সেগুলোর পরিচালনা ও কর্মপ্রকৃতির মধ্যে যোগসূত্র ছিল না। ফলে ঐ সকল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার মানও তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না। তাই ভারত সরকার জাতীয় আদর্শের উপযোগী উচ্চশিক্ষার কাঠামো রচনা করার উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সালের নভেম্বর মাসে ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের সভাপতিত্বে গঠিত এক শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। এই কমিশনের নাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্, দার্শনিক ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের সভাপতিত্বে গঠিত এই শিক্ষা কমিশন রাধাকৃষ্ণান কমিশন নামে বিশেষ পরিচিত। এটিই হল স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষা কমিশন। কমিশনের সদস্যগণ বিভিন্ন প্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয়, বহু কলেজের কর্মপদ্ধতি, পরিদর্শন, দেশের শিক্ষা সমস্যার নানা দিক পর্যালোচনা করে ১৯৪৯ সালের আগস্ট মাসে ৭৪৭ পৃষ্ঠার একটি সুচিন্তিত রিপোর্ট ভারত সরকারের কাছে পেশ করেন। এই প্রতিবেদনে উচ্চশিক্ষা ছাড়াও সাধারণ শিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রভৃতি বিভিন্ন দিকে কমিশন গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেন।

ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ হলেন এই কমিশনের সভাপতি, ড. নির্মল কুমার সিদ্ধান্ত হলেন এই কমিশনের সম্পাদক। এই কমিশনের অন্যান্য ভারতীয় সদস্য হলেন ড. তাঁরাচাদ দত্ত, ড. জাকির হুসেন, ড. এ লক্ষনস্বামী মুদালিয়র, ড. মেঘনাথ সাহা, ড. করম নারায়ণ বহল। এছাড়া যে তিনজন বিদেশী শিক্ষাবিদ কমিশনের সদস্যরূপে নির্বাচিত হয়েছিলেন, তারা হলেন - ড. আর্থার. ই. মরগ্যান, ড. জেমস্. এফ. ডাফ, ড. জন. জে. টিগার্ট প্রমুখ।

কমিশনের অনুসন্ধানের বিষয়বস্তু

(১) বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার লক্ষ্য,
(২) বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ও গবেষণার ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যভিত্তিক পর্যালোচনা ও নীতি নির্ধারণ করা,
(৩) ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কাঠামো, কার্যধারা, কর্মসীমা প্রভৃতি ক্ষেত্রে সুপারিশ প্রদান,
(৪) বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আর্থিক সমস্যার সমাধানকল্পে পরামর্শ দান,
(৫) শিক্ষাদানের মাধ্যম সম্পর্কে নীতি নির্ধারণ,

(৬) বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত মান নিরূপণ করা,
(৭) ভারতীয় সংস্কৃতি, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, চারুকলা প্রভৃতির সমৃদ্ধকরণের জন্য অভিমত প্রদান,
(৮) গ্রামীণ শিক্ষার উন্নতিকল্পে গ্রামীন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ,
(৯) ধর্ম নিরপেক্ষতার কথা মাথায় রেখে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ধর্মীয় শিক্ষা সম্পর্কে অভিমত প্রদান,
(১০) বিশ্ব বিদ্যালয়গুলোতে কর্মরত অধ্যাপকবৃন্দের যোগ্যতাভিত্তিক বেতন, সুযোগ সুবিধা এবং গবেষণার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান,
(১১) পাঠ্যক্রম প্রণয়ন ও পাঠ্যক্রম সমাপ্তির সময় নির্ধারণ,
(১২) ভারতীয় শিক্ষার বিভিন্ন দিক যেমন নারীশিক্ষা, পেশাগত শিক্ষা, বৃত্তিশিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে সুপারিশ প্রদান,
(১৩) বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নিয়মশৃঙ্খলা বজায় রাখতে, ছাত্রাবাসের সমস্যা মেটাতে, শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশের ক্ষেত্রে অভিমত প্রদান,
(১৪) বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, পরীক্ষা ব্যবস্থা, নিয়মনীতি ইত্যাদি সম্পর্কে সুপারিশ প্রদান,

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ

(Recommendations of University Education Commission)

ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপাচার্য, বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা অধিকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিভাগীয় প্রধান, বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষ প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে গৃহীত তথ্যাদি সংগ্রহ করে কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে বিভিন্ন সুপারিশ প্রদান করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে যেসব সুপারিশ করেছেন সেগুলি হল -

(১) নেতৃত্ব দানের শিক্ষা : কমিশনের মতে বিশ্ব বিদ্যালয় শিক্ষার লক্ষ্য এমন হবে যাতে শিক্ষার্থীরা দেশের রাজনৈতিক ও শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারে। শুধু তাই নয়, এই নেতৃত্ব গ্রহণের দ্বারা তারা যাতে দেশের যোগ্য নাগরিক হয়ে উঠতে পারে, সেদিকে নজর দিতে হবে।
(২) জাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সংরক্ষণ : বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার লক্ষ্য হবে, শিক্ষার্থীরা যাতে জাতীয় সংস্কৃতির ভাবধারাকে সমৃদ্ধ করে, হৃদ্গত করে, সংরক্ষণ করে।
(৩) শিক্ষার মানোন্নয়ণ : কমিশনের মতে উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য হবে শিক্ষার মান উন্নত করা। মানববিদ্যার চর্চার দ্বারা মানবতাবাদের বিকাশ, বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার সাহায্যে জীবনযাত্রার মানের উন্নতি, কৃষিবিদ্যার চর্চার মধ্য দিয়ে কৃষির উন্নত ও স্বাস্থ্যরক্ষা জন্য চিকিৎসাবিদ্যার প্রসার ঘটানো বিশেষ প্রয়োজন। দেশের সাধারণ শিক্ষা, যান্ত্রিক শিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রভৃতি নানা ধরনের শিক্ষার মান উন্নত করতে হবে।
(৪) নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি : শিক্ষার্থীদের মধ্যে উচ্চতর ভাবধারা ও সমাজ জীবনে নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করা হবে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। ছাত্রছাত্রীদের চারিত্রিক উন্নতির পাশাপাশি তাদের মধ্যে নতুন নতুন মূল্যবোধের জাগরণ ঘটাতে হবে।

(৫) গবেষণা ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ : দেশ ও জাতির বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের নতুন করে চিন্তা করার ক্ষমতা অর্জন। জীবনের নানা প্রশ্নের উত্তরের সন্ধান এবং বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করার ব্যবস্থা করতে হবে।

(৬) মানবিক গুণাবলির বিকাশ সাধন : কমিশনের মতে, উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে গড়ে উঠবে সৌভ্রাতৃত্ববোধ, স্বাধীন মত প্রকাশের ক্ষমতা, শ্রদ্ধাবোধ প্রভৃতি।

(৭) সুশৃঙ্খল সমাজ স্থাপন : বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার লক্ষ্য হবে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিভিন্ন সামাজিক গুণের বিকাশ ঘটিয়ে এক সুশৃঙ্খল সমাজ সৃষ্টি করা।

(৮) সহপাঠ্যক্রমিক শিক্ষা : শিক্ষার লক্ষ্য হবে, সহপাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহে গুরুত্ব দেওয়া।

(৯) প্রজ্ঞার উন্মেষ : কমিশনের মতে, শিক্ষার মাধ্যমে আমাদের জ্ঞান ও বিচক্ষণতার উন্মেষ ঘটবে। কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে : "Education is both a training of minds, training of souls, it should give both knowledge and wisdom." অর্থাৎ, শিক্ষা হল মনের প্রশিক্ষণ, আত্মার প্রশিক্ষণ, জ্ঞান ও বিচক্ষণতা উভয়ের জন্ম দিয়ে থাকে।

(১০) গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা : রাধাকৃষ্নান কমিশন চারটি গণতান্ত্রিক সমাজ দর্শনের উপর উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন। সেগুলি হল সামাজিক ন্যায়বিচার (Social Justice), স্বাধীনতা (Liberty), সাম্য (Equality), সৌভ্রাতৃত্ব (Fraternity) উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য হবে সামাজিক ন্যায় বিচারের পথটি প্রশস্ত করা, পক্ষপাতহীন জীবনদর্শন গড়ে তোলা। উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য হবে শিক্ষার্থীদের স্বাধীনতা দান। গণতান্ত্রিক পরিকাঠামো স্বাধীনতাকেন্দ্রিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। স্বাধীনতাই আদর্শ জীবনের পথিকৃত হয়ে পথ দেখায়। গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হল, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে সমানাধিকার। সমানাধিকারই হল মানব বন্ধনের অন্যতম হাতিয়ার। সবশেষে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রেম, প্রীতি ও মানবিক বন্ধন গড়ে, বিশ্ববিদ্যালয়কে আবাসিক করে। সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলির সুব্যবস্থা। সহশিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে অবাধ মেলামেশার সুযোগ সৃষ্টি করে, সৌহার্দ্যের পরিবেশ সৃষ্টি করাই হবে উচ্চশিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য।

(১১) শিক্ষা ও মানব সভ্যতা : অতীতকাল থেকে বর্তমান শতাব্দী পর্যন্ত মানবজাতি কঠোর সংগ্রাম করে বর্তমান সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ হয়েছে। যাতে শিক্ষার্থীরা মানব সভ্যতার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করতে আগ্রহী হয় তার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য।

(১২) কৃষিবিদ্যা শিক্ষা : ভারতবর্ষ প্রধানত কৃষিভিত্তিক দেশ। ভারতের অধিকাংশ লোক গ্রামে বসবাস করে। গ্রামীণ উন্নতির জন্য ভারতবর্ষের বিশ্ব বিদ্যালয়গুলোর লক্ষ্য হবে কৃষিবিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

(১৩) জাতীয় সংহতি, আন্তর্জাতিকতাবোধের জন্য শিক্ষা : ভারতীয় সংস্কৃতির প্রধান বিবেচ্য বিষয় 'বিভেদের মধ্যে ঐক্য' প্রতিষ্ঠা, যা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। সেইজন্য ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য সম্পর্কে ছাত্রদের সচেতন করার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দেশের অন্তর্নিহিত মূল সত্য,

জাতীয় ও আন্তর্জাতিকতার সম্পর্ক, আন্তর্জাতিক সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান প্রভৃতি বিষয়েও ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা দিতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার পাঠ্যক্রম :

পাঠ্যক্রম গঠন পদ্ধতির উপর শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ বহুলাংশে নির্ভরশীল। তাই পাঠ্যক্রম জাতীয় জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশনের পাঠ্যক্রম সংক্রান্ত সুপারিশগুলো হল -

(১)প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে কৃষিবিদ্যার উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

(২)বিশ্ববিদ্যালয় ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর পাঠ্যসূচী এমনভাবে তৈরী করতে হবে, যাতে সেখানে সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় ক্ষেত্রের সংযুক্তি থাকে। এর উপযোগিতা হল তাত্ত্বিকের সঙ্গে ব্যবহারিকের বন্ধন অতীত বিদ্যাকে সহজ সরল পদ্ধতিতে জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে জটিলতা হ্রাস করবে, শিক্ষার্থীর আত্মবিকাশের পথ প্রশস্ত করবে।

(৩)সাধারণধর্মী শিক্ষা ও বিশেষধর্মী শিক্ষার মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ করতে হবে।

(৪)পাঠ্যক্রমে কর্মকেন্দ্রিক উৎপাদনমুখী শিক্ষার সংযুক্তি ঘটাতে হবে।

(৫)গ্রাম্য পরিবেশে কৃষি কলেজ ও গ্রামীণ কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

উপরোক্ত সুপারিশগুলো ছাড়াও কমিশন সাধারণধর্মী শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার পাঠ্যক্রম সংক্রান্ত কিছু সুপারিশ করেছেন, যেগুলো হল -

সাধারণ শিক্ষা : বিদ্যালয়ের শিক্ষাকাল হবে ১২ বছর। বিদ্যালয় স্তরের সফল ছাত্রছাত্রীরা কলেজে কলা বা বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হতে পারবে।

বৃত্তিমূলক শিক্ষা : বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন তাদের রিপোর্টে বৃত্তিমূলক বা কারিগরী শিক্ষার ক্ষেত্রে দুটি বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সেগুলো হল -

(১) **কৃষি :** জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে কৃষিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কৃষি মহাবিদ্যালয়গুলোকে উন্নত করতে হবে। গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে কৃষি মহাবিদ্যালয়গুলোকে যুক্ত করতে হবে। গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন সহ কৃষি খামার ও কৃষি গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

(২) **বাণিজ্য :** যেসকল শিক্ষার্থী বাণিজ্য নিয়ে পড়াশোনা করবে, তাদের মধ্যে বাস্তব সম্মত জ্ঞানের স্ফুরণ ঘটাতে বিভিন্ন ফার্মে: হাতে কলমে কাজ করার ব্যবস্থা রাখতে হবে। বাণিজ্য বিভাগে স্নাতক ডিগ্রি লাভের পর বিশেষজ্ঞ হতে হলে সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়ে পঠন পাঠন করতে হবে। M.Com-এর পাঠ্যক্রম হবে ব্যবহারিক।

(৩) **শিক্ষাতত্ত্ব :** শিক্ষাবিজ্ঞানের তত্ত্বগত বিষয়গুলো যাতে স্থানীয় পরিবেশের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ ও নমনীয় হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কমিশনের সুপারিশে বলা হয়েছে যে, তাত্ত্বিক জ্ঞানকে বাস্তবের আঙিনায় ফলদায়ক করতে হলে ব্যবহারিক শিক্ষণের প্রয়োজন, এক্ষেত্রে উপযুক্ত বিদ্যালয়ের সাহায্য নিতে হবে। প্রশিক্ষণ কলেজে যাদের অধ্যাপক হিসাবে নিয়োগ করা হবে তাদের অবশ্যই বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

(৪) **আইন :** আইন শিক্ষায় ভর্তির জন্য শিক্ষার্থীদের অবশ্যই তিন বছরের স্নাতমক স্তরের পড়া আবশ্যিক। আইন শিক্ষা হবে বিশ্ব বিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন। আইনের প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে এক বছরেরর শিক্ষানবীশ হিসেবে কোনো উকিলের অধীনে কাজ করতে হবে।

(৫) **ইঞ্জিনীয়ারিং ও প্রযুক্তিবিজ্ঞান :** বিভিন্ন স্তরের ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুলগুলোর সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। ইঞ্জিনীয়ারিং-এর সমস্ত শাখায় প্রথম বছরের পাঠ্যক্রম একরকম হবে। কলেজীয় শিক্ষার সঙ্গে কর্ম অভিজ্ঞতার সুযোগ দিতে হবে। উচ্চতর টেকনোলজিক্যাল ইন্সটিটিউট খোলার চেস্টা করতে হবে। ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষার উন্নতি সাধনে গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে।

(৬) **চিকিৎসাবিদ্যা :** চিকিৎসা ক্ষেত্রের যেসব বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য হাসপাতালের সাহায্য প্রয়োজন সেই বিভাগগুলোকে হাসপাতাল সংলগ্ন করতে হবে। নার্সিং-এ গুরুত্ব দিতে হবে। হাসপাতাল সংলগ্ন মেডিক্যাল কলেজগুলোতে সর্বোচ্চ ছাত্রসংখ্যা হবে ১০০ জন এবং প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য দশটি রোগীর শয্যা নির্দিষ্ট থাকবে। চিকিৎসাবিদ্যার প্রথম ডিগ্রি কোর্সে ভারতীয় প্রণালী সহ ভেষজ শাস্ত্রের ইতিহাস পড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে। উন্নততর কলেজগুলোতেই কেবলমাত্র স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পড়ানোর ব্যবস্থা থাকবে।

শিক্ষার মান : বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশনের শিক্ষার মান সংক্রান্ত সুপারিশগুলো হল -

(১) ১২ বছরের মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পূর্ণকরণের পর শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে পঠন পাঠনের যোগ্যতা অর্জন করবে।

(২) কলেজগুলোতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৫০০-এর বেশি হবে না। আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা ও বিজ্ঞান বিভাগ মিলিয়ে ৩০০০ জনের বেশি শিক্ষার্থী নেওয়া চলবে না।

(৩) গ্রন্থাগারের সুব্যবস্থা রাখতে হবে এবং গবেষণার বিশেষ সুযোগ থাকবে।

(৪) পরীক্ষার দিনগুলো ছাড়া সারা বছরে কাজের দিন সংখ্যা হবে ১৮০।

(৫) বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভীড় কমানোর জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রতিষ্ঠান খুলতে হবে।

শিক্ষার মাধ্যম : শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন যেসব সুপারিশ করেছেন। সেগুলো হল -

(১) আঞ্চলিক ভাষাকে সমৃদ্ধ করতে হবে।

(২) উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে, কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলকভাবে রাষ্ট্রভাষা (হিন্দি) চালু করার জন্য রাজ্য সরকারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

(৩) উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ইংরেজীর পরিবর্তে কোনো ভারতীয় ভাষাকে গ্রহণ করতে হবে।

(৪) মাধ্যমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের তিনটি ভাষার সঙ্গে পরিচিত হবে হবে - (i) মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা (ii) হিন্দি ভাষা (iii) ইংরেজী ভাষা।

(৫) ক্রমবর্ধমান জ্ঞানের সঙ্গে সংগতি রেখে চলার জন্য কমিশন মাধ্যমিক স্তর এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ইংরেজী ভাষা চর্চার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা : ভারতবর্ষে বহু ধর্মের লোক বসবাস করে। তাই ধর্মীয় নিরপেক্ষতাকে বজায় রেখে ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করার কথা কমিশনে বলা হয়েছে। এইক্ষেত্রে কমিশনের সুপারিশগুলো হল -

(১) শিক্ষার সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক থাকা অবশ্যই প্রয়োজন; তবে ধর্মের তাত্ত্বিক গোঁড়ামি থাকলে চলবে না।

(২) বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কাজ শুরু হওয়ার আগে ছাত্রদের কিছুক্ষণ নীরবে ধ্যান করে চিত্তকে সংযম করে নিতে হবে।

(৩) ডিগ্রি কোর্সের প্রথম বছর বিভিন্ন ধর্মীয় নেতাদের জীবনীপাঠের ব্যবস্থা করতে হবে। ডিগ্রি কোর্সের দ্বিতীয় বছর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থসমূহ থেকে সর্বজনীন আবেদনপূর্ণ বাণী আলোচনা করতে হবে। তৃতীয় তথা ডিগ্রি কোর্সের শেষে ধর্মতত্ত্বের মূল সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করা হবে।

(৪) দর্শন শাস্ত্রের পাঠ্যসূচিতে ধর্মের তাত্ত্বিক বিষয় উপস্থাপন করতে হবে।

নারী শিক্ষা : কমিশন নারীশিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কমিশন মনে করেন নারীশিক্ষা ব্যহত হলে দেশের অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি হবে। তাই কমিশন নারী শিক্ষা সম্পর্কে কতগুলো মূল্যবান সুপারিশ করেন। এগুলো হল -

(১) মহিলাদের প্রয়োজন অনুসারেই তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

(২)সমাজে পুরুষদের মতো নারীদেরও কতগুলো পৃথক দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। এজন্য তাদের বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। মহিলাদের জন্য গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, গৃহপরিচালনা, গার্হস্থ্য অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ে পাঠদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৩) শিক্ষাক্ষেত্রে নারীরাও পুরুষদের মতো সমান সুযোগ সুবিধা ভোগ করবে। শিক্ষিকারা একই প্রকার কাজের জন্য শিক্ষকদের সমানহারে বেতন পাবেন।

(৪) সমাজে নাগরিক ও নারী হিসাবে মেয়েরা যাতে উপযুক্ত মর্যাদা পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

পরীক্ষা ব্যবস্থা : বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করে পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার সম্বন্ধে কতকগুলো সুপারিশ করেন, সেগুলো হল -

(১) বৈজ্ঞানিক উপায়ে অভীক্ষা প্রস্তুতির কাজ কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় শুরু করতে হবে।

(২) পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে রচনাধর্মী ও নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা এই দুয়েরই সমন্বয় করা প্রয়োজন।

(৩) বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় নম্বর দেওয়ার ক্ষেত্রে সমতাবিধান বাঞ্ছনীয়।

(৪) সারা বছরের আভ্যন্তরীন কাজের ভিত্তিতে এক তৃতীয়াংশ নম্বর দিতে হবে।

(৫) গ্রেস নম্বর দেওয়ার পদ্ধতি তুলে দিতে হবে।

(৬) কমিশনের মতে, সরকারি চাকুরির ক্ষেত্রে পৃথক পরীক্ষা গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত।

(৭) পরীক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে অন্তত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পাঁচ বছরের অধ্যাপনার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

(৮) বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ণের ক্ষেত্রে তিনটি বিভাগে পাশের ব্যবস্থা থাকবে। প্রথম বিভাগে কমপক্ষে ৭০ শতাংশ, দ্বিতীয় বিভাগে কমপক্ষে ৫৫ শতাংশ এবং তৃতীয় বিভাগে ৪০ শতাংশ নম্বর পেতে হবে। কমিশনের মতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান বহুলাংশে শিক্ষকের উপর নির্ভরশীল।

শিক্ষক : বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশনের শিক্ষক সম্পর্কিত সুপারিশ হল - শিক্ষক হবেন জ্ঞান পিপাসু, আদর্শ চরিত্রের দক্ষ মানুষ। তার পবিত্রতায়, সংযমে, অনির্বচনীয় মাধুর্যে, মানবতায় আদর্শ পরিবেশ

রচিত হবে। কমিশন শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে শিক্ষকদের চারটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। সেগুলো হল - (i) প্রফেসর (ii) রীডার (iii) লেকচারার (iv) ইনস্ট্রাকটর। শিক্ষকের কার্যকার ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত বহাল থাকবে, তবে কর্মক্ষমতা অটুট বলে বিবেচিত হলে কার্যকার ৬৪ বছর বয়স পর্যন্ত বাড়ানো যাবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ি শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। শিক্ষকদের পদোন্নতি হবে যোগ্যতা ও মেধার ভিত্তিতে। মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের প্রভিডেন্ড ফাণ্ড, ছুটি ও কর্মের সময় নির্ঘন্ট বিষয়ক শর্তাদি সুষ্ঠভাবে প্রণয়েনর যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন : বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন সম্পর্কিত সুপারিশগুলো হল -

(১) জাতীয় শিক্ষানীতির রূপায়ন, সঠিক পরিচালনা, অর্থ সংস্থান প্রভৃতি বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যাবলির উপর কেন্দ্রীয় সরকারের নজর থাকবে।

(২) বেসরকারী মহাবিদ্যালয়গুলোকে স্বীকৃতি দানের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে। সেগুলো গ্র্যান্ট-ইন-এইড পাবার যোগ্য কিনা এবং যেগুলো শিক্ষার্থীদের আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ণে সক্ষম কিনা।

(৩) বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কাজ কেবলমাত্র অনুমোদন প্রদান করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না।

(৪) বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য কমিটিতে থাকবেন - (ক) আচার্য (খ) উপাচার্য (গ) সিনেট বা কোর্ট (ঘ) সিন্ডিকেট (ঙ) অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল (চ) ফ্যাকাল্টিজ (ছ) ফিনান্স কমিটি (জ) বোর্ড-অব-স্টাডিজ (ঝ) নির্বাচন কমিটি।

গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় (Rural University) : বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সংক্রান্ত যে সকল সুপারিশ কমিশন করেছিলেন তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা। কমিশন উপলব্ধি করেছিলেন যে ভারতবর্ষে যেসব কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল সেগুলোর মাধ্যমে শহরাঞ্চলের বাসিন্দাদের স্বার্থ রক্ষা হলেও গ্রামের ছেলেমেয়েরা উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছ। তাই গ্রামে যেসব ছেলেমেয়ে বসবাস করে এবং যাদের শহরে এসে পড়ার সুযোগ হয় না তাদের উচ্চশিক্ষার জন্য কমিশন গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় নামে এবং নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন।

গ্রামের মানুষ যাতে গ্রামের মধ্যেই নিম্নতর প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত শিক্ষালাভ করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই কমিশন গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। ভারতের সমাজ, সংস্কৃতি অর্থনৈতিক জীবনে গ্রামের গুরুত্ব বিবেচনা করে শিক্ষাব্যবস্থাকে গ্রাম জীবনের সঙ্গে সমন্বয় সাধনের কথাও রিপোর্টে বলা হয়েছে। কমিশন সুপারিশ করেন যে, ভারতের নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অগণিত গ্রামবাসীর প্রয়োজন সামনে রেখে উচ্চশিক্ষার কর্মসূচী গ্রহণ করবে। যেমন শহরের উচ্চশিক্ষায় কারিগরী, যন্ত্রশিক্ষা, চিকিৎসাবিদ্যা প্রভৃতি প্রাধান্য লাভ করে থাকে সেখানে গ্রামীণ উচ্চশিক্ষায় প্রাধান্য লাভ করবে জনশিক্ষা, কৃষি, গ্রামোন্নয়ণ, সমাজ উন্নয়ণ প্রভৃতি। গ্রাম্যজীবনে বিশেষ চাহিদা ও স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম রচনা করা হবে। এখান থেকে শিক্ষালাভের পর শিক্ষার্থীদের প্রথম ও প্রধান কাজ হবে ভারতের মানুষের জীবনযাত্রার সংস্কার সাধন ও তার মান উন্নয়ণ করা।

গ্রামের মানুষের প্রয়োজন মেটাতে, তাদের চলমান সভ্যতার আলোকে আলোকিত করতে কমিশন শিক্ষাক্ষেত্রে চারটি স্তরের উল্লেখ করেছেন। যেগুলো হল -

(১) প্রাথমিক শিক্ষা (Primary Education)
(২) মাধ্যমিক শিক্ষা বা উত্তর বুনিয়াদী শিক্ষা (Secondary Education or Post Basic Education)
(৩) কলেজীয় শিক্ষা (College Education)
(৪) বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষা (University Education)

প্রাথমিক শিক্ষা : প্রাথমিক স্তরের সঙ্গে যুক্ত থাকবে আট বছরের বুনিয়াদী শিক্ষা, গান্ধিজির বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কমিশন এই পরিকল্পনারই আরও ব্যাপক রূপ দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত একটি সর্বাঙ্গীন ব্যবস্থার প্রস্তাব করেন।

মাধ্যমিক শিক্ষা : মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশ হল -

(১) মাধমিক বিদ্যালয়গুলোকে আবাসিক করতে হবে।
(২) প্রতিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে একটি আদর্শ গ্রাম গড়ার বিষয়ে উদ্যোগী হতে হবে।
(৩) প্রতিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৩০ থেকে ৬০ একর জায়গা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে। তার মধ্যে থাকবে বিদ্যালয়গৃহ, খেলার মাঠ, কৃষিক্ষেত্র, কর্মশালা, পশুচারণ ক্ষেত্র, ছাত্রাবাস, শিক্ষকদের আবাসন, বাগান ইত্যাদি।
(৪) বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা ১৫০ জনের বেশি হবে না।
(৫) পাঠ্যসূচীর ৫০ শতাংশ হবে তাত্ত্বিক এবং ৫০ শতাংশ হবে ব্যবহারিক বিষয়।

কলেজীয় শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষা : মাধ্যমিক স্তরের পর গ্রামীণ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। কতকগুলো গ্রামীণ কলেজ নিয়ে একটি গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় হবে। স্নাতক স্তরের শিক্ষা হবে কলেজে এবং স্নাতকোত্তর স্তরের পাঠদান ও গবেষণা হবে বিশ্ববিদ্যালয়ে। গ্রামীণ বিষয়গুলো ছাড়াও উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার জন্য অন্যান্য বিষয়ের পাঠদানের ব্যবস্থা থাকবে। পাঠ্যক্রমে প্রধান বিষয় হিসাবে থাকবে দর্শন, ভাষা, সাহিত্য, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, জীববিদ্যা, শরীরবিদ্যা, সমাজবিদ্যা, মনোবিদ্যা, অর্থনীতি, কৃষিবিদ্যা ইত্যাদি।

গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হল -

(১) গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকাভুক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজগুলোর অনুমোদন দান।
(২) সম্পূর্ণ আবাসিক শিক্ষালয় গড়ে তোলা।
(৩) রচিত পাঠ্যক্রম হবে গ্রাম্য সমাজে সংস্কৃতি, শিল্প ও অর্থনীতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।
(৪) গ্রাম্য জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত শিক্ষা, অর্থনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণার ব্যবস্থা করা।

উপসংহার : রাধাকৃষ্ণান কমিশনের প্রতিবেদনটি নব ভারত গঠনের পক্ষে এক ঐতিহ্যপূর্ণ, তথ্যবহুল দলিল। কমিশন ভারতে প্রচলিত শিক্ষার বিভিন্ন ত্রুটি তুলে ধরে সেগুলো দূরীকরণের জন্য যে সুপরামর্শ দিয়েছে তা অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে। কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষের আর্থ সামাজিক কাঠামো সুদৃঢ় করতে কমিশন কৃষিবিদ্যা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, পেশাগত শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ

করেছেন। কমিশন শিক্ষাকে গণতান্ত্রিক আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত করার সুপারিশ করে আধুনিক ও প্রগতিশীল মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে। অর্থ বণ্টনের জন্য ইউ.জি.সি. গঠন এবং গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশও ছিল প্রয়োজনীয় ও প্রশংসনীয়। সুতরাং, সবদিক থেকে বিচার বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, রাধাকৃষ্নান কমিশনের সুপারিশগুলো আমাদের দেশে যে-কোনো কালে শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

দ্বিতীয় একক — মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (১৯৫২-৫৩)

পটভূমি : ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৪৮ স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষা কমিশন (রাধাকৃষ্ণাণ কমিশন) বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজীয় শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠনের জন্য বিভিন্ন সুপারিশ করেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার পূর্বশর্ত হল মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠন। তাই স্বাধীনতার পর সর্বভারতীয় ভিত্তিতে মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কারের জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পর্ষদ (CABE) প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধান ও প্রচলিত ব্যবস্থার উপযোগিতা বিচারের জন্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ ড. তারাচাঁদের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির সদস্যবৃন্দ মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠনকল্পে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট একটি কশিশন গঠনের প্রস্তাব দেয়। ওই প্রস্তাব অনুযায়ী তদানীন্তন ভারত সরকার, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন উপাচার্য ড. লক্ষনস্বামী মুদালিয়র-এর সভাপতিত্বে ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন, ১৯৫২ (The Secondary Education Commission, 1952) নামে একটি কমিশন গঠন করে। মুদালিয়র-এর নাম অনুসারে এই কমিশনকে 'মুদালিয়র কমিশন' নামে অভিহিত করা হয়।

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন তথা মুদালিয়র কমিশনের মোট সদস্যসংখ্যা ছিল ৯ জন। এদের মধ্যে দুজন বিদেশী সদস্য ছিলেন। তাঁরা হলেন -

(১) ড. লক্ষনস্বামী মুদালিয়র (সভাপতি) (Dr. A. Lakshmanswami Mudaliar, President)
(২) শ্রী অনাথ বসু (Sri. Anath Basu)
(৩) শ্রীমতি হংস মেহতা (Smt. Hangs Mehta)
(৪) শ্রী জে.এ. তারপরভেলা (Dr. J.A. Tarparvela)
(৫) ড. কে.এস. শ্রীমানী (Dr. K.S. Srimani)
(৬) শ্রী কে.জি. সাইয়াদীন (Sri. K.G. Saiyidain)
(৭) শ্রী এস. টি . ব্যাস (Sri. S.T. Byas)
(৮) জন ক্রিস্টি (John Kristi, Principal of James College, OXFORD)
(৯) ড. কিনেথ উইলিয়াম (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)

মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার সবদিক বিচার বিশ্লেষণ করে ১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দে কমিশন ভারত সরকারের কাছে ৩১১ পৃষ্ঠা সম্বলিত একটি দীর্ঘ রিপোর্ট পেশ করে। মুদালিয়র কমিশনের এই রিপোর্টে ১৬ অধ্যায়ে মাধ্যমিক শিক্ষার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করা হয় এবং প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ নথিভুক্ত করা হয়।

কমিশনের বিচার্য বিষয়সমূহ :

(১) মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার লক্ষ্য কি হবে - তা নির্ধারণ,
(২) মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠন সম্পর্কে পরামর্শ দান,
(৩) পাঠ্যক্রম প্রণয়ন এবং পাঠ্যক্রমের পুনর্বিন্যাস সম্পর্কে পরামর্শ দান,
(৪) প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার সঙ্গো মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার সমন্বয়ের বিষয়ে পরামর্শ দান,

(৫) বিভিন্ন ধরনের যেসকল মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হবে, তাদের মধ্যে গড়ে ওঠা সম্পর্ক সম্বন্ধে পরামর্শ দান,

(৬) মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত অন্যান্য বিষয়ের সংস্কার সম্বন্ধে সুপারিশ দান।

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের সুপারিশসমূহ (Recommendation of Secondary Education Commission)

১৯৫২ খ্রীস্টাব্দে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন সারা ভারতবর্ষের মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তাদের ত্রুটিগুলো চিহ্নিত করেন। কমিশন লক্ষ্য করেন যে, প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা ছিল বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন, পাঠ্যক্রম ছিল বৈচিত্রহীন ও গতানুগতিক, এই শিক্ষাব্যবস্থায় আত্ম সক্রিয়তা ও আত্মপ্রত্যয়ের স্থান নেই। সার্বিক বিকাশের সুযোগ নেই। মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য ছিল সংকীর্ণ। তাই কমিশন তার সুপারিশের প্রথমেই মাধ্যমিক শিক্ষার একটি সুসংহত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করেন।

মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য :

(১) আদর্শ নাগরিক সৃষ্টি - কমিশনের মতে, শিক্ষার্থীদর এমন শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে যাতে তারা গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক হিসাবে দায়িত্বগুলো যোগ্যতার সাথে পালন করতে পারে এবং সমস্ত বিভাজনপ্রবণ প্রবণতাগুলো যা উদার জাতীয়তাবোধ ও ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে, সেগুলো প্রতিরোধ করতে পারে।

(২) জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি - মাধ্যমিক শিক্ষার অপর একটি লক্ষ্য হল জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করা। শিক্ষার্থীদের এমনভাবে প্রশিক্ষণ দিতে হবে যাতে তারা ভারতবর্ষের জাতীয় আয় বৃদ্ধি করে অর্থনৈতিক কাঠামো সুদৃঢ় করে এবং জীবনের মান উন্নয়ণের গুরুদায়িত্ব পালনে আগ্রহী ও সমর্থ হয়।

(৩) গণ সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন - বৈদেশিক শাসনে শাসিত ও নিষ্পেষিত ভারতবাসী দারিদ্রের শিকার হয়ে শক্তি হারায় ; ফলে ভারতের গণসংস্কৃতির স্বাভাবিক বিকাশ পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। তাই মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য হবে দেশের সংস্কৃতিকে উজ্জীবিত করা।

(৪) গণতান্ত্রিক মনোভাব সৃষ্টি - শিক্ষার্থীদের চরিত্র গঠনের সহায়ক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করে গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীরা যাতে যোগ্য ও সক্ষম সুনাগরিক হয়ে উঠতে পারে - সেটাই হবে মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য।

(৫) অর্থনৈতিক বিকাশে সহায়তা - মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য হবে শিক্ষার্থীদের এমন শিক্ষায় শিক্ষিত করা যাতে তারা বৃত্তিমূলক দক্ষতা অর্জন করতে পারে এবং দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধনে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে পারে।

(৬) জাতীয় সংস্কৃতি গঠন - মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য হবে, সাহিত্য, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক দিকে তাদের উৎসাহ বৃদ্ধি করে তাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের ও আত্ম প্রকাশের সুযোগ করে দেওয়া। মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম এমনভাবে রচিত হবে যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যোগ্যতা বৃদ্ধি করে সংস্কৃতিসম্পন্ন নাগরিক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

(৭) নেতৃত্ব দানের শিক্ষা - কমিশন বলেছেন যে, দেশে সর্বভারতীয় স্তরের নেতার অভাব না থাকলেও মধ্যবর্তী স্তরে নেতার ঘাটতি আছে। যেহেতু সৎ, নিষ্ঠাবান আঞ্চলিক নেতাদের নেতৃত্বে দেশের উত্তরোত্তর

শ্রীবৃদ্ধি হতে পারে, সেহেতু মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য হবে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্ব গ্রহণের উপযোগী শিক্ষা দেওয়া।

(৮) আদর্শ বিদ্যালয় পরিবেশ সৃষ্টি - মাধ্যমিক শিক্ষার আর একটি লক্ষ্য হবে শিক্ষার্থীরা যেন আদর্শ বিদ্যালয় পরিবেশ রচনা করতে ভূমিকা নিতে পারে।

(৯) বয়ঃসন্ধিকালের চাহিদা - মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা বয়ঃসন্ধিকালের যাত্রী। তাই শিক্ষার্থীদের বয়ঃসন্ধিকালের দৈহিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক, সামাজিক - বিভিন্ন বিকাশের ধারা ও চাহিদার কথা মাথায় রেখে মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য স্থির করার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন।

(ক) মানসিক তাড়নায় তাড়িত বয়ঃসন্ধিকালের শিক্ষার্থীরা চিরচঞ্চল জগতের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হতে চায়, তারা হতে চায় আত্মনির্ভরশীল। তাই শিক্ষালয়ে এমন সমস্ত কার্যাবলির অন্তর্ভুক্তি করতে হবে যাতে তাদের মধ্যে দায়িত্ববোধের জাগরণ ঘটে, সামাজিক গুণের বিকাশ হয়, আত্মনির্ভরশীল হওয়ার পথ প্রশস্ত হয়।

(খ) দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তন হেতু বয়ঃসন্ধিকালের শিক্ষার্থীদের মনে যৌন কৌতুহল দেয়। ঝড়-ঝঞ্ঝামুখর কৈশোরে মনের মধ্যে নানারূপ দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। সুতরাং, দ্বন্দ্বের প্রশমন ঘটাতে পাঠ্যক্রম সৃজনশীল কর্মের ব্যবস্থা রাখতে হবে, যাতে তারা সৃজনাত্মক কাজের মধ্য দিয়ে আদর্শ জীবনদর্শনের অধিকারী হতে পারে।

(গ) বয়ঃসন্ধিকালে শিক্ষার্থীরা খুবই কর্মমুখর হয়ে উঠে। সেই কারণে মাধ্যমিক শিক্ষা যাতে শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তার চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়, তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে।

(ঘ) বয়ঃসন্ধিকালে শিক্ষার্থীদের আবেগ ও প্রক্ষোভ যাতে বাঞ্ছিত পথে প্রশমিত হয়। তার জন্য মাধ্যমিক স্তরে বৃত্তিমূলক শিক্ষার আয়োজন করতে হবে।

(১০) মানসিক গুণাবলির বিকাশ - মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য হবে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করা, কর্মপ্রেরণা জাগ্রত করা এবং বিভিন্ন ধরনের মানবিক গুণাবলির বিকাশ সাধনে সহায়তা করা।

(১১) নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও কুসংস্কারমুক্ত সমাজ গঠন - মাধ্যমিক শিক্ষার আর একটি লক্ষ্য হল কুসংস্কারমুক্ত সমাজ গঠন। শিক্ষার্থীদের এমনভাবে শিক্ষা দিতে হবে যাতে তারা দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে পারে।

মাধ্যমিক শিক্ষার কাঠামো

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার এমন এক কাঠামো তৈরি করতে চেয়েছেন যাতে শিক্ষার্থীরা বাস্তবধর্মী অভিজ্ঞতা লাভ করে উপযুক্ত দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়। কমিশনের মতে মানবজীবনের প্রস্তুতির জন্য মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কর্মকেন্দ্রিক জীবনের এই প্রস্তুতির কালকে ফলপ্রসু করতে কমিশন প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের সঙ্গে উচ্চশিক্ষা স্তরের সুসামঞ্জস্য বিধানের কথা বলেছে। কমিশন তাঁদের সুপারিশে সম্পূর্ণ বিদ্যালয়ের শিক্ষাকালকে ১২ বছর করার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছে। উক্ত ১২ বছরের মধ্যে থাকবে প্রথম স্তরে ৪ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা বা ৫ বছরের নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষা; প্রথম স্তর শেষে শুরু হবে মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর। এই মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় দুটি পর্যায় থাকবে। প্রথম পর্যায়ে ৩ বছরের উচ্চ বুনিয়াদী শিক্ষা বা ৪ বছরের নিম্ন মাধ্যমিক স্তর। আর দ্বিতীয় পর্যায়ে থাকছে ৪ বছরের উচ্চতর মাধ্যমিক স্তর।

মুদালিয়র কমিশনের প্রস্তাবিত ১২ বছরের শিক্ষাকালের কাঠামো হল —
৪ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা → ৪ বছরের নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা → ৪ বছরের উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা = ১২ বছরের সম্পূর্ণ বিদ্যালয় স্তরের শিক্ষা।
৫ বছরের নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষা → ৩ বছরের উচ্চ বুনিয়াদী শিক্ষা → ৪ বছরের উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা = ১২ বছরের সম্পূর্ণ বিদ্যালয় স্তরের শিক্ষা।

কাঠামো সম্পর্কে মুদালিয়র কমিশনের পরবর্তীকালের বিকল্প পদক্ষেপ :

মুদালিয়র কমিশন পরবর্তীকালে অভিভাবক ও কর্তৃপক্ষের সুযোগ সুবিধার কথা ভেবে বিকল্প এক শিক্ষা কাঠামো গঠনের সুপারিশ করেছেন, তা হল - প্রচলিত বিদ্যালয় স্তরের শিক্ষাকালকে ১০ বছরের পরিবর্তে ১১ বছর করা হয়েছে এবং প্রচলিত 'ইন্টারমিডিয়েট' স্তরের ২ বছরের শিক্ষাকালকে এক এক বছর করে ভাগ করা হয়েছে। উক্ত ২ বছরের মধ্যে এক বছর মাধ্যমিক স্তরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ১১ বছরের সম্পূর্ণ বিদ্যালয় শিক্ষাস্তরের শিক্ষা শেষ হবে এবং অপর এক বছর প্রচলিত দুবছরের স্নাতক স্তরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তিন বছরের স্নাতক গঠিত হবে। তবে যতদিন না পর্যন্ত উপরোক্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হচ্ছে। ততদিন পর্যন্ত নিম্ন মাধ্যমিক ও প্রস্তাবিত উচ্চতর মাধ্যমিক উভয় ব্যবস্থাই পাশাপাশি চালানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

কমিশনের সুপারিশে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর সম্বন্ধে আরও কতকগুলো প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে সেগুলো হল - (ক) দশম শ্রেণির বিদ্যালয়গুলোকে একাদশ শ্রেণির (HS বা হায়ার সেকেণ্ডারী) বিদ্যালয়ে উন্নীত করার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(খ) যেসকল শিক্ষার্থী স্কুল ফাইনাল (দশম শ্রেণি) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে তাদেরকে এক বছরের প্রাক্ বিশ্ববিদ্যালয় কোর্স অধ্যয়ন করে স্নাতক স্তরে পড়ার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।

(গ) যে সকল শিক্ষার্থী একাদশ শ্রেণির পাঠ তথা HS অথবা PU (প্রাক্ বিশ্ববিদ্যালয়) কোর্স শেষ করবে তারাই শুধুমাত্র পেশাগত শিক্ষার কলেজে ভর্তি হবার জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

(ঘ) বৃত্তি বা পেশাগত শিক্ষার কলেজগুলোতে এক বছরের প্রাক্ বৃত্তিমূলক কোর্স চালু করার প্রস্তাবও করা হয়।

(ঙ) আর্থিক সংগতির কথা বিবেচনা করে কমিশন বলেছে, যতদিন না পর্যন্ত সমস্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোকে উচ্চতর মাধ্যমিকে উন্নীত করা যায়, ততদিন পর্যন্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক, গ্রন্থাগার, পরীক্ষাগার, সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলির ব্যবস্থা করতে হবে।

(চ) শিক্ষার্থীরা যাতে নিজেদের রুচি, প্রবণতা ও সামর্থ অনুযায়ী শিক্ষালাভের সুযোগ পায়, তার জন্য মাধ্যমিক স্তরে বহুমুখী বিদ্যালয় স্থাপনের কথাও বলা হয়।

(ছ) সাধারণ শিক্ষা কাঠামোর পাশাপাশি কমিশন কারিগরী শিক্ষার কাঠামো সম্পর্কে বলেন, প্রতিটি রাজ্যে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে বহুমুখী বিদ্যালয়ের সঙ্গে অধিক সংখ্যক কারিগরী বিদ্যালয় বা প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষার প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা দরকার। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর পাঠ্যক্রম প্রণয়ন, নিয়মনীতি নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণের জন্য AICTE (All India Council for Technical Education) -এর মতো সংস্থাগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে শিক্ষাক্রম পরিচালনার প্রস্তাব দেওয়া হয়।

(জ) কমিশনের মতে, শিক্ষাক্ষেত্রে ছেলেমেয়ে উভয় সম্প্রদায় একই ধরনের সুযোগ লাভ করবে। তবে সহশিক্ষার বিদ্যালয়ে এবং কেবল মেয়েদের জন্য স্থাপিত বিদ্যালয়ে 'গাহর্স্থ্য বিজ্ঞান' শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

পাঠ্যক্রম (Curriculum)

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের মতে, প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম বহুলাংশে ত্রুটিপূর্ণ। এই পাঠ্যক্রম দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ণের পথ প্রদর্শক নয়। এখানে কারিগরী শিক্ষার বা বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রয়োজনমুখী ব্যবস্থা নেই, বাস্তবতার স্পর্শবর্জিত এই পাঠ্যক্রম সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির শিকার। তাই গতানুগতিক পাঠ্যক্রমের বিলোপ সাধন করে বাস্তবধর্মী, আগ্রহভিত্তিক, গতিশীল জীবনোপযোগী এক পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থা করতে হবে। কমিশনের মতে, পাঠ্যক্রমের অর্থ শুধুমাত্র বিদ্যালয়ে পঠনীয় গতানুগতিক কতকগুলো শিক্ষামূলক বিষয়কে বোঝায় না। বরঞ্চ এর অন্তর্গত হল সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা, যা শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে গিয়ে বিবিধ কার্যাবলির মাধ্যমে গ্রহণ করে - যেমন শ্রেণিকক্ষে, গ্রন্থাগারে, পরীক্ষাগারে, কর্মশালায়, খেলার মাঠে এবং শিক্ষকদের সংস্পর্শে এসে বিবিধ অপ্রথাগত সংযোগের মাধ্যমে। এর পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যালয় জীবন সর্বদিকে শিক্ষার্থীদের জীবন স্পর্শ করে এবং ভারসাম্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বের বিকাশে সাহায্য করে।

কমিশন পাঠ্যক্রম রচনা করার জন্য কতগুলো মৌলিক নীতি অবলম্বন করার কথা বলেছেন, সেই নীতিগুলো হল -

(ক) পাঠ্যক্রম হবে বৈচিত্রপূর্ণ। শিক্ষার্থীদের মানসিক ক্ষমতা ও ইচ্ছানুযায়ী এটি রচিত হবে।

(খ) সামাজিক পরিবেশ ও সামাজিক চাহিদা অনুযায়ী পাঠ্যক্রম নির্বাচন করতে হবে।

(গ) পাঠ্যক্রমে সাধারণ শিক্ষামূলক বিষয়গুলো ছাড়া অবসর বিনোদনমূলক কার্যাবলি অন্তর্ভুক্ত থাকবে, যাতে অবসর সময় অবসাদমুক্ত, আনন্দমুখর, মানসিক তৃপ্তিদায়ক হয়।

উপরিউক্ত মৌলিক নীতিগুলোকে সামনে রেখে কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার দুটি পর্যায়ের জন্য দুটি পৃথক পাঠ্যক্রমের সুপারিশ করেছে।

(১) প্রথম পর্যায়ের জন্য অর্থাৎ নিম্ন মাধ্যমিক বা উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলোর জন্য যে পাঠ্যক্রমের সুপারিশ করেছে তা হল - (ক) ভাষাসমূহ (খ) সমাজবিদ্যা (গ) সাধারণ বিজ্ঞান (ঘ) গণিত (ঙ) কলা ও সংগীত (চ) হস্তশিল্প (ছ) শারীর শিক্ষা।

এই পর্যায়ে মাতৃভাষা ছাড়া হিন্দি ও ইংরেজী থাকবে; তবে ইংরেজী বাধ্যতামূলক হবে না বলে এর পরিবর্তে অন্য কোনো ভারতীয় ভাষা পাঠ্যক্রমে থাকবে। আবার মাতৃভাষা হিন্দী হলে তার পরিবর্তে অন্য কোনো ভারতীয় ভাষা পাঠ্যক্রমে থাকবে। উক্ত বিষয়গুলো ছাড়া থাকবে ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, পৌরনীতি প্রভৃতি।

(২) দ্বিতীয় পর্যায় অর্থাৎ উচ্চ এবং উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যক্রম নির্ধারমের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক কমিশন শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত সামর্থ্য ও আগ্রহের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। কমিশন দ্বিতীয় পর্যায়ের এই পাঠ্যক্রমকে দুটি অংশে ভাগ করেছে, সেগুলো হল -

(ক) আবশ্যিক (Compulsory) বা মূল (Core) অংশ

(খ) ঐচ্ছিক (Elective) অংশ

পাঠ্যক্রমের আবশ্যিক বা মূল অংশের বিষয়সমূহ

মুদালিয়র কমিশন পাঠ্যক্রমের আবশ্যিক বা মূল অংশে যে বিষয়গুলোকে উপস্থাপন করেছেন, তা নিচে উল্লেখ করা হল -

(১) ভাষা - এই পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের দুটি ভাষা শিখতে হবে।

(a) মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা অথবা মাতৃভাষা এবং প্রাচীন ভাষার মিশ্রণ

(b) নিচে উল্লেখিত ভাষাগুলোর মধ্যে যে-কোনো একটি -

(i) হিন্দি (যাদের মাতৃভাষা হিন্দি নয়)

(ii) প্রাথমিক ইংরেজি (ইংরেজি যারা পূর্বে পড়েনি)

(iii) ইংরেজি (যারা পূর্বস্তরে ইংরেজী পড়েছে)

(iv) হিন্দি ছাড়া একটি আধুনিক ভারতীয় ভাষা

(v) ইংরেজী ছাড়া একটি আধুনিক ভারতীয় ভাষা

(vi) একটি প্রাচীন ভাষা

(২) সমাজবিজ্ঞান - সাধারণ পাঠ (প্রথম দু-বছরের জন্য)

(৩) গণিত ও সাধারণ বিজ্ঞান - সাধারণ পাঠ (প্রথম দু-বছরের জন্য)

(৪) হস্তশিল্প - নিচে উল্লেখিত বিষয়গুলোর মধ্যে যে-কোনো একটি বয়ন বা বুনন, কাঠের কাজ, ধাতুর কাজ, উদ্যান রচনা, দর্জির কাজ, টাইপোগ্রাফি, কর্মশালায় প্রস্তুতিমূলক কাজ, সেলাই ও সুচিশিল্প, মূর্তি শিল্প ইত্যাদি।

পাঠ্যক্রমের ঐচ্ছিক অংশের বিষয়সমূহ

কমিশন ঐচ্ছিক পাঠ্যক্রমে বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়গুলোকে সাতটি মূল প্রবাহে বা বিভাগে ভাগ করে উপস্থাপন করেছেন। এদের যে-কোনো বিভাগ থেকে শিক্ষার্থীকে তিনটি বিষয় নির্বাচন করতে হবে। নিচে সাতটি বিভাগ ও সেগুলোর অন্তর্গত বিষয় উল্লেখ করা হল -

মূল বিভাগ	বিভাগ বা প্রবাহের অন্তর্গত বিষয়সমূহ
(১) মানবীয় বিদ্যা	(i) একটি প্রাচীন ভাষা বা একটি তৃতীয় ভাষা যা শিক্ষার্থী আবশ্যিক অংশে গ্রহণ করেনি। (ii)ইতিহাস (Humainities) (iii) ভূগোল (iv) অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান (v)মনোবিজ্ঞান ও তর্কশাস্ত্র (vi) গণিত (vii) সংগীত (viii) গার্হস্থ্য বিজ্ঞান।
(২) বিজ্ঞান	(i) পদার্থবিদ্যা (ii) রসায়ন বিদ্যা (iii) জীবন বিজ্ঞান (iv) ভূগোল (v) গণিত (vi) প্রাথমিক শারীরবিদ্যা (Science)ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান।
(৩) কারিগরি বিদ্যা	(i) ব্যবহারিক গণিত ও জ্যামিতিক অঙ্কণ (ii) ফলিত বিজ্ঞান (iii) প্রযুক্তি বিদ্যা - মেকানিক্যাল (Technical)ইঞ্জিনীয়ারিং অথবা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং

(৪) বাণিজ্য	(i) বাণিজ্যের প্রয়োগবিদ্যা (ii) হিসাব নিকাশ (iii) বাণিজ্যিক ভূগোল বা প্রাথমিক অর্থনীতি ও (Commerce)পৌরবিজ্ঞান (iv) শর্টহ্যান্ড ও টাইপ রাইটিং
(৫) কৃষি	(i) সাধারণ কৃষিবিদ্যা (ii) পশুপালন (iii) উদ্যান রচনা ও কৃষিকাজ (iv) কৃষি রসায়ন ও উদ্ভিদবিদ্যা।(Agriculture)
(৬) চারুকলা	(i) চারুকলার ইতিহাস (ii) অঙ্কণ ও নক্‌শা (iii) চিত্রাঙ্কণ (iv) সংগীত কলা (v) নৃত্যকলা।(Fine Arts)
(৭) গার্হস্থ্য বিজ্ঞান	(i) গার্হস্থ্য অর্থনীতি (ii) খাদ্য প্রস্তুতি ও রন্ধন প্রণালী (iii) মাতৃমঙ্গাল ও শিশুপালন (iv) গৃহ (Home Science)পরিচালনা ও শুশ্রূষা (v) অন্যান্য যে-কোনো বিভাগ থেকে যে-কোনো একটি অতিরিক্ত বিষয় শিক্ষার্থী নির্বাচন করতে পারে।

পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার —

পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারকল্পে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেছেন, সেগুলো হল -

(১) কমিশন রচনাধর্মী পরীক্ষার পরিবর্তে নৈব্যক্তিক পরীক্ষার প্রচলনের কথা ব্যক্ত করেছেন।

(২) পরীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি করতে হবে।

(৩) কমিশন শুধুমাত্র বার্ষিক পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করার পরিবর্তে তাদের বিদ্যালয় জীবনের সব ধরনের ঘটনাগুলো সর্বাত্মক পরিচয়পত্র বা কিউম্যুলেটিভ রেকর্ড কার্ড (Cumulative Record Card)-এ লিপিবদ্ধ করার সুপারিশ করে।

(৪) স্কুল রেকর্ডে সাংখ্যমানের পরিবর্তে গ্রেডিং ব্যবস্থা অর্থাৎ A, B, C, D প্রভৃতি প্রতীক চিহ্ন ব্যবহার করতে হবে।

(৫) সাধারণ বহিঃস্থ পরীক্ষার একটি বা দুটি বিষয়ে যারা অকৃতকার্য হবে তাদের জন্য কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষা গ্রহনের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

(৬) মাধ্যমিক শিক্ষার পরিসমাপ্তিতে একটিমাত্র বহিঃপরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে।

শিক্ষক সম্পর্কিত সুপারিশসমূহ -

মুদালিয়র কমিশন শিক্ষকদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে কতকগুলো মূল্যবান সুপারিশ করেছেন। সেগুলো হল -

(১) শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বত্র একই নীতি অবলম্বন করতে হবে।

(২) জীবনজীবিকার স্বার্থে শিক্ষকদের জন্য পেনশন, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, জীবনবিমা প্রভৃতি ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

(৩) শিক্ষকদের অবসর গ্রহণের বয়স ৬০ বছর হতে হবে।

(৪) শিক্ষকদের যোগ্যতা অনুযায়ী যাতে বেতন প্রদান করা যায় তার জন্য বিশেষ কমিটি নিয়োগ করতে হবে।

(৫) প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকদের জন্য সরকার স্নাতকদের জন্য এক বছরের এবং যারা স্নাতক নয় তাদের জন্য দুই বছরের শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থা করবে।

বিদ্যালয় পরিচালনা বা প্রশাসন সম্পর্কিত সুপারিশ (School Administration) :

বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন যেসব সুপারিশ করেছে, সেগুলো হল -

(১) মাধ্যমিক শিক্ষার নীতি নির্ধারণ করবে মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ, যার সদস্য সংখ্যা হবে অনধিক ২৪ জন এবং এর সভাপতি হবেন মাধ্যমিক শিক্ষা অধিকর্তা

(২) প্রতিটি রাজ্যে পরামর্শ দানের জন্য রাজ্য শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করতে হবে।

(৩) বিদ্যালয় পরিদর্শনের জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন পরিদর্শক নিয়োগ করতে হবে।

(৪) প্রতিটি বিদ্যালয়ে একটি পরিচালনা সমিতি থাকবে।

(৫) বিদ্যালয়ে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩০০-৭৫০ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে এবং কোনো শ্রেণির শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩০-৪০ এর মধ্যে থাকবে।

(৬) সপ্তাহে নিয়মিত পঠন পাঠনের দিনসংখ্যা হবে ৬ দিন।

নির্দেশনা ও পরামর্শদান (Guidance and Counselling)

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনার জন্য যেসব সুপারিশ করেছে সেগুলো হল -

(১) প্রত্যেকটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত গাইডেন্স অফিসার (Guidance Officer) এবং কেরিয়ার মাস্টার (Career Master) নিয়োগ করতে হবে।

(২) যথাযথ নির্দেশনা, যথাযথ পরামর্শদানের জন্য শিক্ষক, অভিভাবক ও পরামর্শদাতা শিক্ষককে বিশেষ ভূমিকা নিতে হবে। স্মরণে রাখতে হবে যে, তাঁদের যৌথ প্রয়াসে গড়ে দিতে পারে মূল্যবোধ, নীতিবোধ, কল্যাণকর জীবনদর্শন। কমিশন পরামর্শদাতা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার সুপারিশ করেছে।

(৩) বহুমুখী শিক্ষাক্রম সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীরা যাতে বিভিন্ন তথ্য জানতে পারে, তার জন্য চলচ্চিত্রের মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

পাঠ্যপুস্তক

পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের সুপারিশগুলো হল -

(১) পাঠ্যপুস্তকের উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করতে হবে।

(২) কমিশন পাঠ্যপুস্তক বিক্রয় থেকে একটি তহবিল গঠনের সুপারিশ করেন। ওই তহবিল থেকে মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তিদান, দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য বিনামূল্যে পুস্তক বিতরণ এবং অন্যান্য সাহায্যে প্রদানের সুপারিশও করা হয়।

(৩) কোনো বিষয়ের একটিমাত্র পুস্তকের পরিবর্তে সমমানের একাধিক পুস্তক মনোনীত করা যাবে।

(৪) পাঠ্যপুস্তক কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের ধর্ম বা রাজনৈতিক মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হবে না।

(৫) পাঠ্যপুস্তকের পরিবর্তন খুব কম সময়ের ব্যবধানে হবে না।

শিক্ষণ পদ্ধতি (Method of Teaching)

মুদালিয়র কমিশন মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীদের জন্য গতিশীল শিক্ষণ পদ্ধতির সুপারিশ করে -

(১) কমিশনের মধ্যে বিদ্যালয় স্তরের শিক্ষণ পদ্ধতির লক্ষ্য হল ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মূল্যবোধ ও সঠিক ধারণা গড়ে তোলা এবং তাদের মধ্যে কর্মের প্রতি আসক্তি সৃষ্টি করা।

(২) পঠন পাঠনের ক্ষেত্রে মুখস্থের পরিবর্তে ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন কর্মমুখী প্রকল্পে যুক্ত করার সুপারিশ করা হয়।

(৩) কমিশন ছাত্রছাত্রীদের দৈনিক বাড়ির কাজ দেওয়ার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন।

(৪) প্রতিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যাতে গ্রন্থাগার গড়ে উঠে তার জন্য কমিশন সুপারিশ করে।

(৫) শিক্ষাদানের সময় ছাত্রছাত্রীদের মনোযোগ আকর্ষণ এবং কঠিন বিষয়গুলো সহজ করে বোঝানোর জন্য শ্রেণিকক্ষে প্রয়োজনীয় শিক্ষা সহায়ক উপকরণ ব্যবহার প্রসঙ্গেও মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন অভিমত ব্যক্ত করেন।

নারীশিক্ষা ও সহশিক্ষা ((Women Education and Co-education))

কমিশনের মতে প্রাথমিক স্তরে সহশিক্ষার প্রচলন ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থায় আগেও ছিল। বর্তমানে সেই সুযোগ উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও দিতে হবে। কমিশনের অভিমত হল যে, পাঠ্যক্রমে গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের শিক্ষা মেয়েরা শিক্ষালয়ে পেলে তারা পরিবার তথা সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালনে ব্রতী হবে। কমিশনের সুপারিশে আরও বলা হয়েছে যে সম্ভব হলে অভিভাবকদের সম্মতিক্রমে মেয়েরা সহশিক্ষার ব্যবস্থাপনায় পঠন পাঠন করবে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিভিন্ন রূপ (Different Types of Schools)

মুদালিয়র কমিশন মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাদানের জন্য বিভিন্ন বিদ্যালয়ের সুপারিশ করেন -

(১) নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় - এই ধরনের বিদ্যালয়গুলোতে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম এই তিনটি শ্রেণি থাকবে। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হবার পর এই ধরনের বিদ্যালয়ে ভরতি হতে পারবে।

(২) উচ্চ বিদ্যালয় - তৎকালীন সময়ে প্রচলিত দশম শ্রেণি বিদ্যালয়গুলোকে উচ্চ বিদ্যালয় বলা হয়ে থাকে।

(৩) উচ্চতর বিদ্যালয় - এই ধরনের বিদ্যালয়গুলোতে অষ্টম শ্রেণি থেকে একাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদানের ব্যবস্থা থাকবে।

(৪) বালিকা বিদ্যালয় - কমিশনের মতে ভারতবর্ষের প্রত্যেক রাজ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে পৃথক পৃথক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৫) আবাসিক বিদ্যালয় - যে সমস্ত ব্যক্তি চাকুরিসূত্রে বিভিন্ন স্থানে ঘুরতে হয়, তাদের ছেলেমেয়েদের জন্য অথবা যাদের অভিভাবক- অভিভাবিকা ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা করতে পারে না, তাদের ছেলেমেয়েদের জন্য কমিশন গ্রামাঞ্চলে আবাসিক বিদ্যালয়ের সুপারিশ করে।

(৬) আবাসিক দিবা বিদ্যালয় - এই ধরনের বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যে ৬টা পর্যন্ত থাকতে পারবে। বিদ্যালয়েই তাদের আহার ও জলখাবারের ব্যবস্থা থাকবে। এর জন্য অভিভাবকদের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করতে হবে।

(৭) আংশিক সময়ের বিশেষ বিদ্যালয় - কমিশনের মতে যে সমস্ত শিক্ষার্থী ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা সম্পূর্ণ না করে মাঝপথে পড়া ছেড়ে দেয়। তাদের জন্য আংশিক সময়ের বিশেষ বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।

(৮) প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় - কমিশনের মতে দৈহিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ ধরনের বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। ফলে প্রতিবন্ধীরা পঠন পাঠনের সুযোগ পাবে।

(৯) পাবলিক স্কুল - কমিশন পাবলিক স্কুলগুলোকে জাতীয় ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে পঠন পাঠন চালানোর জন্য সুপারিশ করেন। বিদ্যালয়গুলো স্বাবলম্বী হওয়া প্রস্তাব দেয়।

(১০) কারিগরী শিক্ষার বিদ্যালয় - দেশের শিল্পাঞ্চলগুলোর নিকটবর্তী অংশে কারিগরী শিক্ষার জন্য যথেষ্ট সংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।

(১১) কৃষি বিদ্যালয় - গ্রামাঞ্চলে কৃষি বিষয়ে শিক্ষার জন্য কৃষি বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।

ভাষাশিক্ষা

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি ত্রিভাষা সূত্রের সুপারিশ করেছে। এক্ষেত্রে কমিশনের সুপারিশ হল -

(১) মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষাই হবে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে শিক্ষার মাধ্যম। কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পর্ষদ এর নির্দেশমতো লঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে।

(২) মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের জন্য তিটি ভাষা শিক্ষা ব্যবস্থায় রাখতে হবে। যেগুলো হল (ক) মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা (খ) হিন্দি (গ) ইংরেজী।

(৩) কমিশনের সুপারিশ হল যে, নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা ছাড়া ইংরেজি ও হিন্দি শিখতে হবে। যাদের মাতৃভাষা হিন্দি তাদের অন্য যে-কোনো একটি ভারতীয় ভাষা শিখতে হবে।

(৪) উচ্চ ও উচ্চতর বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য কমপক্ষে দুটি ভাষা আবশ্যিক থাকবে, যার একটি হবে মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা। সংস্কৃত ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে গৃহীত হতে পারে।

উপসংহার

ব্রিটিশের পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন ভারতের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অর্থনীতি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে সংস্কার ও উন্নতি সাধনের জন্য নতুন গঠিত কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্নভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। ব্রিটিশের শাসনে শোষিত হয়ে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা যখন সংকটাপন্ন, সেইসময় দেশের নেতৃবৃন্দ উপলব্ধি করেছিলেন যে আর্থ সামাজিক অবস্থার পূর্ণবিন্যাস করতে শিক্ষা সংস্কারের আশু প্রয়োজন। তৎকালীন সময়ে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন কমিশন ও কমিটি গঠনের প্রস্তাব নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কমিশন প্রস্তাবিত সকল সুপারিশ বাস্তবে রূপায়িত করার পথে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলেও মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশগুলো ফলশ্রুতি হিসাবে মাধ্যমিক স্তরে বেশ কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই আগামী দিনে আমাদের দেশের মাধ্যমিক শিক্ষা জাতীয় আশা আকাঙ্খা পূরণে সহায়ক হয়ে উঠেছিল। তাই বলা যায়, মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশগুলো আমাদের দেশের মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সামনে নতুন জগতের দরজা খুলে দিয়েছে।

তৃতীয় একক ভারতীয় শিক্ষা কমিশন বা কোঠারী কমিশন (১৯৬৪-৬৬)

পটভূমি : ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে শিক্ষার ক্ষেত্রে যে বৈষম্যমূলক ও নিম্নমানের শিক্ষা কাঠামো গড়ে উঠেছিল, সেই কাঠামো ভেঙে নতুন করে গড়ার প্রয়োজনীয়তা স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে শিক্ষাবিদ ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিগণ উপলব্ধি করেছিলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৪৮-৪৯ সালে রাধাকৃষ্নান কমিশন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার উন্নতিকল্পে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেন এবং পরবর্তী সময়ে ১৯৫২-৫৩ সালে মুদালিয়র কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতিকল্পে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ প্রদান করেন। কিন্তু এই দুটি কমিশনই শিক্ষার এক একটি নির্দিষ্ট স্তরের উন্নতিকল্পে সুপারিশ করে। ফলে সামগ্রিক শিক্ষার অন্যান্য স্তরগুলো উপেক্ষিত রয়ে গেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে তদানীন্তন জাতীয় সরকারের নেতৃবৃন্দ একটি জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার তাগিদ অনুভব করেন। যেখানে প্রাক্ প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা প্রভৃতি সকল স্তরের শিক্ষার বিস্তৃত আলোচনা, সর্বস্তরের শিক্ষার সমস্যা ও তার সমাধানের পথ নির্দেশ থাকবে। তাই তদানীন্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী এম.সি. চাগলার (M.C. Chagla) উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের (University Grants Commission) চেয়ারম্যান ড. ডি. এস. কোঠারীর (Dr. D.S. Kothari) সভাপতিত্বে ১৯৬৪ খ্রীস্টাব্দের ১৪ জুলাই ভারতীয় শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। ডি.এস. কোঠারীর নামানুসারে এই কমিশন কোঠারী কমিশন নামে বিশেষভাবে খ্যাত। এই কমিশনে দেশ ও বিদেশের মোট বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সংখ্যা ছিল ১৭ জন। কমিশনের ১৭ জন সদস্য ছাড়াও ২০ জন বিদেশি পরামর্শদাতা ছিলেন। এঁরা কমিশনকে বিভিন্ন কাজে সাহায্য করেছেন। ভারতীয় সদস্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন জে.পি. নায়েক (J.P. Naik), ড. কে.জি. সাইয়াদিন (Dr. K.G.Saiyidain), ড. ত্রিগুণা সেন (Dr. Triguna Sen), কুমারী এস. পানান্ডিকার (Kumari S. Panandikar), অধ্যাপক এম.ভি.মাথুর (M.V.Mathur) প্রমুখ। এছাড়া বিদেশী সদস্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ইংল্যান্ডের মিস্টার এইচ.এল.এলভিন (H.L.Elvin), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধ্যাপক রজার রেভিল (Roger Revelle), ফরাসী দেশের জিনথমাস (Jean Thomas) ইউনেস্কোর প্যারিস শাখার জে.এফ.ম্যাকডুগাল (J.F. Mcdugal), জাপানের সাদা তোশি ইহারা (Sadatoshi Ihara) প্রমুখ। কমিশন ১৯৬৪ খ্রীস্টাব্দের ২রা অক্টোবর থেকে কাজ শুরু করে ১৯৬৬ খ্রীস্টাব্দের ২৯শে জুন "শিক্ষা ও জাতীয় অগ্রগতি" (Education and National Development) শিরোনামে রিপোর্ট জমা দেন।

কমিশনের রিপোর্টে প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ স্তরের শিক্ষার নানা দিক সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে। এই কমিশন ১২টি Task force গঠন করেন এবং ৭টি working group তৈরি করেন। কমিশন ভারতের সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে বিশেষভাবে অনুসন্ধান করে, বিভিন্ন প্রগতিশীল দেশের শিক্ষাকাঠামো পর্যালোচনা করে ভারতের শিক্ষার ভবিষ্যত রূপ সম্পর্কে যে রিপোর্ট পেনশন করেছে নানা দিকে থেকে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কমিশন তার **রিপোর্টে তৎকালীন ভারতবর্ষের কতগুলো সমস্যা তুলে ধরেন। সেগুলো হল** - (১) খাদ্য সমস্যা (২) বেকারত্বের সমস্যা (৩) সামাজিক ও জাতীয় সংহতির সমস্যা (৪) বিজ্ঞান ও প্রয়োগ বিদ্যায় ভারতের অনগ্রসরতা (৫) আত্মিক মূল্যবোধের সমস্যা। কমিশন বলেছেন যে, শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিমাণগত প্রসার এবং গুণগত উন্নতির দ্বারাই

এই সমস্যাগুলো নিরসন করা সম্ভব। তাই কমিশন প্রথমেই জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে বেশ কয়েকটি দিকের উপর সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কমিশন প্রস্তাবিত জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্যগুলো হল -

(১) জাতীয় উৎপাদনমুখী শিক্ষা : কমিশন উৎপাদনমুখী শিক্ষার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কমিশন বলেছে, শিক্ষাকে এমনভাবে পরিচালিত করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ বাড়ে এবং কর্মের প্রতি শিক্ষার্থীদের আকর্ষণবোধ জন্মায়। শিক্ষাকে যদি জাতীয় উৎপাদনমুখী করা যায় তাহলে দেশের জাতীয় আয় বাড়বে এবং দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ঘটবে।

(২) জাতীয় সংহতি স্থাপন : ভারত একটি বৈচিত্রময় দেশ। এখানে বিভিন্ন জাতি, ধর্ম বর্ণের লোক বসবাস করে। ভারতের একটি প্রদেশের সঙ্গে অন্য প্রদেশের ভাষাগত, ধর্মগত, কৃষ্টিগত, সংস্কৃতিগত ব্যবধান রয়েছে। এত ব্যবধান বা বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও, ভারতের প্রতিটি মানুষের একটি বড়ো পরিচয় হল তিনি ভারতীয়। এটিই হল জাতীয় সংহতিবোধ। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষার দ্বারা এই জাতীয় সংহতিবোধ যত বাড়ানো যাবে, ততই দেশের ঐক্য ও সংহতি মজবুত হবে।

(৩) গণতান্ত্রিক চেতনার জাগরণ : কমিশন বলেছেন, গণতন্ত্র একটি মহান আদর্শ। এই আদর্শকে যদি দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হয় তাহলে গণতান্ত্রিক চেতনাকে শৈশবকাল থেকেই জাগিয়ে তুলতে হবে। বিদ্যালয়ে প্রথম থেকেই যদি গণতান্ত্রিক রীতিনীতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বাড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলে সারাজীবন ধরেই শিক্ষার্থীরা গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবে।

(৪) সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের বিকাশ : কমিশনের মতে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ আমাদের ভারতীয় সমাজ জীবনের ধারক ও বাহক। ভারতীয় সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যকে বিকশিত করতে হলে প্রয়োজন নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের বিকাশ।

(৫) সামাজিক পরিবর্তনে সাহায্য করা : কোঠারী কমিশনে বলা হয়েছে, শিক্ষার একটি বড়ো উদ্দেশ্য হল ব্যক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমাজেরও বিকাশ সাধন করা। সমাজের বিকাশ বলতে বোঝায় সামাজিক উন্নয়ণ ও সামাজিক পরিবর্তন। যে পরিবর্তন সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের মঙ্গল সাধন করবে।

(৬) আধুনিকীকরণ : আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় বিজ্ঞানভিত্তিক প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে। তাই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিজ্ঞানভিত্তিক প্রযুক্তি আনা দরকার, যার দ্বারা আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের উন্নতি সম্ভব হবে, একে কমিশন শিক্ষায় আধুনিকীকরণ (Modernisation) বলেছেন।

কোঠারী কমিশন প্রস্তাবিত শিক্ষার কাঠামো :

কোঠারী কমিশন প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষা থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত শিক্ষাস্তরের একটি কাঠামো স্থির করে, কমিশনের মতে প্রাক্প্রাথমিক স্তরটি হবে তিন বছরের। প্রাথমিক স্তরটি হবে ৭ বা ৮ বছরের। প্রাথমিক স্তরটিকে আবার দুভাবে ভাগ করা হয়েছে - নিম্ন প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক। নিম্ন প্রাথমিক স্তরটি হবে চার বছরের জন্য আর উচ্চ প্রাথমিক স্তরটি হবে চার বছরের জন্য। অষ্টম শ্রেণিতে গিয়ে স্তরটি শেষ হবে। কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরকেও দুটি ভাগে ভাগ করেছেন - নিম্ন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক, নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরটি হবে দু-বছরের, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা দুবছর পড়বে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যক্রম। বিদ্যালয় স্তরে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষালাভের পর শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষা স্তরে প্রবেশের সুযোগ পাবে। কমিশন প্রস্তাবিত শিক্ষার কাঠমোটি হল ১০+২+৩+২। নিচে কোঠারি কমিশন প্রস্তাবিত শিক্ষাস্তরের কাঠামোটি সারণির সাহায্যে দেখানো হল -

শিক্ষার স্তর	শ্রেণির নাম	শিক্ষার্থীর বয়স
(১) প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষা	KG - I KG - II KG - III	৩ বছর ৪ বছর ৫ বছর
(২) নিম্ন প্রাথমিক শিক্ষা	প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ	৬ বছর ৭ বছর ৮ বছর ৯ বছর
(৩) উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষা	পঞ্চম ষষ্ঠ সপ্তম অষ্টম	১০ বছর ১১ বছর ১২ বছর ১৩ বছর
(৪) নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা	নবম দশম	১৪ বছর ১৫ বছর
(৫) উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা	একাদশ দ্বাদশ	১৬ বছর ১৭ বছর
(৬) উচ্চশিক্ষা	স্নাতক - প্রথম বর্ষ স্নাতক - দ্বিতীয় বর্ষ স্নাতক - তৃতীয় বর্ষ	১৮ বছর ১৯ বছর ২০ বছর
	স্নাতকোত্তর - প্রথম বর্ষ স্নাতকোত্তর - দ্বিতীয় বর্ষ	২১ বছর ২২ বছর

প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষা (Pre-Primary Education)

প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষা হল প্রথাগত শিক্ষার প্রথম স্তর। দুই বা আড়াই বছর বয়স থেকে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার আগে পর্যন্ত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকে বলে প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষা। কমিশন বিভিন্ন কারণে প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষা শিশুর মানসিক শক্তি বৃদ্ধির সহায়ক। শিশুর জীবনের ভিত রচনার অন্যতম হাতিয়ার; সুতরাং এই শিক্ষার মূল্য অসীম।

প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and Objectives of Pre-primary Education)

এই স্তরের শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল -

(১) দৈহিক বিকাশ : প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হল দৈহিক বিকাশ। সুস্থ সবল দেহই সুস্থ মনের অধিকারী। তাই শিশুদের সুস্বাস্থ্যের অধিকারী করে গড়ে তোলা প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যে।

(২) মানসিক বিকাশ : এই স্তরে শিশুর মধ্যে কৌতুহল, অনুসন্ধানের ইচ্ছা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। তাই শিশুদের মধ্যে চিন্তাশক্তি জাগিয়ে তোলে তাদের মানসিক বিকাশের পথ সুগম করা হল প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য।
(৩) প্রাক্ষোভিক বিকাশ : এই স্তরে শিশুদের মধ্যে রাগ, ভয়, আনন্দ ইত্যাদি প্রক্ষোভগুলো পরিলক্ষিত হয়। এই প্রক্ষোভগুলোর যথাযথ বিকাশ সাধন করা প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য।
(৪) সামাজিক বিকাশ : শিশুর মধ্যে বিভিন্ন সামাজিক গুণাবলি যেমন সহযোগিতা, সহমর্মিতা, সহানুভূতি প্রভৃতির বিকাশ ঘটানো প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য।
(৫) বাচনিক বিকাশ : প্রাক্ প্রাথমিক স্তর ভাষা বিকাশের স্তর। তাই যথাযথ পরিচালনার মাধ্যমে শিশুর মধ্যে ভাষার যথার্থ বিকাশ ঘটানোই হল প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য।
(৬) সুঅভ্যাস গঠন : শিশুদের সুঅভ্যাস গঠনে সহায়তা করা প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য। নিয়মিত পড়াশোনা করা, শরীরচর্চা করা, হাতমুখ ধোওয়া, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা ইত্যাদি সুঅভ্যাস শিশুর ভবিষ্যত জীবনকে প্রভাবিত করে।
(৭) সৃজনশীলতার বিকাশ : প্রত্যেক শিশুই জন্মগতভাবে কিছু বিশেষ ক্ষমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যে হল তার এই বিশেষ মানসিক ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে তার মধ্যে সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ ঘটানো।
(৮) দেশাত্মবোধ জাগরণ : আজকের শিশু ভবিষ্যতের নাগরিক। তাই শৈশবেই শিশুর মধ্যে দেশের প্রতি কর্তব্যবোধ, তার অধিকার সম্বন্ধে সচেতনতা এবং সমাজ সম্বন্ধে আগ্রহ সৃষ্টি করা প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য।

প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষার কাঠামো (Structure of Pre-primary Education)

ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের মতে, প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের শিক্ষাকাল হবে ১ থেকে ৩ বছরের। শিশুরা ৩ বা ৪ বছর বয়সে পৌঁছালে এই স্তরের পাঠ্যগ্রহনের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে। এই পাঠ চলবে ৫ থেকে ৬ বছর পর্যন্ত। তারপর তারা প্রাথমিক স্তরে ভর্তি হওয়ার উপযুক্ত হবে। কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে, “The Primary Stage will be proceded, wherever possible, by pre-primary education of one to three years.”।

প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম (Curriculum of Pre-primary Education)

প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমে যে বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার কথা কমিশনে বলা হয়েছে যেগুলো হল -
(১) শিশুর দৈহিক বিকাশে উন্নতি সাধনের জন্য প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমে খেলাধূলা, ব্যায়াম, আসন প্রভৃতি শারিরীক ক্রিয়াকলাপের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
(২) বিশ্ব বিকৃতির যে পরিবেশের সঙ্গো সার্থক অভিযোজন করে শিশুর সারাটা জীবন অতিবাহিত করতে হবে, সেই পরিবেশের আঙিনায় থাকা নদী, খালবিল, পশু, পাখি, গাছপালা প্রভৃতি পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। শিশুদের বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণে নিয়ে গিয়ে প্রকৃতির সঙ্গো যোগসূত্র রচনা করার কথা কমিশনে বলা হয়েছে।

(৩) বিভিন্ন ধরনের সৃজনাত্মক কার্যাবলি যেমন - বিভিন্ন ধরনের হাতের কাজ, অংকন করা, গান করা, ছবি কাটা ও ছবি লাগানো, কাগজ দিয়ে খেলনা তৈরি করা ইত্যাদি পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

(৪) প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমে ভাষার বিকাশের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। তাই ভাষার বিকাশের জন্য নানা বিষয়ের গল্প, আবৃত্তি, অভিনয় প্রভৃতি পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা হয়েছে।

(৫) শৈশবে শিশুর মধ্যে ভাষাগত বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে গণনা শেখা ও গণিত শেখার উপর গুরুত্ব দেওয়ার কথা কমিশনে উল্লেখ করা হয়েছে। হিসাব সংক্রান্ত দিকে সচেতনতা আনয়নের জন্য শিশুর উপযোগী নানা উপকরণের সহায়তা নেওয়া আবশ্যক।

(৬) বিভিন্ন শিখনমূলক কাজ যেমন স্বাস্থ্যসম্মত নিয়ম, নিজের কাজ নিজে করা, সুঅভ্যাস গঠন ইত্যাদি পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা হয়েছে।

প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠানসমূহ (Institutions of Pre-primary Education)

যেহেতু কমিশন প্রাক্ প্রাথমিক স্তরটিকে প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তুতি পর্ব হিসাবে গণ্য করেছেন তাই ভারতে প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষার সুনির্দিষ্ট কোনো কাঠামো ছিল না। মূলত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান দ্বারাই প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালিত হত। প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান হল -

● ক্রেস : প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষার প্রথম প্রতিষ্ঠান হল ক্রেস। বর্তমানে অনেক শিশুর পিতামাতা উভয়ই চাকুরিরত হওয়ার কারণে শিশুর সুষ্ঠ বিকাশের জন্য সময় দিতে পারেন না। তাই প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠান হিসাবে ক্রেস এই ঘাটতি পূরণ করে থাকে।

● কিণ্ডারগার্টেন স্কুল : কিণ্ডারগার্টেন স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা হলেন বিখ্যাত দার্শনিক Wilhelm August Friedrich Froebel (উইলহেম. অগাস্ট ফ্রেডরিক ফ্রয়েবেল)। ফ্রয়েবল শিশুদের সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য কিণ্ডারগার্টেন স্কুল গড়ে তুলেছিলেন। কিণ্ডারগার্টেন শব্দের অর্থ হল শিশু উদ্যান। তিনি শিশুদেরকে চারাগাছের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এখানে শিশুরা স্বাধীনভাবে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে মূর্ত বস্তুর মাধ্যমে শিক্ষালাভ করবে। শিশুদের দক্ষতা বিকাশের জন্য তিনি Gift এবং Occupation-এর সাহায্য নিয়েছিলেন। তার শিক্ষার মূল কথাই হল খেলাভিত্তিক শিক্ষা (Playway in education)।

● মন্তেসরি স্কুল : প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্ মাদাম মারিয়া মন্তেসরী তাঁর চিন্তাপ্রসূত যে প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়েছেন তাকে বলে 'কাসা দাই বামবিনি', যার অর্থ হল 'শিশুদের জন্য গৃহ। তিনি ইন্দ্রিয়ভিত্তিক জ্ঞানার্জনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে তিনি যে যান্ত্রিক কৌশলের প্রবর্তন করেছেন তার নাম হল 'Didactie Apparatus'। মন্তেসরী স্কুলে হাতের কাজ, সংগীত, বাগান, পরিচর্যা, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়।

● নার্সারী স্কুল : মার্গারেট ম্যাকমিলান (Margart McMillian) এবং র‍্যাচেল ম্যাকমিলান (Rachel McMillan) নামে দুই বোন ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে ইংল্যান্ডে প্রথম নার্সারি স্কুল গড়ে তোলেন। সমাজে অবহেলিত, দরিদ্র, অনগ্রসর শ্রেণির শিক্ষার্থীদের শিক্ষার জন্য এই দুই বোন উদ্যোগী হয়েছিলেন। নার্সারী স্কুলে শিশুদের নাচ, গান, হাতের কাজ, ছবি আঁকা, খেলাধুলা প্রভৃতির মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হত।

● প্রাক্ বুনিয়াদী স্কুল : জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী প্রাক্ বুনিয়াদী স্কুলের প্রবর্তন করেন। শিশুদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশের জন্য এবং কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষের শিশুদের মধ্যে শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ জাগিয়ে

তাদের স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য তিনি অক্লান্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। এছাড়াও তিনি শিশুর শারীরিক, সামাজিক, নৈতিক ও প্রক্ষোভিক বিকাশের উপর জোর দিয়েছিলেন।

প্রাথমিক শিক্ষা (Primary Education)

প্রাথমিক শিক্ষার সময়কাল ৫ বা ৬ বছর বয়স থেকে ১১ বা ১২ বছর বয়সকাল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে থাকে। এই সময় শিশুদের স্মৃতিশক্তি খুব প্রখর থাকে, মনোযোগের পরিসর উন্নত থাকে। কমিশন প্রাথমিক স্তরে শিশুর, দৈহিক, বৌদ্ধিক, প্রাক্ষোভিক, নান্দনিক, সামাজিক ও নৈতিক বিকাশের উপর জোর দিয়েছেন।

প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and Objectives of Primary Education)

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলো হল -

(১) আদর্শ নাগরিক গড়া : দায়িত্বশীল উপযুক্ত নাগরিক তৈরি করাই হল প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার উদ্দেশ্য। শিক্ষার মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে আদর্শ নাগরিকের নীতিবোধগুলো জাগ্রত করতে হবে।

(২) সামাজিক চেতনার বিকাশ : সমাজের মাঝে শিশুর জন্ম, সমাজের মাঝে বৃদ্ধি ও বিকাশ। তাই প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হল শিশুর সামাজিকীকরণে সহায়তা করা। সমাজের প্রতি চেতনাবোধ জাতীয় সংহতি বিকাশের সহায়ক হবে।

(৩) নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশ : প্রাথমিক শিক্ষার আর একটি উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদের নৈতিক মূল্যবোধগুলোর বিকাশ সাধন করে তাকে আদর্শ চরিত্রের অধিকারী করে গড়ে তোলা।

(৪) স্বাস্থ্যভ্যাস গঠন : প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদের সুস্বাস্থ্যের অধিকারী করে তোলা, কারণ সুস্থ দেহই সুস্থ মনের জন্ম দেয়।

(৫) ভাষার বিকাশ : বাচনিক বিকাশ ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক। প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হল শিশুর ভাষার দক্ষতার বিকাশ ঘটিয়ে তাদের চিন্তাশক্তিকে জাগ্রত করা।

(৬) আত্মপ্রকাশের সুযোগ : প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হল শিশুদের সৃজনশীল ক্ষমতার বিকাশ ঘটিয়ে তাদের আত্ম প্রকাশের সুযোগ প্রদান করা।

(৭) কৃষ্টি ও সংস্কৃতির বিকাশ : প্রাথমিক শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হল দেশের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য প্রভৃতির সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় ঘটিয়ে সেগুলোর সংরক্ষণ ও সঞ্চালনের জন্য উপযুক্ত নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা।

প্রাথমিক শিক্ষার কাঠামো (Structure of Primary Education)

কমিশন প্রাথমিক শিক্ষাকে দুটি স্তরে ভাগ করেছেন। (ক) নিম্ন প্রাথমিক স্তর (Lower Primary Stage)-এই স্তরের শিক্ষা শুরু হবে ৬ বছর বয়সে। এই স্তরে প্রথম শ্রেণি থেকে চতুর্থ বা পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত প্রায় ৪/৫ বছর শিক্ষার্থীরা পড়বে। (খ) উচ্চ প্রাথমিক স্তর (Upper Primary Stage) -এই স্তরের শিক্ষা শুরু হবে ১১/১২ বছর বয়সে। এই স্তরে পঞ্চম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা পড়বে।

প্রাথমিক শিক্ষা

নিম্ন প্রাথমিক স্তর :	উচ্চ প্রাথমিক স্তর :
প্রথম থেকে চতুর্থ বা পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত	পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত।
বয়সকাল ৬ বছর থেকে ১০ বা ১১ বছর	বয়সকাল ১১/১২ থেকে ১৪ বছর

প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম (Curriculum of Primary Education)

নিম্ন প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার পাঠ্যক্রম (I–IV or V)

(ক) ভাষা — মাতৃভাষা অথবা একটি আঞ্চলিক ভাষা

(খ) গণিত — গণিতের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। ভাষা ও গণিতকে শিখনের মৌলিক দক্ষতা হিসাবে বিচার করতে হবে।

(গ) পরিবেশ সম্বন্ধে ধারণা — এই স্তরে গাছপালা, প্রাণী, বায়ু, জল, আবহাওয়া প্রভৃতি সম্বন্ধে ধারণা দেওয়া হবে। বাগান তৈরি ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকবে। এছাড়া ম্যাপ, চার্ট ও রাশিবিজ্ঞানের টেবিল ইত্যাদি শেখানোর ব্যবস্থা থাকবে।

(ঘ) সৃজনশীল কাজ : সংগীত, কলা, নাটক ও বিভিন্ন হাতের কাজ রাখতে হবে শিশুদের সৃজনশীলতা প্রকাশের জন্য।

(ঙ) কর্মশিক্ষা ও সমাজসেবা — কাগজ টাকা, কার্ডবোর্ড কাটা ও ভাঁজ করা, মাটি দিয়ে মডেল তৈরি, সুতো কাটার কাজ, ছুঁচের কাজ, রান্নার কাজ, বাগান তৈরি ইত্যাদি। এই স্তরে সমাজ সেবামূলক কাজের মধ্যে পড়ে ক্লাসঘর পরিষ্কার করা, স্কুল সাজানো ইত্যাদি।

(চ) স্বাস্থ্য শিক্ষা : এই স্তরে শিশুদের ভালো স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন বিষয় পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

উচ্চ প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যক্রম (V-VII or VIII)

(ক) দুটি ভাষা হবে আবশ্যিক — (i) মাতৃভাষা অথবা আঞ্চলিক ভাষা (ii) হিন্দি অথবা ইংরেজি।

(খ) গণিত — প্রাথমিক স্তরে গণিতের মধ্যে পাটিগণিত, বীজগণিত ও জ্যামিতি পড়তে হবে। গণিতে বিভিন্ন সূত্র, গাণিতিক নীতি ও যুক্তিমুলক চিন্তনের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। পাঠ্যসূচীতে থাকবে বিভিন্ন চিহ্ন, সমীকরণ, গ্রাফ সম্পর্কে ধারণা।

(গ) বিজ্ঞান — পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যক্রমে থাকবে পদার্থবিদ্যা, ভূবিদ্যা, জীববিজ্ঞান। ষষ্ঠ শ্রেণিতে পাঠ্যক্রমে থাকবে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীবনবিজ্ঞান। সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যক্রমে থাকবে পদার্থবিদ্যা, জীবনবিজ্ঞান, রসায়ন, জ্যেতির্বিদ্যা।

(ঘ) সমাজবিজ্ঞান — এই স্তরে সমাজবিজ্ঞানের পাঠ্যক্রমে থাকবে ইতিহাস, ভূগোল ও পৌরবিজ্ঞান।

(ঙ) চারুকলা, কর্মশিক্ষা ও সমাজসেবা — এই স্তরে কর্মশিক্ষার মধ্যে রয়েছে বাঁশের কাজ, চামড়ার কাজ, মাটির কাজ, ছুঁচের কাজ, সেলাই, বাগান তৈরি। মডেল তৈরি, কৃষি খামারে কাজ ইত্যাদি। সমাজসেবামূলক কাজের জন্য প্রতি বছর একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

(চ) শারীরশিক্ষা — এই স্তরের প্রথম দিকে ছেলে ও মেয়েদের অভিন্ন শারীর শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। শেষ ৫ বছরের শিক্ষার্থীদের রুচি ও আগ্রহ অনুযায়ী খেলাধূলার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

(ছ) নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা — সপ্তাহে একটি বা দুটি ক্লাস এই বিষয়ে শিক্ষার জন্য রাখতে হবে। এছাড়া এই স্তরে বিভিন্ন নীতিগল্প পাঠের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

শিক্ষাস্তরের পাঠ্যক্রম নিচে ছকের মাধ্যমে দেখানো হল —

প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম

নিম্ন প্রাথমিক স্তর

মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা
গণিত
পরিবেশ পরিচিতি
সৃজনশীল কার্যাবলি
কর্ম অভিজ্ঞতা ও সমাজসেবা
স্বাস্থ্যশিক্ষা

উচ্চ প্রাথমিক স্তর

মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা
সহ হিন্দি অথবা ইংরেজী ভাষা
গণিত
সাধারণ বিজ্ঞান
সমাজবিদ্যা
চারুকলা
কর্ম অভিজ্ঞতা ও সমাজসেবা
শারীরশিক্ষা
নৈতিক মূল্যবোধের শিক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা ও তার সমাধানের জন্য সুপারিশ :

প্রাথমিক শিক্ষাই হল শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে ভিত্তি প্রস্তর। কমিশন ভারতে প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যাগুলো পর্যালোচনা করে দেখেছেন যে, অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা, অন্ধবিশ্বাস, রক্ষণশীলতা, সামাজিক কুপ্রথা, পরিকাঠামোগত সমস্যা, উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার অভাব, ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা পদ্ধতি, প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করছে। কমিশন দেখেছেন প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারে অন্যতম সমস্যা হল অপচয় ও অনুত্তীর্ণতা। প্রাথমিক স্তরে ক্লাস-I এর অনুত্তীর্ণতা সবচেয়ে বেশি। ক্লাস-II এর ক্ষেত্রে অনুত্তীর্ণতা অনেকটা কম। আবার ছেলেদের থেকে মেয়েদের অনুত্তীর্ণতা সব থেকে বেশি। তবে অঞ্চলভেদে এই সংখ্যার পার্থক্যও ঘটতে পারে। অপচয়ের ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণিতে এই সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। উচ্চ প্রাথমিক স্তরে অপচয় অনেক কম।

প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশগুলো হল —

(১) সংবিধানের ৪৫ নং ধারায় ৬ থেকে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সকল শিশুকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। তাই কমিশনে বলা হয়েছে, সাংবিধানিক নির্দেশমতো ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত প্রতিটি শিশুর বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা রাষ্ট্র করবে। ১৯৭৫-৭৬ সালের মধ্যে প্রতিটি শিশুর ৫ বছরের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে এবং ১৯৮৫-৮৬ সালে মধ্যে প্রতিটি শিশুর ৭ বছরের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে।

(২) অপচয় ও অনুন্নয়ন এমনভাবে কমাতে হবে যাতে বিদ্যালয়ে যারা প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হয় তাদের ৮০ ভাগ শিশু যাতে সাত বছরে সপ্তম শ্রেণিতে পৌঁছুতে পারে।

(৩) সপ্তম শ্রেণির শেষে কোনো শিক্ষার্থীর বয়স যদি ১৪ বছরের কম হয় এবং সে যদি পড়াশোনা চালিয়ে

যেতে চায় তাহলে তাকে ১৪ বছর বয়স পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিদ্যালয়ের কোনো বৃত্তিমুখী কাজে নিযুক্ত রাখতে হবে।

(৪) নিছক জ্ঞানমূলক বিষয়ের পরিবর্তে বাস্তব জীবনের সহায়ক বিষয়কে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

(৫) প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য সফল করতে হলে প্রয়োজন রাজ্য ও জেলাভিত্তিক একটি সুসমন্বিত পরিকাঠামো।

(৬) পরবর্তী দশ বছরের প্রাথমিক শিক্ষায় গুণগতমান বাড়ানো প্রয়োজন।

(৭) অপচয় এবং অনুন্নয়ন রোধ করার জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিকে একটি সুসংহত একক হিসাবে গণ্য করতে হবে।

(৮) এক বছরের প্রাক্ বিদ্যালয় চালু করতে হবে।

(৯) প্রথম শ্রেণিতে খেলাচ্ছলে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

(১০) কমিশনের মতে উচ্চ প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের বৃদ্ধি বিকাশ ও পারদর্শিতার ভিত্তিতে সর্বাত্মক পরিচয়পত্র (Cumulative Record Card) ব্যবহার করা।

(১১) প্রাথমিক স্তরে বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কর্মসূচী গ্রহণের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের কর্ম অভিজ্ঞতার উপর গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

মাধ্যমিক শিক্ষা (Secondary Education)

মাধ্যমিক শিক্ষা হল প্রথাগত শিক্ষার তৃতীয় স্তর। প্রাক্ প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরে শিশু, যেই জ্ঞান অর্জন করে সেই জ্ঞান মাধ্যমিক স্তরে আরও সমৃদ্ধ হয়। এই শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী আদর্শ চরিত্রের অধিকারী হয়, তার ব্যক্তিসত্ত্বার বিকাশ সাধিত হয় এবং ভবিষ্যত জীবনের উপযোগী নানাবিধ বৃত্তি ও কারিগরী শিক্ষা লাভ করে কর্মজীবনে প্রবেশ করার দক্ষতা অর্জন করে। অর্থাৎ মাধ্যমিক শিক্ষা হল জীবনের প্রস্তুতির স্তর।

মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলি (Aims and Objectives of Secondary Education)

(১) ব্যক্তি-চরিত্র গঠনের শিক্ষা, নেতৃত্বদানের ক্ষমতার বিকাশ, শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল কর্মে উৎসাহদান এবং সেই সঙ্গে শিক্ষার্থীদের অবসর জীবনযাপনের প্রশিক্ষণ ও বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের বিকাশ ঘটানো মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যে।

(২) সাহিত্য, কলা, শিল্প ও সাংস্কৃতিক দিকের প্রতি শিক্ষার্থীদের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি করা।

(৩) শিক্ষার্থীদের কর্মমুখী দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলা, কায়িক শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধা জাগ্রত করা এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কর্মদক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য।

(৪) মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদের মধ্যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা।

(৫) মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গীর বিকাশ সাধন করা। যাতে শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির মধ্য দিয়ে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারে।

(৬) মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হল বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিকাশ ঘটানো।

(৭) শিক্ষার্থীদের সমাজসেবামূলক কাজে সচেতন করে তোলা মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য।

(৮) শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাতীয় সংহতি ও আন্তর্জাতিকতাবোধের বিকাশ ঘটানো মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য।

(৯) মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হল সুনাগরিক তৈরি করা এবং গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণার প্রতি শিক্ষার্থীদের আস্থাশীল করা।

(১০) এছাড়াও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হল শিক্ষায় সকলকে সমান সুযোগ দান, পিছিয়ে পড়া এবং অনুন্নত সম্প্রদায়ের মানুষকে শিক্ষার সুযোগ দিয়ে তাদের জীবনের মান উন্নত করা।

মাধ্যমিক শিক্ষার কাঠামো (Structure of Secondary Education)

কোঠারী কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার কাঠামো সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেছেন। কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষাকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। একটি হল দুই বা তিন বছরের নিম্ন মাধ্যমিক স্তর আর অন্যটি হল দুই বছরের উচ্চ মাধ্যমিক স্তর। কমিশন মূলত চার বা পাঁচ বছরের মাধ্যমিক শিক্ষার কথা বলেছেন। নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা অষ্টম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত তিনবছর বা ৯ম-১০ম শ্রেণি এই দুই বছর ধরে চলবে। এই স্তরে দুই বা তিন বছরব্যাপী সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। প্রথম দশ বছরের শিক্ষা হবে সাধারণধর্মী। এই পর্যায়ে কোনো বিশেষধর্মী শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে না। দশ বছরব্যাপী সাধারণ শিক্ষার শেষে প্রথম বহিরনুষ্ঠিত পরীক্ষা (Public Examination) গ্রহণ করা হবে। নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের পর একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি এই দুই বছরের শিক্ষাকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা হিসাবে গণ্য করা হবে। এই স্তরে বহুমুখী সাধারণধর্মী শিক্ষা দেওয়া হবে। অর্থাৎ এই স্তরে কমিশন সাধারণধর্মী শিক্ষার পাশাপাশি বৃত্তিমুখী শিক্ষার কথা বলেছেন।

মাধ্যমিক শিক্ষার কাঠামো

নিম্ন মাধ্যমিক স্তর : (২/৩) বছরের শিক্ষা অষ্টম থেকে দশম শ্রেণি

উচ্চ মাধ্যমিক স্তর : (২বছরের শিক্ষা) একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি

নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যক্রম সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশ

(১) তিনটি ভাষা আবশ্যিক থাকবে। মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা, হিন্দি ও ইংরেজী। যাদের মাতৃভাষা হিন্দি তারা যে-কোনো একটি ভারতীয় ভাষা শিখবে। এছাড়া থাকবে একটি ঐচ্ছিক ভাষা।

(২) গণিত — প্রচলিত গণিতের মধ্যে যেমন পাটিগণিত, জ্যামিতি, বীজগণিত, রাশিবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়গুলোর উপর অধিক গুরুত্ব-.
দিতে হবে।

(৩) বিজ্ঞান — পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জীবনবিজ্ঞান ও ভূ-বিজ্ঞান আবশ্যিক হিসাবে পাঠ্যক্রমে থাকবে।

(৪) সমাজবিজ্ঞান — ইতিহাস, ভূগোল ও পৌরবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞানে অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

(৫) চারুকলা ,

(৬) কর্মশিক্ষা — কর্মশিক্ষার মধ্যে থাকবে কাঠের কাজ, ধাতুর কাজ, চামড়ার কাজ, সেলাই, মডেল তৈরি, ক্লাসঘর সাজানো, বই বাঁধানো, কার্পেট তৈরি, খেলনা তৈরি ইত্যাদি। কর্মশিক্ষার জন্য কৃষি খামার, ওয়ার্কশপ ও অন্য উৎপাদনশীল ইউনিট-এর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে।

(৭) সমাজসেবা — প্রতিবছর একটি নির্দিষ্ট সময়ে সমাজসেবার কাজ করতে হবে। এই স্তরে সমাজসেবামূলক কাজের জন্য ৩০ দিন নির্দিষ্ট করতে হবে।
(৮) শারীর শিক্ষা — শারীর শিক্ষার মধ্যে থাকবে বিভিন্ন খেলার আসন, ব্যায়াম প্রভৃতি।
(৯) নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা — এক্ষেত্রেও প্রাথমিক শিক্ষার মতো সপ্তাহে একটি অথবা দুটি পিরিয়ড নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার জন্য রাখতে হবে।

মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতিকল্পে কমিশনের সুপারিশ

মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশগুলো হল —
(১) আগামী কুড়ি বছরের মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষাগ্রহণকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর অবস্থান সম্পর্কে উপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ, শিক্ষার মানোন্নয়ণ ও যোগ্যতম শিক্ষার্থী নির্বাচন করা একান্ত প্রয়োজন।
(২) একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের সমস্ত বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে সহযোগিতামূলক মনোভাব ও শিক্ষার মানের উন্নতি ঘটানোর জন্য কয়েকটি বিদ্যালয় নিয়ে একটি করে বিদ্যালয়গুচ্ছ (School complex) গড়ে তুলতে হবে। বিদ্যালয়গুচ্ছ গঠনের মাধ্যমে কোনো বিশেষ অঞ্চলের শিক্ষাগত মান সমবেত চেষ্টায় উন্নত করা সম্ভব হবে। এই বিদ্যালয়গুচ্ছের কাজের তদারকির জন্য একটি সমন্বয় কমিটি থাকবে যার প্রধান হবেন নিম্নমাধ্যমিক / উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা এর সদস্য থাকবেন। বিদ্যালয়গুচ্ছের মূল প্রাণকেন্দ্র হল সকলের সহযোগিতা।
(৩) শিক্ষার মান উন্নয়ন : প্রতিটি নতুন বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান যেন উন্নত হয় এবং যে বিদ্যালয়গুলো আছে সেগুলোর মান যাতে আরও উন্নত হয় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে।
(৪) নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে ২০ শতাংশ এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ৫০ শতাংশ শিক্ষার্থী যাতে ১৯৮৬ সালের মধ্যে বৃত্তিশিক্ষার সুযোগ পায় সে ব্যবস্থা করতে হবে।
(৫) গ্রাম ও শহরের ছেলেমেয়েদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য নানা ধরনের আংশিক ও পুরো সময়ের বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।
(৬) আগামী কুড়ি বছরের মধ্যে নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে মেয়ে ও ছেলেদের অনুপাত ১:২ ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের ক্ষেত্রে এই অনুপাত হওয়া উচিত ১:৩।
(৭) অধিক সংখ্যক ছাত্রীকে শিক্ষায় আগ্রহী করে তোলার জন্য বৃত্তি বা স্কলারশিপের ব্যবস্থা করতে হবে।
(৮) যেসব ছাত্রীর বাড়ি বিদ্যালয় থেকে অনেক দূরে তারা যাতে বিদ্যালয়ে থেকে পড়াশোনা করতে পারে তার জন্য ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা করতে হবে।
(৯) কমিশন বালিকাদের জন্য পৃথক বিদ্যালয় গড়ার সুপারিশ করে। যদি অর্থাভাব ও স্থানাভাবের কারণে পৃথক বিদ্যালয় স্থাপন করা না যায়, তাহলে বিদ্যালয়ে কিছু শিক্ষিকা ও মহিলা শিক্ষাকর্মী নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।
(১০) কমিশন সুপারিশ করে যে দশম শ্রেণির পাঠ শেষ হলে প্রথম বহির্বিভাগীয় পরীক্ষা, আর দ্বাদশ শ্রেণির শেষে দ্বিতীয় বহির্বিভাগয়ী পরীক্ষা গ্রহণ করতে হবে। বিদ্যালয়সমূহে কাজের দিন মোট ৩৯ সপ্তাহ হবে। পরীক্ষার জন্য স্কুলে ২১ দিন ব্যয় করা হবে। অন্যান্য ছুটি কমিয়ে ১০ দিন করতে হবে।

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা (Higher Secondary Education)

মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর পরবর্তী দুবছরের শিক্ষাস্তর হল উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাস্তর। মাধ্যমিক স্তরের সাধারণধর্মী জ্ঞান উচ্চমাধ্যমিক স্তরে দৃঢ় ও প্রসারিত হয়। উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো হল—

(১) উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের বিকাশে সহায়তা করা।

(২) উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হল বিশেষজ্ঞ কর্মী তৈরি করা. উচ্চমাধ্যমিক স্তরে সাধারণধর্মী শিক্ষালাভের সুযোগ ছাড়াও থাকে কারিগরী বিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, কৃষিবিদ্যা প্রভৃতি। মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা এখানে ভর্তি হয়। এখানে মেধা ও ব্যক্তিত্বের স্ফুরণহেতু বিশেষজ্ঞ মানুষ তৈরি হয়।

(৩) উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদের মধ্যে চিন্তাশক্তি, বিচারশক্তি প্রভৃতি উন্মেষ ঘটানো।

(৪) উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীরা যাতে ভবিষ্যৎ জীবনে আর্থিক দিকে স্বনির্ভর হয়ে জীবন ও জীবিকার পথ মসৃণ করতে পারে। তার ব্যবস্থা করা।

(৫) উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক গুণাবলির বিকাশ সাধণ করে তাদের সুনাগরিক হিসাবে তৈরি করা।

(৬) উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাতীয় সংহতি ও আন্তর্জাতিকতাবোধের বিকাশ ঘটানো।

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের কাঠামো (Structure of Higher Secondary Education)

কমিশনের মতে উচ্চমাধ্যমিক স্তর হল ১০ + ২ অর্থাৎ দশম শ্রেণির পর একাদশ ও দ্বাদশ এই দুটি শ্রেণিকে উচ্চমাধ্যমিক স্তর হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। সাধারণত এই স্তরে শিক্ষার্থীদের বয়স ১৬ থেকে ১৮ বছর। এই স্তরে ৫০ শতাংশ শিক্ষার্থীর জন্য বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে, দ্বাদশ শ্রেণির পর সাধারণ পরীক্ষা গৃহীত হবে।

উচ্চমাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যক্রম (Curriculum of Higher Secondary Stage)

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা হল উচ্চশিক্ষার প্রারম্ভিক স্তর। শিক্ষার্থীরা যাতে নিজ নিজ প্রবণতা অনুযায়ী বিষয় নির্বাচন করতে পারে তার জন্য বিষয়গুলোকে কলা বিভাগ, বিজ্ঞান বিভাগ, বাণিজ্য বিভাগ প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগে ভাগ করা হয়েছে। অন্যদিকে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে কিছু বৃত্তি শিক্ষারও ব্যবস্থা আছে। যারা সাধারণ বিভাগে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী নয় তাদের জন্যই এই বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। এই বিভাগের মূল ক্ষেত্রগুলো হল - কৃষিবিজ্ঞান, কারিগরী বিদ্যা, বয়নশিল্প, ব্যবসা বাণিজ্য, প্যারামেডিকেল। এগুলো শিক্ষার্থীদের বৃত্তি গ্রহণে সাহায্য করে। কমিশন দশম শ্রেণি পাশ করা ছাত্রছাত্রীর ৫০ শতাংশ-এর জন্য সাধারণ শিক্ষা ও ৫০ শতাংশ ছাত্রছাত্রীর জন্য পূর্ণ সময়ের বা আংশিক সময়ের বৃত্তিমূলক শিক্ষার কথা বলেছেন। তবে সুপারিশে একথাও বলা হয় যে, দুটি বিভাগের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য থাকবে না অর্থাৎ ছাত্রছাত্রীরা তিনটি আবশ্যিক বিষয়ের মধ্যে পছন্দমতো বিষয় গ্রহণ করতে পারবে। তারা বিজ্ঞানের তিনটি বিষয়কে যেমন পড়তে পারবে তেমনি দুটি বিজ্ঞানের বিষয়ের সঙ্গে একটি কলা বিষয় বা একটি বিজ্ঞান বিষয়ের সঙ্গে দুটি কলা বিষয়কে আবশ্যিক বিষয় হিসাবে নিতে পারবে।

কোঠারী কমিশনের উচ্চমাধ্যমিক (XI & XII) স্তরের পাঠ্যক্রম হল নিম্নরূপ -

(১) যে-কোনো দুটি ভাষা - মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা ও ইংরেজি। এছাড়া যে-কোনো আধুনিক ভারতীয় ভাষা, যে-কোনো আধুনিক বিদেশি ভাষা।

(২) ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে যে-কোনো তিনটি বিষয় নির্বাচন করতে হবে, যেমন - একটি অতিরিক্ত ভাষা, ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, তর্কবিদ্যা, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, চারুকলা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ণ, গণিত, জীববিজ্ঞান, ভূ-তত্ত্ব, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান।

(৩) কর্ম অভিজ্ঞতা ও সমাজসেবা

(৪) শারীরশিক্ষা

(৫) চারুকলা বা হস্তশিল্প

(৬) নৈতিক বা আধ্যাত্মিক শিক্ষা

উচ্চশিক্ষা (Higher Education)

প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে ১৯১৭-১৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন (স্যাডলার কমিশন) উচ্চশিক্ষার কাঠামো এবং পাঠ্যক্রম সম্বন্ধে সুপারিশ করেছিলেন। স্বাধীনতার পর ১৯৪৮ সালে প্রথম কমিশনই হল উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ড. রাধাকৃষ্নানের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন। আর রাধাকৃষ্নান কমিশনের ১৫ বছর পরে গঠিত হল কোঠারী কমিশন। এই অন্তবর্তী সময়ে অনেক নতুন বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনও গঠিত হয়েছে। কিন্তু উচ্চশিক্ষার গুণগত পরিবর্তন তেমন কিছুই হয়নি।

উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে কোঠারী কমিশনের সুপারিশগুলো হল -

(১) উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য হল প্রতিভাবান শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে কর্মক্ষেত্রের জন্য নেতৃত্ব সৃষ্টি করা।

(২) কৃষি, কলা, চিকিৎসা, বিজ্ঞান, কারিগরি এবং অন্যান্য বিশেষ ক্ষেত্রের জন্য সমাজ চেতনা সম্পন্ন তরুণ, তরুণী তৈরি করা উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য।

(৩) উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য হল শিক্ষাকে সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্য দূর করে সামাজিক ন্যায় ও ঐক্য স্থাপন করা।

(৪) উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য হল নতুন জ্ঞান আহরণ, সত্যানুসন্ধান এবং প্রাচীনকালের জ্ঞান ও বিদ্যার্জন নতুন আবিষ্কারের আলোকে ব্যাখ্যা করা।

(৫) উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদের জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা।

উচ্চশিক্ষার কাঠামো (Structure of Higher Education) :

কোঠারী কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী উচ্চশিক্ষাস্তর হবে তিন ধরনের -

(১) প্রথম ডিগ্রি কোর্স (স্নাতক স্তর) (২) দ্বিতীয় ডিগ্রি কোর্স (স্নাতকোত্তর স্তর) এবং (৩) গবেষণা স্তর।

স্নাতক স্তর : এই স্তরের শিক্ষা হবে দু-বছরের পাস এবং ৩ বছরের অনার্স কোর্স। কলেজে কাজের দিন হবে ৩৬ সপ্তাহ (২১৬ দিন)। পরীক্ষার জন্য ২৯ দিন ব্যয় করা হবে।

দ্বিতীয় ডিগ্রি স্তর (স্নাতকোত্তর স্তর) : এই স্তরের শিক্ষা হবে দু-বছরের। শিক্ষার্থীর বয়স হবে ২১ থেকে ২৩ বছর। কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ বিষয়ে ৩ বছরের M.A., M.Sc., M.Com ডিগ্রি কোর্স

চালু করতে পারেন। এছাড়াও কমিশন বলেন, কোনো কোনো নির্বাচিত বিষয়ে বিশেষ শিক্ষাদানের জন্য ৪ বছরের ডিগ্রি কোর্স চালু করা যুক্তিযুক্ত।

গবেষণা স্তর : উচ্চশিক্ষা স্তরে "Major University" সংক্রান্ত সুপারিশটি উল্লেখযোগ্য। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে স্নাতকোত্তর পঠন ও গবেষণা হবে। এদের মান হবে বিশ্বের যে-কোনো উন্নতমানের বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তুলনীয়। এছাড়াও এগুলোতে কৃষি, কারিগরি ও ডাক্তারি শাখার গবেষণার ব্যবস্থা থাকবে। বিজ্ঞান ও গণিতের জন্য Advanced Study Centre-এর কথা বলা হয়।

উচ্চশিক্ষাস্তরে পাঠ্যক্রম

(১) উচ্চশিক্ষার স্তরে কোনো ভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক নয়। তবে আঞ্চলিক ভারতীয় ভাষা বা প্রাচীন ভাষা ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে উচ্চশিক্ষার স্তরে থাকবে।

(২) স্নাতক স্তরে আঞ্চলিক ভাষা হবে শিক্ষার মাধ্যম এবং স্নাতকোত্তর স্তরে ইংরেজী ভাষা হবে - শিক্ষার মাধ্যম।

(৩) স্নাতক স্তরে কলা ও বিজ্ঞান বিভাগের বিষয় নির্বাচনে ছাত্রছাত্রীদের স্বাধীনতা থাকবে।

(৪) স্নাতকোত্তর স্তরে পাঠ্যক্রমের পুনর্নবীকরণ প্রয়োজন। পাঠ্যক্রম হওয়া উচিত General based (জেনারেল বেসড)।

(৫) বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানের মধ্যে সমতা বিধান করা প্রয়োজন। পদার্থ ও রসায়ন বিদ্যার ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক কাজের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে।

(৬) গবেষণা কাজের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

(৭) স্নাতক স্তরে কলা, বাণিজ্য এবং বিজ্ঞান বিভাগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো হল ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, শিক্ষাবিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, জীববিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা, রাশিবিদ্যা, বাণিজ্যের বিভিন্ন বিষয় এবং কারিগরী বা প্রযুক্তিবিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যা, আইনবিদ্যা, চারুকলা ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

(৮) স্নাতকোত্তর স্তরে এক একটি বিষয়কে নিয়ে এক একটি বিভাগ থাকবে।

উচ্চশিক্ষার উন্নতি সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশ -

(১) শিক্ষামানের উন্নতিকল্পে অনুমোদন প্রাপ্ত কলেজগুলোর সাজসরঞ্জাম, শিক্ষা প্রভৃতির সংস্কার, শিক্ষকের গুণাগুণ প্রভৃতির উপর কমিশন গুরত্ব দিয়েছে।

(২) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, গবেষণা, প্রশাসন সংস্কার প্রভৃতি ক্ষেত্রে উন্নয়ণের কথা ব্যক্ত করা হয়েছে।

(৩) আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা ও গবেষণার জন্য কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে 'Advanced Centres' গড়ে তোলার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

(৪) আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষাকেন্দ্ররূপে একটি কারিগরি, একটি কৃষি ও চারটি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়কে 'Major University'-তে উন্নীত করার কথা বলা হয়েছে।

(৫) কমিশনের রিপোর্টে, শ্রম এবং সমাজসেবা শিবিরে অংশগ্রহণের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

(৬) কমিশনের রিপোর্টে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে স্বাধীনতা দানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

(৭) কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উন্নতমানের গ্রন্থাগার গড়তে হবে।

(৮) প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়গুলো, অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের চাহিদা মেটাবে। প্রধান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতিভাবান শিক্ষার্থীরা যাতে শিক্ষকতা বৃত্তিতে যোগ দেয়, সেজন্য সমস্ত রকম চেষ্টা করতে হবে।
(৯) অধ্যাপকের সংখ্যা না বাড়িয়ে ব্যয় হ্রাসকল্পে গবেষক শিক্ষার্থীদের দিয়ে আংশিকভাবে অধ্যাপনার কাজ পরিচালনার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

ত্রিভাষা সূত্র (Three Language Formula)

কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড (Central Advisory Board of Education) ১৯৫৬ সালে ত্রিভাষা সূত্রের (Three Language Formula) প্রস্তাব দেন। ১৯৬১ সালের রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে ত্রিভাষা নীতি গৃহীত হয়। ১৯৬৩ খ্রীস্টাব্দে 'ভাষাবিল'-এ যে ত্রিভাষা নীতি গৃহীত হয়, তাতে মাধ্যমিক স্তরে যে তিনটি ভাষার কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো হল — (১) মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা (২) হিন্দি ভাষা, তবে যাদের মাতৃভাষা হিন্দি, তাদের পড়তে হবে যে-কোনো একটি আধুনিক ভারতীয় ভাষা (৩) ইংরেজি অথবা অন্য একটি বিদেশি ভাষা।

কোঠারী কমিশন (১৯৬৪-৬৬) ভাষা সম্পর্কে একটি ত্রিভাষা সূত্রের সুপারিশ করেছেন, তার মধ্যে নিম্নলিখিত ভাষাগুলো অন্তর্ভূক্ত হবে।
(১) মাতৃভাষা কিংবা আঞ্চলিক ভাষা
(২) কেন্দ্রীয় সরকারী ভাষা (হিন্দি) অথবা সহযোগী ভাষা (ইংরেজি)
(৩) একটি আধুনিক ভারতীয় ভাষা বা ইউরোপীয় ভাষা, যা প্রথম দুটি জায়গায় পড়ানো হয়নি।

শিক্ষার প্রাক্ প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীরা মাতৃভাষা না হয় আঞ্চলিক ভাষা শিখবে। উচ্চ প্রাথমিক স্তরে তারা মাতৃভাষা এবং রাষ্ট্রভাষা - এই দুটি ভাষা শিখবে। নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষনীয় ভাষা হবে তিনটি - মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা, রাষ্ট্রভাষা এবং একটি আধুনিক ভারতীয় ভাষা। উচ্চমাধ্যমিক স্তরে দুটি ভাষা বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষা করতে হবে। স্নাতক স্তরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষাকেই বেছে নিয়েছেন। উচ্চশিক্ষা বা বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে কোনোরূপ বন্ধন না থাকার সুপারিশ করেছেন।

বৃত্তি ও কারিগরী শিক্ষা সম্পর্কে কোঠারী কমিশনের সুপারিশ :

কোঠারী কমিশন উৎপাদনমুখী শিক্ষার (Education for Productivity) কথা সুপারিশ করেছেন। কমিশন বলেছেন, শিক্ষার সঙ্গে উৎপাদনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করতে হলে মাধ্যমিক স্তরে বৃত্তিশিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে কৃষি ও কারিগরী শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে। এই বিষয়ে কমিশন যেসব কর্মসূচী গ্রহণ করার বলেছেন সেগুলো হল -
(১) বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার করতে হবে।
(২) কর্ম অভিজ্ঞতার (Work Experience) প্রবর্তন করতে হবে।
(৩) বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।
(৪) অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের বৃত্তি ও কারিগরী শিক্ষা সম্পর্কে সচেতন করা প্রয়োজন এবং এই সম্পর্কে তাদের উৎসাহিত করে তোলা প্রয়োজন।
(৫) যারা স্কুল ছেড়ে কাজ করতে বাধ্য হয় তাদের জন্য আংশিক বৃত্তি ও কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

(৬) ১৯৮৬ সালের মধ্যে নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে মোট ছাত্রসংখ্যার ২০ শতাংশ এবং উচ্চমাধ্যমিক স্তরে মোট ছাত্রসংখ্যার ৫০ শতাংশ বিভিন্ন ধরনের বৃত্তি শিক্ষার প্রতিষ্ঠানে যাতে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

(৭) দক্ষ ও কুশলী কর্মীসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য I.T.I. গুলোতে শিক্ষার সুযোগ বাড়াতে হবে।

(৮) পলিটেকনিকগুলো শিল্পাঞ্চলে প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং গ্রামাঞ্চলে পলিটেকনিকগুলোতে কৃষিবিদ্যা ও কৃষির সঙ্গে যুক্ত শিক্ষার ব্যবহার করতে হবে।

(৯) পলিটেকনিকগুলোতে গণিত ও বিজ্ঞান শিক্ষার উপর জোর দিতে হবে।

(১০) কলকারখানাতে ব্যবহারিক শিক্ষার সুযোগ বাড়ানো দরকার। যেসব কারখানায় শিক্ষার্থীরা শিক্ষাগ্রহণ করছে তাদের কেন্দ্র থেকে সাহায্য দেওয়া হবে।

শিক্ষার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির জন্য কমিশনের সুপারিশ

(১) প্রত্যেক ব্লকে অন্তত একটি করে আঞ্চলিক বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।

(২) মেধা অনুযায়ী ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতিভাবান ছাত্রছাত্রীদের চিহ্নিত করে তাদের বিশেষ সাহায্যের ব্যবস্থা করতে হবে। কমিশন ঋণমূলক ছাত্রবৃত্তি (Loan Scholarship) দেবার পরামর্শ দিয়েছেন।

(৩) মাধ্যমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে Book Bank স্থাপন করতে হবে।

(৪) যারা একবার পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছে তাদের শিক্ষার জন্য ডাকযোগে শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

(৫) প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষা সামগ্রী ইত্যাদি সরবরাহ করতে হবে।

(৬) প্রতি বছর ৫০ শতাংশ শিক্ষার্থীদের বিদেশে পাঠাবার জাতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। বিদেশে পেশাগত শিক্ষার জন্য ঋণবৃত্তি দেবার ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারকে করতে হবে।

(৭) জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে সমান সুযোগ দেবার উদ্দেশ্যে কমন স্কুল (Common School) চালু করার কথা বলা হয়। এই ধরনের স্কুলগুলোর শিক্ষার মান উন্নত ও অবৈতনিক হবে।

(৮) দুর্বল ও অনগ্রসর শ্রেণির শিক্ষার সুযোগ আরও অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি করতে হবে।

(৯) স্ত্রী শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার উন্নতির জন্য কমিশনের সুপারিশ

ইন্দ্রিয়জাত সমস্যার কারণে প্রতিবন্ধী শিশুরা শিক্ষার দিক দিয়ে সাধারণ শিশুদের থেকে অনেকটাই পিছিয়ে থাকে। কোঠারী কমিশন বলেছেন প্রতিবন্ধী শিশুদের যাতে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে সমাজের একজন উপযুক্ত নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা যায় সেই ব্যবস্থা করতে হবে। কমিশন প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার উন্নতির জন্য কয়েকটি সুপারিশ করেন, সুপারিশগুলো হল —

(১) প্রতিটি জেলাতে প্রতিবন্ধীদের জন্য কমপক্ষে একটি স্কুল স্থাপন করতে হবে।

(২) ১৯৮৬ সালের মধ্যে ১০ শতাংশ প্রতিবন্ধী শিশুর শিক্ষার সুযোগ সুবিধা দিতে হবে।

(৩) প্রতিবন্ধী স্কুলের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।

(৪) প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা নিয়ে গবেষণা করার জন্য শিক্ষামন্ত্রককে নানা কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে ও আর্থিক

সাহায্য দিতে হবে।

(৫) আগামী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যেসব শিশু আংশিক দৃষ্টিহীন, যারা ভালোভাবে কথা বলতে পারে না তাদের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে।

মূল্যায়ণ :

মূল্যায়ণ সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশগুলো হল —

(১) নিম্ন প্রাথমিক স্তরে মূল্যায়ণের উদ্দেশ্য হবে শিশুদের মধ্যে সাধারণ দক্ষতা, সঠিক অভ্যাস এবং আগ্রহ গড়ে উঠেছে কিনা তা পরিমাপ করা।

(২) উচ্চ প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের লিখিত পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মৌখিক পরীক্ষার উপর গুরুত্ব দিতে হবে। এই পরীক্ষাগুলো হবে আভ্যন্তরীণ। দুর্বলতা নির্ণায়ক পরীক্ষাগুলোর ক্ষেত্রে অভীক্ষাগুলো হবে শিক্ষক দ্বারা নির্মিত।

(৩) প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের শেষে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মান সঠিক আছে কিনা তা দেখার জন্য জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক মাঝে মাঝে স্কুলগুলোকে Survey করতে পারেন।

(৪) প্রাথমিক শিক্ষার শেষে বিদ্যালয়গুলোই সার্টিফিকেট দেবে। এই সার্টিফিকেটের সঙ্গে সর্বাত্মক পরিচয়পত্রও দেবে।

(৫) প্রাথমিক শিক্ষার শেষে বৃত্তি দেওয়ার জন্য অথবা মেধাবী শিক্ষার্থী শনাক্তকরণের জন্য সাধারণ পরীক্ষা ছাড়াও বিশেষ পরীক্ষা নেওয়া যেতে পারে।

(৬) প্রতিটি স্তরের আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গীন বিকাশের পরিমাপের ব্যবস্থা থাকা উচিত। স্কুল যে সমস্ত লিখিত পরীক্ষা নেবে সেগুলোর মানোন্নয়ণ প্রয়োজন।

(৭) দশম ও একাদশ শ্রেণির যে পরীক্ষাগুলো হবে তা পরিচালনা করবে Board of Secondary Education। আবার এই বোর্ড দ্বাদশ শ্রেণির শেষে বহিঃপরীক্ষার ব্যবস্থা করবে।

(৮) শিক্ষকদের মূল্যায়ণ সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেওয়ার জন্য সেমিনার, আলোচনা ও ওয়ার্কশপের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

(৯) পরীক্ষা ব্যবস্থায় নম্বর দানের বদলে গ্রেড প্রথা চালু করতে হবে।

শিক্ষক শিক্ষণ সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশ

শিক্ষার মান উন্নয়ণের জন্য কমিশন শিক্ষক প্রশিক্ষণের কথা বলেন। কমিশন শিক্ষকদের কর্মকালীন এবং কর্মপূর্ব শিক্ষক শিক্ষণের কথা বলেন। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষক শিক্ষণ কোর্সের স্থায়িত্ব হবে ২ বছর। প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত শিক্ষকদের বি.এড. ডিগ্রি সহ শিক্ষাতত্ত্বে, বা কোনো একটি বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকবে। মাধ্যমিক শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শিক্ষকদের দুটি স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকবে — একটি সাধারণ বিষয়ে অন্যটি শিক্ষাতত্ত্বে। শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের চাহিদা অনুসারে প্রত্যেক রাজ্যে প্রশিক্ষণ লাভের সুযোগ সুবিধা বাড়াতে হবে। আংশিক সময়ের জন্য বা ডাকযোগে শিক্ষক শিক্ষণ-এর সুযোগ শিক্ষার প্রতিটি স্তরে থাকা উচিত। শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিনা বেতনে পড়ানো হবে। জাতীয় স্তরে U.G.C. শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর দায়িত্বে থাকবে আর রাজ্যস্তরে এই প্রতিষ্ঠানগুলোর দায়িত্বে থাকবে রাজ্য শিক্ষক শিক্ষা পর্ষদ (State Board of Teacher Education)। কেন্দ্রীয় শিক্ষণ

প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ বরাদ্দ করবে; আর রাজ্য শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য রাজ্য সরকার অর্থ বরাদ্দ করবে বলে কমিশন সুপারিশ করে।

নারী শিক্ষা :

নারীশিক্ষা সম্পর্কে কোঠারী কমিশনের সুপারিশগুলো হল —

(১) ছেলে ও মেয়েদের পাঠ্যক্রমের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা চলবে না।

(২) মেয়েরা ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে গৃহবিজ্ঞান শিক্ষা করতে পারে, কিন্তু একে বাধ্যতামূলক করা চলবে না।

(৩) মেয়েদের জন্য ব্যাপকভাবে সঙ্গীত ও চারুকলা শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

(৪) বিজ্ঞান ও অঙ্ক শেখার ব্যাপারে মেয়েদের উৎসাহ দিতে হবে।

(৫) স্ত্রী শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের ব্যবস্থা করতে হবে।

উপসংহার —

জাতীয় শিক্ষা কমিশন বা কোঠারী কমিশন প্রাক্ প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষা স্তর পর্যন্ত সকল স্তরের শিক্ষার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছে এবং প্রত্যেকটি বিষয়ে তাদের সুচিন্তিত মতামত প্রদান করেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার ব্যাপারেও এই কমিশন বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিল। ভাষা সম্পর্কে ‘ত্রিভাষা সূত্র’ এই কমিশনের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ। পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার, বিদ্যালয় গুচ্ছ, বয়স্ক শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়েও কমিশন গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেছে। তবে এই সুপারিশগুলো বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য সরকারের যেই প্রচেস্টা তা প্রশংসার দাবী রাখে।

চতুর্থ একক জাতীয় শিক্ষানীতি ১৯৮৬ এবং তার সংশোধিত খসড়া-১৯৯২

সুচনা - ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে স্বাধীনতা লাভের পর ভারত সরকার গ্রাম এবং শহরাঞ্চলে জনগণের নিরক্ষরতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কর্মসূচী হাতে নিয়েছেন। ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজদ সারা ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা পর্যালোচনা করে একটি সুষ্ঠ শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতে ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দে গঠিত হয় প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন বা রাধাকৃষ্ণাণ কমিশন (১৯৪৮-৪৯)। ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দে গঠিত হয় মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন বা মুদালিয়র কমিশন (১৯৫২-৫৩)। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন মূলত ১৯৫৩ সালের ২৮শে ডিসেম্বর ভিত্তি স্থাপিত হলেও (Inaugurated) ইহা ১৯৫৬ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয়েছিল। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু ১৯৫১ সালে উন্নত ও গুণগত মানের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষার জন্য এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরে শিক্ষার উন্নতির জন্য ১৯৬১ সালে গঠন করেন। এবার ১৯৬৪ খ্রীস্টাব্দে গঠিত হয় ভারতীয় শিক্ষা কমিশন বা কোঠারী কমিশন (১৯৬৪-৬৬)। তারা প্রত্যেকেই ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের জন্য বিভিন্ন সুপারিশ করেছেন।

কোঠারী কমিশন সেদিন জাতীয় শিক্ষানীতির যে বুনিয়াদ তৈরি করেছিলেন সেই বুনিয়াদের উপর ভিত্তি করে ১৯৬৮ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী প্রথম জাতীয় শিক্ষানীতি রচনা করেন। (ক) এই শিক্ষানীতির লক্ষ্য ছিল শিক্ষার সমসুযোগ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক অসাম্য দূর করা (খ) জাতীয় সংহতি স্থাপন করা (গ) ভারতের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক দিকের বিকাশ সাধন করা (ঘ) সংবিধানের নির্দেশ অনুযায়ী ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সকল শিশুর অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা (ঙ) উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকদের পেশাগত উন্নতি সাধন করগা (চ) কোঠারী কমিশন প্রস্তাবিত ত্রিভাষা সূত্রের প্রয়োগ করা এবং (ছ) শিক্ষার জন্য জাতীয় আয়ের শতকরা ছয়ভাগ বরাদ্দ করা।

১৯৬৮ সালে জাতীয় শিক্ষানীতি রচিত হওয়ার এক দশক পর ১৯৭৯ সালে আবার সংশোধিত রূপে জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষিত হয়েছিল। এই দুই শিক্ষানীতির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, দেশের সর্বত্র প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন করা সম্ভব হয়নি, আজও নিরক্ষরতার প্রশ্ন আগেকার মতোই আছে, শিক্ষার সাথে বাস্তু জীবিকার প্রত্যক্ষ সংযোগ নেই; শুধু ডিগ্রির পেছনে ছুটবার আকুলতা আছে। তাই সাংবিধানিক কর্তব্যের দিকটা মাথায় রেখে সেদিন দেশের নেতৃবর্গ স্বাধীন ভারতে আরও একটি নতুন জাতীয় শিক্ষানীতির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন।

১৯৮৪ সালে তদানীন্তন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর পর তার পুত্র রাজীব গান্ধী জনগণের ভোটের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে প্রধানমন্ত্রীর আসন অলংকৃত করেন। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে জনগণের প্রতি তাঁর প্রথম ভাষণে তিনি এমন এক শিক্ষাব্যবস্থা রচনা করার প্রতিশ্রুতি দেন যা দেশের

প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদকে সর্বোচ্চমাত্রায় ব্যবহার করে জাতির পুনর্গঠনকে দ্রুতরূপ দিতে সফল হয়। তিনি আরও বলেছেন যে, বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ভারতের উন্নয়ণকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে শক্ত ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তিনি দেশের সকল চিন্তাশীল ব্যক্তির সহমতের ভিত্তিতে এক নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের প্রতিশ্রুতি দেন। আর প্রধানমন্ত্রীর এই প্রতিশ্রুতিকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে ১৯৮৫ খ্রীস্টাব্দে তদানীন্তন ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রক "Challange of Education : A policy Perspective" নামে একটি প্রতিবেদন পার্লামেন্টে পেশ করেন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রিত একবিংশ শতাব্দীতে জাতীয় জীবনে যে ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দেবে তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এক শিক্ষাব্যবস্থা তৈরির প্রচেষ্টা এই প্রতিবেদনে দেখা যায়। সেই শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্য হবে জাতীয় জীবনের প্রতিটি দিকের উন্নতি ঘটানো। বিশদ আলোচনার পর ১৯৮৬ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে উক্ত প্রতিবেদনটি সংবিধানের উভয় সভার অনুমোদন লাভ করে। এই অনুমোদিত শিক্ষা দলিলই হল জাতীয় শিক্ষানীতি ১৯৮৬ (National Policy on Education-1986)।

জাতীয় শিক্ষানীতির (১৯৮৬) উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো নিম্নরূপ

১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতির প্রতিবেদনটি মোট ১২টি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে রয়েছে ভূমিকা এবং শেষ অধ্যায়ে রয়েছে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। আর বাকী দশটি অধ্যায়ে ভবিষ্যৎ ভারতের শিক্ষার গতিপ্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে বিভিন্ন অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হল —

প্রথম অধ্যায় : ভূমিকা (Introduction)

এই অধ্যায়ে ১৯৬৮ ও ১৯৭৯ সালের জাতীয় শিক্ষানীতি ও তার ফলশ্রুতি সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। ঐ শিক্ষানীতিতে উল্লেখিত এমন অনেক বিষয় আছে যেগুলোর বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। ভারতবর্ষ মূলত কৃষি নির্ভর দেশ। ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এক সংকটের মধ্যে চলেছে। এগুলোর যথার্থ বিকাশ ততদিন সম্ভব হবে না যতদিন না পর্যন্ত শিক্ষার প্রসারে যথার্থ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তাই আগামী দিনের জনগণকে নতুন চিন্তাধারা এবং বৃত্তিমূলক কাজে নিয়োজিত করতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। সামাজিক ন্যায় ও মূল্যবোধের প্রতি তাদের দায়বদ্ধতাকে নিশ্চিত করতে হবে। এসবের জন্য প্রয়োজন নতুন শিক্ষাব্যবস্থা। তাই শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে জাতীয় শিক্ষানীতিতে কয়েকটি বিশেষ বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায় : শিক্ষার কাঙ্খিত বিষয় এবং বাস্তবায়ণে এর পটভূমি (The Essence and Role of Education)

শিক্ষা হল বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য এক বিশেষ বিনিয়োগ। এর তাৎপর্য হল আর্থিক বিনিয়োগে যেমন লাভ আসার সম্ভাবনা থাকে তেমনি জাতীয় শিক্ষার মাধ্যমে বর্তমান ও ভবিষ্যতের চাহিদা পূরণের প্রত্যাশা থাকে। তাই ১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে শিক্ষা হবে সকলের জন্য। শিক্ষা হবে সর্বাঙ্গীন উন্নয়ণের হাতিয়ার। সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয় সংহতি, গণতন্ত্র বিষয়ক ধারণা, বিজ্ঞানভিত্তিক ভাবধারা, স্বাধীন মানসিকতা, পরিবেশ সংরক্ষণ, সামাজিক অসাম্য

দূরীকরণ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করার শিক্ষা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে জাতীয় শিক্ষানীতিতে। শিক্ষার উপর ভিত্তি করে গবেষণা ও উন্নয়ণ প্রক্রিয়া পরিচালিত হলে তবেই সেই শিক্ষার্থী দ্বারা জাতীয় উন্নয়ণ সম্ভব হবে।

তৃতীয় অধ্যায় : জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা (National System of Education)

জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা হল একটি নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত জাতি, ধর্ম, বর্ণ, স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য সমমানের শিক্ষাব্যবস্থা করা। তাই জাতীয় শিক্ষানীতিতে যে প্রস্তাব করা হয় তাতে বলা হয় —

(১) সাধারণ শিক্ষাকাঠামো — সারা দেশে একই প্রকারের শিক্ষাকাঠামো (১০+২+৩) চালু করা প্রয়োজন। এই শিক্ষানীতিতে দশম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাকে ৫ বছরে নিম্ন প্রাথমিক, ৩ বছরের উচ্চ প্রাথমিক ও ২ বছরের নিম্ন মাধ্যমিক — এই তিনভাগে ভাগ করার কথা বলা হয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিক স্তর হবে ২ বছরের এবং উচ্চশিক্ষা হবে ৩ বছরের।

(২) জাতীয় পাঠ্যক্রম — জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার একটি আবশ্যিক সাধারণ পাঠ্যক্রম থাকবে। এর অন্তর্ভুক্ত হবে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, সাংবিধানিক দায়িত্ব ও কর্তব্য, জাতীয় ভাবধারা বিকাশের সহায়ক বিষয় ইত্যাদি। এছাড়াও নতুন পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্তুতে থাকবে দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, নারী পুরুষের সমান অধিকার, পরিবেশ সংরক্ষণ, সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণ, ছোটো পরিবারের উপযোগিতা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গঠন প্রভৃতি বিষয়ক শিক্ষা যা শিক্ষার্থীদের মূল্যবোধের বিকাশ ঘটাবে। সমগ্র বিশ্বকে একটা পরিবার হিসাবে কল্পনা করে আমাদের দেশের ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার পাঠ্যক্রম রচনা করতে হবে।

(৩) ভাষানীতি — ভাষা সম্পর্কে জাতীয় শিক্ষানীতির বক্তব্য হল, কোঠারী কমিশন (১৯৬৪-৬৬) যে ভাষানীতি সুপারিশ করেছে এবং যা ১৯৬৮ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে অনুমোদিত হয়েছে তা বজায় রাখা, যেমন -

(ক) প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাস্তর পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা।

(খ) ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে ত্রিভাষা সত্র চালু থাকবে। নিম্ন প্রাথমিক স্তরে ছাত্রছাত্রীরা একটি ভাষা শিখবে। উচ্চ প্রাথমিক স্তরে ছাত্রছাত্রীরা দুটি ভাষা শিখবে। মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রছাত্রীরা তিনটি ভাষা শিখবে। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রছাত্রীরা দুটি ভাষা শিখবে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষা শিক্ষা অতিরিক্ত বিষয় বলে বিবেচিত হবে।

(গ) শিক্ষানীতিতে সব শিক্ষাস্তরে ইংরেজীতে বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষা দেবার বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্ব পায়। এছাড়া উচ্চশিক্ষাস্তরে পাঠাগারের ভাষা আন্তর্জাতিক স্তরে যোগাযোগের ভাষা, শিল্প, বাণিজ্য, রাজনীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষাশিক্ষা বিশেষ প্রয়োজন।

(ঘ) ভারতের সাংস্কৃতিক ধারা বজায় রাখার কারণে এবং জাতীয় সংহতি রক্ষার জন্য সংস্কৃত ভাষাশিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

(৪) উচ্চশিক্ষার সার্বজনীন — উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিটি রাজ্যের শিক্ষার্থীরা যাতে তাদের প্রতিভার ভিত্তিতে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। গবেষণা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে তোলা প্রয়োজন।

(৫) জীবনব্যাপী শিক্ষা — জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় জীবনব্যাপী শিক্ষার কথা বলা হয়। সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর লক্ষ্যে বিদ্যালয় দুটি যুবক-যুবতী, গৃহবধূ, কৃষি ও কলকারখানার শ্রমিকদের জন্য তাদের পছন্দের নিরিখে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এর জন্য মুক্ত ও দূরাগত শিক্ষার বিকাশ সাধন বিশেষভাবে প্রয়োজ।

(৬) জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সহযোগিতা গ্রহণ --- ভারতের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় যেসব প্রতিষ্ঠানগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সেগুলো হল U.G.C. (University Grants Commission), AICTE (All India Council of Technical Education), ICAR (Indian Council of Agricultureal Research), M.C.I. (Medical Council of India), N.C.E.R.T. (National Council of Education Research and Training), NIEPA (National Institute of Educational Planning and Administration) ইত্যাদি। এই কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করে তুলতে হবে। যার সহযোগিতায় জাতীয় শিক্ষানীতিকে সফল রূপ দেওয়া সম্ভব হবে।

(৭) অর্থপূর্ণ অংশীদায়িত্ব — ১৯৭৬ খ্রীস্টাব্দে ৪২ তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে শিক্ষাকে যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটি একটি সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ, ১৯৮৬ খ্রীঃ জাতীয় শিক্ষানীতিতে "অর্থপূর্ণ অংশীদারিত্ব" বলতে বোঝায় যুগ্ম তালিকায় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের ভূমিকা কি হবে তার ব্যাখ্যা। জাতীয় শিক্ষানীতিকে বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য, জাতীয় শিক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলোকে সুদৃঢ় করার জন্য, শিক্ষার গুণগত মানের উন্নয়ন ঘটানোর জন্য, জনগণের মধ্যে জাতীয় সংহতি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে এবং মানব সম্পদের যথাযথ বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য অর্থপূর্ণ অংশীদারত্ব সম্পর্কে অর্থাৎ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার যৌথভাবে কি কি দায়িত্ব পালন করবে সে সম্পর্কে নির্দিষ্ট মতামত প্রকাশ করাই হল অংশীদারে ধারণার মূল কথা।

চতুর্থ অধ্যায় : সাম্যের জন্য শিক্ষা (Education for Equality)

জাতীয় শিক্ষানীতির অন্যতম উদ্দেশ্য হল অসাম্য দূর করা, যারা শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত তাদেরকে শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে। নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে যেসব অসুবিধাগুলো রয়েছে সেগুলোকে দূর করতে হবে। এছাড়া দেশের অনুন্নত সম্প্রদায়, যেমন - তপশিলি জাতি ও উপজাতি, সংখ্যালঘু, মহিলা, প্রতিবন্ধী এবং বয়স্কদের শিক্ষার প্রসারে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার কথা শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে।

(১) নারীশিক্ষা — সমাজে নারীদের যাতে যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায় সেজন্য শিক্ষাকে কাজে লাগাতে হবে। নারীশিক্ষার পূণর্গঠনের জন্য পাঠ্যক্রম, পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক-শিক্ষণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী প্রশাসকদের প্রশিক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে নারীশিক্ষা উন্নয়নের বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। মেয়েরা যাতে বৃত্তিমূলক, কারিগরী ও পেশাগত শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে অংশগ্রহণ করে তার উপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। সাধারণ শিক্ষায় ছেলে ও মেয়েদের পাঠ্যক্রমে কোনো পার্থক্য রাখা যাবে না।

(২) তপশিলি জাতির জন্য শিক্ষা (Education of Sheduled Castes) : গ্রাম ও শহরের নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকল তপশিলি তালিকাভুক্ত জাতির শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষার প্রতিটি স্তরে সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত প্রতিটি তপশিলি জাতিভুক্ত ছেলেমেয়ে যাতে বিদ্যালয়ে আসে তার

জন্য সরকারের পক্ষ থেকে তপশিলি পরিবারগুলোকে আর্থিক প্রেরণা দেওয়া প্রয়োজন। বিদ্যালয়ে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিশেষ বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। তপশিলি ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে ভরতি করা, বিদ্যালয়ে নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত তাদের ধরে রাখা, প্রতিকারমূলক বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে স্থানীয় ভিত্তিতে ছোটো ছোটো পরিকল্পনা গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে। তপশিলি ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রতিটি জেলা সদরে আবাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। তপশিলি অধ্যুষিত অঞ্চলে বা তার নিকটবর্তী স্থানে বিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা করতে হবে। তপশিলি ছাত্রছাত্রীদের পঠন পাঠনে সহায়তা করার জন্য সম্ভব হলে তপশিলি সম্প্রদায়ের মধ্য থেকেই উপযুক্ত শিক্ষক শিক্ষিকা নিয়োগ করতে হবে। শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধির জন্য নতুন পদ্ধতি ও কৌশল আবিষ্কার করতে হবে।

(৩) তপশিলি উপজাতির জন্য শিক্ষা (Education of Sheduled Tribes) :

উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলার উপর অগ্রাদিকার দেওয়া হবে। তপশিলি উপজাতিদের ভাষার উন্নতি ঘটিয়ে, সেই ভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও পাঠদানের ব্যবস্থা করতে হবে। উপজাতিদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করে পাঠ্যক্রম ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষিত তপশিলি উপজাতি যুবক যুবতিদের শিক্ষকতা বৃত্তিতে আনার জন্য উৎসাহিত করতে হবে এবং তাদের চাহিদা ও পছন্দ অপছন্দকে গুরুত্ব দিয়ে তাদের বিভিন্ন পেশাগত ও বৃত্তিমুখী শিক্ষায় উৎসাহিত করতে হবে। প্রয়োজনে বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করতে হবে। তপশিলি উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে অঙ্গানওয়ারি, প্রথাবহির্ভূত কেন্দ্র ও বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করতে হবে।

(৪) সংখ্যালঘুদের শিক্ষা (Minorities Education):

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষজনের জন্য বিশেষ বিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা করতে হবে। তারা যাতে নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতির উন্নতিসাধনের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটায় - তার জন্য সরকারিভাবে সাহায্যের বন্দোবস্ত করতে হবে।

(৫) প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা (Education of Handicapped):

দৈহিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীরা যাতে নিজেদের সাধারণ সমাজের অংশ হিসাবে মনে করতে পারে সেজন্য তাদেরকে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে বিদ্যালয়ে পঠনপাঠনের সুযোগ করে দিতে হবে। যাদের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা খুব বেশি তাদের জন্য নিকটবর্তী অঞ্চলে ছাত্রাবাস সহ বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতিবন্ধীদের জন্য যথেষ্ট সংখ্যায় বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার জন্য যতটা সম্ভব স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে উৎসাহ দেওয়া হবে।

(৬) বয়স্ক শিক্ষা (Adult Education) :

জাতীয় শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে, ১৫-৩৫ বছর বয়স্ক জনগণকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করার জন্য দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করতে হবে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার, রাজনৈতিক দল ও তাদের সংগঠনগুলো, গণমাধ্যমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সাক্ষরতা কর্মসূচী রূপায়ণে উৎসাহিত করা হবে। শিক্ষক, ছাত্র, যুবক, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, নিয়োগকর্তা ইত্যাদি সব স্তরের পক্ষ থেকে বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করতে হবে। বয়স্ক শিক্ষা প্রকল্পের আওতায় ১৯৮৫ সালের মধ্যে ৪ কোটি

নিরক্ষর মানুষকে আনতে হবে। বয়স্ক শিক্ষার জন্য যে সকল প্রয়াস গ্রহণ করার সুপারিশ ১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে করা হয়েছিল সেগুলো হল —

(i) গ্রামাঞ্চলে প্রবহমান শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন।

(ii) সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থার মাধ্যমে শ্রমিক ও কর্মচারীদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা।

(iii) মাধ্যমিক পরবর্তী স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন।

(iv) পুস্তক প্রকাশ, গ্রন্থাগার ও পাঠকক্ষ স্থাপন ও তার প্রসার।

(v) বেতার, দূরদর্শন, চলচ্চিত্র ইত্যাদি গণমাধ্যমগুলোকে ব্যবহার করা।

(vi) দূরবর্তী শিক্ষার প্রচলন।

(vii) বৃত্তিশিক্ষার কর্মসূচী রূপায়ণ ইত্যাদি।

পঞ্চম অধ্যায় : বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার পুনর্গঠন

(Reorganisation of Education at Different Stages)

(১) প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা : শৈশবে শিশুর সামগ্রিক বিকাশের দিকে লক্ষ্য রেখে পুষ্টি, স্বাস্থ্য, সামাজিক, মানসিক, দৈহিক, নৈতিক, প্রক্ষোভিক বিকাশ ইত্যাদি মৌলিক বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিয়ে শিশুর যত্ন ও শিক্ষাকে (Early Childhood Care and Education, ECCE) অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা জাতীয় শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে। এই কর্মসূচীকে শিশু উন্নতি সেবামূলক কর্মসূচীর (Integrated Child Development Scheme, ICDS) সঙ্গে যুক্ত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশ, ইচ্ছার প্রকাশ ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য রেখে খেলার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। শিক্ষার এই কর্মসূচীর সঙ্গে স্থানীয় সমাজকে সংযুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

(২) প্রাথমিক শিক্ষা : প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে জাতীয় শিক্ষানীতিতে যে দুটি বিষয়ের উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় তা হল —

() দেশের সকল ছেলেমেয়েকে স্কুলে ভর্তি করা এবং ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত তাদেরকে বিদ্যালয়ে ধরে রাখা।

() শিক্ষার গুণগত মানের প্রকৃত উন্নয়ন ঘটানো।

এছাড়াও জাতীয় শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতির জন্য কয়েকটি বিষয়ের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়। সেগুলো হল শিশুকেন্দ্রিকতা, বিদ্যালয়ের সুযোগ সুবিধা, বিধিমুক্ত শিক্ষা ও সার্বজনীন শিক্ষা।

শিশুকেন্দ্রিকতা — প্রাথমিক স্তরে শিশুকেন্দ্রিক ও কর্মভিত্তিক শিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। শিশুর বিকাশের সঙ্গে সংগতি রেখে জ্ঞানমূলক শিক্ষার প্রসার ও দক্ষতার জন্য অনুশীলনের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় সফল হতে না পারলে অনুন্নয়ন ব্যবস্থা একেবারে বাতিল করে দৈহিক শাস্তিকে বিদ্যালয় থেকে দূর করতে হবে।

বিদ্যালয়ের সুযোগ — প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতিকল্পে শিক্ষানীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ হল **‘অপারেশন ব্ল্যাক বোড’** কর্মসূচী। এই কর্মসূচীতে ঠিক করা হয়, প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সব ঋতুতে ব্যবহার উপযোগী দুইটি করে বড়ো শ্রেণিকক্ষ এবং প্রতি বিদ্যালয়ে দুইজন করে শিক্ষক থাকবেন। যার

মধ্যে একজন হবেন মহিলা ও অপরজন হবেন পুরুষ। ধীরে ধীরে প্রত্যেক শ্রেণির জন্য একজন করে শিক্ষকের ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়া থাকবে ব্ল্যাকবোর্ড, মানচিত্র, নানারকম চার্ট, প্রয়োজনীয় বই, রাজ্য ও জেলার মানচিত্র, বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য সহজ সরঞ্জাম, খেলার জন্য ফুটবল, রাবারের কল, চক্, ডাস্টার, ঘন্টা ইত্যাদি। সরকার, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে এই ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করা হবে। স্থির হয়েছে, ১৯৮৭-৮৮ সালের মধ্যে দেশের ২০ শতাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়কে 'অপারেশন ব্ল্যাকবোর্ডের' আওতায় আনা হবে।

বিধিমুক্ত শিক্ষা : বিদ্যালয় ছুট (Drop-out) শিক্ষার্থীদের, বিদ্যালয়বিহীন অঞ্চলের শিশুদের, কর্মরত শিশু এবং যেসব বালিকারা দিবা বিদ্যালয়ে পুরো সময়ের জন্য উপস্থিত থাকতে পারে না তাদের জন্য ব্যাপকভাবে বিধি বহির্ভূত ধারাবাহিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এই শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে আধুনিক প্রযুক্তিগত উপকরণ ব্যবহার করা হবে। অঞ্চলের প্রতিভাবান ও উৎসর্গীকৃত যুবক ও যুবতীদের শিক্ষার্থীর কাজে নিয়োগ করা হবে এবং তাদের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এর পাঠ্যক্রম জাতীয় পাঠ্যক্রমের সঙ্গে সংগতি রেখেই তৈরি করা হবে। এই শিক্ষা ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের জন্য আকর্ষনীয় পরিবেশ, খেলাধূলার ব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক বিভিন্ন কর্মসূচী, শিক্ষার্থীদের ভ্রমণের ব্যবস্থা ইত্যাদি থাকবে। এই শিক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হবে পঞ্চায়েত বা স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলোকে। তবে এইসব সংস্থাকে যথেষ্ট পরিমাণে এবং যথাসময়ে আর্থিক সহায়তা করতে হবে। ১৯৯০ সালের মধ্যে যারা ১১ বৎসরে উপনীত হবে তারা যাতে ৫ বছরের বিদ্যালয় শিক্ষা বা সেইমানের বিধিবহির্ভূত শিক্ষা অর্জন করতে পারে তা সুনিশ্চিত করতে হবে। ১৯৯৫ সালের মধ্যে ১৪ বছর বয়স্ক সব শিশুদের অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা দেওয়া হবে।

সর্বজনীন শিক্ষা — সংবিধানের ৪৫ নং ধারায় প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক, বাধ্যতামূলক ও সর্বজনীন করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে যেমন শিক্ষার প্রতি সাধারণ জনগণের একটা বড়ো অংশের অনীহা, দারিদ্র, অবাস্তব শিক্ষার বিষয়যোগ্য শিক্ষক, শিক্ষা উপকরণ, বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা পদ্ধতির অভাব এবং ত্রুটিপূর্ণ মূল্যায়ণ ব্যবস্থা ইত্যাদি কারণে লক্ষ্য পূরণ সম্ভব হয়নি। কেবলমাত্র নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্যই শিক্ষার এই লক্ষ্যটি বাস্তবায়িত করতে হবে তাই নয়, সমগ্র বিশ্বে জাতির সম্মানজনক অবস্থানের জন্য এটি বিশেষ প্রয়োজন। শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার গুণগত মান উন্নতির জন্যও প্রচুর অর্থের প্রয়োজন।

(৩) মাধ্যমিক শিক্ষা :

জাতীয় শিক্ষানীতিতে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রসঙ্গে আলোচনায় মাধ্যমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার ও মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত মানের কথা বলা হয়েছে।

মাধ্যমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা : মাধ্যমিক শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা এবং উচ্চশিক্ষার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে। মাধ্যমিক শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান, মানবিক বিষয় ও সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকের সঙ্গে পরিচিত করা হয়। এই স্তরেই শিক্ষার্থীরা ঐতিহাসিক চেতনা জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী, সাংবিধানিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার শিক্ষা পায়। তাই জাতীয় বিকাশে এই স্তরের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার : যদিও স্বাধীনতা লাভের পর মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার ঘটেছে কিন্তু সামগ্রিকভাবে বিচার করলে দেখা যায় যে, আমাদের মত উন্নয়ণশীল দেশের মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। তাই যেখানে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা অনুপস্থিত সেখানে মাধ্যমিক শিক্ষাকে প্রসারিত করতে হবে।

মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগতমান : মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নত করার জন্য মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যক্রমের পুনর্গঠন করার কথা জাতীয় শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে। মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যক্রম সুচিন্তিত ও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে রচিত হওয়া প্রয়োজন যাতে শিক্ষার্থীদের মনে উন্নত কর্মনীতি, মানবিক ও সংস্কৃতি বিষয়ক মূল্যবোধ সৃষ্টি হয়। এই স্তরে বিশেষ ধরনের প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বৃত্তিমুখীকরণ বা মাধ্যমিক শিক্ষাকে পূনর্গঠন করে আর্থিক বিকাশের জন্য মানবসম্পদ সরবরাহ করা হবে। বিশেষ প্রতিভা বা প্রবণতাসম্পন্ন শিশুদের আর্থিক সংগতি বিবেচনা না করে যাতে তারা দ্রুত এগিয়ে যেতে পারে, সেজন্য উন্নতমানের শিক্ষার সুযোগ করতে হবে। এই উদ্দেশ্যপূরণের জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে নির্দিষ্ট ধাঁচের বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে যেখানে নতুন আবিষ্কার ও পরীক্ষানিরীক্ষা করার পূর্ণ সুযোগ থাকবে। এই ব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য হবে সমতা ও সামাজিক ন্যায় (তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য সংরক্ষণ সহ) বজায় রেখে উৎকর্ষের উদ্দেশ্য পূরণ, জাতীয় সংহতির জন্য দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চল থেকে প্রতিভাসম্পন্ন শিশুদের একত্রে বেঁচে থাকার শিক্ষা এবং তাদের সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশ। বিদ্যালগুলো অবৈতনিক এবং আবাসিক হবে। এই ধরনের বিদ্যালয়গুলোকে **নবোদয় বিদ্যালয় বা পথ প্রদর্শনকারী বিদ্যালয়** (Pace-setting School) বলা হবে যা কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় থেকে পৃথক হবে। এই বিদ্যালয়ে কলা, বিজ্ঞান ও বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। এই বিদ্যালয়গুলো কেন্দ্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হবে। পাঠ্যক্রম প্রণয়নের দায়িত্বে থাকবে NCERT।

বৃত্তিমুখীকরণ : জাতীয় শিক্ষানীতিকে বাস্তবরূপে দিতে হলে মাধ্যমিক স্তরে বৃত্তিশিক্ষামূলক কর্মসূচীর অন্তভূক্তি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই কর্মসূচীর উদ্দেশ্য হল ব্যক্তির বৃত্তিযোগ্যতা বৃদ্ধি করা, দক্ষ মানবশক্তির চাহিদা ও জোগানের মধ্যে পার্থক্য দূর করা এবং যেসব ব্যক্তি উৎসাহ ব্যতিরেকে ও উদ্দেশ্যহীনভাবে উচ্চশিক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে তার বিকল্প ব্যবস্থা করা। বৃত্তিশিক্ষা হতে হবে ভিন্নতর শিক্ষা ধরো যার উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে বৃত্তিচয়নে শিক্ষার্থীদের উপযোগী করে তোলা। এই কোর্সগুলো হবে মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর, তবে এর মধ্যে এমন নমনীয়তা থাকবে যাতে অষ্টম শ্রেণির পরেই এগুলো গ্রহণ করা যায়। বৃত্তিশিক্ষার স্বার্থে শিল্প প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বৃত্তিশিক্ষার সংযুক্তি ঘটাতে হবে।

বৃত্তিশিক্ষার বিষয়সমূহ — প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে স্বাস্থ্যশিক্ষা (Health Education) চালু করে শিক্ষার্থীদের পারিবারিক ও সামাজিক স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতন করে তোলা দরকার। এরপর এই ছাত্ররাই +২ স্তরে বিষয়ে বৃত্তিমূলক কোর্স নিয়ে পড়াশোনা করবে। কৃষি, মার্কেটিং, সমাজসেবা ইত্যাদি বিষয়েও বৃত্তিমূলক কোর্সের ব্যবস্থা থাকবে। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাকে বৃত্তিমুখীকরণ, বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নতি ও পরিবেশ শিক্ষার উপর গুরুত্ব প্রদানের পরিকল্পনা নেওয়া হয়।

নারী, গ্রামীণ ও উপজাতি ছাত্র এবং সমাজে বঞ্চিত ছাত্রছাত্রীদের চাহিদা পরিপূরণের জন্য সরকারকে উপযুক্ত বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রতিবন্ধীদের জন্যও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। নব স্বাক্ষর, প্রাথমিক শিক্ষা, সমাপ্তকারী যুবক, বিদ্যালয় ছুট, কর্মরত ব্যক্তি, বেকার বা আংশিক কর্মরত ব্যক্তিদের জন্য প্রথাবহির্ভূত, নমনীয় এবং চাহিদাভিত্তিক বৃত্তিমুখী কর্মসূচীর ব্যবস্থা থাকবে। বৃত্তিমুখী কোর্সের শিক্ষার্থীদের মধ্যে অধিকাংশ যাতে চাকরি পায় বা স্বনিযুক্ত বৃত্তিতে প্রবেশ করে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। নিয়মিতভাবে কোর্সগুলোর পুনর্বিবেচনা প্রয়োজন।

উচ্চশিক্ষার পুনর্গঠন —

উচ্চশিক্ষা মানুষকে সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক ইত্যাদি বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে উদ্বুদ্ধ করে। বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতার সম্প্রসারণ করে জাতীয় উন্নয়ণে সাহায্য করাই হল উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। উচ্চশিক্ষা সংস্কারের জন্য জাতীয় শিক্ষানীতিতে কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন -

(ক) উচ্চশিক্ষায় ভরতির সুযোগ — স্নাতকোত্তর শিক্ষার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের ভর্ত্তির সুযোগ দেওয়া হবে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় যোগ্যতা অর্জনকারী শিক্ষার্থীরাই ভর্ত্তির সুযোগ পাবে।

(খ) বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার — জ্ঞানের অভূতপূর্ব বিকাশের জন্য উচ্চশিক্ষার গতিশীলতা পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নতুন নতুন ক্ষেত্রে এর প্রবেশ হয়েছে। বর্তমানে ভারতবর্ষে যে মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেগুলোর চাহিদা ও সার্বিক উন্নতির জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে যে অদূর ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠানগুলোর সুযোগ সুবিধা সুদৃঢ় এবং বৃদ্ধি করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে।

(গ) মানোন্নয়নের জন্য বিশেষ সুযোগ সুবিধা --- উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসূচীগুলোকে পুনর্বিন্যাস করতে হবে। ভাষার উৎকর্ষতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। কাউন্সিল অফ হায়ার এডুকেশনের মাধ্যমে রাজ্য স্তরে পরিকল্পনা এবং উচ্চশিক্ষার মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে হবে। শিক্ষণ পদ্ধতির ব্যাপক পরিবর্তনে প্রয়াসী হতে হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা, পাঠ্যক্রম ও শিক্ষা উপকরণ, গবেষণা এবং শিক্ষকদের অভিমুখীকরণের উন্নতির জন্য দর্শন শ্রবণ, শিক্ষা উপকরণ এবং বৈদ্যুতিন যন্ত্রকে ব্যবহার করা হবে। এর জন্য চাকুরি গ্রহণের আগে শিক্ষকের প্রস্তুতি এবং প্রবহমান শিক্ষার প্রয়োজন। ধারাবাহিকভাবে শিক্ষকের পারদর্শিতার মূল্যায়ন করতে হবে। মেধার ভিত্তিতে সমস্ত পদ পূরণ করতে হবে।

(ঘ) বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার সুযোগ — বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণার সুযোগ বৃদ্ধি এবং এর উচ্চমান বজায় রাখা হবে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার মধ্যে (বিশেষ করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্র) এবং অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক গবেষণার সঙ্গে সংযোগ রক্ষার জন্য UGC-কে উপযুক্ত ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি অনুসারে স্বশাসিত কোনো ব্যবস্থাপনায় জাতীয় গবেষণার সুযোগ সৃষ্টির অনুকূল প্রয়াসকে উৎসাহিত করা হবে।

(ঙ) মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় — শিক্ষায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও উচ্চশিক্ষার সুযোগ সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়ার

জন্য NPE ১৯৮৬-তে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কথা বলা হয়। এই উদ্দেশ্যেই ১৯৮৫ সালে ইন্দিরা গান্ধী মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (IGNOU) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। এছাড়াও এই শিক্ষানীতিতে প্রতিটি রাজ্যে এই ধরনের মুক্ত বিশ্ব বিদ্যালয় খোলার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্ত্তির জন্য কোনো বয়সের বাধা থাকবে না। শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরনের উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে পাঠদান করা হবে। চাকুরিরত অবস্থায় যারা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাননি তারা এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়তে পারবেন।

(চ) ডিগ্রিকে চাকুরী থেকে বিচ্ছিন্নকরণ — জাতীয় শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে, কোনো ব্যক্তির কোন্ বিষয়ে কতটা জ্ঞান আছে তা তার ডিগ্রি দেখে বলা সম্ভব নয়। সুতরাং চাকুরীর ক্ষেত্রে ডিগ্রি অবশ্য প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হবে না। চাকুরীতে নিয়োগকর্তারা প্রয়োজনমত পরীক্ষার ব্যবস্থা করে উপযুক্ত ব্যক্তিকে বাছাই করে নেবেন। তবে অধ্যাপনা, গবেষণা, ইঞ্জিনিয়ারিং, চিকিৎসা, আইন ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলোতে ডিগ্রির উপর গুরুত্ব দিতে হবে। মানবিক বিষয়, সমাজবিজ্ঞান, বিজ্ঞান ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের চাকুরী ও পদের প্রয়োজন অনুসারে ডিগ্রির মর্যাদা থাকবে। কাজের বিভিন্ন দিক খুলে গেলে উচ্চশিক্ষার উপর চাপ কমবে ও পরীক্ষায় ব্যর্থতাজনিত অপচয়ও কম হবে। একমাত্র উপযুক্ত মেধাসম্পন্ন ব্যক্তিরা উচ্চশিক্ষা নেওয়ার সুযোগ পাবে।

(ছ) গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় --- গান্ধিজির চিন্তাধারা ও আদর্শ অনুসরণ করে নতুন ধারার গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ছোটো ছোটো পরিকল্পনার মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের উন্নতি সাধন করবে এবং বুনিয়াদী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়নে সাহায্য করবে।

(জ) উচ্চশিক্ষার ব্যয় বহন -- উচ্চশিক্ষার ব্যয় বহনের জন্য সরকার এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক সংস্থাকে এগিয়ে আসতে হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায় : কারিগরী ও পরিচালনার শিক্ষা (Technical and Management Education)

জাতীয় শিক্ষানীতির এই অধ্যায়ে কারিগরী ও ব্যবস্থাপনার শিক্ষা সম্পর্কে আলোচিত বিষয়গুলো নিচে উল্লেখ করা হল —

(১) কারিগরী ও পরিচালনা শিক্ষার পুনর্গঠন : নতুন শতাব্দীর অর্থনীতি, সামাজিক পরিবেশ, উৎপাদন ও পরিচালন পদ্ধতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কিত জ্ঞানের বিস্ফোরণের সঙ্গে সংগতি রেখে কারিগরি ও পরিচালনা শিক্ষা পূণর্গঠিত করা প্রয়োজন। এর জন্য করণীয়গুলো হল -

(ক) তথ্য প্রযুক্তিকে শক্তিশালী করা — জনসম্পদ সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহের জন্য যে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তাকে আরও শক্তিশালী করতে হবে।

(খ) প্রবহমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নত করা — আধুনিক প্রযক্তিকে কাজে লাগিয়ে যে প্রবহমান শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে সেটিকে আরও উন্নত করা প্রয়োজন।

(গ) বিদ্যালয় স্তর থেকে কম্পিউটার শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা — কম্পিউটার শিক্ষা কর্মসূচীকে বিদ্যালয় স্তর থেকে শেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে এবং একে পেশাগত শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে স্থান দিতে হবে।

(ঘ) বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্প্রসারণে শিক্ষক ও কর্মী নিয়োগ করা — বৃত্তিমূলক শিক্ষার সম্প্রসারণ,

প্রযুক্তির উন্নতি, পাঠ্যক্রমের উন্নতি ইত্যাদির জন্য বহু শিক্ষক ও কর্মীর প্রয়োজন। এব্যাপারে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।

(ঙ) স্বনিযুক্তি প্রকল্পকে উৎসাহিত করা — স্বনিযুক্তি প্রকল্পে উৎসাহিত করার জন্য ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা স্তরে ঐচ্ছিক কোর্স চালু করা প্রয়োজন যেখানে নিজ চেষ্টায় ব্যবসা পরিচালনা সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করা হবে। গ্রামাঞ্চলের পলিটেকনিকগুলোর গুণগত ও সংখ্যাগত মান বৃদ্ধির প্রতি গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

(চ) কারিগরি বিষয়ে উন্নত গবেষণা — উচ্চতর কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে উন্নত গবেষণার দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। গবেষণার বিষয় হিসেবে গ্রামীণ উন্নয়নমূলক কাজ, গ্রামীন প্রযুক্তির উদ্ভাবনা, উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়কে গুরুত্ব দিতে হবে। মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক, ইঞ্জিনিয়ারীং বৃত্তিমূলক ও ম্যানেজমেন্ট শিক্ষাসহ টেকনিশিয়ান ও কারিগরদের শিক্ষার উন্নয়নের মধ্যে সমন্বয় বিধান প্রয়োজন।

(২) সর্বস্তরের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি —

সর্বস্তরের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে জাতীয় শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে -

(ক) গতানুগতিকতার অবসান ঘটিয়ে আধুনিকতার উপর অধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

(খ) মেয়েদের জন্য হোস্টেলের ব্যবস্থা করতে হবে। খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক বিভিন্ন কার্যাবলির সুবিধাকে সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন।

(গ) কারিগরী শিক্ষা ও শিল্প, গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থা, সমাজ উন্নয়ন কর্মসূচী প্রভৃতির মধ্যে সমন্বয় সাধন করা প্রয়োজন।

(ঘ) মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের দায়িত্ব হবে ইঞ্জিনিয়ারিং, বৃত্তিমূলক ও ম্যানেজমেন্ট শিক্ষাসহ সব ধরনের শিক্ষার সমন্বয় সাধন করা।

(ঙ) টেক্‌নিক্যাল ও ম্যানেজমেন্ট শিক্ষার সমন্বয় ও সংহতির জন্য নিখিল ভারত কারিগরী শিক্ষা পরিষদের (AICTE) উপর আইনগত ক্ষমতা তুলে দেওয়া হবে। সবক্ষেত্রে মূল্যায়নের জন্য একটি অ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড (Accrediation Board) গঠন করা প্রয়োজন।

সপ্তম অধ্যায় : শিক্ষাব্যবস্থাকে সক্রিয়করণ (Making the System Work)

জাতীয় শিক্ষানীতির সপ্তম অধ্যায়ে শিক্ষাব্যবস্থার সক্রিয়করণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। শিক্ষার জন্য প্রয়োজন বিধিবদ্ধ পরিবেশ, আন্তরিকতা, উদ্ভাবন ও সৃষ্টিমূলক কাজে স্বাধীনতা। আর শিক্ষা ব্যবস্থাকে সঠিকভাবে কার্যকরি করতে হলে সকল শিক্ষককে শিক্ষাদানে ও সকল শিক্ষার্থীকে শিক্ষার্জনে মনোনিবেশ করা উচিত। এর জন্য প্রয়োজন হল -

(ক) শিক্ষকের আন্তরিক ও নিষ্ঠামূলক কর্মতৎপরতা এবং দায়বদ্ধতা পালনের প্রতি একনিষ্ঠ হওয়া আবশ্যক।

(খ) শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন ধরনের কল্যানমূলক ব্যবস্থা চালু করা এবং তাদের আচার আচরন এবং নিয়মনীতি পালনের প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

(গ) প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উত্তম শিক্ষার জন্য যাবতীয় অনুকূল পরিবেশ গঠন করা বিশেষ প্রয়োজন।

(ঘ) জাতীয় ও রাজ্যস্তরে ধার্য শিক্ষার মান ও বিধি অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের গুণমান বিচারের রীতি প্রচলনের ব্যবস্থা করা।

অষ্টম অধ্যায় : শিক্ষার বিষয়বস্তু ও শিক্ষা প্রক্রিয়ার পুনর্বিন্যাস
(Reorienting the Content and Process of Education)

অষ্টম অধ্যায়ে শিক্ষার বিষয়বস্তু ও শিক্ষা প্রক্রিয়ার পুনর্বিন্যাসের কথা বলা হয়েছে —

(ক) সংস্কৃতি — আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও নব প্রযুক্তির মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। শিক্ষার বিষয়সূচী ও পদ্ধতির সঙ্গে সাংস্কৃতিক বিষয়সমূহকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সৌন্দর্য, ঐক্য ও শিষ্টাচার বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সচেতন করে তুলতে হবে। কলা, মিউজিওলজি, লোককাহিনী ইত্যাদি বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্ব দেওয়া দরকার। এইসব বিষয়গুলোতে শিক্ষকতা, শিক্ষণ ও গবেষণা প্রক্রিয়াকে জোরদার করতে হবে।

(খ) মূল্যবোধের শিক্ষা - সামাজিক, নৈতিক ও শাস্ত্রগত মূল্যবোধের অনুশীলনের জন্য প্রয়োজনীয় পাঠ্যক্রম তৈরি করে শিক্ষাকে শক্তিশালী করতে হবে। মূল্যবোধের শিক্ষার মাধ্যমে অজ্ঞতা, ধর্মান্ধতা, হিংসা, কুসংস্কার ইত্যাদি দূর করা সম্ভব।

(গ) ভাষা - ১৯৩৮ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে ভাষা সম্পর্কে যা সুপারিশ করা হয়েছিল বাস্তবে তা সম্পূর্ণ রূপায়ন করা সম্ভব হয়নি। তাই ১৯৮৬ সালের শিক্ষানীতিতে সেটি কার্যকর করার কথা বলা হয়েছে।

(ঘ) পুস্তক ও গ্রন্থাগার — পুস্তকের গুণগত উৎকর্ষ সাধন, পাঠকদের পঠন পাঠনের অভ্যাসবৃদ্ধি, সৃষ্টিমূলক রচনায় উৎসাহ দানের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ভারতীয় ভাষায় বিদেশি পুস্তকের অনুপাদ প্রয়োজন। পুস্তকের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে লাইব্রেরিগুলোর উন্নয়ন ও নতুন লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

(ঙ) গণমাধ্যম ও প্রযুক্তি — উন্নয়ন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তরের মধ্যে যোগসূত্র রচনা জন্য আধুনিক প্রযুক্তিকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় সম্পদ সরবরাহ, শিক্ষক-শিক্ষণ, শিল্পকলা ও কৃষি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন প্রথাযুক্ত ও প্রথামুক্ত শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষাগত প্রযুক্তিকে ব্যবহার করা দরকার। শিশুশিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষা উভয়ের ক্ষেত্রে গণমাধ্যম ও উপকরণের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এদের জন্য শিক্ষা উপযোগী ফিল্ম তৈরির ব্যবস্থা করা দরকার।

(চ) কর্ম অভিজ্ঞতা — যেসব কর্ম অভিজ্ঞতা সমাজে এবং অন্য শিক্ষা প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় যেগুলো শিক্ষার সকল স্তরে অপরিহার্যরূপে গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষার ধাপে ধাপে কর্মসূচী প্রয়োগ করলে শিক্ষার্থীদের কর্মদক্ষতা ও জ্ঞানের গভীরতা ক্রমশ বাড়বে।

(ছ) শিক্ষা ও পরিবেশ — শিশু থেকে সব বয়সের ও সকল স্তরের মানুষের জন্য পরিবেশ সচেতনতা সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এই কারণে শিক্ষার সকল স্তরে পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়টিকে পাঠ্যক্রমের মধ্যে রাখতে হবে।

(জ) গণিত শিক্ষা — যেসব বিষয়ের ক্ষেত্রে যুক্তি দিয়ে কোনো কিছু বিশ্লেষণের সুযোগ আছে সেক্ষেত্রে অঙ্কশাস্ত্রকে সহায়ক হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। অঙ্কশাস্ত্র শিক্ষণ আধুনিক প্রযুক্তিমূলক পদ্ধতির সঙ্গে

সঠিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে উপস্থাপিত করা দরকার।

(ঝ) বিজ্ঞান শিক্ষা — বিজ্ঞানশিক্ষাকে এমনভাবে সংগঠিত করা হবে যে, প্রত্যেক শিক্ষার্থী বিজ্ঞান সচেতন ও অনুসন্ধিৎসু হয়ে উঠে। বিজ্ঞান ও অঙ্কশাস্ত্র দশম শ্রেণি পর্যন্ত অবশ্যপাঠ্য হবে। বিজ্ঞানের সঙ্গে কৃষি, স্বাস্থ্য, শিল্প ও দৈনন্দিন জীবনের সম্পর্ক স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা পাঠ্যসূচীতে রাখা প্রয়োজন।

(ঞ) দৈহিক শিক্ষা ও খেলাধূলা — মানসিক বিকাশের সঙ্গে দৈহিক বিকাশ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। শিক্ষার সার্থকতা অনেকাংশে দৈহিক শিক্ষার উপর নির্ভরশীল। দৈহিক শিক্ষা ও খেলাধূলার জন্য খেলার মাঠ, সাজসরঞ্জাম, উপযুক্ত শিক্ষক ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে। খেলার জন্য প্রতিষ্ঠান ও হোস্টেল প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে ক্রীড়াশিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। যোগ ব্যায়ামের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হবে। শিক্ষক শিক্ষণ পাঠ্যক্রমেও যোগব্যায়ামকে স্থান দেওয়া হবে।

(ট) যুবসমাজের ভূমিকা NCC, NSS — ছাত্ররা যেসব পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করবে সেগুলোর মধ্যে NCC, NSS উল্লেখযোগ্য। জাতীয় সেবা প্রকল্পকে আরও শক্তিশালী করার কথা জাতীয় শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে।

(ঠ) মূল্যায়ন — শিক্ষা প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি বিচারের ক্ষেত্রে মূল্যায়ন অপরিহার্য। ১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে পরীক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারের প্রয়োজনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পরীক্ষা ব্যবস্থা হবে নির্ভরযোগ্য ও যথার্থ। পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্রদের কৃতিত্বের পরিমাপ করা হবে। পরীক্ষা ব্যবস্থা হবে নৈর্ব্যক্তিক। মাধ্যমিক স্তর থেকে সেমিস্টার প্রথা চালু করা হবে। নম্বরের বদলে গ্রেড প্রথা চালু করা হবে। পরীক্ষা পরিচালন ব্যবস্থাকে উন্নত করতে হবে। পরীক্ষাব্যবস্থা সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার সাজসরঞ্জাম ও শিক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োজনীয় পরিবর্তন প্রয়োজন।

নবম অধ্যায় : শিক্ষক (Teacher)

জাতীয় শিক্ষানীতির নবম অধ্যায়ে শিক্ষকগণের প্রতি বিশেষ মর্যাদা দানের কথা আলোচনা করা হয়েছে। এর জন্য কমিশন যে, বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেছেন সেগুলো হল -

(ক) শিক্ষকের বেতন ও চাকরির শর্তাবলি তাদের সামাজিক ও পেশাগত দায়িত্বের সঙ্গে সংগতি রেখেই নির্ধারণ করা হবে।

(খ) শিক্ষার কর্মসূচী সংগঠনে ও রূপায়নে শিক্ষকের ভূমিকা হবে গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষকদের জন্য খোলাখুলি অংশগ্রহণমূলক ও তথ্যভিত্তিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং যুক্তিসংগত সুযোগের প্রমোশনের মাধ্যমে শিক্ষকদের কৃতিত্বের পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকবে।

(গ) সারা দেশে শিক্ষকদের একই রকম বেতন হার, চাকুরির শর্ত ও চাহিদা মেটাবার ব্যবস্থা রাখা হবে।

(ঘ) শিক্ষক শিক্ষণ হবে একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। চাকরি পূর্ব ও চাকরিকালীন শিক্ষণের মধ্যে কোনো বিচ্ছিন্নতা নেই। তবে প্রথম কাজ হবে শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থাকে পুনর্বিন্যাস করা।

(ঙ) প্রতিটি জেলায় DIET (Discrict Institute of Education and Training) প্রতিষ্ঠা করা হবে। এই প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষক, বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষকদের চাকুরিরত অবস্থায় অথবা চাকুরি

পূর্ব অবস্থায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে। প্রতিষ্ঠার পরে নিম্নমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে তুলে দেওয়া হবে।

(চ) জাতীয় শিক্ষানীতিতে শিক্ষক শিক্ষণের উন্নয়নের দায়িত্ব NCTE (National Council for Teacher Education) -এর উপর অর্পন করার কথা বলা হয়েছে। এর প্রধান কাজ হবে সারা দেশের শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি নজর রাখা ও শিক্ষক শিক্ষণ মানের উন্নয়ন ঘটানো। তাছাড়া পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্তু নির্ধারণ, ছাত্র ভর্ত্তির নিয়মকানুন স্থিরকরণ, শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর অনুমোদন দেওয়া বা অনুমোদন প্রত্যাহার করা, শিক্ষক শিক্ষণ কলেজগুলোর পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা, মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

দশম অধ্যায় : শিক্ষা ব্যবস্থাপনা (The Management of Education)

জাতীয় শিক্ষানীতিতে শিক্ষা ব্যবস্থাপনাকে সর্বাধিক প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। শিক্ষা ব্যবস্থাপনার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলো নেওয়া দরকার।

(ক) শিক্ষার ব্যবস্থাপনায় দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা এবং তার সঙ্গে দেশের উন্নয়ন ও জনশক্তির প্রয়োজনীয়তার মধ্যে সমন্বয় সাধন।

(খ) বিকেন্দ্রীকরণ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বায়ত্ত শাসনের প্রবণতা সৃষ্টি।

(গ) শিক্ষা পরিচালনায় বেসরকারী ও স্বেচ্ছাসেবী প্রয়াসের সঙ্গে জনশক্তিকে যুক্ত করা।

(ঘ) শিক্ষার উদ্দেশ্য ও আদর্শের প্রেক্ষিতে দায়বদ্ধতা পালনের নীতি নির্ধারণ করা।

(ঙ) জাতীয় স্তরে শিক্ষার উন্নয়নের জন্য CABE কে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে এবং CABE এর মত রাজ্যস্তরে SABE (Sate Advisory board of Education) গঠন করা হবে।

(চ) শিক্ষার ক্ষেত্রে সমাজকর্মী, বেসরকারী ও স্বেচ্ছাসেবী প্রয়াসকেও উৎসাহিত করা হবে। তবে ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে কোনো প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

একাদশ অধ্যায় : সম্পদ ও পর্যালোচনা (Resource and Review)

একাদশ অধ্যায়ে শিক্ষার সার্থক রূপদানের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সম্পদ এবং পর্যালোচনার উল্লেখ করা হয়েছে।

(ক) আর্থিক সংস্থান - একটি উন্নতিশীল দেশের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় জাতীয় শিক্ষানীতির বাস্তব রূপায়নের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। স্কুলবাড়ি সংরক্ষণ, শিক্ষার অনকূল সামগ্রির জোগান, বৃত্তিশিক্ষা, কারিগরী শিক্ষা, গবেষণা, প্রাথমিক শিক্ষার সার্বজনীনতা, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, দেশের সর্বত্র শিক্ষার সমসুযোগ সৃষ্টি, বিধিমুক্ত শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার অগ্রগতি প্রভৃতি সবদিকে নজর দিতে হবে। শিক্ষার ব্যবস্থাকে আধুনিক করে তোলা দরকার। এগুলোকে কার্যকরিতার তোলার জন্য ১৯৬৮ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছিল শিক্ষাখাতে জাতীয় আয়ের ছয় শতাংশ বিনিয়োগ করতে হবে। ১৯৮৬ সালের শিক্ষানীতিতে বলা হয় ধীরে ধীরে শিক্ষার জন্য অর্থ বরাদ্দ বাড়িয়ে অষ্টম পঞ্চমবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই বরাদ্দ যাতে ৬ শতাংশ ছাড়িয়ে যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

(খ) পর্যালোচনা — প্রতি পাঁচ বছর অন্তর শিক্ষানীতি কতটা কার্যকর হল তা খতিয়ে দেখতে হবে। স্বল্প সময়ের ব্যবধানে শিক্ষা কর্মসূচীর গুণাগুণ বিচার করার ব্যবস্থা করতে হবে। এর ফলে শিক্ষাসূচী

রূপায়নে অগ্রগতি ও প্রবণতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে।

দ্বাদশ অধ্যায় : ভবিষ্যৎ (The Future)

ভারতের ভবিষ্যৎ শিক্ষা ব্যবস্থার গঠন অতি জটিল। তবুও আমাদের বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের কথা মনে রেখেই লক্ষ্য পূরণের জন্য আমাদের এগিয়ে যেতে হবে আগামী শতকের জন্য, ভবিষ্যৎ ভারতের শিক্ষার্থীদের জন্য একটি মজবুত শিক্ষা কাঠামো গড়ে তোলা অর্থাৎ শিক্ষা পিরামিডের ভিত্তি শক্ত করাই হবে আমাদের প্রধান কাজ।

রামমূর্তি সমীক্ষা কমিটি (Ramamurti Review Committee)

১৯৮৬ খ্রীস্টাব্দের জাতীয় শিক্ষানীতির পুনর্বিবেচনার জন্য ভারত সরকারের মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক (Ministry of Human Resource Development) ১৯৯০ খ্রীস্টাব্দে ৭মে আচার্য রামমূর্তির সভাপতিত্বে ৭ জন সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করে। সভাপতির নামানুসারে উক্ত কমিটিকে বলা হয় রামমূর্তি সমীক্ষা কমিটি (Ramamurti Review Committee)। রামমূর্তি কমিটি দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগণের সাহচর্যে ১৯৮৬ খ্রীস্টাব্দের জাতীয় শিক্ষানীতির পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যালোচনা করে এবং পর্যালোচনার ফলশ্রুতিস্বরূপ ১৯৯০ খ্রীস্টাব্দের ২৬ ডিসেম্বর তাদের সুচিন্তিত সুপারিশ, Towards an enlightened and Human Society, NEP 1986- A Review - এই শিরোনামে তদানীন্তন মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের (Ministry of Human Resource Development) দপ্তরে জমা দেন।

রামমূর্তি কমিটি শিক্ষাক্ষেত্রে যে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশগুলো করেছেন সেগুলো হল -

(১) প্রাথমিক শিক্ষাকে সংবিধানের নির্দেশ অনুসারে বাধ্যতামূলক করতে হবে।

(২) জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে। এর ফলে সমগ্র শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্য বজায় থাকবে।

(৩) বৃত্তিশিক্ষার উপযোগী পাঠ্যক্রম তৈরি করে শিক্ষাকে বৃত্তিমুখীকরণ করতে হবে।

(৪) সাক্ষরতা অভিযান, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, নারী শিক্ষার সম্প্রসারণ ঘটিয়ে দেশের উন্নতি সাধন করতে হবে।

(৫) শিক্ষাক্ষেত্রে সমতা বজায় রাখার জন্য কমন স্কুল ব্যবস্থার উন্নয়ন করতে হবে।

(৬) রাজ্য সরকারের উপর দেশের নবোদয় বিদ্যালয়গুলোর দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে। নতুন করে নবোদয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা না করে পূর্ব প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলোর পুনর্বিন্যাস করে সেগুলোর শ্রীবৃদ্ধি করতে হবে।

(৭) সারা দেশে একই রকম পাঠ্যক্রম, শিক্ষার কাঠামো, শিক্ষার পদ্ধতি প্রচলন করে দেশের ঐক্য ও সংহতিকে বজায় রাখতে হবে।

(৮) শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য অবসানকল্পে গ্রামাঞ্চল ও উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে বসবাসকারী অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোকেরা যাতে অধিক পরিমাণে শিক্ষার সুযোগ পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

(৯) আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের সুযোগ সুবিধাসহ আঞ্চলিক ভাষাগুলোকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করতে হবে।

(১০) রাজ্য সরকার বা অন্যান্য স্থানীয় সংস্থার উপর অপারেশন ব্ল্যাকবোর্ড কর্মসূচীর দায়িত্ব দিতে হবে। সব সময়ের ব্যবহারের জন্য উপযোগী দুটি বড়ো ঘর, ব্ল্যাকবোর্ড, মানচিত্র, নানা রকমের চার্ট, প্রয়োজনীয় বই, খেলার সরঞ্জাম এবং একজন করে শিক্ষক ও শিক্ষিকা থাকবে।

(১১) সম্পদ সংগ্রহের জন্য উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্র বেতন ও পরীক্ষার ফি বৃদ্ধি করতে হবে।

(১২) স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা দরকার।

(১৩) পরীক্ষা ব্যবস্থা ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার সংস্কার সাধন প্রয়োজন।

(১৪) কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে স্বশাসিত সংস্থায় রূপান্তরিত করতে হবে যাতে তারা নিজস্ব ধারায় ছাত্র ভর্তি, শিক্ষাদান, পরীক্ষাগ্রহণ মূল্যায়ন প্রভৃতি করতে পারে।

(১৫) শিক্ষার মাধ্যমে সমাজের মানুষের মধ্যে মূল্যবোধ জাগ্রত করা দরকার।

(১৬) শিক্ষার সকল স্তরে কর্মসংস্কৃতি ফিরিয়ে আনতে হবে।

(১৭) সম্পদ সংগ্রহের জন্য উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্রবেতন ও পরীক্ষার ফি বৃদ্ধি করতে হবে।

(১৮) নিয়ন্ত্রিত বিদ্যালয়ে বিধিমুক্ত (Non-formal Education) ব্যবস্থার প্রচলন ঘটাতে হবে।

(১৯) শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানমনস্ক করে গড়ে তুলতে, বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করতে হবে। আত্মসক্রিয়তা বাড়াতে খেলাচ্ছলে পাঠদান, সৃজনাত্মক কার্যাবলির অনুশীলন প্রভৃতির ব্যবস্থা করতে হবে।

(২০) বিদ্যালয়ে Non-formal ব্যবস্থা বাস্তবায়িত করতে হলে নিয়মিত শিক্ষক শিক্ষিকা ছাড়াও প্রধান শিক্ষক শিক্ষিকাদের "প্যারা শিক্ষক" শিক্ষাকর্মী নিয়োগের ক্ষমতা দিতে হবে। প্যারা শিক্ষকদের মেয়াদকাল হবে দুই বা তিন বছর। স্থানীয় মানুষ বিশেষত মহিলাদের প্যারা শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করতে হবে।

জনার্দন কমিটি - ১৯৯২ (Programme of Action (POA), 1992)

১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতির মূল্যায়ণের জন্য শিক্ষানীতি গঠিত হওয়ার চার বছর পর ১৯৯০ সালে রামমূর্তি কমিটি গঠিত হয়। আর রামমূর্তি কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে তদানীন্তন কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত অপর যে কমিটি গঠিত হয় সেটিকে ব লা হয় জনার্দন কমিটি। সেই কমিটির সভাপতি ছিলেন তৎকালীন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন.জনার্দন রেড্ডি। জনার্দন কমিটি রামমূর্তি কমিটির সংশোধিত খসড়া অনুমোদন করেন এবং জাতীয় শিক্ষানীতি প্রগতিশীল ভারতে যাতে যথার্থভাবে আত্মপ্রকাশ করে সেজন্য কতগুলো সুপারিশ করেন। জনার্দন কমিটির সুপারিশ পার্লামেন্টে ১৯৯২ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে অনুমোদিত হয়। উক্ত খসড়া রূপায়ানের জন্য যে কর্মসূচী কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করে, তাকে বলা হয় Programme of Action (POA), 1992।

১৯৯২ সালে Programme of Action-এ যেসব ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া হয় তা হল -

(১) শিক্ষার কাঠামো সংক্রান্ত সুপারিশ : সারাদেশে শিক্ষার কাঠামো হবে ১০+২+৩। ১০ বছরের শিক্ষার মধ্যে ৫ বছরের শিক্ষা হবে নিম্ন প্রাথমিক এবং ৩ বছরের শিক্ষা হবে উচ্চ প্রাথমিক। মাধ্যমিক স্তর হবে ২ বছরের। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা হবে ২ বছরের এবং উচ্চশিক্ষা হবে ৩ বছরের।

(২) প্রাথমিক শিক্ষা — প্রাথমিক শিক্ষার উপর গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশগুলো হল -

(ক) সার্বিক সাক্ষরতার দিকে নজর দিতে হবে।

(খ) ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত প্রতিটি শিশুদের জন্য সর্বজনীন অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা। এর জন্য জাতীয় স্তরে চিন্তাভাবনা করতে হবে ও সমগ্র দেশজুড়ে বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

(গ) 'বিদ্যালয় ছুট'-এর সমস্যা সমাধানের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণির মধ্যে বিদ্যালয় ছুটের সংখ্যা ২০ শতাংশ কমিয়ে আনতে হবে ও ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ কমিয়ে আনতে হবে।

(ঘ) প্রাথমিক শিক্ষার পদ্ধতি ও বিষয়বস্তুকে পুনরায় বিবেচনা করতে হব।

(ঙ) প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য 'অপারেশন ব্ল্যাকবোর্ড' পরিকল্পনাকে সঠিকভাবে রূপায়িত করতে হবে।

(চ) প্রাথমিক স্তরে MLL (Minimum Levels of Learning) অর্থাৎ ন্যূনতম শিক্ষার মান নির্দিষ্ট করতে হবে।

(ছ) প্রাথমিক শিক্ষার জন্য জাতীয় স্তরে একই পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থা করতে হবে এবং এই পাঠ্যক্রম প্রণয়নের দায়িত্বে থাকবে NCERT।

(জ) প্রতি দুটি নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য একটি করে উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।

(৩) মাধ্যমিক শিক্ষা — মাধ্যমিক শিক্ষা সংক্রান্ত সুপারিশগুলো হল -

(ক) নবোদয় বিদ্যালয়গুলো পথ নির্দেশক বিদ্যালয় হিসাবে কাজ করবে। ভালোভাবে সাজসরঞ্জাম দ্বারা নবোদয় বিদ্যালয় তৈরি করানো গেলে নিম্নমানের নবোদয় বিদ্যালয়ের পরিবর্তে গ্রামীণ বিদ্যালয়গুলোকে নবোদয় বিদ্যালয়ে পরিণত করা ভালো।

(খ) প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষক ও যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করতে হবে।

(গ) অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর বৃত্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঘ) প্রতিভাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

(ঙ) বর্তমানের পরীক্ষা পদ্ধতি ও মূল্যায়ণকে আরও বেশি বাস্তব সম্মত ও নৈর্ব্যক্তিক করা প্রয়োজন।

(চ) কোঠারী কমিশন উল্লিখিত 'কমন স্কুল' ব্যবস্থা এবং প্রতিবেশী ব্যবস্থাকে (Neighbourhood system) গুরুত্বের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

(ছ) যারা অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল তাদের জন্য নতুন বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।

(জ) স্কুলের প্রশাসন ও পরিদর্শন ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করতে হবে।

(ঝ) মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের পুনর্গঠন ও তাদের স্বশাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঞ) মাধ্যমিক স্তরে পাঠ্যক্রমের আধুনিকীকরণ ও মানোন্নয়ন প্রয়োজন।

(ট) এস.সি, এস.টি এবং অন্যান্য পিছিয়ে পড়া মানুষজন সেখানে রয়েছে যেখানে নতুন বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে এবং বালিকাদের ভর্তির উপর অধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

(ঠ) প্রতিটি শিক্ষার্থীকে নাগরিক হিসাবে সাংবিধানিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করা দরকার।

(ড) ১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে যে নবোদয় বিদ্যালয় বা মডেল স্কুলের সুপারিশ করা হয়েছিল ১৯৯২ সালের পুনর্বিন্যাসেও এটি বিশেষ গুরুত্ব পায়। এর প্রধান উদ্দেশ্য হল সামাজিক ন্যায় ও সমতাসহ উন্নত শিক্ষার ব্যবস্থা করা। প্রতিভাবান শিক্ষার্থীদের প্রতিভার বিকাশের জন্য সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করাই হল এই বিদ্যালয়ের লক্ষ্য। নবোদয় বিদ্যালয়কে সমস্ত দিক দিয়ে প্রত্যেক জেলার কাছে আদর্শ বিদ্যালয় হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছে। এখানে ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনার ব্যবস্থা করা হয়। অন্যান্য বিদ্যালেয়র কাছে এগুলি পথপ্রদর্শক স্বরূপ।

(৪) উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংক্রান্ত সুপারিশ :

(ক) জাতীয় পাঠ্যক্রম রচনা এবং এর ভিত্তিতে পাঠদানের ব্যবস্থা করা।

(খ) এই শিক্ষাকে 'কমন স্কুল' ব্যবস্থায় নিয়ে আসা।

(গ) উচ্চমাধ্যমিক পাঠ্যক্রমকে বহুমুখী করা।

(৫) উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত সুপারিশ :

এই শিক্ষাস্তরের গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশগুলো হল -

(ক) উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তির মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে নেতৃত্বদানের ক্ষমতা যাতে বৃদ্ধি পায়, বিশেষ বিষয় সমূহে জ্ঞান ও দক্ষতার যাতে বিকাশ ঘটে এবং তা যাতে জাতীয় উন্নতির সহায়ক হয়, সেদিকে নজর দিতে হবে।

(খ) বর্তমানে যে সমস্ত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে, সেগুলোর পরিকাঠামোগত উন্নয়নের দিকে নজর দিতে হবে।

(গ) মুক্ত শিক্ষার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন।

(ঘ) উন্নতমানের গবেষণার ব্যবস্থা করা দরকার।

(ঙ) রাজ্যে উচচশিক্ষার মান বজায় রাখতে SCHE (State Council for Higher Education) স্থাপন করতে হবে।

(চ) স্বয়ংশাসিত কলেজ স্থাপন করতে হবে।

(ছ) কলেজের পরিকাঠামো অনুযায়ী ছাত্র ভর্ত্তির সংখ্যা ঠিক করতে হবে।

(৬) বৃত্তি শিক্ষা সংক্রান্ত সুপারিশ :

বৃত্তিশিক্ষার উপর গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশগুলো হল -

(ক) ১৯৯৫ সালের মধ্যে উচ্চমাধ্যমিক স্তরের ১০ শতাংশ শিক্ষার্থীকে এবং ২০০০ সালের মধ্যে ২৫ শতাংশ শিক্ষার্থীকে বৃত্তিশিক্ষার আওতায় নিয়ে আসতে হবে।

(খ) পরিকল্পিতভাবে বৃত্তিমুখী শিক্ষা চুলা করতে হবে।

(গ) সাধারণ শিক্ষার বিদ্যালয়গুলোতে বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। এর জন্য উন্নত ব্যবস্থা গ্রহণের চিন্তা করতে হবে।

(ঘ) বৃত্তিশিক্ষার পর অধিকাংশ শিক্ষার্থী যাতে চাকরী পায় বা স্বনিযুক্তি প্রকল্পের সঙ্গো যুক্ত হতে পারে। তার ব্যবস্থা করতে হবে।

(৭) শিক্ষক শিক্ষণ সংক্রান্ত সুপারিশ :

জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার সামগ্রিক উৎকর্ষসাধনের জন্য শিক্ষকদের শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণের মানোন্নয়নের এবং পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষক শিক্ষণ কর্মসূচীর প্রতি নজর দেওয়া প্রয়োজন।

(৮) প্রথাযুক্ত শিক্ষা :

(ক) বিদ্যালয়ছুট শিক্ষার্থীদের জন্য প্রথাযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। যেসব শিশু কর্মরত এবং যেসব মেয়ের পক্ষে সারাদিনব্যাপী স্কুল যাওয়া সম্ভব নয় তাদের জন্য প্রথামুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

(খ) প্রথাযুক্ত শিক্ষার মানের উন্নয়নের জন্য উন্নতমানের শিক্ষা সহায়ক উপকরণ ব্যবস্থা করতে হবে।

(গ) আগ্রহী ও উপযুক্ত ব্যক্তিদেরকে প্রথামুক্ত শিক্ষার শিক্ষক হিসাবে গ্রহণ করতে হব।

(ঘ) প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা প্রসারে পঞ্চায়েত ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে গুরুত্ব দিতে হবে এবং আরও বেশি অর্থ বরাদ্দ করতে হবে।

(ঙ) প্রথামুক্ত শিক্ষা যাতে প্রথাযুক্ত শিক্ষার গুণমানের তুলনীয় হয় সেদিকে নজর দিতে হবে।

এছাড়াও ১৯৯২-এর 'Programme of Action'-এ আরও কতকগুলো সুপারিশ উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো হল -

(ক) সারাদেশে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

(খ) শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন বোর্ডের ভূমিকার পরিবর্তন প্রয়োজন।

(গ) সমস্ত স্তরের শিক্ষার পাঠ্যক্রমের আধুনিকীকরণের প্রয়োজন।

(ঘ) পাঠ্যক্রম সংক্রান্ত গবেষণা ও বিকাশের সঙ্গে যুক্ত সংস্থাগুলোর উন্নতির উপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

(ঙ) প্রতিটি রাজ্য সরকার যাতে 'ইন্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিস' গঠন করে তার ব্যবস্থা করা।

(চ) শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করে সমতা আনার উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

(ছ) সমস্ত স্তরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক চেতনা, ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতান্ত্রিকতার বিকাশ ঘটানো দরকার।

(জ) শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশের দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন।

উপসংহার -

১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতি ও তার সংশোধিত খসড়া রামমূর্তি কমিটি-১৯৯০ ও জনার্দন কমিটি-১৯৯২ শিক্ষাক্ষেত্রে এবং যুগান্তকারী পরিবর্তন নিয়ে এসেছে একথা জোর দিয়ে বলা যায়। ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থা জাতীয় শিক্ষানীতির পথ অনুসরণ করে চলেছে। শিক্ষানীতিতে উল্লেখিত শিক্ষা কাঠামো, কারিগরী ও পরিচালন ব্যবস্থার শিক্ষা, মূল্যবোধের শিক্ষা, শিক্ষকের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নতি, চাকুরি থেকে ডিগ্রিকে বিচ্ছিন্ন করা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করা হয়েছে সেগুলোকে কার্যকরী রূপ দিতে পারলে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা এক নতুন মাত্রা লাভ করবে।

পঞ্চম একক ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেম ওয়ার্ক, ২০০৫

স্বাধীনতা লাভের পর ভারতবর্ষে শিক্ষার উন্নতিকল্পে বহু শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে এবং তার সঙ্গে বহু সংস্থাও তৈরি হয়েছে যা শিক্ষার প্রসার ও উন্নতিকল্পে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (NCERT) এইরূপ একটি জাতীয় স্তরের সংস্থা যা বিদ্যালয় শিক্ষার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। বিদ্যালয়স্তরের গবেষণা, প্রশিক্ষণ এবং পাঠ্যক্রম পরিমার্জন ও পরিবর্ধনে NCERT (National Council of Educational Research and Training) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। যেহেতু শিক্ষার চারটি উপাদানের মধ্যে পাঠ্যক্রম হল একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। পাঠ্যক্রমের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাই পরিকল্পিত পথ প্রদর্শকরূপে শিক্ষার্থীকে তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। তাই একবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশের পর বিগত দুই দশক ধরে চলতে থাকা পাঠ্যক্রমের (1) Expert Group on Curriculum for the Ten-year School : A Framework (1975) (2) National Curriculum of Elementary and Secondary Education (1988) (3) National Curriculum Framework in School Education (2000) (NCF-1975, 1988, 2000) পর্যালোচনার একান্ত প্রয়োজন অনুভূত হয়। তাই মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের নির্দেশে NCERT-এর প্রশাসনিক সহায়তায় একুশ শতকের জন্য একটি উপযুক্ত পাঠ্যক্রম তৈরি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এই উদ্যোগটি হল জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখা, ২০০৫ (NCF, 2005)। জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখা-২০০৫ (NCF, 2005) ২২টি ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে এবং ১৭টি রাজ্যের পাঠ্যক্রম এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

পাঠ্যক্রমের প্রণেতাগত National Curriculum Framework-2005-এ যে রূপরেখা নির্ণয় করেন সেগুলো হল -

(ক) বিদ্যালয়ের বাইরের জীবনের সঙ্গে জ্ঞানকে যুক্ত করা।

(খ) অর্থহীন মুখস্থ পদ্ধতিকে বাতিল করে শিখনকে নিশ্চিত করা।

(গ) পাঠ্যপুস্তক কেন্দ্রিকতার পরিবর্তে শিশুর যাতে সার্বিক বিকাশ ঘটানো যায় তার প্রতি লক্ষ্য রেখে পাঠ্যক্রমকে সমৃদ্ধ করা।

(ঘ) পরীক্ষা পদ্ধতিকে আরও নমনীয় করা এবং শ্রেণিকক্ষের জীবনের সাথে তাকে আরও সম্পর্কিত করা।

(ঙ) দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে একাত্মবোধ গড়ে তোলা এবং তার পরিচর্যা করা।

NCF-2005 ভারতের বিদ্যালয় শিক্ষার পাঠ্যসূচী, পাঠ্যপুস্তক, শিখন উপকরণের মূল কাঠামোর বিষয় আলোচনা করেছে। এই দলিলে বলা হয়েছে যে পাঠ্যক্রমে এমন কিছু কাযাসূচি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যা সমস্ত শিশুকে বিদ্যালয়ে ধরে রাখতে পারে এবং বিদ্যালয় শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ণের জন্য শিশুকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমের উপর গুরুত্ব দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। ১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতি এবং POA-1992-এর উপর গুরুত্ব দিয়েই এই জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখা তৈরী করা হয়েছে। NCF-2005 -এ জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য কতগুলো সাধারণ বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ

করে। যেমন ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ইতিহাস, সাধারণ সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য, ধর্মনিরপেক্ষতা, পরিবেশ রক্ষা, সামাজিক বাধা দূর করা, ছোটো পরিবার, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গঠন ও মূল্যবোধের গঠন ইত্যাদি।

-এর মূল বৈশিষ্ট্য : এই দলিল ৫টি ভাগে বিভক্ত।

(১) প্রেক্ষিত (Perspective)

(২) শিখন এবং জ্ঞান (Learning and Knowledge)

(৩) পাঠ্যক্রমের ক্ষেত্রসমূহ, বিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্তর ও মূল্যায়ন (Curricular Areas, School Stages and Assessment)

(৪) বিদ্যালয় এবং শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ (School and Classroom Environment)

(৫) সুপরিকল্পিত সংস্কার (Systemic Reforms) : নিম্নে ছকের সাহায্যে ইহা বিবৃত হল -

প্রথম অধ্যায় : প্রেক্ষিত : NCF-2005-এর প্রথম অধ্যায় NCF-2000 (Learning without Burden)-এর রিপোর্টের ত্রুটিগুলো তুলে ধরা হয়েছে। সেই ত্রুটিগুলো হল - (ক) অনমনীয় ও পরিবর্তনে বাধা (খ) বর্তমান চিন্তাধারাকে উৎসাহিত না করা। (গ) সৃজনশীল চিন্তা ও অন্তদৃষ্টিকে উৎসাহ না দেওয়া (ঘ) বর্তমানকে বাদ দিয়ে শিশুর ভবিষ্যতকে চিন্তা করা। এই ত্রুটিগুলোকে দূর করে পাঠ্যক্রমের বোঝা কমিয়ে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার উপযোগী একটি পাঠ্যক্রমের তৈরি করার লক্ষ্যে NCF-2005-এ কিছু গুরতবপূর্ণ সুপারিশ গুণগত মান NCF-2005-এর প্রথম ও শেষ কথা হল গুণগত মান বজায় রাখা। এই গুণগত মান বজায় রাখার জন্য যেগুলো বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ সেগুলো হল -

(১) যোগ্যতাসম্পন্ন এবং শিক্ষকতা পেশাকে যারা ভালোবাসে সেই ধরনের ব্যক্তিকে এই পেশায় নিযুক্ত করা।

(২) গুণগতমানের আরেকটি দিক হল শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ও দক্ষতাকে মাঝে মাঝে পরীক্ষা করা।

(৩) প্রতিটি বিষয়ে কী ধরনের জ্ঞান অন্তর্ভুক্ত করানো হবে তা সমাজ, অর্থনীতি, সংস্কৃতি এবং শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বিবেচনা করে নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। শিক্ষাক্ষেত্রে যেটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হল গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করা এবং ভারতের সংবিধান সম্মত মূল্যবোধগুলোকে ছাত্রছাত্রীদের কাছে তুলে ধরা।

পাঠ্যক্রমের সামাজিক তাৎপর্য - শিক্ষা ব্যবস্থা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। জাতপাত, অর্থনৈতিক অবস্থা, লিঙ্গাভেদ, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র এবং অসমবিকাশ ভারতীয় সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য যা শিশুদের শিক্ষায় অংশগ্রহণের উপর প্রভাব বিস্তার করে। বিশ্বায়ণ এবং মুক্ত অর্থনীতি শিক্ষার ক্ষেত্রে সামাজিক প্রেক্ষিতকে আরও গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। তাই ভারতবর্ষে শিক্ষার ক্ষেত্রে সামাজিক প্রেক্ষিত জাতীয় পাঠ্যক্রমে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক বলে বিবেচিত হয়।

নতুন পাঠ্যক্রমে শিক্ষার লক্ষ্য --- শিক্ষার লক্ষ্যে বর্তমান সমাজের চাহিদা এবং আশা প্রত্যাশা প্রতিফলিত হয়। পাশাপাশি স্থায়ী মূল্যবোধ এবং মানবিক আদর্শসমূহ শিক্ষার লক্ষ্যের মধ্যেই প্রতিফলিত। NCF-2005 এর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক হল জ্ঞান নির্মাণের প্রক্রিয়ার উপর গুরত্বদান। শিক্ষার মাধ্যমে কর্মদক্ষতা বিকশিত হবে। শিক্ষা অর্থনৈতিক এবং সামাজিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করবে। এর জন্য প্রয়োজন হল শিক্ষার সঙ্গে কর্মের সমন্বয়করণ, কর্ম সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা অর্জন, দক্ষতা অর্জন এবং দৃষ্টিভঙ্গী গঠন। কাজের মধ্য দিয়েই শিক্ষার্থীর সমাজ সম্পর্কিত মানসিকতা গড়ে উঠবে। শিক্ষার মাধ্যমেই শিশুর তার সৃজনশীলতার প্রকাশ এবং সৌন্দর্য অনুভূতি প্রকাশ করার সুযোগ পায়। পাঠ্যক্রম প্রনয়ণে শিক্ষার লক্ষ্যগুলো যাতে বাস্তবে রূপায়িত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায় : শিখন এবং জ্ঞান

NCF-2005-এর দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে শিশুকে একজন স্বাভাবিক শিক্ষার্থী হিসাবে বিবেচনা করা হবে। পাশাপাশি বিদ্যালয় এবং বিদ্যালয়ের বাইরে শিশুর সক্রিয়তাকে জ্ঞান হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো উল্লেখিত হয়েছে।

(১) পাঠ্যক্রমের প্রাণকেন্দ্র হল শিখন NCF-2005-এ শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা বলতে বোঝায় শিশুদের অভিজ্ঞতা, তাদের মতামত এবং তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের উপর বিশেষ গুরুত্বদান। এর জন্য প্রয়োজন শিশুর মনস্তত্ব এবং আগ্রহের উপর ভিত্তি করে শিখন পরিকল্পনা।

(২) বিকাশ এবং শিখন - শিখনের বিশেষ দিকগুলো হল বিষয়কে অর্থবহ করে তোলা এবং বিমূর্ত চিন্তন ক্ষমতার বিকাশ করা। বিদ্যালয় এবং বিদ্যালয়ের বাইরে উভয় ক্ষেত্রেই শিখন ঘটে। যদি এই দুটি কাজের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া ঘটানো যায় তাহলে শিখন সমৃদ্ধ হয়।

(৩) জ্ঞান বিকাশের জন্য শিখন - শিক্ষক সর্বদাই চেষ্টা করবেন শিক্ষার্থীদের চিন্তা শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করতে এবং তার দ্বারা জ্ঞানকে নতুনভাবে নির্মাণ করতে।

(৪) শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ বিন্যাস করা - শিখনের মান শিক্ষার্থীর শিখন যোগ্যতার উপর প্রভাব বিস্তার করে। শিখনীয় কর্মসূচীকে এমনভাবে বিন্যাস করতে হবে যাতে শিক্ষার্থী পাঠ্যপুস্তক ছাড়াই অন্যান্য উৎস থেকে জ্ঞান আহরণ করতে পারে।

(৫) জ্ঞান ও বোধগম্যতা - পাঠ্যক্রমে এমন সব অভিজ্ঞতা সরবরাহ করা প্রয়োজন যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মৌলিক ক্ষমতা যেমন বোধগম্যতা, যুক্তিসম্মত চিন্তা, মূল্যবোধ ও দক্ষতার বিকাশ হয়। NCF-2005-এ এক্ষেত্রে ভাষার বিকাশ, সামাজিক জগতের সঙ্গে প্রাকৃতিক জগতের সম্পর্ক, কাজ করার ক্ষমতা এবং সক্রিয়তা, দক্ষতা ও বোধগম্যতা ইত্যাদি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

(৬) বোধগম্যতার প্রকৃতি - বিভিন্ন জ্ঞানের বিষয়কে বোঝানোর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। যেমন গণিতের ক্ষেত্রে মৌলিক সংখ্যা, বর্গক্ষেত্র, গাণিতিক প্রক্রিয়া, বর্গমূল, ভগ্নাংশ ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা। তেমনি বিজ্ঞানভিত্তিক বিষয়, সামাজিক ও মানবিক বিষয়গুলোর ক্ষেত্রেও এরকম ধারণা দিতে হবে।

(৭) শিশুদের জ্ঞান ও স্থানীয় জ্ঞান - NCF-2005 আধুনিক পাঠ্যক্রম তৈরির ক্ষেত্রে যে বিষয়টির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন তা হল - পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞানের সঙ্গে দৈনন্দিন জ্ঞানের সামঞ্জস্য সাধন করা। বিদ্যালয়কে চার দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে তাকে প্রাকৃতিক এবং সামাজিক পরিবেশে উন্মুক্ত করতেহবে। অর্থাৎ শিশুর অর্জিত জ্ঞানকে বিশ্বজগতের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।

তৃতীয় অধ্যায় : পাঠ্যক্রমের বিভিন্ন দিক, বিদ্যালয় স্তর এবং মূল্যায়ন

NCF-2005 -এর তৃতীয় অধ্যায়ে পাঠ্যবিষয়ের ক্ষেত্রে ৮টি ভাগের কথা বলা হয়েছে। যেগুলো হল -

(১) ভাষা - ভাষা ব্যবহারের দক্ষতা, পাঠ করা এবং শ্রবণ করা, পঠন এবং লিখন প্রভৃতি বিষয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন হিসাবে গ্রহণ করে ত্রিভাষা সূত্রকেই গ্রহণ করতে হবে। ভারতীয় ভাষার পাশাপাশি ইংরেজী ভাষাকে গুরুত্ব দিতে হবে। ভারতীয় সমাজে বহু ভাষাবাষি দিকটির উপর বিদ্যালয় জীবনে গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

(২) গণিত - গণিত শিখনে প্রথাগত ও যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার পরিবর্তে যুক্তি ক্ষমতা এবং বিমূর্ত বিষয় নিয়ে চিন্তা করার ক্ষমতার উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

(৩) বিজ্ঞান - শিক্ষার্থীদের বয়স এবং তাদের প্রজ্ঞামূলক বিকাশের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। পরিবেশের সঙ্গে যোগ রেখে বিজ্ঞান পাঠ্যক্রম প্রস্তুত করতে হবে। অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষা প্রদান করা হবে যাতে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অনুসন্ধিৎসা এবং সৃজনশীলতার সৃষ্টি হয়। বিজ্ঞান শিক্ষা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পরিবেশ সুরক্ষার বোধ জাগ্রত করবে।

(৪) সমাজবিজ্ঞান - সমাজবিজ্ঞান শিক্ষা শিক্ষার্থীকে মুখস্থ করার পরিবর্তে তাত্ত্বিক চিন্তা ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করবে। ভারতীয় সংবিধানে উল্লেখিত মূল্যবোধগুলো যেমন লিঙ্গসাম্য, মানবাধিকার, ন্যায়, প্রান্তীয় জনগণের প্রতি সংবেদনশীলতা প্রভৃতি সমাজবিজ্ঞান শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে তৈরি হবে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান, আমাদের জীবনে ইতিহাসের গুরুত্ব, অতীতের প্রাসঙ্গিকতা ইত্যাদির প্রতি নজর দিতে হবে।

প্রাথমিক শ্রেণিতে প্রাকৃতিক এবং সামাজিক পরিবেশকে ভাষা এবং গণিতের সাথে সমন্বিত করে

ব্যাখ্যা করতে হবে। তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণিতে পরিবেশবিদ্যা অন্তর্ভুক্ত হবে। উচ্চ প্রাথমিক বা নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে সমাজবিদ্যা অন্তর্ভুক্ত হবে। যার মধ্যে থাকবে ইতিহাস, ভূগোল, পৌরবিজ্ঞান, আর মাধ্যমিক স্তরে থাকবে ইতিহাস, ভূগোল, সমাজবিদ্যা, পৌরবিজ্ঞান এবং অর্থনীতি।

(৫) কর্মের মাধ্যমে শিক্ষা - প্রাক্ প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পাঠ্যক্রমকে এমনভাবে পুনর্বিন্যাস করতে হবে যাতে জ্ঞান আহরণ, মূল্যবোধের বিকাশ এবং বিবিধ দক্ষতা গঠনে ছাত্রছাত্রীদের সহায়তা করতে পারে। অর্থাৎ ছাত্রছাত্রীদের কর্মক্ষমতা অনুযায়ী তাদের কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম নির্বাচনে যোগ দিতে হবে।

(৬) শিল্প - লোকশিল্প, ধ্রুপদি শিল্পকলা, কারুশিল্প, নৃত্য, পুতুল নাচ, নাটক ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়কে অবশ্যই পাঠ্যক্রমের অঙ্গীভূত করতে হবে। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, শিক্ষা আধিকারিক এবং অভিভাবকদের এই ধরনের শিল্পকলা এবং কারুশিল্পের সামগ্রিক গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করা প্রয়োজন। বিদ্যালয় পাঠ্যক্রমের সর্বস্তরেই শিল্পকলাকে একটি বিষয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

(৭) বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও কার্যকলাপের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মনে শান্তির বার্তা ছড়িয়ে দিতে হবে। শান্তিকামী মূল্যবোধ ছাত্রছাত্রীদের মনে জাগ্রত করা গেলে সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় থাকবে। ফলে সমাজ উন্নয়নের পথে অগ্রসর হতে পারবে। শান্তি শিক্ষাকে শিক্ষক শিক্ষণ পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করার কথাও NCF-2005-এ বলা হয়েছে।

(৮) স্বাস্থ্য ও শারীর শিক্ষা - শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক বিকাশের জন্য স্বাস্থ্য ও শারীর শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই বিদ্যালয়গুলোতে খেলাধূলা ও যোগচর্চার ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় : বিদ্যালয় এবং শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ :

এই অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হল -

(১) শ্রেণিকক্ষের পরিকাঠামোগত দিকের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। শ্রেণিকক্ষগুলোতে পর্যাপ্ত আলো ও বায়ু চলাচল, ছাত্র ও শিক্ষক অনুপাত এবং নিরাপদ পরিবেশের ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন।

(২) শিক্ষকদের উৎকর্ষতার জন্য ন্যূনতম পরিকাঠামো এবং উপকরণাদির সরবরাহ এবং দৈনন্দিন নমনীয় সময় তালিকার পরিকল্পনা করা প্রয়োজন।

(৩) বিদ্যালয়ে সমতা, ন্যায়বিচার, সম্মান ও মর্যাদা এবং ছাত্রদের অধিকার নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। সকল ছাত্রছাত্রীদের কোনো রকম বৈষম্য ছাড়া বিদ্যালয়ের সকল কাজে সমসুযোগ দিতে হবে।

(৪) বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে বিদ্যালয়ে শিখন প্রক্রিয়াকে নতুনভাবে তুলে ধরার কথা বলা হয়েছে। যেমন সহায়ক পুস্তক, ওয়ার্কবুক ইত্যাদির সাহায্যে নতুন চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গীকে উৎসাহদান, গবেষণাগার, গ্রন্থাগার, শিক্ষা প্রযুক্তি বিষয়ক পরীক্ষাগার এবং বহুবিধ মাধ্যম (Multi Media) ব্যবহার করে শিক্ষাদান, ইত্যাদি বিষয়কে পাঠ্যক্রমে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

(৫) শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও সম্ভাবনাগুলো বিকাশের জন্য উপযুক্ত বিদ্যালয় সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। বিদ্যালয়গুলোতে উন্নত পাঠাগার তৈরি করতে হবে। এই পাঠাগার হবে জ্ঞানের উৎস যেখানে শিক্ষক, শিক্ষার্থীগণ বিশ্ব সম্পর্কে নানাবিধ জ্ঞানার্জনের সুযোগ পাবে।

(৬) অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাই বিদ্যালয়গুলোর মূলনীতি হতে হবে।

পঞ্চম অধ্যায় : সুপরিকল্পিত সংস্কার

প্রচলিত পাঠ্যক্রমের ধারাবাহিক সংস্কারের জন্য NCF-2005 -এ নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর গুরত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

(১) ধারাবাহিক সংস্কারের অন্যতম উদ্দেশ্য হল গুণগত মান বৃদ্ধি করা।

(২) প্রধান শিক্ষক এবং সহ-শিক্ষকদের অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে অর্থবহ অ্যাকাডেমিক পরিকল্পনা প্রস্তু করা।

(৩) শ্রেণি এবং মেধা নির্বিশেষে সকল শিক্ষার্থীর জন্য 'কমন বিদ্যালয় ব্যবস্থা' গড়ে তোলা, যাকে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থা বলা হয়।

(৪) শিক্ষক শিক্ষণ কর্মসূচীর সংস্কার সাধন করে তাকে শক্তিশালী করতে হবে। শিক্ষক এমনভাবে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করবেন যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের ক্ষমতা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়। তাদের শারীরিক ও বৌদ্ধিক বিকাশ সম্পূর্ণতা পায়।

(৫) বৃত্তিকালীন প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে হবে।

(৬) অহেতুক মানসিক চাপ দূর করে পরীক্ষায় যাতে ভালো ফল করা যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

(৭) বিষয়বস্তুভিত্তিক পরীক্ষার পরিবর্তে বোধগম্যতা এবং সমস্যা সমাধান দক্ষতার উপর পরীক্ষার গুরুত্ব দান।

(৮) স্বল্প সময়ের পরীক্ষা গ্রহণ।

(৯) সমগ্র পরীক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয় বজায় রাখার জন্য একটি সংস্থা Nodal স্থাপন করা।

(১০) প্রাক্ প্রাথমিক স্তর থেকে +2 শিক্ষা স্তর পর্যন্ত কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাকে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা।

উপসংহার -

আধুনিক শিক্ষা হল শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা। আর শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম নির্ধারিত হবে শিশুর চাহিদা, সামর্থ্য, প্রয়োজন, অভিজ্ঞতা প্রভৃতির সমন্বয়ে। জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখা-২০০৫-এ শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার উপযোগী একটি পাঠ্যক্রম রচনার চেষ্টা করা হয়েছে যা কার্যকরী হলে শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশ সাধিত হবে এবং শিক্ষার আধুনিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণ হবে। এই পাঠ্যক্রমের রূপরেখায় শিক্ষার গুণগত মান, বিদ্যালয়ের পরিবেশ, সময় তালিকা, শিক্ষণ উপকরণ, শিক্ষকের যোগ্যতা, বিদ্যালয়ের সঙ্গে সমাজের যোগসূত্র, কর্মক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তি এবং সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পাঠ্যক্রম নির্ধারণের ক্ষেত্রে বর্ণিত সুযোগ সুবিধাগুলোর বাস্তব রূপায়ণে শিক্ষার্থীর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজ তথা রাষ্ট্রে অগ্রগতির পথে ধাবিত হবে।

সারসংক্ষেপ

প্রথম একক : বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন (১৯৪৮-৪৯)

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশকে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ও শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের প্রয়োজন দেখা দিল। তাছাড়া দেশের আর্থসামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের লক্ষ্যে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নতির কথা চিন্তা করে, বিজ্ঞান, কারিগরী বিদ্যা ও অন্যান্য পেশাগত ক্ষেত্রে উপযুক্ত দক্ষ নাগরিক গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন ধরনের বিশেষধর্মী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছিল। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে দেশের প্রচলিত উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য ও পাঠ্যক্রমের পুনর্বিন্যাসও অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার সময় ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ২১টি। কিন্তু দেশের ক্রমবর্ধমান উচ্চশিক্ষার চাহিদা মেটানোর পক্ষে এই সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য। প্রাক্ স্বাধীনতাযুগে ইংরেজ সরকার সুপরিকল্পিতভাবে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলেন নি। বিক্ষিপ্তভাবে যে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্থাপন করা হয়েছিল, সেগুলোর পরিচালনা ও কর্মপ্রকৃতির মধ্যে যোগসূত্র ছিল না। ফলে ঐ সকল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার মানও তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না। তাই ভারত সরকার জাতীয় আদর্শের উপযোগী উচ্চশিক্ষার কাঠামো রচনা করার উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সালের নভেম্বর মাসে ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের সভাপতিত্বে গঠিত এক শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। এই কমিশনের নাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্, দার্শনিক ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের সভাপতিত্বে গঠিত এই শিক্ষা কমিশন রাধাকৃষ্ণান কমিশন নামে বিশেষ পরিচিত। এটিই হল স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষা কমিশন।

রাধাকৃষ্ণান কমিশনের প্রতিবেদনটি নব ভারত গঠনের পক্ষে এক ঐতিহ্যপূর্ণ, তথ্যবহুল দলিল। কমিশন ভারতে প্রচলিত শিক্ষার বিভিন্ন ত্রুটি তুলে ধরে সেগুলো দূরীকরণের জন্য যে সুপরামর্শ দিয়েছে তা অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে। কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষের আর্থ সামাজিক কাঠামো সুদৃঢ় করতে কমিশন কৃষিবিদ্যা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, পেশাগত শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কমিশন শিক্ষাকে গণতান্ত্রিক আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত করার সুপারিশ করে আধুনিক ও প্রগতিশীল মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে। অর্থ বণ্টনের জন্য ইউ.জি.সি. গঠন এবং গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশও ছিল প্রয়োজনীয় ও প্রশংসনীয়।

দ্বিতীয় একক : মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (১৯৫২-৫৩)

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৪৮ স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষা কমিশন (রাধাকৃষ্ণাণ কমিশন) বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজীয় শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠনের জন্য বিভিন্ন সুপারিশ করেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার পূর্বশর্ত হল মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠন। তাই স্বাধীনতার পর সর্বভারতীয় ভিত্তিতে মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কারের জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পর্ষদ (CABE) প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধান ও প্রচলিত ব্যবস্থার উপযোগিতা বিচারের জন্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ ড. তারাচাঁদের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির সদস্যবৃন্দ মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠনকল্পে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট একটি কশিশন গঠনের প্রস্তাব দেয়। ওই প্রস্তাব অনুযায়ী তদানীন্তন ভারত সরকার, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন উপাচার্য ড. লক্ষনস্বামী মুদালিয়র-এর সভাপতিত্বে ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দে মাধ্যমিক

শিক্ষা কমিশন, ১৯৫২ (The Secondary Education Commission, 1952) নামে একটি কমিশন গঠন করে। মুদালিয়র-এর নাম অনুসারে এই কমিশনকে 'মুদালিয়র কমিশন' নামে অভিহিত করা হয়।
মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশগুলো ফলশ্রুতি হিসাবে মাধ্যমিক স্তরে বেশ কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই আগামী দিনে আমাদের দেশের মাধ্যমিক শিক্ষা জাতীয় আশা আকাঙ্খা পূরণে সহায়ক হয়ে উঠেছিল। তাই বলা যায়, মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশগুলো আমাদের দেশের মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সামনে নতুন জগতের দরজা খুলে দিয়েছে।

তৃতীয় একক : কোঠারি কমিশন (১৯৬৪-৬৬)

ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে শিক্ষার ক্ষেত্রে যে বৈষম্যমূলক ও নিম্নমানের শিক্ষা কাঠামো গড়ে উঠেছিল, সেই কাঠামো ভেঙে নতুন করে গড়ার প্রয়োজনীয়তা স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে শিক্ষাবিদ ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিগণ উপলব্ধি করেছিলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৪৮-৪৯ সালে রাধাকৃষ্ণান কমিশন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার উন্নতিকল্পে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেন এবং পরবর্তী সময়ে ১৯৫২-৫৩ সালে মুদালিয়র কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতিকল্পে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ প্রদান করেন। কিন্তু এই দুটি কমিশনই শিক্ষার এক একটি নির্দিষ্ট স্তরের উন্নতিকল্পে সুপারিশ করে। ফলে সামগ্রিক শিক্ষার অন্যান্য স্তরগুলো উপেক্ষিত রয়ে গেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে তদানীন্তন জাতীয় সরকারের নেতৃবৃন্দ একটি জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার তাগিদ অনুভব করেন। যেখানে প্রাক্ প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা প্রভৃতি সকল স্তরের শিক্ষার বিস্তৃত আলোচনা, সর্বস্তরের শিক্ষার সমস্যা ও তার সমাধানের পথ নির্দেশ থাকবে। তাই তদানীন্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী এম.সি. চাগলার (M.C. Chagla) উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের (University Grants Commission) চেয়ারম্যান ড. ডি. এস. কোঠারীর (Dr. D.S. Kothari) সভাপতিত্বে ১৯৬৪ খ্রীস্টাব্দের ১৪ জুলাই ভারতীয় শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। ডি.এস. কোঠারীর নামানুসারে এই কমিশন কোঠারী কমিশন নামে বিশেষভাবে খ্যাত।
জাতীয় শিক্ষা কমিশন বা কোঠারী কমিশন প্রাক্ প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষা স্তর পর্যন্ত সকল স্তরের শিক্ষার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছে এবং প্রত্যেকটি বিষয়ে তাদের সুচিন্তিত মতামত প্রদান করেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার ব্যাপারেও এই কমিশন বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিল। ভাষা সম্পর্কে 'ত্রিভাষা সূত্র' এই কমিশনের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ। পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার, বিদ্যালয় গুচ্ছ, বয়স্ক শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়েও কমিশন গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেছে। তবে এই সুপারিশগুলো বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য সরকারের যেই প্রচেষ্টা তা প্রশংসার দাবী রাখে।

চতুর্থ একক : জাতীয় শিক্ষানীতি-১৯৮৬ ও তার সংশোধিত খসড়া

রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে জনগণের প্রতি তাঁর প্রথম ভাষণে তিনি এমন এক শিক্ষাব্যবস্থা রচনা করার প্রতিশ্রুতি দেন যা দেশের প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদকে সর্বোচ্চমাত্রায় ব্যবহার করে জাতির পুনর্গঠনকে দ্রুতরূপ দিতে সফল হয়। তিনি আরও বলেছেন যে, বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ভারতের উন্নয়ণকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে শক্ত ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তিনি দেশের সকল চিন্তাশীল ব্যক্তির সহমতের ভিত্তিতে এক নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের প্রতিশ্রুতি দেন। আর প্রধানমন্ত্রীর এই প্রতিশ্রুতিকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে ১৯৮৫

খ্রীস্টাব্দে তদানীন্তন ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রক "Challange of Education : A policy Perspective" নামে একটি প্রতিবেদন পার্লামেন্টে পেশ করেন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রিত একবিংশ শতাব্দীতে জাতীয় জীবনে যে ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দেবে তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এক শিক্ষাব্যবস্থা তৈরির প্রচেষ্টা এই প্রতিবেদনে দেখা যায়। সেই শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্য হবে জাতীয় জীবনের প্রতিটি দিকের উন্নতি ঘটানো। বিশদ আলোচনার পর ১৯৮৬ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে উক্ত প্রতিবেদনটি সংবিধানের উভয় সভার অনুমোদন লাভ করে। এই অনুমোদিত শিক্ষা দলিলই হল জাতীয় শিক্ষানীতি ১৯৮৬ (National Policyan Education-1986)।

১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতি ও তার সংশোধিত খসড়া রামমূর্তি কমিটি-১৯৯০ ও জনার্দন কমিটি-১৯৯২ শিক্ষাক্ষেত্রে এবং যুগান্তকারী পরিবর্তন নিয়ে এসেছে একথা জোর দিয়ে বলা যায়। ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থা জাতীয় শিক্ষানীতির পথ অনুসরণ করে চলেছে। শিক্ষানীতিতে উল্লেখিত শিক্ষা কাঠামো, কারিগরী ও পরিচালন ব্যবস্থার শিক্ষা, মূল্যবোধের শিক্ষা, শিক্ষকের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নতি, চাকুরি থেকে ডিগ্রিকে বিচ্ছিন্ন করা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করা হয়েছে সেগুলোকে কার্যকরী রূপ দিতে পারলে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা এক নতুন মাত্রা লাভ করবে।

পঞ্চম একক : ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেম ওয়ার্ক, ২০০৫

শিক্ষার চারটি উপাদানের মধ্যে পাঠ্যক্রম হল একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। পাঠ্যক্রমের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাই পরিকল্পিত পথ প্রদর্শকরূপে শিক্ষার্থীকে তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের নির্দেশে NCERT-এর প্রশাসনিক সহায়তায় একুশ শতকের জন্য একটি উপযুক্ত পাঠ্যক্রম তৈরি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এই উদ্যোগটি হল জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখা, ২০০৫ (NCF, 2005)। জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখা-২০০৫ (NCF, 2005) ২২টি ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে এবং ১৭টি রাজ্যের পাঠ্যক্রম এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। NCF-2005 ভারতের বিদ্যালয় শিক্ষার পাঠ্যসূচী, পাঠ্যপুস্তক, শিখন উপকরণের মূল কাঠামোর বিষয় আলোচনা করেছে। এই দলিলে বলা হয়েছে যে পাঠ্যক্রমে এমন কিছু কাযাসূচি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যা সমস্ত শিশুকে বিদ্যালয়ে ধরে রাখতে পারে এবং বিদ্যালয় শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ণের জন্য শিশুকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমের উপর গুরুত্ব দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে।

জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখা-২০০৫-এ শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার উপযোগী একটি পাঠ্যক্রম রচনার চেষ্টা করা হয়েছে যা কার্যকরী হলে শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশ সাধিত হবে এবং শিক্ষার আধুনিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণ হবে। এই পাঠ্যক্রমের রূপরেখায় শিক্ষার গুণগত মান, বিদ্যালয়ের পরিবেশ, সময় তালিকা, শিক্ষণ উপকরণ, শিক্ষকের যোগ্যতা, বিদ্যালয়ের সঙ্গে সমাজের যোগসূত্র, কর্মক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তি এবং সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

অনুশীলনী

ক) ১ মানের প্রশ্ন : সর্বাধিক শব্দ সংখ্যা ২০

১) গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এর কথা কোন কমিশন সুপারিশ করেছিল?

২) কেরিয়ার মাস্টার নিয়োগ এর কথা কোন কমিশন সুপারিশ করেছিল?

৩) কোঠারী কমিশনের অন্য কি নামে পরিচিত?

৪) ১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতির প্রতিবেদন মোট কতটি অধ্যায়ে বিভক্ত?

৫) NCF-2005 এ মূলত কি বিষয়ের উপর মূল গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে?

খ) ২ মানের প্রশ্ন : সর্বাধিক শব্দসংখ্যা ৪০

১) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে কি সুপারিশ করেছিল?

২) মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন এর কয়েকজন সদস্য এর নাম লিখ।

৩) কোঠারী কমিশন প্রস্তাবিত নারী শিক্ষার দুটি সুপারিশ লিখ।

৪) 'অপারেশন ব্ল্যাকবোর্ড' বলতে কি বুঝায়?

৫) NCF-2005 এ বর্ণিত পাঁচটি দলিল কি কি ?

গ) ৪ মানের প্রশ্ন : সর্বাধিক শব্দসংখ্যা ১০০

১) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশনের সুপারিশসমূহ লিখ।

২) মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের সুপারিশসমূহ লিখ।

৩) কোঠারী কমিশন প্রস্তাবিত শিক্ষার কাঠামোটি লিখ।

৪) শিক্ষাক্ষেত্রে রামমূর্তি কমিটির প্রস্তাবিত সুপারিশগুলি লিখ।

৫) NCF-2005 এর দ্বিতীয় অধ্যায় (শিখন এবং জ্ঞান) এ বর্ণিত বিষয়গুলি বর্ণনা কর।

ঘ) ৫ মানের প্রশ্ন : সর্বাধিক শব্দসংখ্যা ১৫০

১) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাকমিশন প্রস্তাবিত গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে যে সুপারিশ করেছিল তা বিশ্লেষণ কর।

২) মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনে বর্ণিত পাঠ্যক্রমের আবশ্যিক এবং ঐচ্ছিক অংশের বিষয়সমূহ সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৩) কোঠারী কমিশন প্রস্তাবিত উচ্চ শিক্ষার কাঠামোটি বর্ণনা কর।

৫) NCF-2005 এর পঞ্চম অধ্যায়ে পাঠ্যক্রমের ধারাবাহিক সংস্কারের ধারণাটি বিশ্লেষণ কর।

ঙ) ৬ মানের প্রশ্ন : সর্বাধিক শব্দসংখ্যা ২০০

বোধপরীক্ষণমূলক : কোঠারী কমিশন প্রাক্ প্রাথমিক স্তরটিকে প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তুতিপর্ব হিসাবে গণ্য করেছে তাই ভারতে প্রাক্প্রাথমিক শিক্ষার সুনির্দিষ্ট কোন কাঠামো ছিল না। মূলত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান দ্বারাই প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালিত হত। প্রাক্প্রাথমিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান হল :ক্রেস, কিন্ডারগার্ডেন স্কুল, মন্তেসরি স্কুল, নার্সারী স্কুল, প্রাক্বুনিয়াদী স্কুল।
— উপরিউক্ত চারটি স্কুল সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখ। ১.৫×৪ = ৬

ষষ্ঠ অধ্যায় : মহান ভারতীয় শিক্ষাবিদ্‌গণ

- প্রথম একক : রাজা রামোহন রায়
- দ্বিতীয় একক : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
- তৃতীয় একক : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- চতুর্থ একক : স্বামী বিবেকানন্দ
- পঞ্চম একক : মহাত্মা গান্ধি

ষষ্ঠ অধ্যায় : মহান ভারতীয় শিক্ষাবিদ্‌গন

উদ্দেশ্য (Objective) :

১) শিক্ষার্থীরা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী, সমাজসংস্কারমূলক কাজ, জনশিক্ষা বিস্তারে উনার ভূমিকা, স্ত্রী শিক্ষা বিস্তার, সংবাদপত্র প্রকাশ, পুস্তকরচনা, নবজাগরণে উনার ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়ে অবগত হতে পারবে।

২) শিক্ষার্থীরা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনী, শিক্ষায় উনার অবদান, স্ত্রীশিক্ষা ও গণশিক্ষায় উনার অসামান্য ভূমিকা, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে উনার অবদান ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারবে।

৩) শিক্ষার্থীরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাদর্শন, শিক্ষার লক্ষ্য, আশ্রমিক শিক্ষা, মাতৃভাষায় শিক্ষা, জনশিক্ষা ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে পারবে।

৪) শিক্ষার্থীরা স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শন, জীবনী, গণশিক্ষা ও নারীশিক্ষায় অবদান, ধর্মশিক্ষা, শিক্ষাপদ্ধতি, সমাজসেবা ইত্যাদি বিষয়গুলো সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে।

৫) শিক্ষার্থীরা মহাত্মাগান্ধির জীবনদর্শন, সমাজদর্শন, শিক্ষাদর্শন, শিক্ষার লক্ষ্য ও পাঠ্যক্রম, শিক্ষণপদ্ধতি, বুনিয়াদী শিক্ষা, বয়স্ক ও নারীশিক্ষায় উনার অবদান ইত্যাদি বিষয়ে জানতে পারবে।

প্রথম একক রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩)

প্রস্তাবনা :

বর্তমান পশ্চিমবাংলার অন্তর্গত হুগলি জেলার রাধানগর গ্রামের খানাকুল অঞ্চলে ২২ মে ১৭৭২ সালে রাজা রামমোহন রায়ের জন্ম হয়। রাজা রামমোহন রায় ছিলেন প্রতিভাবান ও মেধাবী বালক। পাঠশালার শিক্ষা শেষ করে রাজা রামমোহন মৌলবির নিকট ফরাসী ভাষা শেখেন। এরপর তিনি পাটনায় যান আরবি ভাষা শিখতে। শিক্ষা শেষ করে তিনি কাশীতে গিয়ে সংস্কৃত শেখেন। এছাড়া তিনি গ্রীক, ল্যাটিন ও হিব্রু ভাষা ও অধ্যয়ন করেছিলেন। এই গভীর ও ব্যাপক অধ্যয়নের ফলেই তাঁর মানসলোকে পৃথিবীর বিভিন্ন সৃষ্টির এক অপূর্ব সমন্বয় সাধন হয়েছিল। বাবা রমাকান্ত রায়ের মৃত্যুর পর তিনি কিছুদিনের জন্য মুর্শিদাবাদে বসবাস করেন। এখানে থাকতেই তাঁর প্রথম বই 'তু-হাফতুঅল-মুত্তয়াহ্‌-হিদিন' প্রকাশিত হয়। এই বইয়ের প্রকাশকাল থেকেই তিনি একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। ১৮০৫ সালে রাজা রামমোহন রায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে চাকুরি গ্রহণ করেন। এই সময় তিনি হিন্দু, মুসলমান এবং জৈন পন্ডিতদের সংস্পর্শে আসেন এবং সকল ধর্মের সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত হন। এই সময় তিনি ইংরেজি ভাষাও ভালোভাবে শেখেন। এভাবে রাজা রামমোহন রায় তাঁর জীবনের প্রথম ৪০ বছর কাল ধরে আত্মশিক্ষার মাধ্যমে নিজেকে প্রস্তুত করেন।

বহুযুগব্যাপী অন্ধতার দিনে দেশ যখন নিশ্চলতাকেই পবিত্রতা বলে স্থির করে নিস্তব্ধ ছিল, এমন সময়েই ভারতবর্ষে রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাব ঘটে। তিনিই প্রথন অন্ধ মূঢ়তার অচলায়তনে যুক্তির নির্মল আলোক ও মুক্তির বাতাস সঞ্চারিত করেছিলেন। তিনি অনুভব করেছিলেন শিক্ষা ও সংস্কারের ভিতর দিয়ে জাতিকে জাগাতে হবে এবং বাঙালীর বর্তমান পরনির্ভরতার মায়া খুঁচিয়ে গোলামীর ক্ষেত্র দূর করতে হবে। তাঁর দৃষ্টি ছিল সংস্কারের দিকে, নব্য বঙ্গের স্রষ্ট্রা রাজা রামমোহন রায়ের ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য ও অসীম ব্যক্তিত্ব। তিনিই প্রথম কুসংস্কারের পথ থেকে বাঙালী জাতিকে উদ্ধার করেন। রামমোহন ভারতীয় সমাজ ও জীবনধারাকে পুনরুজ্জীবিত করার কথা চিন্তা করেছিলেন।

রাজা রামমোহন রায়ের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ইংরেজী শিক্ষা বা পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যমেই এদেশে নবজাগরণ আসবে। তাঁর স্বপ্ন ছিল ঘুনেধরা ভারতীয় সমাজ ও জীবনধারায় গতি সঞ্চার করতে, প্রানের নতুন প্রবাহ এনে দিয়ে এবং ভারতবাসীর জন্য বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বার প্রশস্ত ও উন্মুক্ত করে ভারতবর্ষকে ইউরোপের অন্যান্য প্রগতিশীল জাতির সমপর্যায়ে উন্নতি করতে। তাই তিনি আধুনিক ভারতের পথ প্রদর্শক বা 'ভারত পথিক' হিসাবে খ্যাত হন।

সমাজ সংস্কার :

রাজা রামমোহন রায় শুধুমাত্র ধর্মবিশ্বসের সংস্কারের মধ্য দিয়েই দেশবাসী শিক্ষিত করে তুলতে চাননি। প্রাচীন ভারতীয় সমাজের যে সার্বিক সংস্কার প্রয়োজন, সে ব্যাপারে ভারতবাসীকে সচেতন করতে চেয়েছিলেন। রাজা রামমোহন তাঁর কর্ম প্রবণতাকে সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রেও কাজে লাগিয়েছেন, বহুবিধ সামাজিক অন্যায় ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ করেছেন। যেযুগে নারী স্বাধীনতা বা নারী মুক্তি আন্দোলনের কথা ভারতীয় সমাজে কেউ কল্পনা করতে পারতেন না, সেই যুগে শাস্ত্রীয় বিধানের অজুহাতে নারীদের ওপর সমাজের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। লর্ড বেন্টিক যখন সতীদাহ প্রথা বন্ধ করার উদ্যোগী হলেন, তখনকার রক্ষণশীল সমাজের কর্ণধারগণ প্রতিবাদের ঝড় তোলেন। কিন্তু রামমোহন দৃঢ়ভাবে লর্ড বেন্টিংক-এর সমর্থনে এগিয়ে আসেন। রামমোহন হিন্দু সমাজের জাতিভেদ প্রথারও বিরোধী ছিলেন। এ বিষয়ে দেশের মানুষকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য তিনি ওই প্রথার বিরুদ্ধে লেখা বৌদ্ধ মহাযান সম্প্রদায়ের গ্রন্থ 'বজ্রসূচির' অনুবাদ প্রকাশ করেন। রাজা রামমোহন রায় বহুবিবাহ বাল্যবিবাহ প্রথার ঘোরতার বিরোধী ছিলেন এবং এই সব প্রথার কুপ্রভাব সম্পর্কে দেশবাসীকে সচেতন করার জন্য তাঁর সম্পাদিত 'সম্বাদ কৌমুদী' পত্রিকায় নিয়মিত প্রবন্ধ প্রকাশ করতেন। রাজা রামমোহন রায় তাঁর প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে সমাজের সবরকম কুসংস্কার যে দূর করতে পেরেছিলেন তা নয়, কিন্তু তিনি তাঁর প্রচেষ্টায় সেগুলোর কু-প্রভাব সম্পর্কে দেশবাসীকে সচেতন করতে পেরেছিলেন। তিনি একদল প্রতিবাদী মানুষ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন । তাই ইতিহাস তাঁকে সমাজ সংস্কারক হিসাবে চিহ্নিত করলেও তিনি বাস্তবে ছিলেন একজন সমাজ সচেতক ব্যক্তি।

শিক্ষার লক্ষ্য:

রাজা রামমোহনের মতে শিক্ষার লক্ষ্য হবে জাগতিক ও সামাজিক কল্যান সাধন করা। শিক্ষার মাধ্যমে একটি পরিশীলিত ও যুক্তিবাদী মনের জন্ম হোক এই ছিল তাঁর লক্ষ্য। রাজা রামমোহন রায় মনে

করতেন শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে বুদ্ধির জড়তা ও মনের অজ্ঞানতা দূঢ় করার জন্য জ্ঞান বৃদ্ধি করা। শিক্ষার মাধ্যমে তিনি মানুষের মনের পরিপূর্ণ বিকাশ ও উন্নতির দিকে নজর দিয়েছিলেন।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যার সমন্বয়:

রাজা রামমোহন রায় ছিলেন আধুনিক ভারতের রূপকার ও স্রষ্টা। তাঁর জীবনের মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে মেলবন্ধন ঘটানো। তিনি চেয়েছিলেন প্রাচ্যের ভালো দিক্‌গুলোর সঙ্গে পাশ্চাত্যের উৎকৃষ্ট দিকগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন ঘটাতো। তাঁর জীবনের মূল ব্রত ছিলো প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির মধ্যে সমন্বয় সাধানের মাধ্যমে ভারতবাসীর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করা। রামমোহন রায় অনুভব করেছিলেন যে, ভারতে সত্যিকারের উন্নতি নির্ভর করছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সমন্বয়ের উপর। তিনি হিন্দুধর্ম বা সংস্কৃতিকে ত্যাগ করেননি, পাশ্চাত্যের ভালো দিকগুলো গ্রহণ করে তিনি নিজের দেশের সংস্কৃতির ভাণ্ডারকে পুষ্ট ও সমৃদ্ধ করতে চেষ্টা করেন। রাজা রামমোহন রায়ের এই নতুন শিক্ষার ধারণা ভারতের শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে এক বিপ্লব এনেছিল।

জনশিক্ষা বিস্তার:

উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও রাজা রামমোহন রায় অজ্ঞ, দরিদ্র ও অনগ্রসর জনসাধারণের কথা ভুলে যান নি। তিনি তাদের সর্বাঙ্গিন উন্নতির জন্য পরিশ্রম ও চেষ্টা করেন। সাধারণ মানুষ যাতে নিজেরাই সমাজ ও ধর্ম সম্পর্কে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পারে - আর এই কাজ যে একমাত্র শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমেই সম্ভব, তা তিনি অনুভব করেছিলেন। তাঁর সমাজ সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য ছিল, সাধারণ মানুষকে কুসংস্কার ও অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে জ্ঞানের পথে ও সত্যের পথে আনা। তিনি চেয়েছিলেন সাধারণ মানুষকে মূল হিন্দু ও ধর্মশাস্ত্রের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে তাদের মধ্যে অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের অন্ধকার দূর করতে।

স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তার:

স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে রাজা রামমোহন রায়ের অবদান ছিল অসমান্য। নারীকে অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে শিক্ষার আলোকে উদ্ভাসিত করার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অগ্রণী। নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে যেকোনো উদ্যোগকেই তিনি সাদরে গ্রহণ করেন। হিন্দুদের মধ্যে স্ত্রী শিক্ষার বিস্তারে রাজা রামমোহন রায়ের কৃতিত্ব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হিন্দুশাস্ত্র থেকে উদাহরণ সংগ্রহই করে তিনি প্রমাণ করেন যে, প্রাচীনকাল থেকে সমাজে নারী শিক্ষার বিশেষ প্রচলন ছিল, নারীরা সমাজে বিশেষ মর্যাদা পেতেন। তিনি সমাজে নারী ও পুরুষদের সমান মর্যাদা দানের পক্ষপাতী ছিলেন। ১৮২২ সালে নারীদের উপর তিনি একটি পুস্তিকা লেখেন। এই পুস্তিকায় নারীদের আইন অনুযায়ী অধিকার দেওয়া এবং তাদের শিক্ষাদানের কথা বলেন। নারীমুক্তি আন্দোলনের সূত্রপাত রাজা রামমোহন রায়ের নেতৃত্বেই ঘটেছিল, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁর সক্রিয় সহযোগিতায় এদেশে সতীদাহ প্রথা বন্ধ হয়েছিলো। তাঁর পত্রিকা "সম্বাদ কৌমুদীতে" তিনি দরিদ্র বিধবাদের সাহায্যের জন্য একটি সমিতি গঠন করতে সরকারকে অনুরোধ করেন। নারী শিক্ষার পাশাপাশি সম্পত্তিতে নারীর অধিকার এবং সমাজে নারীর উপযুক্ত স্থান এগুলো ভারতপথিক রামমোহন রায়েরই লড়াই-এর ফল।

সংবাদপত্র প্রকাশ ও পুস্তক রচনা :

সংবাদপত্র প্রকাশনার ক্ষেত্রে রাজা রামমোহন রায়ের মুন্সীয়ানার পরিচয় দেন। তাই রাজা রামমোহন রায়কে 'আধুনিক ভারতীয় সাংবাদিকতার জনক' বলা যায়। তাঁর সম্পাদনায় ১৮২১ সালে 'সম্বাদ কৌমুদী' এবং ১৮২২ সালে মিরাৎ-উল-আখবার' প্রকাশিত হয়। এছাড়া ইংরেজী পত্রিকা Bengal Herald ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই সব পত্রিকাগুলোতে সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা, অর্থনীতি, রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ক প্রবন্ধ আলোচনা ও সংবাদ প্রকাশ করা হত। সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে এই সব পত্র পত্রিকাগুলো অত্যন্ত কার্যকরি ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এছাড়া জনসাধারণের কল্যাণ সাধন ও জনমত গঠনের ক্ষেত্রেও পত্র-পত্রিকাগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তিনি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং স্বাধীন মতামত প্রকাশের আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র সেন, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ সংবাদপত্র সেবিরা তাঁর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হন।

রাজা রামমোহন রায় দেশে বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলনের উদ্দেশ্যে দুটি মাধ্যমকে ব্যবহার করেছিলেন । এদের একটি হল সংবাদপত্র এবং অন্যটি হল বই। ১৮১৫ সাল থেকে ১৮৩০ সালের মধ্যে রামমোহন প্রায় ৩০ টি পুস্তক রচনা করেন। এইগুলোর মেধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'বেদান্ত গ্রন্থ' (১৮১৫), 'বেদান্তসার' (১৮১৬), 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার'(১৮১৭), 'নিবর্ত্তক সম্বাদ' (১৮১৮), 'ব্রাহ্মণ সেবার্ধ' (১৮২১), 'পথ্যপ্রদান' (১৮২১, 'ব্রহ্মসঙ্গীত' (১৮১৯), ' গৌড়ীয় ব্যাকরণ' (১৮৩০) প্রভৃতি। বাংলা ছাড়া ইংরেজি ভাষার বই, প্রচার পুস্তিকার সংখ্যাও ছিল প্রচুর। তিনি প্রধানত: সমাজ ও ধর্ম সংস্কারের উদ্দেশ্যে অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদ, তর্ক ও বিচারমূলক গ্রন্থ রচনা করেন।

সাহিত্য ভাবনা:

রাজা রামমোহন রায়ের বহুমুখী কার্যধারার মধ্যে সাহিত্য চর্চা ছিল অন্যতম। তিনি সমাজ সংস্কার, শিক্ষা সংস্কার ও প্রগতিমূলক চিন্তাধারাকে ভাষায় রূপ দেবার জন্যই সাহিত্য সেবায় ব্রতী হন। এই প্রক্রিয়ায় তিনি বাংলা সাহিত্য ও বাংলা ভাষাকে একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামো দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনিই প্রথম গভীর তাত্ত্বিক আলোচনার মাধ্যম হিসাবে বাংলা গদ্যকে ব্যবহার করেন। প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থগুলো অনুবাদেও তিনি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় রেখে গেছেন। তিনি সাধারণ মানুয়ের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সঞ্চারেই বেশি আগ্রহী ছিলেন। জনশিক্ষা ও জনচেতনা জাগ্রত করার জন্য তিনি সংবাদপত্র প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। রাজা রামমোহন রায়ের অসামান্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় সংস্কৃত শব্দ বহুল দুর্বোধ্য বাংলা ভাষাকে তিনি প্রথম সর্বজনবোধ্য, হৃদয়গ্রাহী ও সহজরূপ দিতে সক্ষম হন। ধর্মমত প্রচার করতে গিয়ে অনেকটা নিজের অজ্ঞাতেই তিনি বাংলা সাহিত্যে একটি নবরূপ দান করেন। ১৮২৩ সালে প্রকাশিত তাঁর বাংলা ব্যাকরণ বাংলা সাহিত্য এক অমূল্য সম্পদ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'রামমোহন বঙ্গ সাহিত্যকে গ্রানিট স্তরের উপর স্থাপন করতে পেরেছিলেন। বাংলা সাহিত্যে রামমোহনই সর্বপ্রথম লেখক, যিনি আধুনিক অনুশীলিত মন নিয়ে গদ্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

হিন্দুস্কুল ও রামমোহন :

১৮১৭ সালে গঠিত হিন্দু কলেজ কমিটি থেকে সরে গিয়ে রামমোহন বাঙ্গালী হিন্দু ছেলেদের ইংরেজি শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ১৮২২ সালে 'Anglo Hindu School' স্থাপন করেন। এই স্কুলের সমস্ত খরচ রামমোহনকেই দিতে হত। ডেভিড হেয়ার, উইলিয়াম এ্যাডাম, উইলসন প্রমুখ মনীষীগণ তাঁকে স্কুল পরিচালনায় সাহায্য করতেন। এই স্কুলের পাঠ্য তালিকায় কারিগরি বিদ্যা, জ্যোতিষ বিজ্ঞান, জ্যামিতি প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই স্কুলের একজন অন্যতম ছাত্র ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। হিন্দুস্থান কেবলমাত্র একটি সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়, এটি ছিল একটি জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। হিন্দু বিদ্যালয়ের প্রধান বৈশিষ্ঠ্য হল হিন্দুদের মধ্যে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান ও ভাষা সাহিত্যের বিস্তার ঘটিয়ে তাদের কুসংস্কার মুক্ত করা। জাতি, ধর্মনির্বিশেষে সকল শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেশের নবজাগরণের গতি ত্বরান্বিত করা এই বিদ্যালয়ের অন্যতম বৈশিষ্ঠ্য।

রামমোহনের প্রগতিশীল ভাবনা :

রাজা রামমোহন রায়ের বিভিন্ন প্রগতিশীল চিন্তার মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য দিকগুলো হল: ১) ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসার বিরুদ্ধে আন্দোলন। ২) সেনাবাহিনীতে ভারতীয়করণ ৩)জুরি প্রথার প্রবর্তন ৪) শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের মধ্যে পৃথকীকরণ ইত্যাদি। এই দিকগুলোর প্রতিষ্ঠার জন্য রামামোহন যা করেছিলেন সেই যুগে তাঁর আগে আর কেউ করেন নি। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, ব্রিটিশ উপনিবেশগুলো একদিন না একদিন স্বাধীনতার জন্য সচেস্টা হবেই। সেই সময়ে শাসন ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত দুর্নীতিগ্রস্থ।এই জন্য তিনি শাসন ব্যবস্থার সংস্কারের দাবি করেন। অন্যদিক কৃষকদের করুণ অবস্থা লক্ষ্য করে রামমোহন কৃষকদের ক্ষেত্রে সংস্কারের কাজে করের পরিমান কমানোর দাবি করেন। তৎকালীন সরকারের কাছে এই সব দাবি পেশ করার জন্য তিনি স্বারকলিপি লিখতেন, সেই সংগ্রহ করতেন, সভা আহ্বান করতেন, এমনকি পত্রিকার মাধ্যমে জনমত ও গঠন করতেন।

আত্মীয়সভা ও ব্রাহ্মসভা:

ধর্মীয় সংস্কারের মূল অঙ্গ হিসাবে হিন্দু সমাজের গোঁড়ামি, সুসংস্কার ও পৌত্তলিকতাবাদের বিরুদ্ধে রাজা রামমোহন রায় আন্দোলন শুরু করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৮১৫ সালে কলকাতায় তাঁর বন্ধু ও অনুগামীদের নিয়ে 'আত্মীয় সভা' প্রতিষ্ঠা করেন। এই সভার সদস্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর, নন্দকিশোর বসু,রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ প্রমুখ। এই সভায় মূর্তি পূজার অসারতা, জাতিভেদ প্রথা, সতীদাহ প্রথা, বহুবিবাহ, বিধবা বিবাহ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা হত। এছাড়া হিন্দু শাস্ত্র থেকে পাঠ ও ধর্মীয় সঙ্গীত গাওয়া হত। পরপর্তী পর্যায়ে ১৮২৫ সালে উপনিষদের মূলকথা তুলে ধরার জন্য তাঁর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় ব্রাহ্মসভা, যা পরবর্তীকালে পরিচিত হয়। ব্রাহ্ম সমাজ (১৮৩০) নামে যেহেতু রামমোহন বহু দেব-দেবীতে বিশ্বাসী ছিলেন না, তাই তিনি একেশ্বরবাদ প্রচারে ব্রতী হন। উপনিষদের বিভিন্ন অংশ ব্যাখ্যা করে তিনি একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন। বিশেষত বৈদান্তিক একেশ্বরবাদ প্রচারের জন্য ১৮২৫ সালে তিনি 'বেদান্ত মহাবিদ্যালয়' স্থাপন করেন।

নবজাগরণ : রাজা রামমোহন রায় ভারতের ইতিহাসে এক নবযুগের প্রবর্তক রূপে দেখা দেন। বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন রাজা রামমোহন রায় উনিশ শতকের ভারতের নবজাগরেণের পুরোধা ছিলেন। দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে তিনি ভারতের শতাব্দী সঞ্চিত কু-শিক্ষা, অজ্ঞতা কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস জঞ্জাল পরিষ্কারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এইজন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে 'ভারত পথিক' বলে অভিহিত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে যে প্রগতিশীল ভারতকে আমরা এখন দেখছি। এই নব ভারতের ভাবমূর্তির অন্যতম ভাষ্কর ছিলেন রাজা রামমোহন রায়।

রামমোহনকেই যথার্থই বাংলার নবজাগরণের তথা আধুনিক ভারতের নির্মাতা বলা যায়। তিনি অনুধাবন করেছিলেন শিক্ষা ও সংস্কারের ভিতর দিয়ে জাতিকে জাগাতে হবে। তাঁর দৃষ্টি নিবন্ধ হল সংস্কারের দিকে, বাঙালীর জাতীয় চরিত্রের আমূল পরিবর্তনের দিকে। তিনি শোষিত, লুণ্ঠিত, আত্মহারা বাঙালীকে ভাষা দিলেন। আশা দিলেন, নতুন জীবনের পথ দেখালেন। জাতিকে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করার পণ করলেন রাজা রামমোহন রায়। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য ভাবধারার সম্পর্কে বাংলাদেশে যে নব যুগের সূচনা হয়েছিল, রামমোহন রায় ছিলেন সেই অভিনব যুগের ঋত্বিক। তিনি এদেশে নবজাগরণের পথ হিসাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যার সুস্থ সমন্বয় সাধন করতে চেয়েছিলেন। বেদ-বিদ্যার প্রতিষ্ঠা এবং বেদান্ত থেকে বিভিন্ন অনুবাদ প্রকাশ ও প্রচার ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা প্রমাণ করে।

রামমোহন ভারতীয় সমাজ ও জীবনধারাকে পুনরুজ্জীবিত করার চিন্তা করেছিলেন। তিনি সদূঢ় প্রসারি সত্যদৃষ্টি দিয়ে ভারতের চিরাচরিত ঘুণধরা জীবন বদল করার এক বিপুল ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল ঘুণধরা ভারতীয় সমাজ ও জীবন ধারায় গতি সঞ্চার করা, প্রাণে নতুন প্রবাহ এনে দিয়েভারতবাসীর জন্য বিশ্বের জ্ঞান বিজ্ঞানের ধারা প্রশস্ত ও উন্মুক্ত করে ভারতবর্ষকে ইউরোপের অন্যান্য প্রগতিশীল জাতির সমপর্যায়ে উন্নিত করা। তাই ছিল আধুনিক ভারতের 'পথপ্রদর্শক বা 'ভারত পথিক' হিসাবে খ্যাত হন।

মন্তব্য: রাজা রামমোহন রায় তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা ও যুক্তিবাদী চিন্তাধারার দ্বারা উনবিংশ শতকের জড় ভারতীয় সমাজকে বার বার আঘাত করেছিলেন। এই সূত্রে তিনি বার বার বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু কোনো সময় তিনি পিছিয়ে আসেন নি। দেশবাসী যাতে জ্ঞানে, শিক্ষাদীক্ষার জগতে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞানের মধ্যে সার্থক সমন্বয়ের চেস্টা করে গেছেন। তাঁর জীবনের পর্যালোচনা করলে দেখা যায় জ্ঞানান্বেষণের স্বাধীনতা, বিজ্ঞানমনস্কতা, নীতিবোধ, অতীত সংস্কৃতি মনস্কতার মূর্ত প্রতীক ছিলেন তিনি। রাজা রামমোহন রায় শিক্ষা, রাজনীতি, ধর্ম, সাহিত্য, সমাজ সংস্কার ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে তাঁর স্থায়ী ছাপ রেখে গেছেন। রামমোহনের নতুন শিক্ষার ধারণা ভারতের শিক্ষার ক্ষেত্রে সত্যিকারের বিপ্লব এনেছিল এবং প্রকৃতপক্ষে ভবিষ্যতের নবীন প্রগতিশীল ভারতের জন্ম দিয়েছিলেন। তাই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজা রামমোহন রায়কে 'ভারত পথিক' বলে সম্বোধন করেছিলেন। অদ্বৈতবাদের ভিত্তিতে বাঙালির সমাজ-সংস্কৃতি-ধর্ম-শিক্ষাজগতের সংস্কারসাধনই ছিল তাঁর জীবনের মূল লক্ষ্য। ইংল্যান্ডেও তিনি যান ভারতবাসীর কল্যাণের জন্য কিন্তু সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয় ১৮৩৩ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর। দেশবাসী চিরতরে হারায় এই মহামানবকে।

দ্বিতীয় একক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)

প্রস্তাবনা:

"তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ'—এই কথাটি উনবিংশ শতকের কীর্তিমান মনিষীদের মধ্যে যার সম্বন্ধে বেশি সত্য, তিনি হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তাঁর প্রকৃত নাম হল ঈশ্বরচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়। ১৮২০ সালে ২৬ সেপ্টেম্বর বর্তমান পশ্চিমবঙ্গোর মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম। তাঁর বাবা ছিলেন ঠাকুরদাস বন্দোপাধ্যায় এবং মাতা ভাগবতী দেবী। তাঁর বাল্যকাল বীরসিংহ গ্রামেই কাটে। পাঁচ বছর বয়সে তাকে গ্রাম্য এক পাঠশালায় ভর্তি করা হয়। বিদ্যাসাগর শৈশবে খুবই চঞ্চল প্রকৃতির ছিলেন। তাই পাঠশালার গুরুমশায় সনাতন সরকার বিদ্যাসাগরকে খুব মারধর করতেন। তাঁর পিতা ভীত হয়ে তাঁকে কালীকান্ত নামে অপর এক গুরুমশায়ের পাঠশালায় পাঠান। এই গুরুমশায় বিদ্যাসাগরকে ইংরাজি শিক্ষা দেওয়ার পরামর্শ দেন। তদনুযায়ী বিদ্যাসাগরের বাবা ঠাকুরদাস বন্দোপাধ্যায় ১৮২৮ সালে তাঁকে কলকাতায় নিয়ে যান। কিন্তু তাঁকে ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত না করে ১৮২৯ সালে সংস্কৃত শিক্ষাদানের জন্য সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করেন। এই ঘটনা বিদ্যাসাগরের জীবনে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হিসাবে পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়। বিদ্যাসাগর প্রায় সাড়ে বারো বছর সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করার পর প্রশংসাপত্র লাভ করেন।

চাকরি জীবন:

সংস্কৃত কলেজে পাঠ শেষ করার পর তিনি ১৮৪১ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে সেরেস্তাদার বা প্রধান পন্ডিতের চাকুরি গ্রহণ করেন। শুরু হয় তাঁর শিক্ষকতা জীবন। এই কলেজে নতুন ইংরেজ সিভিলিয়ানদের দেশীয় ভাষা সংস্কৃতির সঙ্গো পরিচিত করানো হত। বিদ্যাসাগর এই কলেজে প্রায় পাঁচ বছর চাকুরি করেন। এবং সেই সূত্রে শিক্ষিত ইংরেজদের সঙ্গো পরিচিত হওয়ার সুযোগ পান। তখন তিনি ইংরেজি সাহিত্য পাঠের সুযোগ পান এবং ইংরেজদের সংস্কৃতির সঙ্গো বিশেষভাবে পরিচিত হন। ১৮২৬ সালে বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়াম ত্যাগ করে সংস্কৃত কলেজে সহকারী সম্পাদকের পদে যোগ দেন। যে শিক্ষালয়ে তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, সেই প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য তিনি চিন্তাভাবনা করতেন এবং সেই উদ্দেশ্যে কতগুলো প্রস্তাব তিনি কলেজের সম্পাদকের হাতে দেন। এই সময় তিনি বাংলা ভাষার উন্নতির জন্য এবং জনশিক্ষা প্রসারে বাংলা ভাষায় পুস্তকের প্রয়োজনীয়তার কথা চিন্তা করে পুস্তক রচনার কাজে মনোনিবেশ করেন। এই সময়েই তিনি লেখেন 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' এবং বাংলার ইতিহাস। এর থেকে বোঝা যায় তিনি এই সময় শিক্ষার সঙ্গো প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত না থাকলেও, সামগ্রিকভাবে দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে তার চিন্তা ভাবনা চলতে থাকে। অবশেয়ে ১৮৫৮ সালে বিদ্যাসাগর স্থায়ীভাবে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদে যোগদান করেন। কলেজের সম্পূ্র্ দায়িত্ব গ্রহণ করায়, তাঁর নিজস্ব শিক্ষাসংস্কার সংক্রান্ত চিন্তা ভাবনাকে কার্যকর করার ব্যাপারে অনেক বাধা অপসারিত হয়েছিল।

শিক্ষার লক্ষ্য :

শিক্ষার স্বরূপ ও লক্ষ্য সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতামত হল যে,"ভারতীয়গণের শিক্ষার লক্ষ্য হবে সংস্কৃত ও ইংরাজি জ্ঞানের উপর পর্যাপ্ত অধিকার অর্জন করা এবং তার দ্বারা এমন সব মানুষ তৈরি করা, যারা আমাদের পাশ্চাত্য জগতের সভ্যতা ও বিজ্ঞানের দ্বারা আমাদের মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ করতে সমর্থ হবে।" যদি ইংরাজি ভাষার জ্ঞানের উপর অধিকার অর্জন করা যায় তাহলেই পাশ্চাত্য সভ্যতা ও বিজ্ঞানের মাধ্যমে ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ভাষাকে উন্নত করা যাবে। তাঁর শিক্ষানীতি বিশ্লেষণ করলে যে মৌলিক দিক্‌টি আমাদের সামনে সুস্পষ্ট রূপে ফুটে ওঠে তা হল এই যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ছিল তাঁর জীবনের প্রধান ও প্রথম লক্ষ্য।

প্রাথমিক শিক্ষা : প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের অবদানই অবশ্য ইতিহাসের বিচারে সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য।বিদ্যাসাগরেব সময়ে এদেশে প্রাথমিক শিক্ষা ছিল ভীষণভাবে অবহেলিত। বাংলাদেশে অসংখ্য দেশীয় পাঠশালাগুলোর অবস্থা শোচনীয় ছিল। এই সব দেশীয় পাঠশালাগুলোর সংস্কার সাধনের জন্য বিদ্যাসাগর শিক্ষা পরিষদের সভাপতি এফ্. জে.মোয়াট-এর মাধ্যমে একটি প্রতিবেদন পেশ করেন। ওই প্রতিবেদনে সবার আগে গণশিক্ষার কথা, প্রাথমিক স্কুল গঠন করা, পাঠ্য বই রচনা করা, শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষক-শিক্ষণ ইত্যাদি কথার উল্লেখ ছিল। তৎকালীন বড়োলাট লর্ড ডালহৌসি তাঁর প্রতিবেদনের সুপারিশগুলো সমর্থন করেন। এমনকি বাংলাদেশের ছোটো লাট (লেফ্‌টেনান্ট গর্ভনর) মি. হ্যালিডে ও দেশজ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর সম্বন্ধে সহানুভূতি প্রকাশ করেন।

বিদ্যাসাগর প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য যা বলেছিলেন তার মূল কথাগুলো হল —

1) শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বিদ্যালয়গুলোতে মাতৃভাষার মাধ্যমে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা থাকবে।

2) পাঠ্যসূচীতে যে সমস্ত বিষয় স্থান পাবে সেইগুলো হল সাধারণ গণিত, ভূগোল, ইতিহাস, জ্যামিতি, প্রকৃতি বিজ্ঞান,নীতিবিজ্ঞান, শারীর তত্ত্ব, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইত্যাদি।

3) বিদ্যাসাগর প্রতিটি জেলায় তিন থেকে পাঁচ শ্রেণিভুক্ত মডেল স্কুল স্থাপনের কথা বলেন।

4) প্রতিটি জেলায় দুজন করে পরিদর্শক নিযুক্ত হবেন এবং সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ প্রধান পরিদর্শকের দায়িত্ব পালন করবেন।

5) প্রাথমিক শিক্ষার বিদ্যালয়গুলোর জন্য উৎকৃষ্ঠমানের শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। আর এই সব শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য নর্মাল স্কুল স্থাপনের কথা হলা হয়।

6) বিদ্যালয়গুলো প্রশাসনের উদ্দেশ্যে সার্কেল প্রথা চালু হয়। বিদ্যাসাগর দক্ষিণবাংলা সার্কেলের পরিদর্শক নিযুক্ত হন। এক বছর সময়ের মধ্যে বর্ধমান, হুগলী, মেদিনীপুর ও নদীয়ার পাঁচটি করে স্কুল তৈরি হল।

7) বিদ্যাসাগর প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী বহু পুস্তক রচনা করেন। তাঁর পচিত বর্ণ পরিচয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ এক শতাব্দী ধরে বাংলা দেশে প্রচলিত ছিল। এছাড়া বিদ্যাসাগরের প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্য পুস্তকগুলো হল পশ্বাবলী, বাংলার ইতিহাস, চারুপাঠ, জীবন রচিত প্রভৃতি।

তাঁর রচিত বর্ণ পরিচয় (১৮৫৫) শিশু শিক্ষার আদর্শ পাঠ্যপুস্তক ও গণশিক্ষা বিস্তারের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। এই পুস্তকটির মাধ্যমে শিশুরা সহজে বাংলা ভাষার গঠনবৈচিত্র্য ও সাহিত্যের সাথে

পরিচিত হতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে প্রাথমিক শিক্ষার এমন আদর্শ বই পৃথিবীতে খুব অল্প ভাষাতেই আছে।

গণশিক্ষা : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শিক্ষা প্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষাকে জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। বিদ্যাসাগরেব লক্ষ্য ছিল প্রকৃত গণমুখী শিক্ষা। তিনি চান নি যে, শিক্ষার সুফল মুষ্টিমেয় কিছু ভাগ্যবান মানুষ ভোগ করুক। তিনি বলেছেন "আজ জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজন। আমাদের কতকগুলো মাতৃভাষা ভিত্তিক বিদ্যালয় স্থাপন করা এবং মাতৃভাষায় শিক্ষামূলক বিষয়ে প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক রচনা করা। আমাদের উচিত এমন একদল লোককে শিক্ষিত করে তোলা যারা শিক্ষকতার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।"

বিদ্যাসাগরের জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তাই সংস্কৃত কলেজের দরজা তিনি অব্রাহ্মণ শিক্ষার্থীদের জন্য খুলে দিয়েছিলেন। তাই সংস্কৃত কলেজের দরজা তিনি অব্রাহ্মণ শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান কাজকে মহৎ আদর্শ বলে গ্রহণ করেছিলেন। সর্বসাধারণের শিক্ষার জন্য তিনি পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। মানুয়ের প্রতি ছিল তাঁর অকৃত্রিম মমত্ববোধ। মানবতাবোধ থেকেই তিনি শিক্ষা সংস্কারে প্রেরণা পেয়েছিলেন। ঈশ্বরের আরাধণার পরিবর্তে তিনি মানুয়ের আরাধনা করেছেন। মাতৃভাষা ও আঞ্চলিক ভাষা জনসাধারণের শিক্ষার প্রধান মাধ্যমে হবে একথা তিনি জোরের সঙ্গে ঘোষণা করেন। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের উপর গুরুত্ব আরোপ করে তিনি আপামর জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। শিক্ষাক্ষেত্রে সরকরী "চুইয়েঁ -পড়া নীতি" (Downward Filtration Theory)-র তীব্র প্রতিবাদ করেন। বিদ্যাসাগর সমস্ত কিছু প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে জনশিক্ষার জন্য যথাসাধ্য প্রচেস্টা চালিয়ে গেছেন।

নারীশিক্ষা বিস্তার: উনবিংশ শতাব্দীর নারী প্রগতি প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের অন্যতম উল্লেখযোগ্য এবং গৌরবোজ্জ্বল কাজ হল বাংলাদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের জন্য তাঁর আন্তরিক প্রচেস্টা। আধুনিকতার জাগ্রত প্রতিমূর্তি বিদ্যাসাগর উপলব্ধি করেছিলেন যে, শিক্ষা ব্যতিত নারী সমাজের মুক্তি নাই। চিরাচরিত কুসংস্কারকে দূরে সরিয়ে দিয়ে তিনি স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে উদ্যোগী হন। তিনিই প্রথম উপলব্ধি করেন 'যেখানে নারীরা সম্মানিতা হন, সেখানে ভগবান বাস করেন।' নারীসমাজের দেবীমূলে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেছেন স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমেই। ১৮৮৯ সালে বেথুন সাহেবের (শিক্ষা পরিষদের সভাপতি) পৃষ্ঠপোষকতায় কলকাতায় 'হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৫০ সালে বিদ্যাসাগরের ওই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক হন এবং আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলের কাছে অনুরোধ করেন ওই বিদ্যালয়ে তাদের কন্যাদের পড়াতে। তাঁর অনুরোধে সাড়া দিয়ে তারানাথ বাচস্পতি, সম্ভুনাথ পন্ডিত, হরদেব চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ অভিজাত ব্যক্তিগণ নিজ নিজ কন্যাদের শিক্ষা গ্রহণের জন্য স্কুলে পাঠাতে শুরু করেন।

বিদ্যাসাগর শুধু বাংলা তথা ভারতের প্রাণকেন্দ্র কলকাতার মধ্যবিত্ত সমাজে নারী শিক্ষার প্রতি গভীর আগ্রহ সৃষ্টি করেন নি, বাংলার পল্লী অঞ্চলেও নারী শিক্ষার ক্ষেত্র প্রস্তুত ও বিস্তার করেছিলেন। ১৮৫৭ সালে বিদ্যাসাগর নিজে জৌগ্রামে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বাংলার প্রথম ছোটো লাট হ্যালিডে সাহেবের সহযোগিতায় এবং বিদ্যাসাগরের প্রচেস্টায় ১৮৫৮ সালে মেদিনীপুর জেলায় ৩টি, বর্ধমান জেলায় ১১টি, হুগলী জেলায় ২০ টি এবং নদীয়া জেলায় একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

ঈশ্বারচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তরের জন্য, মেয়েদের বিদ্যালয়ে অর্থ সাহায্যের উদ্দেশ্যে 'নারীশিক্ষা ভাণ্ডার' গড়ে তুলেছিলেন। তিনি নারী জাতির বঞ্চনা দূর করার জন্য কৃতসংকল্প হন। তাঁর প্রচেষ্টায় ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ বিধিবদ্ধ হল। এটি তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ একটি কাজ। বাল্য বিবাহ নিবারণ ও তাঁর অন্যতম কীর্তি। বাল্য বিবাহ ও বহু বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক ব্যাধিগুলোর বিরুদ্ধে তিনি জোরালো প্রতিবাদ করেন।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য: শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের অন্যতম অবদান হল তার সাহিত্য কীর্তি। বাংলা গদ্যের বিকাশে তাঁর অবদান অসামান্য জনগণের সুবিধার জন্য তিনি বাংলা বর্ণমালার সংস্কার করেন। তাঁর লেখা প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তকগুলো গণশিক্ষা গণস্বাক্ষরতার সহায়ক হয়েছিল। বংলা ভাষাকে ঘষে মেজে তিনি একে উন্নত চিন্তার বাহণ করে তোলার জন্য চেষ্টা করেন, তিনি প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী নানা পুস্তক রচনা করেছিলেন। তাঁর লেখা 'কথামালা' ও 'বোধোদয়' বাংলা শেখার সবচেয়ে সহজ পথ নির্দেশ করতে পেরেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন," বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন"। তিনিই সর্বপ্রথম বাংলা গদ্যে কলানৈপুণের অবতারণা করেন। বিদ্যাসাগরের যে বাংলা গদ্যকে কেবলমাত্র সর্বপ্রকার ব্যবহারযোগ্য করেই খান্ত ছিলেন তা নয়, তাকে শোভন করার জন্য সর্বদা সচেস্ট ছিলেন।

বিদ্যাসাগরের সাহিত্য কীর্তি সর্বজনবিদিত। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলো হল 'বাসুদেবচরিত' (১৮৪২), 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'(১৮৪৭), জীবনচরিত (১৮৪৯), 'বাংলার ইতিহাস' (১৮৪৮), 'বোধোদয়' (১৮৫১), শকুন্তলা (১৯৫৪) 'কথামালা'(১৮৫৬), 'চরিতাবলী'(১৮৪৮), সীতার বনবাস (১৮৬০), ভ্রান্তিবিসাল (১৮৬৯ প্রভৃতি। তাঁর অন্যান্য সাহিত্য কীর্তি হল 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস','ভ্রান্তবিলাস', 'মেঘদূতম',হর্ষচরিতম' প্রভৃতি। এছাড়া সংস্কৃত শিক্ষাকে সহজ ও উন্নত করার জন্য তিনি লিখেছিলেন

'উপক্রমনিকা', 'বাকরণ কৌমুদী' এবং 'ঋজুপাঠ'। বাস্তবে বিদ্যাসাগরই বাংলা গদ্যকে সাহিত্যরূপে প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলা সাহিত্যের প্রাণপুরুষ বিশ্ববন্দিত কবি রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন,"বঙ্গ সাহিত্যে আমার কৃতিত্ব যদি দেশের লোক স্বীকার করে থাকেন তবে আমি যেন স্বীকার করি, একদা তার দ্বার উদ্‌ঘাটন করেছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।"

বিজ্ঞানসম্মত পুস্তক 'বর্ণপরিচয়' (প্রথমভাগ), 'বর্ণপরিচয়' (দ্বিতীয়ভাগ) বাংলা ভাষা আয়ত্ত করার ক্ষেত্রে বর্ণ ও শব্দের যে ক্রমবিন্যাস তা বাংলা সাহিত্যের মহাসম্পদ। তিনিই প্রথম যতি, চিহ্ন, কমা, সেমিকোলন, জিজ্ঞাসাসূচক চিহ্ন, দাড়ি ছাড়া বাক্যের অর্থের ভিন্নতা উপলব্ধি করে সুচিন্তিত ও সুসংহত পুনর্বিন্যাস করেছিলেন যা ছিল মনস্তাত্ত্বিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক।

সংবাদপত্র প্রকাশ :

সংবাদপত্র জগতেও বিদ্যাসাগরের অবদান গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায। তিনি 'তত্ত্ববোধিনী'ও 'সর্বশুভকারী' পত্রিকা দুটির সাথে প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত ছিলেন। 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকাটি দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদনা করতেন, তার পরিকল্পনা করেছিলেন বিদ্যাসাগর। আবার হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যর পর যখন 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট'(Hindu Patriot) পত্রিকাটি প্রায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল, তখন বিদ্যাসাগরই এই পত্রিকাটিকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন।

ইংরেজি শিক্ষা :

ইংরেজি শিক্ষা সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের দৃঢ় অভিমত ছিল যে, বাংলা ভাষাও সাহিত্যের উন্নতি তখনই সম্ভব হবে, যদি এরই সঙ্গে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন করা যায়। এইজন্য তিনি সংস্কৃত কলেজের পুনর্গঠনের সময় সংস্কৃত-চর্চার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য পঠন-পাঠনেরও ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের যদি ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য ভালোভাবে পড়ানো যায়, তাহলে তারাই একদিন বাংলা সাহিত্যের উৎকৃষ্ট লেখক হতে পারবেন। তিনি সংস্কৃত কলেজের ইংরেজি শেখা সম্পর্কে মন্তব্য করেছন যে, ইংরেজি শেখা ঐচ্ছিক না করে আবশ্যিক করতে হবে। সংস্কৃত সাহিত্য ও ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে একদিক যেমন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ঘটবে, অন্যদিকে তেমনি দুই বিদ্যার সমন্বয়ে শিক্ষার্থীর সুকোমল মনোবৃত্তিগুলোর সার্থক বিকাশ সাধিত হবে।

উচ্চ শিক্ষা :

বিদ্যাসাগরের একটি বড়ো কীর্তি হল 'মেট্রোপলিটান ইন্স্টিটিউশন' নামক একটি বিদ্যালয় স্থাপন। বর্তমানে এই বিদ্যাসাগর কলেজ নামে পরিচিত। এই কলেজটি পরিচালনার জন্য বিদ্যাসাগর দ্বারকানাথ মিত্র এবং কৃষ্ণদাস পালকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির প্রচেষ্টায় ১৮৭২ সালের জানুয়ারি মাসে কলেজটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সর্বপ্রথম আর্টস পড়ার অনুমোদন লাভ করে। অর্থাৎ এই প্রতিষ্ঠানটি ছিল ভারতীয়দের দ্বারা পরিচালিত প্রথম অনুমোদিত উচ্চশিক্ষা কেন্দ্র।

মূল্যায়ন: উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শিক্ষাকর্মে পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন মধ্যাহ্ন সূর্যের মত দেদীপ্যমান। তাঁর চারিত্রিক অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল পান্ডিত্য, তেজস্বিতা, অধ্যাবসায় ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যতা। আধুনিক শিক্ষার ইতিহাসে তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। বিদ্যাসাগর কথা এবং কাজে সমভাবে পারদর্শী ছিলেন। তিনি মনে করতেন যে, সদিচ্ছা থাকলে যে কোনো কাজে সাফল্য পাওয়া যায়। তাই জনশিক্ষা, নারী শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে তিনি তাঁর সফল প্রচেষ্টার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। বর্ণ পরিচয়ের মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তারের প্রচেস্টা যে শুধু ভারতীয় শিক্ষাকে প্রভাবিত করেছিল তা নয়, তৎকালীন শিক্ষানীতিকেও প্রভাবিত করেছিল। সর্বোপরি তাঁর অন্যতম কীর্তি হল প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষার মাধ্যমে পঠন-পাঠনও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার সমন্বয়ে তিনি বাংলার নবজাগরণকে সফলতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছিলেন। আক্ষরিক অর্থে তিনিই হলেন প্রথম আধুনিক বাঙালী। প্রকৃতপক্ষে বাংলার ঘোর অন্ধকার দিনে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব এক বিস্ময়কর ঘটনা। সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরেজি- তিন ভাষার দক্ষতায় বাংলা গদ্যসাহিত্যের উন্নয়ন ও সার্থক অনুবাদ সাহিত্য রচনার পাশাপাশি সাধারণ মানুষদেরও রস আস্বাদনে সাহায্য করেছে। বিদ্যাসাগর অন্যের প্রশংসা গ্রহণ করতে পারতেন না, তাঁর অমর কীর্তি, অপরিসীম দান, উদারতা, বিশাল ব্যক্তিত্ব, জনদরদি মন সর্বদাই মানুষের চেতনা বিকাশে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং সমাজকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করেছে। 'করুণার সিন্ধু' বিদ্যাসাগর জলন্ত দীপশিখা নিভিয়ে দিয়ে অনন্তলোকে যাত্রা করেন ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের ২৯শে জুলাই।

তৃতীয় একক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)

প্রস্তাবনা :

উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। দার্শণিক চিন্তার দিক থেকে রবীন্দ্রনাথকে আমরা ভাববাদী ও প্রকৃতিবাদী দুইই বলতে পারি। তাঁর মতো বহুমুখি প্রতিভা ইতিহাসে খুব বেশি দেখা যায় না। শান্তিনিকেতন আশ্রমিক বিদ্যালয়ের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষা চিন্তাকে বাস্তবে রূপদানের চেষ্টা করেন। তিনি ছিলেন একাধারে সাহিত্যিক, দার্শনিক, নাট্যকার, সঙ্গীত রচয়িতা, শিক্ষক, সমালোচক, শিক্ষাবিদ, চিত্রশিল্পী, ধর্মীয় নেতা, আরো কত কী। শিক্ষার হেরফের, তোতা কাহিনী, শিক্ষার সমস্যা, স্ত্রীশিক্ষা ও প্রভৃতি গ্রন্থও প্রবন্ধে তিনি প্রচলিত শিক্ষাধারার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। ১৮৬১ সালে ৭ মে (২৫ বৈশাখ ১২৬৮ বঙ্গাব্দে) কলকাতার জোড়াসাকোঁর ঠাকুর পরিবারে রবীন্দ্রনাথের জন্ম। তার ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মাতা ছিলেন সারদা দেবী। পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আধ্যাত্মিক জীবনের অধিকারী হলেও তাঁর সমাজ চিন্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল। ঠাকুরবাড়ির আবহাওয়া ছিল সাহিত্যচর্চা, গান, অভিনয় ইত্যাদিতে কোলাহল মুখর। এমনই এক সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে রবীন্দ্রনাথ বড়ো হয়ে উঠেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা শুধুমাত্র তত্ত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, তিনি নিজেই তাঁর প্রয়োগ করে গেছেন। তাই তাঁর শিক্ষাতত্ত্বের মধ্যে কল্পনাবিলাসের বিশেষ কোনো স্থান নেই। তাঁর শিক্ষাতত্ত্ব বিশেষভাবে বাস্তববাদী, প্রয়োগের ক্ষেত্র 'ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়' যা শান্তিনিকেতনে স্থাপন করেন। শুধু শিক্ষাতত্ত্ব নয়, সাহিত্যেও অনন্য কীর্তির তিনি অধিকারী, যার ফলে নোবেল পুরস্কার পান ১৯১৩ সালে।

রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন :

রবীন্দ্রনাথ উপনিষদীয় চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন সৃষ্টির মূলে আছে এক সর্বব্যাপী আধ্যাত্মিক শক্তি। এই শক্তি সৃষ্টির মধ্যেই সতত প্রকাশমান এবং সবকিছুর মধ্যেই এই সত্ত্বা প্রকাশিত। একে তিনি বলেছেন 'বিশ্বচেতনা'। এই বিশ্বাচেতনা সুসামঞ্জস্য রূপে সর্বত্র বিরাজমান। এই বিশ্বাচেতনাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা মানুষ সবসময় করে এবং পরিপূর্ণ আত্মবিকাশের মাধ্যমে তাকে লাভ করা যায়। মানুষ বিশ্ব প্রকৃতির নিয়ম জেনেই নিজের নিয়মেই বিকাশ লাভ করে। রবীন্দ্রনাথের জীবন দর্শনের মূল বক্তব্য হল - বিশ্ববৈচিত্র্যের মাঝে এক শক্তি বিরাজ করছে। বহু বৈচিত্র্যের মাঝে তার ঐক্যের যে নিয়ম, সেই নিয়ম জেনে আনন্দরূপে তাকে লাভ করাই হল মানুষের জীবনের লক্ষ্য ও সাধনা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন মানুষকে ভালোবাসার মধ্যদিয়েই ঈশ্বরকে লাভ করা যায়। তিনি বলেছেন ,"আমাদের জীবনে যা অতিরিক্ত, তারই অন্তহীন দেশে থাকেন প্রেমের দেবতা"। রবীন্দ্রনাথ আমাদের চেতনাকে বিচ্ছেদবোধের মায়া থেকে মুক্ত করেন। এই মুক্তিই হলো ভারতীয় দর্শনের মূল কথা এবং রবীন্দ্রনাথের জীবন দর্শণের মূল বক্তব্য।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন :

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন তাঁর জীবনদর্শন দ্বারা প্রভাবিত। তিনি মূলত কবি, কিন্তু মানবজীবনের এমন কোনো অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র নেই, যেখানে তাঁর চিন্তার ছোঁয়া লাগেনি। মানব অভিজ্ঞতার বিভিন্ন দিকের উপর তিনি

প্রভাব বিস্তার করে গেছেন। তাঁর শিক্ষা চিন্তা শুধুমাত্র তত্ত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, তিনি নিজেই তার প্রয়োগ করে গেছেন। তাঁর শিক্ষাতত্ত্ব বিশেষভাবে বাস্তববাদী। তিনি এক দিকে যেমন ভাববাদী চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত হন, অন্যদিকে প্রয়োগের ক্ষেত্রে দেখা যায় তিনি প্রকৃতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে সেই শিক্ষাই হল প্রকৃত শিক্ষা, যা কেবলমাত্র তথ্য পরিবেশন করে না, যা বিশ্ব সত্তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের জীবনকে গড়ে তোলে। বাস্তবায়িত করার জন্য গড়ে তোলেন শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাদর্শনের মৌলিক দিক্‌গুলো হল— স্বত:স্ফূর্ত শিক্ষা, উন্মুক্ত প্রান্তরে অর্থাৎ প্রাকৃতিক পরিবেশে শিক্ষা, শৃঙ্খলাযুক্ত শিক্ষা, আনন্দময় শিক্ষা, ব্যক্তিসত্তার বিকাশ, সক্রিয়তার শিক্ষা, কর্মভিত্তিক শিক্ষা ইত্যাদি।

শিক্ষার লক্ষ্য :

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয় করতে গিয়ে ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন তথ্য জ্ঞাপন প্রক্রিয়ায় কখনই শিক্ষা হতে পারে না। সর্বোচ্চ শিক্ষা কেবলমাত্র তথ্য পরিবেশন করে না, বিশ্বসত্ত্বার সাথে ব্যক্তিসত্ত্বার সংগতি রাখতে সাহায্য করে। তাঁর মতে শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হবে—

১) স্বাধীন চিন্তা শক্তির বিকাশই হবে শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। তাঁর মতে, " যে শিক্ষা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগ্রত ও সক্রিয় করে, আমাদের মনকে অবুদ্ধির প্রভাব থেকে মুক্ত করতে পারে, সেই শিক্ষার দ্বারাই আমাদেরও সমস্ত দু:খ-দূর্গতির অবসান ঘটতে পারে।"

২) পাঠের বোঝা বইতে বইতে আমাদের দেশের শিশুরা যে স্বাস্থ্য সম্পদ হারিয়েছে তা নিয়ে কবির দু:খের অন্ত নেই। তাই তিনি শিক্ষার্থীদের দৈহিক বিকাশের উপর জোড় দিয়েছেন।

৩) রবীন্দ্রনাথর মতে, যে সর্বব্যাপী পরমসত্তা ছায়ার মতো আমাদের সহগামী তাঁকে উপলব্ধি করাই সকল প্রকার শিক্ষার উদ্দেশ্য। তাই আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি শান্তি নিকেতনের শিক্ষা পরিকল্পনায় প্রাধান্য পেয়েছে।

৪) রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন সমস্ত মানুষের মধ্য দিয়েই পরম ব্রহ্মের প্রকাশ ঘটে। তাই শৈশব থেকেই শিক্ষার মধ্যদিয়ে ভ্রাতৃত্ববোধ,মানুষকে ভালোবাসা, আর্তকে সেবা করা প্রভৃতি সামাজিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটাতে হরে।

৫) কবিগুরু ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক সমন্বয় ঘটনাকেই শিক্ষার মূল লক্ষ্য মনে করতেন।

৬) জনশিক্ষার বিস্তারও শিক্ষার লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

শিক্ষার পাঠ্যক্রম :

বৃটিশ শাসনের শিক্ষা ব্যবস্থায় রবীন্দ্রনাথ মর্মাহত হয়েছিলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, বৃটিশ শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য ও জীবনের কোনো যোগ নেই। রবীন্দ্রনাথ পরিপূর্ণ বিকাশের দিকে লক্ষ্য রেখে পাঠক্রমের পরিকল্পনা করেছেন। (১) তিনি বিদ্যালয়কে মানব সংস্কৃতি অনুশীলনের ক্ষেত্র হিসাবে বিবেচনা করেছেন। মানব সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটবে এমন পাঠ্যক্রমের সমর্থন তিনি করেছেন। (৩) তিনি পাঠ্যক্রমে ভাষা ও সাহিত্যকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। (৪) সুস্থ মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী গঠনের জন্য তিনি পৃথকভাবে রামায়ণ, মহাভারত পাঠের কথা বলেছেন। (৫) ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান সাধনাকে তিনি

পাঠ্যক্রমে গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেছেন,“ আমাদের দেশের বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তকের পরিধির মধ্যে জ্ঞানচর্চার যে সংকীর্ণ সীমা নির্দিষ্ট আছে কেবলমাত্র তাই নয়, সকল রকম কারুকার্য ও চর্চার প্রয়োজন সমস্তই এই সংস্কৃতির অন্তর্গত বলে স্বীকার করব। চিত্তের পূর্ণ বিকাশের পক্ষে এই সমস্তরেই প্রয়োজন আছে বলে আমি জানি।” (৬) তিনি ইংরেজি শিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন না। (৭) তিনি মাতৃভাষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। (৮) বিভিন্ন ধরণের সমাজসেবা ও সমাজ উন্নয়নমূলক কাজের ব্যবস্থা রাখারও পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। (৯) এছাড়াও তিনি খেলাধূলা, গান, বাগানের কাজ, গল্প বলা, হাতের কাজ প্রভৃতিকে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত করেছেন। (১০) প্রকৃতিকে উপলব্ধিকরণের জন্য শিল্পকলাকেও পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

শিক্ষণ পদ্ধতি :

রবীন্দ্রনাথ নির্দিষ্ট কোনো শিক্ষণ পদ্ধতির কথা বলেন নি। তবে তিনি ইন্দ্রিয়ানুশীলন, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ, সৃজনধর্মী কাজকর্ম প্রভৃতির মাধ্যমে ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়ার কথা বলেছেন। শ্রেণি শিক্ষণের গতানুগতিক প্রথার পরিবর্তে তিনি প্রকৃতির খোলা আকাশের নীচে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থাকেই উপযুক্ত বলে বিবেচনা করেছেন। তাঁর মতে শিক্ষক যদি উৎসাহী ও গুণসম্পন্ন হন, তবে প্রয়োজন মত তিনি নিত্য নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন করবেন। তিনি প্রাচীন তপোবনের শিক্ষার দ্বারা প্রভাবতি হয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন গুরু ও শিষ্যের মধ্যে সু-সম্পর্ক থাকলে সেখানে শিক্ষাদানের কাজ অনেক সহজ হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষণ পদ্ধতির মূলকথা হল শিশুকে শিক্ষায় পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে। সব সময় তাকে বিধিনিষেধের মধ্যে আবদ্ধ রাখা চলবে না। অবশ্য স্বাধীনতা ও স্বেচ্চারিতা এক নয়। তাই শান্তিনিকেতনে স্বাধীনতার সাথে সাথে সংযম ও ব্রহ্মচর্য পালনের কঠোর নির্দেশ ছিল।

সক্রিয়তা রবীন্দ্রনাথের শিক্ষণ পদ্ধতির অন্যতম দিক। ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়গুলো সক্রিয়তার ভেতর দিয়ে সহজেই শেখানো যায়। তিনি বিশ্বাস করতেন শিল্প শিক্ষা ও অন্যান্য কাজ যেমন, বাগান পরিচর্যা, কৃষিকাজ প্রভৃতির শিশু দেহ ও মন গঠনে সাহায্য করে। পর্যটনের মাধ্যমে শিশুরা যে অভিজ্ঞতা লাভ করবে বিদ্যালয়ের বন্ধ ঘরে তা কখনোই সম্ভব নয়। শিক্ষণ পদ্ধতিতে অনুবন্ধ নীতি অনুসরণ করে চলার কথা বলেন, তাঁর মতে, “কোনদিনই বঙ্গভাবে আমি শিক্ষা দিতে চাইনি, ক্লাসের বিচ্ছিন্ন ব্যবস্থায় তাদের শিক্ষার সমগ্রতাকে আমি কখনও বিপর্যস্ত করিনি।” পাশাপাশি তিনি বলেন শিক্ষণ পদ্ধতি নির্ভর শিক্ষার আদর্শের উপর। “জলের দ্বারা যেমন জলাশয় পূর্ণ হয়, শিক্ষার দ্বারা শিক্ষা জ্বলিয়া উঠে, প্রাণের দ্বারা প্রাণ সঞ্চারিত হয়।” এককথায় বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চিরাচরিত শিক্ষণ পদ্ধতিরপরিবর্তে মনোবৈজ্ঞানিক ও শিক্ষার্থীর চাহিদাভিত্তিক শিক্ষণ পদ্ধতিরই কথা বলেছেন।

শিক্ষার ভাষা মাধ্যম :

শিক্ষার বাহন হিসাবে রবীন্দ্রনাথ মাতৃভাষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে গিয়ে তিনি মাতৃভাষাকে মাতৃদুগ্ধের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাঁর মতে, “Mother Tounge in Education is the same as Mother’s Milk to a Growing Child for his Total Development.” মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষার্থীরা শিক্ষণীয় বিষয়গুলোকে সবচেয়ে অল্প পরিশ্রমে আয়ত্ত করতে পারে। আবার মাতৃভাষার উপর গুরুত্ব আরোপ করলেও তিনি ইংরেজি

ভাষার প্রয়োজনীয়তাকে কখনো অস্বীকার করেননি। তাঁর শিক্ষা পরিকল্পনায় ইংরেজি সহ বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি স্বীকার করেছেন।

জনশিক্ষা :

জনশিক্ষার দিকেও রবীন্দ্রনাথের সজাগ দৃষ্টি ছিল, তিনি জানতেন যে ভারতের অগণিত জনসাধারণ জ্ঞানের আলোক থেকে বঞ্চিত। তাঁর মতে শিশুর শিক্ষা শুরু হবে তার পরিবার থেকে। গ্রামের পাঠাগারগুলোকে তিনি জনশিক্ষা প্রসারের কেন্দ্ররূপে গড়ে তোলার কথা বলেছেন। যাত্রা, লোকনৃত্য, লোকসংগীত,সাধারণ উৎসব প্রভৃতির মাধ্যমে জনশিক্ষার প্রসারের কথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ জাতিকে জনশিক্ষার মাধ্যমে সচেতন করে তোলার কথা বলেছেন। বিশেষ করে যাঁরা জননী, যাঁদের উপর জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে, তাদেরকে শিক্ষিত করে তোলা অবশ্যই প্রয়োজন বলে তিনি মনে করতেন।

শিক্ষক সম্পর্কে ধারণা:

রবীন্দ্রনাথ “শিক্ষার ধারা” প্রবন্ধে শিক্ষক সম্পর্কে বিশেষ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন মানুষ মানুষের কাছ থেকেই শিখতে পারে। তিনি এও বলেছেন, ‘তাঁরাই শিক্ষক হবার উপযুক্ত যারা ধৈর্যবান, ছেলেদের প্রতি স্নেহ যাঁদের স্বাভাবিক।’ শিক্ষক তাঁর মধুর ব্যক্তিত্ব দিয়ে শিক্ষার্থীর মনুষ্যত্ব চর্চার নিত্যসঞ্জী হবেন। তপোবনের কেন্দ্রস্থলে আছেন গুরু। তিনি যন্ত্র নন, তিনি মানুষ। নিষ্ক্রিয়ভাবে মানুষ নন, সক্রিয়ভাবে মানুষ। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,“গুরুর অন্তরের ছেলে মানুষটি যদি একেবার শুকিয়ে যায়,তাহলে তিনি ছেলেদের ভার নেবার অযোগ্য হন” রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন ছিল। কেননা শিক্ষক সর্বদাই ছিলেন জ্ঞানপিপাসু, জ্ঞানার্জনের স্পৃহা, সদা জাগ্রত আর সেইজন্য শিক্ষার্থীর আধ্যাত্মিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক প্রভৃতি দিকের চেতনাবোধগুলো যথার্থই বিকশিত করা সম্ভব বত বন্ধনের মধ্য দিয়ে।

বিশ্বমানবতাবোধ :

রবীন্দ্রনাথ আজীবন বিশ্বমানবিকতার আরাধনা করে গেছেন। তিনি চেয়েছিলেন যে মানুয়ের প্রতি মানুষের ভালোবাসা যেন জাতীয়তা ও স্বদেশিকতাবোধের গন্ডি অতিক্রম করে তা আন্তর্জাতিকতা বোধে উন্নীত হতে পারে । রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ওই বোলপুরের প্রান্তরটিকে সমস্ত জাতিগত ভূগোল বৃত্তান্তের অতীত করে তুলবে। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন শিক্ষার সাহায্যে বিশ্বমানবতাবোধ প্রতিষ্ঠিত করতে।

রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন :

রবীন্দ্রনাথ গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থার বিরোধিতা করেই থেমে থাকেন নি। তাঁর শিক্ষা চিন্তাকে বাস্তবে প্রয়োগ করার জন্য তিনি ১৯০১ সালে শান্তিনিকেতনে আশ্রমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতীয় আশ্রমিক শিক্ষার ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে এই বিদ্যালয়টিকে স্থাপন করেছিলেন। তিনি শান্তিনিকেতনে ছাত্রদের ব্রহ্মচর্য পালনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন শিক্ষার জন্য ব্রহ্মচর্যের প্রয়োজন আছে। তিনি গুরুশিষ্যের সম্পর্কের উপরও গুরুত্ব আরোপ করেছেন। প্রাচীন ভারতের তপোবনের আদর্শ অর্থাৎ তপোবনের শান্ত, স্নিগ্ধ, কল্যাণয়, মূর্তি এরই প্রতিফলন

শান্তিনিকেতন গড়ায় পড়েছিল। তিনি বলেছেন, "দেখেছি মনে মনে তপোবনের কেন্দ্রস্থলে গুরুকে, ... মনুষ্যত্বের লক্ষ্য সাধনেই তিনি প্রবৃত্ত"। শিষ্যের জীবনপ্রেরণা পায় তাঁর অব্যবহৃত মঞ্জা থেকে, 'শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থায় জীবনবিকাশের অনুকূল পঠন-পাঠন, খেলাধূলা, গান-বাজনা ইত্যাদি কর্মচঞ্চলতার বিপুল আয়োজন ছিল। তিনি বলেছেন শিক্ষক-শিক্ষীর্থর মধ্যে শ্রদ্ধার সম্পর্কে না থাকলে আর যা হোক শিক্ষার আদান-প্রদান সম্ভব হয় না ।

১৯২১ সালে আশ্রমিক বিদ্যালয়টি বিশ্বভারতীর মূল উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি বলেন,"আমি প্রথমে শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপন করে এই উদ্দেশ্যে ছেলেদের এখানে এনেছি যে, বিশ্ব প্রকৃতির উদার ক্ষেত্রে আমি এদের মুক্তি দেব। কিন্তু ক্রমশ আমার মনে হল যে, মানুষে মানুষে যে ভীষণ ব্যবধান আছে, তাকে অপসারিত করে মানুষকে সর্বমানবের বিরাট লোকে মুক্তি দিতে হবে।" তিনি বিশ্বভারতীতে প্রাচ্য এবং পাশচাত্য সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে আশ্রমিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য গুলো হল :

১) রবীন্দ্রনাথ শিশুর স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন।তাই শান্তিনিকেতনে শিশুরা তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার খেলাধূলা ও স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পায়।

২) রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার্থীদের প্রকৃতির কোলে শিক্ষাদানের কথা বলেছেন। তিনি মনে করতেন শ্রেণিকক্ষের চার দেওয়ালের মধ্যে শিক্ষার্থীদের আবন্ধ রেখে কখনোও শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। তাই শান্তিনিকেতনের খোলা আকাশের নীচে পাঠদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৩) শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক ছিল এখাত্রে মধুর। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর পাশে বন্ধুর মতো থেকে তাকে সাহায্য করেন।

৪) শান্তিনিকেতনে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান প্রচলিত ছিল। যথার্থ শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ মাতৃভাষার মাধ্যমেই হওয়া উচিত,একথা রবীন্দ্রনাথ মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন।

৫)এখানে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সৃজনমূলক কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ আছে। এখানে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয়।

৬) সমাজসেবা ও পল্লী উন্নয়ণমূলক কাজ শান্তিনিকেতনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই দুটি কাজই প্রতিটি মানুয়ের গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম, তাঁর অনুশীলন শান্তিনিকেতনে অবশ্যিত কর্ম।

১৯২১ সালে ২৩ ডিসেম্বর শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-ভাবনার চূড়ান্ত রূপ। তিনি মনে করতেন, নিজেকে বিশ্ব মানবতার সঙ্গে একীভূত করাই শিক্ষার লক্ষ্য। এতে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেন। 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, পূর্ব ও পশ্চিমকে শিক্ষার মধ্য দিয়ে মেলাতে হবে। তাই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্তের শিক্ষার সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে বিশ্বভারতী।

শ্রীনিকেতন ও রবীন্দ্রনাথ :

শ্রীনিকেতন বর্তমানে পশ্চিমবাংলার বীরভূম জেলার বোলপুর মহকুমায় অবস্থিত একটি শহর। ১৯২২ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রায়পুরের জামিদার কর্ণেল নরেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের কাছ থেকে সুরুল গ্রাম সন্নিহিত কুঠিবাড়িটি দশ হাজার টাকায় কেনন। এটি শান্তিনিকেতন থেকে তিন কিলোমিটার দূরে । ১৯০১ সালে

আশ্রমিক বিদ্যালয় স্থাপনের পর থেকেই রবীন্দ্রনাথ পল্লী সংস্কার নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেছিলেন। শ্রীনিকেতনে সুরুল কুঠিবাড়িটি কেনার পর পল্লী সংস্কারের কাজ শুরু হয়। ১৯২১ সালে রবীন্দ্রনাথ এখানে স্থাপন করেন “পল্লী সংগঠন কেন্দ্র।’ বিশ্বভারতীর দ্বিতীয় শিক্ষাপ্রাঙ্গন শ্রীনিকেতনের কাজের উদ্দেশ্য ছিল কৃষির উন্নতি, রোগ নিবারণ, সমবায় প্রথার ধর্মগোলা স্থাপন, চিকিৎসার সুব্যবস্থা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে গ্রামবাসীদের সচেতন করে তোলা। পল্লী সংগঠন বিভাগ থেকে শিল্পভবন, শিক্ষাশাস্ত্র ও শিক্ষাচর্চাসদন ইত্যাদি কর্মকাণ্ড শান্তিনিকেতনের পাশাপাশি শ্রীনিকেতনেও বিস্তার লাভ করে। ১৯৪১ সালে সরকারী সহযোগিতায় শ্রীনিকেতনে প্রতিষ্ঠিত হয় শিশু ও মাতৃমঙ্গল কেন্দ্র। ‘পল্লী সংগঠন কেন্দ্র’ ও শিল্পসদন সংযুক্ত হয়ে ‘পল্লী সংগঠন বিভাগ’ গঠিত হয়। এই বিভাগের অন্তর্গত ছিল স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শিল্প প্রশিক্ষণ ও উৎপাদন, গো-পালন ইত্যাদি।

মন্তব্য :

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষামূলক অবদান এই স্বল্প পরিসরে আলোচনা করা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ এমন এক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন, যেখানে সেই শিক্ষাব্যবস্থা জাতীয় ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে জ্ঞান-বিজ্ঞান জগতে নতুন নতুন গবেষণালব্ধ আবিস্কার ও চিন্তাধারাকে গ্রহন করে দেশর বিরাট জনসাধারণকে দেশাত্মবোধ ও জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তুলতে সক্ষম হবে এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রার সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থাকে সংযুক্ত করে দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের এমনভাবে গড়ে তুলবে, যাতে তারা নিজেদের সামর্থ্য ও চারিত্রিক গুণপণার দ্বারা জাতির সেবা ও উন্নয়নের কাজে আত্মসমর্পন করতে পারে।

সমস্ত দিক থেকেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন মহান। মূলত একজন কবি শিক্ষাজগতে এত প্রাধান্য পেয়েছিলেন মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসার জন্য। তিনি তাঁর জীবনের শেষ চল্লিশ বৎসর শিক্ষার জন্য ব্যয় করেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন কৃত্রিম ও যান্ত্রিক শিক্ষা কখনোই মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটাতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন কোন একটি জাতির পরিচয় পাওয়া যায় তার সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে। তিনি সমস্ত রকম কুসংস্কার থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। তিনি ভারতীয় শিক্ষায় পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে প্রাচ্য সভ্যতার মিলনের ক্ষেত্র হিসেবে স্থাপন করেন ‘বিশ্বভারতী’ যার মাধ্যমেই শিক্ষায় তিনি বিশ্বজনীনতার বীজ বপণ করেছিলেন। প্রাচীন ভারতীয় উপনিষদের আদর্শে বিশ্বাসী কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২২শ্রাবণ (ইংরেজি ১৯৪১সালের ৭ আগস্ট) ইহলোক ত্যাগ করেন। তিনি ভারতবর্ষকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়েছিলেন। বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ ও বিশ্বশান্তির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

চতুর্থ একক স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩ —১৯০২খ্রী:)

প্রস্তাবনা :

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের যেসব মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটে এবং যাদের মেধা ও ব্যক্তিত্ব ভারতের জাতীয় জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে, স্বামী বিবেকানন্দ হলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি উত্তর কলকাতার বিখ্যাত দত্ত পরিবারে ১২ই জানুয়ারী ১৮৬৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ছিলেন বিশ্বনাথ দত্ত, মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী। বিবেকানন্দের ডাকনাম ছিল 'বিলে'। শৈশবে বিবেকানন্দ ছিলেন অত্যন্ত সাহসী। সব সময়ই তাঁর দুরন্তপনা সবকিছুই জানার প্রবল আগ্রহ ছিল। নরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। কলকাতার মেট্রোপলিটন ইন্সটিটিউশন থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রেসিডেন্সিতে ভর্তি হন। পরে স্কটিশচার্চ কলেজে ভর্তি হন। সেখান থেকে তিনি দর্শনশাস্ত্রে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সঙ্গীতচর্চা, খেলাধূলা ও শরীরচর্চায় ছিল তাঁর গভীর অনুরাগ।

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় চিন্তাজগতে বিভিন্ন দিক থেকে আলোড়ন আনার চেষ্টা করেন। তাই আধুনিক চিন্তাধারায় তাঁর অবদানকে অস্বীকার করা যায় না। পরাধীন ভারতবাসীর আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি তাদের ধর্মীয় ও নৈতিক চেতনাকে জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন। তাই সাধারণ ভারতবাসীর কাছে তিনি ধর্মীয় নেতা হিসাবেই বিশেষভাবে পরিচিত। কিন্তু শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁর অবদান কম নয়। তিনি ভারতীয় উপনিষদ ও বেদান্তের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা পৃথিবীর সামনে উপস্থিত করেছেন এবং ভারতবাসীকে সেই উদ্দেশ্যের পথে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

আধ্যাত্মিক উপলব্ধি :

নরেন্দ্রনাথ কলেজে শিক্ষাকালে আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা উপলব্ধি করেন। যৌবনে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। দুজন-দুজনকে দেখে অভিভূত। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে আহ্বান করেন। সত্যের খোঁজে-ঈশ্বরের খোঁজে আকুল হয়ে বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসেন। দক্ষিণেশ্বরে মাতৃমূর্তির কাছে অর্থ-সম্পদ কামনা করতে গিয়ে তিনি চেয়ে বসেন শ্রদ্ধা-ভক্তি-জ্ঞান। ১৮৮৬ সালে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাপ্রয়াণ ঘটলে বিবেকানন্দ তাঁর আদর্শকে প্রচারের জন্য সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহন করে ভারত পরিক্রমা শুরু করেন। রামকৃষ্ণদেবের সংস্পর্শে এসে তিনি এক বিরাট আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী হন। আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণার ফলে তিনি যে কেবল ঈশ্বর চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন তা নয়, পরাধীন ভারতবাসীর আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি তাদের ধর্মীয় চেতনাকে জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন।

বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শন :

দার্শনিক তত্ত্বের দিক থেকে বিবেকানন্দ ছিলেন ভাববাদী দার্শনিক। শিক্ষায় সংজ্ঞায় তিনি বলেছেন "Education is the manifestation of perfection already in man." তাঁর মতে জ্ঞান মানুষের অন্তরের জিনিস। বাইরে থেকে জ্ঞান আসে না। মানুষের মনই হল বিশ্বপ্রকৃতির জ্ঞানের ভাণ্ডার, সেখানেই সমস্ত জ্ঞান সঞ্চিত থাকে। মনের মধ্য থেকে যখন আচরণকে আমরা সরিয়ে দিতে পারি, তখন

আমাদের আত্মজ্ঞান প্রকাশ লাভ করে। বিবেকানন্দের মতে শিক্ষা হল আন্তরিক সত্তার প্রকাশ। বাইরের কোন প্রচেষ্টা নয় এবং এই প্রক্রিয়া স্বাভাবিক নিয়মেই ঘটবে।

বিবেকানন্দের এই শিক্ষাচিন্তা যদিও ভারতীয় দর্শনের অতি জটিল তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহলেও এর মধ্যে বৈজ্ঞানিক উপাদানের ও সংযোজন আছে এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে এই মতবাদের সঙ্গে অতি আধুনিক শিক্ষা মতবাদের সাদৃশ্য বর্তমান। বিবেকানন্দ বলেছেন, শিক্ষা হল অভ্যন্তরীণ মহত্ত্বের প্রকাশ। এই সংজ্ঞায় দুটি শব্দের ব্যাখ্যা করলে তাঁর শিক্ষা চিন্তার মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। এই শব্দ দুটি হল মহত্ত্ব (Perfection) এবং প্রকাশ (Manifestation)। অন্তর্নিহিত মহত্ত্ব বলতে তিনি ব্যক্তির নিজস্ব গুণাবলির কথা বলেছেন। এই সত্ত্বাকে আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিক ভাষায়, মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দিক বলা যায়। অর্থাৎ ব্যক্তি তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য অনুযায়ী বিকাশ লাভ করবে। এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে বলতে হয় বিবেকানন্দ শিক্ষায় ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন।

অন্যদিকে 'প্রকাশ' শব্দটি বিশ্লেষণ করলে অন্য একটি দিকের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কোন কিছুর প্রকাশ একটি বিশেষ মাধ্যমেই হওয়া স্বাভাবিক। কোন বিশেষ পরিবেশের মধ্যে যদি প্রকাশিত না হয়, তাহলে ব্যক্তির মধ্যে অন্তর্নিহিত শক্তি যতই থাকুক না কেন, তার কোন মূল্য নেই। তাই বিবেকানন্দ 'প্রকাশ' শব্দটির উপর ও সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। ব্যক্তির অন্তর্নিহিত মহত্ত্বের প্রকাশের একমাত্র স্থান হল মানুষ্যসমাজ। মহত্ত্বকে উপলব্ধি করবে কে, যদি তা সমাজ পরিবেশের মধ্যে প্রকাশিত না হয়? তাঁর এই 'প্রকাশ' কথার মধ্যে সামাজিক গুরুত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই দিক থেকে বিবেকানন্দ সমাজতান্ত্রিক মতবাদকে সমর্থন করেছেন। সুতরাং বিবেকানন্দ তাঁর শিক্ষা দর্শনের মধ্যে ব্যক্তিতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক মতবাদের সার্থক সমন্বয় সাধন করারই চেষ্টা করেছেন বলা যায়।

শিক্ষার লক্ষ্য : বিবেকানন্দ শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করতে দিয়ে আধ্যাত্মিক চেতনার সঙ্গে সমাজচেতনার সমন্বয় সাধন করেছেন। তাই তিনি মনুষ্যত্বের শিক্ষার (Man-Making Education) কথা বলেছেন। শিক্ষার লক্ষ্য শুধু কতকগুলো তথ্য পরিবেশন করা নয়, ব্যক্তির অন্তর্নিহিত শক্তিকে যথার্থ সমাজ পথে পরিচালিত করাই হল শিক্ষার লক্ষ্য। বিবেকানন্দের মতে শিক্ষার লক্ষ্য মস্তিষ্কে শুধুমাত্র তথ্য ভাণ্ডার প্রবেশ করানো বা সারাজীবন হজম হল না, মাথার মধ্যে অসংবদ্ধভাবে ঘুরতে লাগল, তা নয়। শিক্ষার লক্ষ্য হল জীবনগঠন, মানুষ তৈরি করা, চরিত্র গঠন করা এবং চিন্তাভাবনা পরিপাক করা। তাঁর মতে প্রকৃত শিক্ষা শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা, মৌলিকত্ব এবং নিজস্বত্বা ও উৎকর্ষতার উপর গুরুত্ব আরোপ করবে। "Education should lay proper emphasis on creativity, originality and excellence." মানুষের মধ্যে যে সৃজনী প্রতিভা রয়েছে তাকে বিকশিত করে তোলাই শিক্ষার লক্ষ্য।

এছাড়া শিক্ষার লক্ষ্যের ক্ষেত্রে বিবেকানন্দের অন্যান্য দিকগুলো হল - (ক) প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনে মানুষকে পূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তোলা। (খ) ব্যক্তিগত স্বার্থ-চেতনাবোধকে বর্জন করে ব্যক্তিকে সামাজিক কল্যাণকর পথে পরিচালিত করা, (গ) ব্যক্তির চরিত্র গঠন ও পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধনে সহায়তা করা, (ঘ) মানুষকে সকল প্রকার বন্ধন এবং সকল প্রকার দুর্বলতা থেকে মুক্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করা (ঙ) আধ্যাত্মিক চেতনার সঙ্গে সমাজচেতনার সমন্বয় সাধন করা। তাই তিনি মনুষ্যত্বের শিক্ষার কথা বলেছেন।

গণশিক্ষা :

ভারত দর্শনের দ্বারা বিবেকানন্দ উপলব্ধি করেছিলেন যে এদেশে যথার্থ শিক্ষাব্যবস্থা হল গণশিক্ষা। তিনি বলেছেন, "One great National sin is the negleet of the mass and that is cause of our downfall. No amount of politics would be of any avail until the masses in India are once move well educated, well fed and well cared for." অর্থাৎ জনগণের প্রতি অবহেলা হল আমাদের পতনের প্রধান কারণ। মানুষের প্রথম প্রয়োজন হল খাদ্য ও শিক্ষা। এই দুটি জিনিস না থাকলে রাজনীতি দিয়ে কোন লাভ হবে না। স্বামীজী ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন, 'সর্বাঙ্গে রক্ত সঞ্চার না হলে কোনো দেহ কোনোও কালে কোথাও উঠেছে দেখেছিস? একটা অঙ্গ পড়ে গেলে অন্য অঙ্গ সবল থাকলে ওই দেহ নিয়ে কোন বড়ো কাজ করা যাবে না— এটা নিশ্চই জানবি।' আধুনিক শিক্ষা মুষ্টিমেয়কে আলোকিত করে। তাই শিক্ষাকে মুষ্টিমেয় কয়েক জনের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে আপামর জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার কথা স্বামীজি বলেছেন।

বিবেকানন্দ শিক্ষিত যুবকদের গ্রামে গিয়ে দেশের লোকদের আধুনিক বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য, ধর্ম শিক্ষা দিতে বলেছেন। স্বামীজি যথার্থই মনে করতেন, জনশিক্ষা প্রসারের ফলে এক নতুন ভারত জন্ম নিক।' নতুন ভারত বেরুক কৃষকের লাঙল ধরে, চামারের কুটির ভেদর করে, জেলে মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক ঝোপ-জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে।'

নারী শিক্ষা :

স্বামী বিবেকানন্দ নারী শিক্ষার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর মতে পুরুষদের মত নারীদের শিক্ষায় সমান সুযোগ থাকা দরকার। তিনি বলেছেন মাতৃজাতির উন্নয়ন করতে পারলেই সমগ্র ভারতবাসীর উন্নয়ন সম্ভব হবে। পৃথিবীর সমস্ত মহৎ জাতিই নারীদের প্রতি সম্মান দেখিয়েছে। আমাদের ভারতেও প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থায় নারীদের সম্মান ও শিক্ষা নিশ্চিত ছিল। তিনি মেয়েদের জন্য গ্রামে গ্রামে পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করে তাদের মানুষ করতে বলেছেন। মেয়েরা মানুষ হলে তবে ভবিষ্যতে তাদের ছেলে মেয়েদের দ্বারা দেশের মুখ উজ্জ্বল হবে। এই জন্য তিনি একদল ব্রহ্মচারিণী গঠন করতে বলেছেন। যাঁরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে মেয়েদের শিক্ষা দেবেন।

আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড এবং জাপানের মত উন্নত দেশের অগ্রগতিতে তিনি নারীর সবিশেষ ভূমিকা লক্ষ করেছেন। তিনি ভারতবর্ষের নারীদের দুর্দশা দেখে অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন। সমাজে নারীর স্থান অবমূল্যায়ণের জন্য তিনি অশিক্ষাকে দায়ী করেছেন। তিনি বলেছেন, যে দেশ নারীকে শ্রদ্ধা করে না সেই দেশ বা জাতি কখনও বড়ো হতে পারে না। তিনি সীতা, সাবিত্রী ও দময়ন্তীর আদর্শে ভারতীয় নারীদের গড়ে তোলার কথা বলেছেন। তিনি নারী শিক্ষার একটি পরিকল্পনা করেছিলেন। মহিলাদের আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশের জন্য থাকবে নারী মঠ এবং বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম হবে ভারতীয় ধর্মশাস্ত্র, সাহিত্য, ব্যাকরণ, রন্ধন, সেলাই, সন্তান পালন, গার্হস্থ্যবিদ্যা সহ অন্যান্য শিক্ষা।

বিবেকানন্দ বলেছেন, নারীর শিক্ষাদীক্ষা এবং চরিত্র রামায়ণে বর্ণিত সীতাদেবীর মতো হওয়া উচিত। ভারতীয় নারীদের তিনি সীতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিজেদের উন্নতি বিধানের চেষ্টা করতে বলেছেন।

তিনি শাস্ত্রের উদ্ধৃতি ব্যাখ্যা করে বলেন পুত্রকে যতটা যত্নের সঙ্গো শিক্ষা দেওয়া হয়, কন্যাদেরও ততটা যত্নের সঙ্গো শিক্ষা দেওয়া উচিত।

ধর্ম শিক্ষা :

স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সংস্পর্শে আসেন এবং তার কাছ থেকে এক বিরাট আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী হন। সেই শক্তি বলেই তিনি ভারতের যোগ সাধনাকে নিয়ে এলেন এক নতুন পথে। দরিদ্র পরাধীন জাতির মুক্তির পথ উন্মেষনে তিনি উন্মুখ হয়ে ওঠেন। পরাধীন ভারতবাসীর আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি তাদের ধর্মীয় চেতনাকে জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন। তিনি ভারতীয় উপনিষদ ও বেদান্তের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা করেছেন এবং ভারতবাসীকে সেই উদ্দেশ্যে ধাবিত হতে আহ্বান জানান।

বিবেকানন্দ বলেছেন, "আমাদের মাতৃভূমির জাতীয় জীবনের মূল ভিত্তি হল ধর্ম। ইহাই আমাদের জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড।" ধর্ম হচ্ছে মানুষের ভেতরে যে ব্রহ্মত্ব প্রথম থেকে বর্তমান তার প্রকাশক। ধর্মের বাণী ও কর্মের বাণী নিয়ে বিবেকানন্দ ভারত ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন এবং অশিক্ষা, দারিদ্রতা এবং দুনীর্তির ভয়াবহতা স্বচক্ষে দেখেন। নরনারায়ণের সেবার জন্য তিনি তাঁর গুরুর নামে ১৮৯৭সালে কলকাতা 'রামকৃষ্ণ মিশন' স্থাপন করেন। এখানে তিনি তৈরী করতে চেয়েছিলেন একদল সর্বত্যাগী প্রচারক, যারা গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে বয়ে নিয়ে যাবে শিক্ষার আলো। ১৮৯৩ সালে আমেরিকার শিকাগো শহরে তিনি বিশ্বধর্ম সভায় হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেন। তিনি প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য ও আধ্যাত্মবাদের পুন:প্রতিষ্ঠা করেন। ধর্মশিক্ষার জন্য তিনি রামায়ণ, মহাভারত, উপনিষদ থেকে ছোটো ছোটো নীতিমূলক গল্প অনুবাদ করে শিশু শিক্ষার্থীদের পড়ানোর কথা বলেছেন।

শিক্ষা পদ্ধতি :

বিবেকানন্দ শিক্ষার পদ্ধতি হিসাবে স্বয়ংশিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। "No one was ever really tgaught by another. Each of us has to teach himself." শিশু তার নিজের নিয়মেই বিকাশলাভ করবে। জোর করে তাকে কিছু করানো যাবে না এবং তার এই বিকাশে সহায়তা করবে মনের কেন্দ্রীকরণ। যার মধ্যে এই ক্ষমতা যত বেশি হবে, সে তত জ্ঞান আহরণ করতে সক্ষম হবে। মনকে কেন্দ্রিভূত করে যে কোনো বস্তুর উপর প্রয়োগ করতে পারলেই তাকে লাভ করা যাবে। প্রাচীন গ্রীক দর্শনে এরূপ বাহ্যিক কেন্দ্রীকরণের কথা বলা হয়েছে। ভারতীয় যোগদর্শনেও অভ্যন্তরীণ কেন্দ্রিকরণের কথা বলা হয়েছে। বিবেকানন্দ বলেছেন ব্রহ্মচর্যের মাধ্যমে জৈবিক শক্তিকে আধ্যাত্মিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়, ফলে কেন্দ্রিকরণের জন্য অনেক শক্তি পাওয়া যায়। এছাড়া শিক্ষণের ক্ষেত্রে তিনি আত্মবিশ্বাসের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। অর্থাৎ একত্রে বলা যায়, আত্মবিশ্বাসের সঙ্গো মনকে কেন্দ্রিভূত করে আত্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে শিক্ষা করাই হল শিক্ষার মূল পদ্ধতি।

শিক্ষার পাঠ্যক্রম :

শিক্ষার পাঠ্যক্রম সম্পর্কে বিবেকানন্দ বিশেষ কিছু বলেননি। তবে তিনি ভারতবাসীর সাধারণ অবস্থার কথা চিন্তা করে তাদের জন্য সর্বজনীন গণশিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এই সর্বজনীন শিক্ষার জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে আলোচনা প্রসঙ্গো বিক্ষিপ্তভাবে যে পাঠ্যক্রমের কথা বলেছেন, তার মধ্যে তিনি জনগণের

আধ্যাত্মিক বিকাশের উপর গুরুত্ব দিয়ে ধর্মীয় শিক্ষা প্রবর্তনের কথা বলেছেন। তিনি সমস্ত কিছু শিক্ষা মাতৃভাষার মাধ্যমে দেওয়ার কথা বলেছেন এবং মাতৃভাষার চর্চার কথা বলেছেন।

এছাড়া তিনি বলেছেন, যেহেতু ভারতীয় চিন্তাভারার সব মূল গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় রচিত, সুতরাং সংস্কৃত চর্চার ব্যবস্থা রাখতে হবে পাঠ্যক্রমের মধ্যে। তাছাড়া কর্ম সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানসম্মত ধারণা দেবার ব্যবস্থা পাঠ্যক্রমে রাখার কথাও তিনি বলেছেন। তিনি আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার উন্নতিতে আস্থাবান ছিলেন এবং বিশ্বাস করতেন বিজ্ঞানের মাধ্যমেই মনুষ্যজীবনের কর্মক্ষমতা বাড়ানো যায়। তাই পাঠ্যক্রমে বিজ্ঞানকে রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। এছাড়া ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য ইত্যাদি পাঠের কথাও বলেছেন। তিনি তাঁর পাঠ্যক্রমের দ্বারা ভারতীয়দের একদিকে যেমন প্রাচীন ভারতীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছেন, অন্যদিকে তাদের বিজ্ঞানের জ্ঞান সরবরাহ করে পাশ্চাত্য দেশের কর্মক্ষমতার সমান অধিকারী করে গড়ে তুলতে চেয়েছেন।

সমাজসেবা ও শিক্ষা :

স্বামীজি বলেছেন শিক্ষার্থীর উৎসাহ ও কর্মশক্তি কেবলমাত্র অধ্যয়ন এবং আত্মোন্নতিতে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না, সমাজসেবার আদর্শে শিক্ষার্থীকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং তাদের সমাজসেবা মূলক কাজে নিয়োজিত করতে হবে। সেবার মনোভাব ব্যতীত শিক্ষা অসমাপ্ত থেকে যাবে। তাঁর এই সেবাধর্মের আদর্শ জনগণের মধ্যে এক জাতীয়তাবোধের জন্ম দিয়েছিল। ১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই স্বামী বিবেকানন্দ নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন।

মন্তব্য :

বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তা তাঁর বলিষ্ঠ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রতীক। তাঁর কাছে শিক্ষা শুধুমাত্র তথ্যের সমষ্টি নয়। কিংবা অভিজ্ঞতার চাপে শিক্ষার্থীর মস্তিষ্ককে ভারাক্রান্ত করে তোলাও নয়। তাঁর কাছে শিক্ষা হল এমন এক জীবনবিধি যার দ্বারা মানুষের চরিত্র সুগঠিত হয় ও মানুষ পরিপূর্ণ সত্ত্বার অধিকারী হয়। স্বামীজি পরাধীন ভারতবর্ষের জন্য এক সর্বার্থসাধক শিক্ষা পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন। দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ তাঁর সমস্ত শিক্ষাচিন্তার প্রেরণা জুগিয়েছিল। দরিদ্র, নিপীড়িত, হতভাগ্য ভারতবর্ষের আদর্শ শিক্ষার লক্ষ্য ও স্বরূপ কী হওয়া উচিত তা তিনি স্পষ্ট অনুভব করেছিলেন। সেজন্য তিনি গণশিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা ও শিল্পায়নের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন, বিবেকানন্দের শিক্ষা দর্শনের মধ্যে আমরা ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক মতবাদের সার্থক সমন্বয় দেখতে পাই। প্রকৃতপক্ষে তিনি নতুন ভারত গড়ের অন্যতম কারিগর ছিলেন।

পঞ্চম একক মহাত্মা গান্ধি (১৮৬৯ —১৯৪৮)

প্রস্তাবনা :

ভারতীয় জনজীবনে গান্ধীজির দান অপরিসীম। শুধু দেশকে বিদেশি শাসক সম্প্রদায় থেকে মুক্ত করার জন্য তাঁকে 'জাতির জনক' বলা হয় না। ভারতবাসীর নৈতিক, অর্থনৈতিক সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য তিনি তাঁর সম্পূর্ণ জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাই তাঁকে জাতির জনক বলা হয়। গান্ধীজির চিন্তাধারা তাঁর সমাজদর্শন ও জীবনদর্শন দ্বারা প্রভাবিত। গুজরাটের পোরবন্দরে গান্ধীজি ১৮৬৯ সালে ২রা অক্টোবর জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ছিলেন করমচাঁদ গান্ধী রাজকোটের দেওয়ান, মাতা পুতলীবাঈ গান্ধী ধর্মপ্রাণা নারী। তাঁর পুরো নাম হল মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী।

স্বাধীনতা যুদ্ধের নায়ক গান্ধীজি উপলব্ধি করেছিলেন যে, দেশের নাগরিকদের যদি শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া না হয়, তাহলে দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি আসবে না। তিনি তাঁর সমস্ত জীবন উৎসর্গ করেছিলেন ভারতবসারীর নৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য। গান্ধীজি পরিকল্পিত শিক্ষার মূল কথা হল অর্থের অভাবে কোন কাজ বন্ধ রাখা চলবে না। শিক্ষাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে সেই সমস্যার সমাধান করতে হবে। কেবলমাত্র পুঁথিপত্রের মধ্যে শিক্ষাকে আবদ্ধ রাখা চলবে না। এই আদর্শকে সামনে রেখে গান্ধীজি নতুন শিক্ষা পরিকল্পনা নেন, যার নাম দেওয়া হয়েছে বুনিয়াদী শিক্ষা। তিনি তাঁর শিক্ষাপরিকল্পনায় প্রাথমিকভাবে 'নঈ তালিম', 'সেবাগ্রাম প্রকল্প' ইত্যাদি বিভিন্ন নামে হরিজন পত্রিকায় পেশ করেন।

গান্ধীজির জীবনের দুটি আদর্শ ছিল, তা হল সত্য এবং অহিংসা। তিনি মনে করতেন সত্য এবং অহিংসা ছাড়া কিছুতেই মানবজাতি ও মানব সভ্যতাকে রক্ষা করা যাবে না। তাঁর স্বপ্নের সমাজ ছিল শ্রেণিহীন, শোষণহীন, অহিংসা ও বিকেন্দ্রীকৃত। প্রকৃতপক্ষে গান্ধীজি ছিলেন ব্যবহারিক বাস্তববাদী।

জীবনদর্শন :

আধ্যাত্মবাদকে কেন্দ্র করে গান্ধিজির জীবনদর্শন গড়ে উঠেছিল। তবে তাঁর আধ্যাত্মবাদের ভিত্তি ছিল সত্য এবং অহিংসা। তাঁর কাছে ঈশ্বরই হলেন চরম সত্যের প্রতীক। ঈশ্বরের বহি:প্রকাশ ঘটে সত্যের মাধ্যমে। আর এই সত্য অনুসন্ধানের উপায় হল অহিংসা। অহিংসার সাধনাই ছিল তাঁর জীবনের মূল আদর্শ। প্রকৃতপক্ষে, গান্ধিজি ছিলেন সত্যের পূজারি। সত্য প্রতিষ্ঠা করতে হলে চাই অনুকূল সমাজব্যবস্থা। আর এই সমাজের ভিত্তি রচিত হবে সাম্য, স্বাধীনতা, শান্তি, সুবিচার ইত্যাদির উপর। সেই জন্য গান্ধিজি মনেপ্রাণে 'সর্বোদয় সমাজ' প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। এই সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজ নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী বিকাশের সুযোগ পাবে। ভাববাদী দার্শনিক গান্ধিজির মতে, "I believe in the absolute oneness of God and therefore also of humanity" অর্থাৎ আমি ঈশ্বরের পরম একত্বকে বিশ্বাস করি এবং ফলে মানবতাকেও। তাঁর কাছে ঈশ্বর হলেন জীবন, সত্য, আলো, ভালোবাসা। "God is truth and truth is God." অর্থাৎ ঈশ্বর সত্য এবং সত্যই ঈশ্বর। একমাত্র আত্মোপলব্ধির মাধ্যমেই ঈশ্বরকে লাভ

করা সম্ভব। বিশ্বাস রাখতে হবে জীব তাঁরই অংশ। সূর্য রশ্মির উৎস যেমন সূর্য তেমনি এই বিশ্বের উৎস সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। ঈশ্বরকে তিনি সত্যেরই অভিব্যক্তি রূপে দেখেছেন। কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগের সুন্দর সমন্বয় ঘটেছে তাঁর জীবনে।

সমাজদর্শন :

গান্ধিজির জীবনদর্শনের উপর ভিত্তি করে তাঁর সমাজ দর্শন গড়ে উঠেছিল। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন জাতিকে সামগ্রিকভাবে উন্নত করতে হলে সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। তিনি মনে করতেন প্রতিটি মানুষ যদি পারস্পরিক আন্তরিকতা বজায় রেখে পাশাপাশি বসবাস করে তবেই সমাজের উন্নতি ঘটবে। তিনি এমন এক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন যেখানে প্রতিটি মানুষ তার নিজ নিজ বিকাশের সমান সুযোগ পাবে। এছাড়াও সামাজিক উন্নতির জন্য তিনি অর্থনৈতিক সাম্য স্থাপনের কথা বলেছেন। সবশেষে সমাজ জীবনের উন্নতির জন্য তিনি নাগরিকতা শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

গান্ধিজির শিক্ষাদর্শন :

গান্ধিজির শিক্ষাদর্শনকে প্রভাবিত করে ভাববাদ ও প্রয়োগবাদ। গান্ধিজির মতে “Education is an all round drawing out of the best in child and man body, mind and spirit” অর্থাৎ শিক্ষা হল অন্তর্নিহিত দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির পরিপূর্ণ প্রকাশ সকল শিশু এবং ব্যক্তির। শিক্ষার চরম লক্ষ্যই হল “The education should result not in material power but in spiritual force”. গান্ধিজি সর্বোদয় সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার অঙ্গ হিসাবে কর্মকেন্দ্রিক, সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা পরিকল্পনা করেছিলেন। গান্ধিজি শিক্ষাকে সত্যান্বেষণ এবং আত্মোপলব্ধির পন্থা হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি মনে করতেন যে, এইরূপ পরিকল্পনার মাধ্যমে যে ধরনের সুসামঞ্জস্য পূর্ণ মানুষ তৈরি হবে, তা সৃষ্টি করতে পারবে সর্বোদয় সমাজ। সর্বোদয় এমন একটি শব্দ যার অর্থ হল সকলের উন্নয়ন। গান্ধিজি তার জীবনদর্শনে এই শব্দটি ব্যবহার করেন। তার মতে রাজনীতি শক্তির কোন যন্ত্র নয়, এটি সেবার একটি সংস্থা। সর্বোদয় সমাজ একটি সমাজতান্ত্রিক সংস্থা, যা সত্যের প্রতীক। সর্বোদয় সমাজ সাম্য ও উদারনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, এখানে ভেদাভেদ ও হিংসার কোন জায়গা নেই। এটি অহিংসার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। যেহেতু গান্ধীজি পরিকল্পিত শিক্ষা সম্পাদিত হবে উৎপাদনি কাজের মধ্য দিয়ে, তাই নিজে থেকে কায়িক শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধা জাগবে। কায়িক শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ জাগ্রত হলে ব্যক্তির মধ্যে আত্মনির্ভরতা দেখা দেবে। তাঁর মতে শিক্ষা কেবলমাত্র বুদ্ধি বা শরীর অথবা হৃদয়ের বিকাশ নয়। এই তিনটির সমবিকাশই হলশিক্ষা। বস্তুতপক্ষে গান্ধীজির শিক্ষা দর্শন তাঁর জীবন দর্শন থেকে আলাদা নয়। আর এই শিক্ষাদর্শনের মূল তত্ত্ব হল জীবে প্রেম করা, জীবের সেবা করা।

শিক্ষার লক্ষ্য :

গান্ধিজির শিক্ষার লক্ষ্যে সমান প্রাধান্য দেয় ব্যক্তি উন্নয়ন ও সমাজ উন্নয়নের। তাই শিক্ষা বলতে গান্ধীজি ব্যক্তি অন্তর্নির্হিত নৈতিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক সকল রকম সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশকেই বুঝিয়েছেন। তিনি নাগরিকতার শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং তিনি মনে করতেন শ্রমবিমুখ ভারতবাসীকে প্রকৃত শিক্ষার দ্বারা শ্রমের প্রতি মর্যাদা দিতে শেখাতে হবে। তাই তিনি কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার

উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। গান্ধিজির কাছে শিক্ষার লক্ষ্য হল ব্যক্তিকে পার্থিব জগতের জন্য প্রস্তুত করা নয়, তার আধ্যাত্মিক শক্তির প্রকাশই হল শিক্ষার চরম লক্ষ্য ।চরম লক্ষ্য বস্তুতান্ত্রিক নয়। ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গো শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়াকেও শিক্ষার লক্ষ্য বলে তিনি স্থির করেন। বস্তুতপক্ষে তাঁর শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হল চরিত্র গঠন, হৃদয়ের শুচিতা, আধ্যাত্মিক চেতনাবোধ এবং পার্থিব জগতের উপযোগী প্রস্তুতি গ্রহণ। গান্ধিজি শিক্ষায় চরম লক্ষ স্থির করেও পাশাপাশি সেই সময়ের ভারতীয় পরিস্থিতি ও সমস্যাবলীর সচেতনতায় সামাজিক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাকেই সমাজের অগ্রগতির মূল হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। সেই হিসাবে শিক্ষার লক্ষ্য — ১) মর্যাদাবোধ জাগ্রত করা শ্রমের প্রতি। (২)অর্থনৈতিক উন্নয়নে উৎসাহিত করা। (৩) আত্মসংযম বোধ ও চারিত্রিক দৃঢ়তা জাগ্রত করা।

শিক্ষার পাঠ্যক্রম :

গান্ধিজির মতে শিক্ষা শিক্ষার্থীর জীবনের সঙ্গো সম্পর্কযুক্ত হওয়া দরকার। তাঁর মতে পাঠ্যক্রমে এমন সব বিষয় নির্বাচন করতে হবে যার সঙ্গো শিক্ষার্থীর সমাজ জীবনের সম্পর্ক আছে। ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়গুলো শিশুর সমাজ পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত ও উপস্থাপিত হবে। তিনি মাতৃভাষায় শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন এবং মাতৃভাষাকে পাঠদানের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি মনে করতেন হস্তশিল্পের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তিনি মনে করতেন হস্তশিল্পের মাধ্যমে একদিকে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন ঘটবে, অন্যদিকে শিক্ষার্থীদের কাজের প্রতি আগ্রহ ও শ্রদ্ধা জন্মাবে। গান্ধীজি প্রস্তাবিত পাঠ্যক্রমটি হল -

১) একটি মৌলিক শিল্প : সূতা কাটা, কাপড় বোনা, কাঠের কাজ, চামড়ার কাজ, কৃষি কাজ, ফল ও সব্জি চাষ, শিক্ষাগত মূল্যযুক্ত স্থানীয় উৎপাদনমূলক কাজ।

২) মাতৃভাষা।

৩) গণিত ।

৪) সমাজবিজ্ঞান : ভারতের ইতিহাস, ভূগোল, পৌরবিজ্ঞান, গ্রামীণ অর্থনীতি ইত্যাদির সমন্বয়ে একটি বিষয়।

৫) সাধারণ বিজ্ঞান : প্রকৃতিবিদ্যা, জীববিদ্যা, শারীরবিদ্যা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ইত্যাদি।

৬) চারুশিল্প : সংগীত ও অঙ্কন।

৭) হিন্দুস্থানের ভাষা : হিন্দি বা উর্দু।

পাঠ্যক্রমের এই কাঠামোটি ১৯৩৭সালে ড: জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে একটি কমিটির মাধ্যমে তৈরি হয় যাতে গান্ধিজিরও সমর্থন ছিল। জাকির হোসেন কমিটির পরিকল্পনা ওয়ার্ধা পরিকল্পনা যা পরবর্তীকালে বুনিয়াদী শিক্ষা নামে সর্বজনগ্রাহ্য হয়। পাঠ্যক্রমের আবশ্যিক হিসেবে চরকা কাটার ন্যূনতম দক্ষতা অর্জনকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়। বুনিয়াদী শিক্ষায় মাতৃভাষার উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়। তবে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবেও তিনি মাতৃভাষাকেই গ্রহণ করার কথাই বলেন। গান্ধিজির ভাষায়, "I wish to cling to mother tongue as to my mother's breast."

সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ পাওয়া যায় বুনিয়াদী শিক্ষায় হস্তশিল্পের উপর গুরুত্ব আরোপের ক্ষেত্র থেকেই। তিনি বলেন, 'কোন হস্তশিল্পকে ভিত্তি করেই আমি শিশুর শিক্ষার সূচনা করতে চাই, যেন শুরু

থেকে শিশু উৎপাদনমূলক কর্মে সামর্থ্য অর্জন করতে থাকে।' গান্ধিজির বিশ্বাস ছিল হস্তশিল্পই গ্রামের আর্থিক উন্নয়ন ঘটাবে, গ্রামজীবনে সুস্থ সম্পর্ক গড়ে তুলবে, কর্মের প্রতি আগ্রহ ও শ্রদ্ধা জন্মাবে। পাশাপাশি দায়িত্ববোধ, সহযোগিতামূলক মনোভাব ও সংহতির বিকাশ হবে। একমাত্র হস্তশিল্পই সুসম্পর্কের বুনিয়াদ সৃষ্টি করতে পারবে গ্রামীণ জীবন ও নগর জীবনের মধ্যে। ১৯৪৫ সালে বুনিয়াদী শিক্ষার অধিকতর গ্রহণযোগ্যতার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশিত হয় নঈতালিম শিক্ষা পরিকল্পনা। বুনিয়াদী পাঠ্যক্রমে সাত থেকে চৌদ্দ বছর বয়সের শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। বুনিয়াদী শিক্ষার মৌলিক আদর্শকে অপরিবর্তিত রেখেই গান্ধিজি মানুষের সর্বস্তরের শিক্ষার জন্যই 'নঈতালিম' পরিকল্পনা করেন। এই পরিকল্পনায় চারটি স্তর রাখা হয় এবং প্রত্যেকটি স্তরেই কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থা করা হয়।

চারটি স্তর : (১) প্রাক্-বুনিয়াদি শিক্ষা — ৭ বছরের নীর্চ পর্যন্ত শিশুদের জন্য।
(২) বুনিয়াদি শিক্ষা — ৭ থেকে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত
(৩) উত্তর-বুনিয়াদি শিক্ষা — ১৫ বছর ও তার উর্ধ্বে শিক্ষার্থীদের জন্য।
(৪) প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষা।

গান্ধিজি বিশ্বাস করতেন পাঠ্যক্রমই মূল হাতিয়ার যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন সম্ভব। সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন হলেই শিক্ষার্থীর সুসম্পর্ক স্থাপিত হবে সমাজের সঙ্গে। 'ব্যক্তিকে নিয়ে সমাজ এবং সমাজের মধ্যেই ব্যক্তি। অর্থাৎ একে অপরের পরিপূরক।' গান্ধিজির শিক্ষাদর্শন, জীবনদর্শন এবং গতিশীল দার্শনিক চিন্তাধারার মূল বক্তব্যই হল প্রগতির অন্যতম সোপান হল পাঠ্যক্রম বা শিক্ষাকাঠামো।

গান্ধিজির শিক্ষণ পদ্ধতি :

গান্ধিজি তাঁর শিক্ষণ পদ্ধতিতে অনুবদ্ধ প্রণালীকে প্রয়োগ করেছেন। তিনি বলেছেন, বিভিন্ন পাঠ্যবিষয় সম্পর্কিত জ্ঞান একটি মূল হস্তশিল্পকে কেন্দ্র করে শেখাতে হবে। তাঁর পদ্ধতি একদিকে যেমন সক্রিয়তার তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, অন্যদিকে তিনি অনুবদ্ধ প্রণালীকে বিশেষভাবে কাজে লাগিয়েছেন। সুতাকাটা একটি হস্ত শিল্প। এই হস্তশিল্পের মধ্য দিয়ে এর প্রধান উপাদান তুলা কোথায় উৎপাদন হয়, কি পরিবেশে তা হয়। কী প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সুতা তৈরী হয় প্রভৃতি শেখানোর মধ্য দিয়ে ইতিহাস, ভূগোল, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, কৃষিবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ের উপর জ্ঞান সঞ্চালন করা যেতে পারে। অনুবদ্ধ প্রণালীতে পাঠদান করলে শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তা এবং আগ্রহ বজায় থাকে। গান্ধিজির হস্তশিল্প ভিত্তিক অনুবদ্ধ শিক্ষাদান পদ্ধতি মনোবিদ্যার যুক্তি দ্বারা সমর্থিত । তিনি আরো বলেছেন হস্তশিল্পটি কি হবে তা নির্ভর করবে স্থানীয় প্রয়োজনীয় ভিত্তিক বিষয়ের উপর।

শিক্ষকের ভূমিকা :

শিক্ষাক্ষেত্রে সাফল্য নির্ভর করে শিক্ষকের উপর। এই ক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন। তাই গান্ধিজি বলেছেন, "We must procure the best teachers for our children, whatever it may cost." তিনি মনে করতেন শিক্ষার্থীরা বই অপেক্ষা শিক্ষকের কাছ থেকে অনেক বেশি শিখবে। গান্ধিজি বিবেকানন্দের ন্যায়, "Character building education"- এ বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি মনে করতেন সব রকমের শিক্ষার মূলকথা শিক্ষার্থীর চরিত্র গঠন। শিক্ষার্থীর উপর শিক্ষকের উল্লেখযোগ্য প্রভাব

সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের জীবন থেকে যে অনুপ্রেরণা লাভ করে, শিক্ষকের পাঠদানের বিষয় থেকে তা লাভ করে না। শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব ও আচরণ এমন হতে হবে যাতে শিক্ষার্থীর কাছে তিনি উদাহরণস্বরূপ হয়ে থাকেন।

ধর্মীয় শিক্ষা :

গান্ধিজি ধর্মীয় শিক্ষাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'ধর্ম ছাড়া জীবন আর নীতিহীন জীবন, রাডার ছাড়া জাহাজের ন্যায়'। গান্ধিজি ধর্ম বলতে কোনো মত বা ধর্মীয় সংস্কারকে বোঝাননি। তিনি বলেছেন "There is no religion higher than truth and righteousness".অর্থাৎ সত্য ও ন্যায়ের উপর কোনো ধর্ম হতে পারে না।

নারী শিক্ষা :

গান্ধিজি ভারতবর্ষে নারীদের অবস্থানকে বিশেষভাবে অনুভব করেছিলেন। বিশ্বের অন্যান্য প্রগতিশীল দেশের মত তিনি মেয়েদের উন্নতির চেষ্টা করেছিলেন। তিনি মনে করতেন কোন জাতির অগ্রগতির জন্য মেয়েদের শিক্ষা অপরিহার্য। গান্ধিজি বলেছেন, 'গৃহস্থজীবন নারীদের বিচরণ ক্ষেত্র। সুতরাং গৃহস্থজীবন, শিশু শিক্ষণ এবং লালনপালন সম্পর্কে নারীদের অধিক জ্ঞান থাকাই স্বাভাবিক। শুধু তাই নয়, তিনি পরীক্ষামূলকভাবে সহশিক্ষার কথাও বলেছেন। অর্থাৎ একই সঙ্গে ছেলে ও মেয়েদের একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ করার কথা তিনি বলেছেন।

বয়স্ক শিক্ষা :

বয়স্কশিক্ষার ক্ষেত্রে গান্ধীজির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বর্তমান। তিনি অনুভব করেছিলেন ভারতের আপামর জনসাধারণের শিক্ষা ব্যতিত দেশের অগ্রগতি সম্ভব নয়। তিনি বলেছেন, 'বয়স্ক শিক্ষা যে অর্থে ব্যবহৃত হয় তা আমি বলতে চাই না। আমি পিতা মাতার এমন শিক্ষা চাই যার দ্বারা তারা তাদের সন্তানদের মানুষ করতে পারেন। ভারতবর্ষের শতকরা আশি ভাগ লোক গ্রামে বসবাস করে। সুতরাং তাদের শিক্ষা বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। দেশের সামগ্রিক উন্নতির জন্য জনশিক্ষার প্রয়োজন।

বুনিয়াদী শিক্ষা :

মহাত্মা গান্ধি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কল্যাণ চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে দেশের শিক্ষা সম্বন্ধেও বহু চিন্তাভাবনা করেছিলেন। তাই দেশের শিক্ষাকে সহজ সুলভ ও কার্যকরী করার জন্য সুনির্ধারিত একটি শিক্ষা পরিকল্পনা ও তিনি দেশবাসির সামনে উপস্থিত করেছিলেন। এই শিক্ষা পরিকল্পনার নাম দেওয়া হয়েছে বুনিয়াদী শিক্ষা। কর্মের সঙ্গে জ্ঞানের এবং শিক্ষার সঙ্গে বাস্তব জীবনের সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে জীবনের যে বুনিয়াদ গঠিত হবে তাই হল বুনিয়াদী শিক্ষা।

এই শিক্ষাকে বুনিয়াদী বলা হয়েছে, কারণ এই শিক্ষা হবে স্বনির্ভর, স্বাবলম্বী, ভবিষ্যৎ জীবন গঠনের ভিত্তিভূমি, যার বুনিয়াদের উপর উঠবে পূর্ণ বিকশিত সার্থক জীবনের সফলতার ইমারত। বুনিয়াদী শিক্ষাদর্শনের মূল কথা হল সহযোগিতার ভিত্তিতে সমাজের পুণর্গঠন, শ্রেণিহীন শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার আশা ও আশ্বাস। বুনিয়াদী শিক্ষার মূলকথা হল কাজের মধ্য দিয়ে জ্ঞান আহরণ। গান্ধিজি অনুভব করেছিলেন

যে গ্রামের অতীত ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করতে হলে নতুন শিক্ষা পরিকল্পনার প্রয়োজন। তাই তিনি বলেছিলেন, "The scheme is a revolution in the education of the village children."

বুনিয়াদী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য :

ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষায় শিক্ষার্থীকে উৎপাদনশীল স্বয়ংসম্পূর্ণ নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার কোন ব্যবস্থা ছিল না। অথচ ভারতের মত দরিদ্র দেশে উৎপাদনধর্মী শিক্ষা ছাড়া অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব ছিল না। তাই গান্ধিজি পরিকল্পিত শিক্ষা উৎপাদনকেন্দ্রিক রূপ নেয়। এর বৈশিষ্ট্যগুলো হল—

১) ৭ থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত সমস্ত ছেলেমেয়েদের জন্য সার্বজনীন বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক শিক্ষা।

২) এই শিক্ষার বাহন হবে মাতৃভাষা।

৩) শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য ও স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী কোন একটি নির্দিষ্ট শিল্পকে কেন্দ্র করে সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালিত হবে।

৪) এই সমস্ত শিল্পকে কেন্দ্র করে তারা অর্থ উপার্জন করবে এবং নিজেদের শিক্ষার ব্যয় তারা নিজেরাই বহন করবে।

৫) এই শিক্ষায় শিক্ষার্থীকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একনাগাড়ে হাতের কাজ শেখানো হবে। শিশুর পরিবেশের দিকে লক্ষ্য রেখে এটি করা হবে। এই পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের নীতিকে বলা হয় অনুবন্ধ নীতি।

৬) পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য এবং নাগরিকতা শিক্ষা বুনিয়াদী শিক্ষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৭) যতদূর সম্ভব এখানে পাঠ্যপুস্তককে পরিহার করতে হবে।

৮) এই শিক্ষা ব্যবস্থায় সমাজ ও বিদ্যালয়ের মধ্যে সংযোগ সাধন হবে।

৯) এই ধরনের কাজে দৈহিক শ্রম ও জ্ঞানের সমন্বয় সাধন হবে।

বুনিয়াদী শিক্ষার উপযোগিতা :

১৯৩৭ সালে গান্ধিজি 'হরিজন' পত্রিকায় বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনাটি প্রথম প্রকাশ করেন। বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনাটি প্রগতিশীল। এই ধরনের শিক্ষার গতগুলো উপযোগিতা রয়েছে।— ১) এই পদ্ধতি কর্মের মাধ্যমে শিক্ষাদানের মূলনীতি স্বীকৃত হয়েছে এবং গতানুগতিক পুঁথিকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রভাবকে খর্ব করা হয়েছে।

২) সামাজিক উপযোগিতার বিচারে শিল্প নির্বাচন করার ফলে এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর সমাজ চেতনার বিকাশ ঘটে।

৩) এই পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা যে শিল্প দ্রব্য উৎপাদন করবে, তা থেকে তাদের শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ করতে পারবে।

৪) বুনিয়াদী শিক্ষার আর একটি সুবিধা হল এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে কাজের প্রতি স্বত:স্ফূর্ত আগ্রহের সৃষ্টি হয়। ফলে সে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পায়।

৫) এই পদ্ধতিতে কর্মের মাধ্যমে হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া হয় বলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ দেখা যায়।

৬) এই পদ্ধতিতে শিক্ষার সাথে জীবনের সংযোগ স্থাপিত হয় এবং শিক্ষার্থীরা বৃত্তির সাথে পরিচিত হবার সুযোগ পায়।

৭) এটি নাগরিকতার শিক্ষা দেয়। শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব ও কর্তব্যপরায়ন করে তোলে।

বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনার সীমাবদ্ধতা ও ব্যর্থতা :

বুনিয়াদী শিক্ষার একাধিক উপযোগিতা থাকা সত্ত্বেও তা সার্থক হতে পারেনি। কারণ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা পরিকল্পনা রচয়িতাগণ গান্ধিজির বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনাকে গুরুত্ব দেননি। বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনার ব্যর্থতার একাধিক কারণ রয়েছে। যেমন—

১) বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থাকে সচল রাখতে গেলে যে ধরনের অভিজ্ঞ শিক্ষকের প্রয়োজন তৎকালীন ভারতবর্ষে তার অভাব ছিল।

২) এই শিক্ষা পরিকল্পনা রূপায়নের জন্য অর্থেরও যথেষ্ট অভাব ছিল।

৩) সাংগঠনিক দিক থেকে এই শিক্ষা পরিকল্পনার মধ্যে অসুবিধা ছিল। কারণ উচ্চ বুনিয়াদী শিক্ষার পর শিক্ষার পরিকাঠামো কি হবে তা স্পষ্ট বলা ছিল না।

৪) বুনিয়াদী শিক্ষায় শিক্ষার্থীর সক্রিয়তাকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে অন্যান্য বিষয়গুলো সম্পর্কে জ্ঞানার্জন অবহেলিত হয়ে পড়ে।

৫) কর্মের প্রতি অধিক গুরুত্ব দিতে গিয়ে শিক্ষার্থীর কাছে কর্মটাই মুখ্য হয়ে পড়ে। আর শিক্ষা তার কাছে গৌণ হয়ে যায়।

৬) এখানে যে শিল্প শিক্ষার কথা বলা হয়েছে তা ছিল সম্পূর্ণভাবে যান্ত্রিক, এর পেছনে কোন বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি ছিল না।

৭) এখানে Liberal Education-কে একেবারে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

মন্তব্য : গান্ধিজি তৎকালীন ভারতে সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনাটি চরনা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর শিক্ষা ব্যবস্থা ভারতের শিক্ষা ক্ষেত্রে আজও স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। তাঁর শিক্ষানীতির অন্তরালে যে জীবন দর্শন ও সমাজদর্শন আছে তাকে যথাযথ উপলব্ধি করতে না পারলে তাঁর চিন্তা ধারাকে সঠিকভাবে বোঝা যাবেনা। মহাত্মা গান্ধি ৩০শে জানুয়ারী ১৯৪৮ সালে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান।

বুনিয়াদী শিক্ষার কিছু কিছু সমালোচনা সত্বেও এই শিক্ষা তৎকালীন সময়ে জনগণের মধ্যে জাতীয় চেতনাবোধ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল। বস্তুতপক্ষে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তার শিক্ষাচিন্তা নিয়ে আর নতুন করে গবেষণা না হওয়ার জন্যই এই শিক্ষা যুগের দাবি মেটাতে পারেনি। তবে একথা নি:সন্দেহে বলা যায় যে, তাঁর শিক্ষা ছিল যথেষ্ট বাস্তবধর্মী। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার বাস্তব উদাহরণ ছিল তাঁর বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থাটি। তিনি অনুধাবন করেছিলেন যে, শিল্পকে কেন্দ্র করে শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত হলে শিক্ষার্থীরা হাতে কলমে কাজ করার সুযোগ পাবে, শ্রমের প্রতি মমত্ববোধ জাগ্রত হবে, বৌদ্ধিক বিকাশ ঘটবে এবং সামাজিক চেতনাবোধ জাগ্রত হবে। প্রকৃতপক্ষে, গান্ধিজি যে জীবনদর্শন এবং সমাজ দর্শনের উপর ভিত্তি করে বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন তার অন্তর্নিহিত ভাবটি দেশবাসী সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারেনি।

সারাংশ

প্রথম একক : রাজা রামমোহন রায়

বহুযুগব্যাপী অন্ধতার দিনে দেশ যখন নিশ্চলতাকেই পবিত্রতা বলে স্থির করে নিস্তব্ধ ছিল, এমন সময়েই ভারতবর্ষে রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাব ঘটে। তিনিই প্রথন অন্ধ মূঢ়তার অচলায়তনে যুক্তির নির্মল আলোক ও মুক্তির বাতাস সঞ্চারিত করেছিলেন।

রাজা রামমোহন রায়ের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ইংরেজী শিক্ষা বা পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যমেই এদেশে নবজাগরণ আসবে। তাঁর স্বপ্ন ছিল ঘুনেধরা ভারতীয় সমাজ ও জীবনধারায় গতি সঞ্চার করতে, প্রানের নতুন প্রবাহ এনে দিয়ে এবং ভারতবাসীর জন্য বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বার প্রশস্ত ও উন্মুক্ত করে ভারতবর্ষকে ইউরোপের অন্যান্য প্রগতিশীল জাতির সমপর্যায়ে উন্নতি করতে। তাই তিনি আধুনিক ভারতের পথ প্রদর্শক বা 'ভারত পথিক' হিসাবে খ্যাত হন।

লর্ড বেন্টিক যখন সতীদাহ প্রথা বন্ধ করার উদ্যোগী হলেন, তখনকার রক্ষণশীল সমাজের কর্ণধারগণ প্রতিবাদের ঝড় তোলেন। কিন্তু রামমোহন দৃঢ়ভাবে লর্ড বেন্টিংক-এর সমর্থনে এগিয়ে আসেন। রামমোহন হিন্দু সমাজের জাতিভেদ প্রথারও বিরোধী ছিলেন। এ বিষয়ে দেশের মানুষকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য তিনি ওই প্রথার বিরুদ্ধে লেখা বৌদ্ধ মহাযান সম্প্রদায়ের গ্রন্থ 'বজ্রসূচির' অনুবাদ প্রকাশ করেন। রাজা রামমোহন রায় বহুবিবাহ বাল্যবিবাহ প্রথার ঘোরতার বিরোধী ছিলেন এবং এই সব প্রথার কুপ্রভাব সম্পর্কে দেশবাসীকে সচেতন করার জন্য তাঁর সম্পাদিত 'সম্বাদ কৌমুদী' পত্রিকায় নিয়মিত প্রবন্ধ প্রকাশ করতেন।

রাজা রামমোহনের মতে শিক্ষার লক্ষ্য হবে জাগতিক ও সামাজিক কল্যান সাধন করা। শিক্ষার মাধ্যমে একটি পরিশীলিত ও যুক্তিবাদী মনের জন্ম হোক এই ছিল তাঁর লক্ষ্য।

রামমোহন রায় অনুভব করেছিলেন যে, ভারতে সত্যিকারের উন্নতি নির্ভর করছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সমন্বয়ের উপর। তিনি হিন্দুধর্ম বা সংস্কৃতিকে ত্যাগ করেননি, পাশ্চাত্যের ভালো দিকগুলো গ্রহণ করে তিনি নিজের দেশের সংস্কৃতির ভাণ্ডারকে পুষ্ট ও সমৃদ্ধ করতে চেষ্টা করেন। রাজা রামমোহন রায়ের এই নতুন শিক্ষার ধারণা ভারতের শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে এক বিপ্লব এনেছিল।

স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে রাজা রামমোহন রায়ের অবদান ছিল অসমান্য। নারীকে অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে শিক্ষার আলোকে উদ্ভাসিত করার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অগ্রণী। নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে যেকোনো উদ্যোগকেই তিনি সাদরে গ্রহণ করেন। হিন্দুদের মধ্যে স্ত্রী শিক্ষার বিস্তারে রাজা রামমোহন রায়ের কৃতিত্ব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সংবাদপত্র প্রকাশনার ক্ষেত্রে রাজা রামমোহন রায়ের মুন্সীয়ানার পরিচয় দেন। তাই রাজা রামমোহন রায়কে 'আধুনিক ভারতীয় সাংবাদিকতার জনক' বলা যায়। তাঁর সম্পাদনায় ১৮২১ সালে 'সম্বাদ কৌমুদী' এবং ১৮২২ সালে মিরাৎ-উল-আখবার' প্রকাশিত হয়। এছাড়া ইংরেজী পত্রিকা Bengal Herald ১৮২৯

সালে প্রকাশিত হয়। এই সব পত্রিকাগুলোতে সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা, অর্থনীতি, রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ক প্রবন্ধ আলোচনা ও সংবাদ প্রকাশ করা হত।

১৮১৭ সালে গঠিত হিন্দু কলেজ কমিটি থেকে সরে গিয়ে রামমোহন বাঙ্গালী হিন্দু ছেলেদের ইংরেজি শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ১৮২২ সালে 'Anglo Hindu School' স্থাপন করেন।

রাজা রামমোহন রায়ের বিভিন্ন প্রগতিশীল চিন্তার মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য দিকগুলো হল: ১) ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসার বিরুদ্ধে আন্দোলন। ২) সেনাবাহিনীতে ভারতীয়করণ ৩)জুরি প্রথার প্রবর্তন ৪) শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের মধ্যে পৃথকীকরণ ইত্যাদি। এই দিকগুলোর প্রতিষ্ঠার জন্য রামামোহন যা করেছিলেন সেই যুগে তাঁর আগে আর কেউ করেন নি।

ধর্মীয় সংস্কারের মূল অঙ্গ হিসাবে হিন্দু সমাজের গোঁড়ামি, সুসংস্কার ও পৌত্তলিকতাবাদের বিরুদ্ধে রাজা রামমোহন রায় আন্দোলন শুরু করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৮১৫ সালে কলকাতায় তাঁর বন্ধু ও অনুগামীদের নিয়ে 'আত্মীয় সভা' প্রতিষ্ঠা করেন।

রাজা রামমোহন রায় ভারতের ইতিহাসে এক নবযুগের প্রবর্তক রূপে দেখা দেন। বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন রাজা রামমোহন রায় উনিশ শতকের ভারতের নবজাগরণের পুরোধা ছিলেন। দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে তিনি ভারতের শতাব্দী সঞ্চিত কু-শিক্ষা, অজ্ঞতা কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস জঞ্জাল পরিষ্কারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এইজন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে 'ভারত পথিক' বলে অভিহিত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে যে প্রগতিশীল ভারতকে আমরা এখন দেখছি। এই নব ভারতের ভাবমূর্তির অন্যতম ভাস্কর ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। রাজা রামমোহন রায় শিক্ষা, রাজনীতি, ধর্ম, সাহিত্য, সমাজ সংস্কার ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে তাঁর স্থায়ী ছাপ রেখে গেছেন। রামমোহনের নতুন শিক্ষার ধারণা ভারতের শিক্ষার ক্ষেত্রে সত্যিকারের বিপ্লব এনেছিল এবং প্রকৃতপক্ষে ভবিষ্যতের নবীন প্রগতিশীল ভারতের জন্ম দিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় একক : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

"তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ'—এই কথাটি উনবিংশ শতকের কীর্তিমান মনিষীদের মধ্যে যার সম্বন্ধে বেশি সত্য, তিনি হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

শিক্ষার স্বরূপ ও লক্ষ্য সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতামত হল যে,"ভারতীয়গণের শিক্ষার লক্ষ্য হবে সংস্কৃত ও ইংরাজি জ্ঞানের উপর পর্যাপ্ত অধিকার অর্জন করা এবং তার দ্বারা এমন সব মানুষ তৈরি করা, যারা আমাদের পাশ্চাত্য জগতের সভ্যতা ও বিজ্ঞানের দ্বারা আমাদের মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ করতে সমর্থ হবে।" তাঁর শিক্ষানীতি বিশ্লেষণ করলে যে মৌলিক দিক্‌টি আমাদের সামনে সুস্পষ্ট রূপে ফুটে ওঠে তা হল এই যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ছিল তাঁর জীবনের প্রধান ও প্রথম লক্ষ্য।

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের অবদানই অবশ্য ইতিহাসের বিচারে সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য। বিদ্যাসাগরেব সময়ে এদেশে প্রাথমিক শিক্ষা ছিল ভীষণভাবে অবহেলিত। বাংলাদেশে অসংখ্য দেশীয় পাঠশালাগুলোর অবস্থা শোচনীয় ছিল। এই সব দেশীয় পাঠশালাগুলোর সংস্কার সাধনের জন্য বিদ্যাসাগর শিক্ষা পরিষদের সভাপতি এফ্. জে.মোয়াট-এর মাধ্যমে একটি প্রতিবেদন পেশ করেন। ওই প্রতিবেদনে সবার আগে গণশিক্ষার কথা, প্রাথমিক স্কুল গঠন করা, পাঠ্য বই রচনা করা, শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষক-শিক্ষণ ইত্যাদি কথার উল্লেখ ছিল।

বিদ্যাসাগরের জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তাই সংস্কৃত কলেজের দরজা তিনি অব্রাহ্মণ শিক্ষার্থীদের জন্য খুলে দিয়েছিলেন। তাই সংস্কৃত কলেজের দরজা তিনি অব্রাহ্মণ শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান কাজকে মহৎ আদর্শ বলে গ্রহণ করেছিলেন। সর্বসাধারণের শিক্ষার জন্য তিনি পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। মানুষের প্রতি ছিল তাঁর অকৃত্রিম মমত্ববোধ। মানবতাবোধ থেকেই তিনি শিক্ষা সংস্কারে প্রেরণা পেয়েছিলেন। ঈশ্বরের আরাধণার পরিবর্তে তিনি মানুয়ের আরাধনা করেছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর নারী প্রগতি প্রসঙ্গো বিদ্যাসাগরের অন্যতম উল্লেখযোগ্য এবং গৌরবোজ্জ্বল কাজ হল বাংলাদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের জন্য তাঁর আন্তরিক প্রচেস্টা। আধুনিকতার জাগ্রত প্রতিমূর্তি বিদ্যাসাগর উপলব্ধি করেছিলেন যে, শিক্ষা ব্যতিত নারী সমাজের মুক্তি নাই। চিরাচরিত কুসংস্কারকে দূরে সরিয়ে দিয়ে তিনি স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে উদ্যোগী হন।

বিদ্যাসাগর শুধু বাংলা তথা ভারতের প্রাণকেন্দ্র কলকাতার মধ্যবিত্ত সমাজে নারী শিক্ষার প্রতি গভীর আগ্রহ সৃষ্টি করেন নি, বাংলার পল্লী অঞ্চলেও নারী শিক্ষার ক্ষেত্র প্রস্তুত ও বিস্তার করেছিলেন। ১৮৫৭ সালে বিদ্যাসাগর নিজে জৌগ্রামে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বাংলার প্রথম ছোটো লাট হ্যালিডে সাহেবের সহযোগিতায় এবং বিদ্যাসাগরের প্রচেস্টায় ১৮৫৮ সালে মেদিনীপুর জেলায় ৩টি, বর্ধমান জেলায় ১১টি, হুগলী জেলায় ২০ টি এবং নদীয়া জেলায় একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

তাঁর প্রচেস্টায় ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ বিধিবন্ধ হল। এটি তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ একটি কাজ। বাল্য বিবাহ নিবারণ ও তাঁর অন্যতম কীর্তি। বাল্য বিবাহ ও বহু বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক ব্যাধিগুলোর বিরুদ্ধে তিনি জোরালো প্রতিবাদ করেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের অন্যতম অবদান হল তার সাহিত্য কীর্তি । বাংলা গদ্যের বিকাশে তাঁর অবদান অসামান্য জনগণের সুবিধার জন্য তিনি বাংলা বর্ণমালার সংস্কার করেন। তাঁর লেখা প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তকগুলো গণশিক্ষা গণস্বাক্ষরতার সহায়ক হয়েছিল। বংলা ভাষাকে ঘষে মেজে তিনি একে উন্নত চিন্তার বাহণ করে তোলার জন্য চেস্টা করেন, তিনি প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী নানা পুস্তক রচনা করেছিলেন। তাঁর লেখা 'কথামালা' ও 'বোধোদয়' বাংলা শেখার সবচেয়ে সহজ পথ নির্দেশ করতে পেরেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন," বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন"।

ইংরেজি শিক্ষা সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের দৃঢ় অভিমত ছিল যে, বাংলা ভাষাও সাহিত্যের উন্নতি তখনই সম্ভব হবে, যদি এরই সঙ্গো ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন করা যায়। এইজন্য তিনি সংস্কৃত কলেজের পুনর্গঠনের সময় সংস্কৃত-চর্চার সঙ্গো সঙ্গো ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য পঠন-পাঠনেরও ব্যবস্থা করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের একটি বড়ো কীর্তি হল 'মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটিউশন' নামক একটি বিদ্যালয় স্থাপন। বর্তমানে এই বিদ্যাসাগর কলেজ নামে পরিচিত।

বর্ণ পরিচয়ের মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তারের প্রচেস্টা যে শুধু ভারতীয় শিক্ষাকে প্রভাবিত করেছিল তা নয়, তৎকালীন শিক্ষানীতিকেও প্রভাবিত করেছিল। সর্বোপরি তাঁর অন্যতম কীর্তি হল প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষার মাধ্যমে পঠন-পাঠনও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার সমন্বয়ে তিনি বাংলার নবজাগরণকে সফলতার দিকে

এগিয়ে নিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছিলেন। আক্ষরিক অর্থে তিনিই হলেন প্রথম আধুনিক বাঙালী। প্রকৃতপক্ষে বাংলার ঘোর অন্ধকার দিনে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব এক বিস্ময়কর ঘটনা।

তৃতীয় একক : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ উপনিষদীয় চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন সৃষ্টির মূলে আছে এক সর্বব্যাপী আধ্যাত্মিক শক্তি। এই শক্তি সৃষ্টির মধ্যেই সতত প্রকাশমান এবং সবকিছুর মধ্যেই এই সত্ত্বা প্রকাশিত। একে তিনি বলেছেন 'বিশ্বচেতনা'।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন তাঁর জীবনদর্শন দ্বারা প্রভাবিত। তিনি মূলত কবি, কিন্তু মানবজীবনের এমন কোনো অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র নেই, যেখানে তাঁর চিন্তার ছোঁয়া লাগেনি। মানব অভিজ্ঞতার বিভিন্ন দিকের উপর তিনি প্রভাব বিস্তার করে গেছেন। তাঁর শিক্ষা চিন্তা শুধুমাত্র তত্ত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, তিনি নিজেই তার প্রয়োগ করে গেছেন। তাঁর শিক্ষাতত্ত্ব বিশেষভাবে বাস্তববাদী।

পাঠের বোঝা বইতে বইতে আমাদের দেশের শিশুরা যে স্বাস্থ্য সম্পদ হারিয়েছে তা নিয়ে কবির দু:খের অন্ত নেই। তাই তিনি শিক্ষার্থীদের দৈহিক বিকাশের উপর জোড় দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথর মতে, যে সর্বব্যাপী পরমসত্তা ছায়ার মতো আমাদের সহগামী তাঁকে উপলধ্বি করাই সকল প্রকার শিক্ষার উদ্দেশ্য। তাই আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি শান্তি নিকেতনের শিক্ষা পরিকল্পনায় প্রাধান্য পেয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ নির্দিষ্ট কোনো শিক্ষণ পদ্ধতির কথা বলেন নি। তবে তিনি ইন্দ্রিয়ানুশীলন, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ, সৃজনধর্মী কাজকর্ম প্রভৃতির মাধ্যমে ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়ার কথা বলেছেন। শ্রেণি শিক্ষণের গতানুগতিক প্রথার পরিবর্তে তিনি প্রকৃতির খোলা আকাশের নীচে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থাকেই উপযুক্ত বলে বিবেচনা করেছেন। তাঁর মতে শিক্ষক যদি উৎসাহী ও গুণসম্পন্ন হন, তবে প্রয়োজন মত তিনি নিত্য নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন করবেন। তিনি প্রাচীন তপোবনের শিক্ষার দ্বারা প্রভাবতি হয়েছিলেন।

শিক্ষার বাহন হিসাবে রবীন্দ্রনাথ মাতৃভাষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে গিয়ে তিনি মাতৃভাষাকে মাতৃদুগ্ধের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

জনশিক্ষার দিকেও রবীন্দ্রনাথের সজাগ দৃষ্টি ছিল, তিনি জানতেন যে ভারতের অগণিত জনসাধারণ জ্ঞানের আলোক থেকে বঞ্চিত। তাঁর মতে শিশুর শিক্ষা শুরু হবে তার পরিবার থেকে। গ্রামের পাঠাগারগুলোকে তিনি জনশিক্ষা প্রসারের কেন্দ্ররূপে গড়ে তোলার কথা বলেছেন।

রবীন্দ্রনাথ আজীবন বিশ্বমানবিকতার আরাধনা করে গেছেন। তিনি চেয়েছিলেন যে মানুয়ের প্রতি মানুষের ভালোবাসা যেন জাতীয়তা ও স্বদেশিকতাবোধের গন্ডি অতিক্রম করে তা আন্তর্জাতিকতা বোধে উন্নীত হতে পারে ।

রবীন্দ্রনাথ গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থার বিরোধিতা করেই থেমে থাকেন নি। তাঁর শিক্ষা চিন্তাকে বাস্তবে প্রয়োগ করার জন্য তিনি ১৯০১ সালে শান্তিনিকেতনে আশ্রমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

চতুর্থ একক : স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় চিন্তাজগতে বিভিন্ন দিক থেকে আলোড়ন আনার চেষ্টা করেন। আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণার ফলে তিনি যে কেবল ঈশ্বর চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন তা নয়, পরাধীন ভারতবাসীর আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি তাদের ধর্মীয় চেতনাকে জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন।

সত্যের খোঁজে-ঈশ্বরের খোঁজে আকুল হয়ে বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসেন। দক্ষিণেশ্বরে মাতৃমূর্তির কাছে অর্থ-সম্পদ কামনা করতে গিয়ে তিনি চেয়ে বসেন শ্রদ্ধা-ভক্তি-জ্ঞান। রামকৃষ্ণদেবের সংস্পর্শে এসে তিনি এক বিরাট আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী হন। আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণার ফলে তিনি যে কেবল ঈশ্বর চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন তা নয়, পরাধীন ভারতবাসীর আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি তাদের ধর্মীয় চেতনাকে জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন।

দার্শনিক তত্ত্বের দিক থেকে বিবেকানন্দ ছিলেন ভাববাদী দার্শনিক। শিক্ষায় সংজ্ঞায় তিনি বলেছেন "Education is the manifestation of perfection already in man." তাঁর মতে জ্ঞান মানুষের অন্তরের জিনিস। বাইরে থেকে জ্ঞান আসে না। মানুষের মনই হল বিশ্বপ্রকৃতির জ্ঞানের ভাণ্ডার, সেখানেই সমস্ত জ্ঞান সঞ্চিত থাকে।

বিবেকানন্দ শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করতে দিয়ে আধ্যাত্মিক চেতনার সঙ্গে সমাজতেনতার সমন্বয় সাধন করেছেন। তাই তিনি মনুষ্যত্বের শিক্ষার (Man-Making Education) কথা বলেছেন। শিক্ষার লক্ষ্য শুধু কতকগুলো তথ্য পরিবেশন করা নয়, ব্যক্তির অন্তর্নিহিত শক্তিকে যথার্থ সমাজ পথে পরিচালিত করাই হল শিক্ষার লক্ষ্য।

বিবেকানন্দ শিক্ষিত যুবকদের গ্রামে গিয়ে দেশের লোকদের আধুনিক বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য, ধর্ম শিক্ষা দিতে বলেছেন। স্বামীজি যথার্থই মনে করতেন, জনশিক্ষা প্রসারের ফলে এক নতুন ভারত জন্ম নিক।' নতুন ভারত বেরুক কৃষকের লাঙল ধরে, চামারের কুটির ভেদর করে, জেলে মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক ঝোপ-জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে।'

স্বামী বিবেকানন্দ নারী শিক্ষার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি মেয়েদের জন্য গ্রামে গ্রামে পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করে তাদের মানুষ করতে বলেছেন। মেয়েরা মানুষ হলে তবে ভবিষ্যতে তাদের ছেলে মেয়েদের দ্বারা দেশের মুখ উজ্জ্বল হবে। এই জন্য তিনি একদল ব্রহ্মচারিণী গঠন করতে বলেছেন। যাঁরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে মেয়েদের শিক্ষা দেবেন।

সমাজে নারীর স্থান অবমূল্যায়ণের জন্য তিনি অশিক্ষাকে দায়ী করেছেন। তিনি বলেছেন, যে দেশ নারীকে শ্রদ্ধা করে না সেই দেশ বা জাতি কখনও বড়ো হতে পারে না।

নরনারায়ণের সেবার জন্য তিনি তাঁর গুরুর নামে ১৮৯৭সালে কলকাতা 'রামকৃষ্ণ মিশন' স্থাপন করেন। এখানে তিনি তৈরী করতে চেয়েছিলেন একদল সর্বত্যাগী প্রচারক, যারা গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে বয়ে নিয়ে যাবে শিক্ষার আলো। ১৮৯৩ সালে আমেরিকার শিকাগো শহরে তিনি বিশ্বধর্ম সভায় হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেন। তিনি প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য ও আধ্যাত্মবাদের পুন:প্রতিষ্ঠা করেন। ধর্মশিক্ষার জন্য

তিনি রামায়ণ, মহাভারত, উপনিষদ থেকে ছোটো ছোটো নীতিমূলক গল্প অনুবাদ করে শিশু শিক্ষার্থীদের পড়ানোর কথা বলেছেন।

বিবেকানন্দ শিক্ষার পদ্ধতি হিসাবে স্বয়ংশিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। “No one was ever really tgaught by another. Each of us has to teach himself.” শিশু তার নিজের নিয়মেই বিকাশলাভ করবে। জোর করে তাকে কিছু করানো যাবে না এবং তার এই বিকাশে সহায়তা করবে মনের কেন্দ্রীকরণ। যার মধ্যে এই ক্ষমতা যত বেশি হবে, সে তত জ্ঞান আহরণ করতে সক্ষম হবে। মনকে কেন্দ্রিভূত করে যে কোনো বস্তুর উপর প্রয়োগ করতে পারলেই তাকে লাভ করা যাবে।

তিনি আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার উন্নতিতে আস্থাবান ছিলেন এবং বিশ্বাস করতেন বিজ্ঞানের মাধ্যমেই মনুষ্যজীবনের কর্মক্ষমতা বাড়ানো যায়। তাই পাঠ্যক্রমে বিজ্ঞানকে রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। এছাড়া ইতিহাস, ভুগোল, সাহিত্য ইত্যাদি পাঠের কথাও বলেছেন। তিনি তাঁর পাঠ্যক্রমের দ্বারা ভারতীয়দের একদিকে যেমন প্রাচীন ভারতীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছেন, অন্যদিকে তাদের বিজ্ঞানের জ্ঞান সরবরাহ করে পাশ্চাত্য দেশের কর্মক্ষমতার সমান অধিকারী করে গড়ে তুলতে চেয়েছেন।

বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তা তাঁর বলিষ্ঠ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রতীক। তাঁর কাছে শিক্ষা শুধুমাত্র তথ্যের সমষ্টি নয়। কিংবা অভিজ্ঞতার চাপে শিক্ষার্থীর মস্তিষ্ককে ভারাক্রান্ত করে তোলাও নয়। তাঁর কাছে শিক্ষা হল এমন এক জীবনবিধি যার দ্বারা মানুষের চরিত্র সুগঠিত হয় ও মানুষ পরিপূর্ণ সত্ত্বার অধিকারী হয়।

সেজন্য তিনি গণশিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা ও শিল্পায়নের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন, বিবেকানন্দের শিক্ষা দর্শনের মধ্যে আমরা ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক মতবাদের সার্থক সমন্বয় দেখতে পাই। প্রকৃতপক্ষে তিনি নতুন ভারত গড়ের অন্যতম কারিগর ছিলেন।

পঞ্চম একক : মহাত্মা গান্ধী

ভারতীয় জনজীবনে গান্ধীজির দান অপরিসীম। শুধু দেশকে বিদেশি শাসক সম্প্রদায় থেকে মুক্ত করার জন্য তাঁকে ‘জাতির জনক’ বলা হয় না। ভারতবাসীর নৈতিক, অর্থনৈতিক সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য তিনি তাঁর সম্পূর্ণ জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাই তাঁকে জাতির জনক বলা হয়।

গান্ধীজির জীবনের দুটি আদর্শ ছিল, তা হল সত্য এবং অহিংসা। তিনি মনে করতেন সত্য এবং অহিংসা ছাড়া কিছুতেই মানবজাতি ও মানব সভ্যতাকে রক্ষা করা যাবে না। তাঁর স্বপ্নের সমাজ ছিল শ্রেণিহীন, শোষণহীন, অহিংসা ও বিকেন্দ্রীকৃত। প্রকৃতপক্ষে গান্ধীজি ছিলেন ব্যবহারিক বাস্তববাদী।

প্রকৃতপক্ষে, গান্ধিজি ছিলেন সত্যের পূজারি। সত্য প্রতিষ্ঠা করতে হলে চাই অনুকূল সমাজব্যবস্থা। আর এই সমাজের ভিত্তি রচিত হবে সাম্য, স্বাধীনতা, শান্তি, সুবিচার ইত্যাদির উপর। সেই জন্য গান্ধিজি মনেপ্রাণে ‘সর্বোদয় সমাজ’ প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। এই সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজ নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী বিকাশের সুযোগ পাবে।

সর্বোদয় এমন একটি শব্দ যার অর্থ হল সকলের উন্নয়ন। গান্ধিজি তার জীবনদর্শনে এই শব্দটি ব্যবহার করেন। তার মতে রাজনীতি শক্তির কোন যন্ত্র নয়, এটি সেবার একটি সংস্থা। সর্বোদয় সমাজ

একটি সমাজতান্ত্রিক সংস্থা, যা সত্যের প্রতীক। সর্বোদয় সমাজ সাম্য ও উদারনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, এখানে ভেদাভেদ ও হিংসার কোন জায়গা নেই। আধ্যাত্মিক শক্তির প্রকাশই হল শিক্ষার চরম লক্ষ্য ।

গান্ধিজির মতে শিক্ষা শিক্ষার্থীর জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়া দরকার। তাঁর মতে পাঠ্যক্রমে এমন সব বিষয় নির্বাচন করতে হবে যার সঙ্গে শিক্ষার্থীর সমাজ জীবনের সম্পর্ক আছে। ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়গুলো শিশুর সমাজ পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত ও উপস্থাপিত হবে। তিনি মাতৃভাষায় শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন এবং মাতৃভাষাকে পাঠদানের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি মনে করতেন হস্তশিল্পের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তিনি মনে করতেন হস্তশিল্পের মাধ্যমে একদিকে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন ঘটবে, অন্যদিকে শিক্ষার্থীদের কাজের প্রতি আগ্রহ ও শ্রদ্ধা জন্মাবে।

গান্ধিজি তাঁর শিক্ষণ পদ্ধতিতে অনুবন্ধ প্রণালীকে প্রয়োগ করেছেন। তিনি বলেছেন, বিভিন্ন পাঠ্যবিষয় সম্পর্কিত জ্ঞান একটি মূল হস্তশিল্পকে কেন্দ্র করে শেখাতে হবে। তাঁর পদ্ধতি একদিকে যেমন সক্রিয়তার তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, অন্যদিকে তিনি অনুবন্ধ প্রণালীকে বিশেষভাবে কাজে লাগিয়েছেন।

অনুবন্ধ প্রণালীতে পাঠদান করলে শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তা এবং আগ্রহ বজায় থাকে। গান্ধিজির হস্তশিল্প ভিত্তিক অনুবন্ধ শিক্ষাদান পদ্ধতি মনোবিদ্যার যুক্তি দ্বারা সমর্থিত ।তিনি আরো বলেছেন হস্তশিল্পটি কি হবে তা নির্ভর করবে স্থানীয় প্রয়োজনীয় ভিত্তিক বিষয়ের উপর।

গান্ধিজি বিবেকানন্দের ন্যায়, "Character building education"- এ বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি মনে করতেন সব রকমের শিক্ষার মূলকথা শিক্ষার্থীর চরিত্র গঠন। শিক্ষার্থীর উপর শিক্ষকের উল্লেখযোগ্য প্রভাব সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের জীবন থেকে যে অনুপ্রেরণা লাভ করে, শিক্ষকের পাঠদানের বিষয় থেকে তা লাভ করে না। শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব ও আচরণ এমন হতে হবে যাতে শিক্ষার্থীর কাছে তিনি উদাহরণস্বরূপ হয়ে থাকেন।

গান্ধিজি ধর্মীয় শিক্ষাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'ধর্ম ছাড়া জীবন আর নীতিহীন জীবন, রাডার ছাড়া জাহাজের ন্যায়'। গান্ধিজি ধর্ম বলতে কোনো মত বা ধর্মীয় সংস্কারকে বোঝাননি। তিনি বলেছেন "There is no religion higher than truth and righteousness".অর্থাৎ সত্য ও ন্যায়ের উপর কোনো ধর্ম হতে পারে না।

গান্ধিজি ভারতবর্ষে নারীদের অবস্থানকে বিশেষভাবে অনুভব করেছিলেন। বিশ্বের অন্যান্য প্রগতিশীল দেশের মত তিনি মেয়েদের উন্নতির চেষ্টা করেছিলেন। তিনি মনে করতেন কোন জাতির অগ্রগতির জন্য মেয়েদের শিক্ষা অপরিহার্য।

শুধু তাই নয়, তিনি পরীক্ষামূলকভাবে সহশিক্ষার কথাও বলেছেন। অর্থাৎ একই সঙ্গে ছেলে ও মেয়েদের একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ করার কথা তিনি বলেছেন।

বয়স্কশিক্ষার ক্ষেত্রে গান্ধীজির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বর্তমান। তিনি অনুভব করেছিলেন ভারতের আপামর জনসাধারণের শিক্ষা ব্যতিত দেশের অগ্রগতি সম্ভব নয়। তিনি বলেছেন, 'বয়স্ক শিক্ষা যে অর্থে ব্যবহৃত হয় তা আমি বলতে চাই না। আমি পিতা মাতার এমন শিক্ষা চাই যার দ্বারা তারা তাদের সন্তানদের মানুষ করতে পারেন। ভারতবর্ষের শতকরা আশি ভাগ লোক গ্রামে বসবাস করে। সুতরাং তাদের শিক্ষা বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। দেশের সামগ্রিক উন্নতির জন্য জনশিক্ষার প্রয়োজন।

অনুশীলনী

ক) ১ মানের প্রশ্ন : সর্বাধিক শব্দসংখ্যা ২০

১) আধুনিক ভারতীয় সাংবাদিকতার জনক কাকে বলা হয়?

২) বর্ণপরিচয় গ্রন্থটি কার লেখা?

৩) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবে শান্তিনিকেতন-এ আশ্রমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন?

৪) 'Man making Education" এটি কার ধারণা?

৫) বুনিয়াদী শিক্ষার ধারণাটি কার?

খ) ২ মানের প্রশ্ন : সর্বাধিক শব্দসংখ্যা ৪০

১) রাজা রামমোহন রায়ের মতে শিক্ষার লক্ষ্য কি ছিল?

২) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতে শিক্ষার লক্ষ্য কি ছিল?

৩) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে শিক্ষার লক্ষ্য কি ছিল?

৪) স্বামী বিবেকানন্দের মতে শিক্ষার লক্ষ্য কি ছিল?

৫) মহাত্মা গান্ধির মতে শিক্ষার লক্ষ্য কি ছিল?

গ) ৪ নামের প্রশ্ন : সর্বাধিক শব্দসংখ্যা ১০০

১) সমাজসংস্কারক হিসাবে রাজা রামমোহন রায়ের অবদান উল্লেখ কর।

২) নারীশিক্ষা বিস্তারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান উল্লেখ কর।

৩) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত শিক্ষার পাঠ্যক্রম এর ধারণাটি উল্লেখ কর।

৪) গণশিক্ষা সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের ধারণা উল্লেখ কর।

৫) মহাত্মা গান্ধি প্রবর্তিত বুনিয়াদি শিক্ষার বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ কর।

ঘ) ৫ মানের প্রশ্ন : সর্বাধিক শব্দসংখ্যা ১৫০

১) নবযুগের প্রবর্তক হিসাবে রাজা রামমোহন রায়ের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।

২) প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান উল্লেখ কর।

৩) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলো লেখো।

৪) স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শন বিশ্লেষণ কর।

৫) মহাত্মা গান্ধির প্রবর্তিত শিক্ষার পাঠ্যক্রমটি উল্লেখ কর।

ঙ) ৬ মানের প্রশ্ন : সর্বাধিক শব্দসংখ্যা ২০০

বোধপরীক্ষণমূলক :

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শিক্ষা প্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষাকে জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। বিদ্যাসাগরের লক্ষ্য ছিল গণমুখী শিক্ষা। তিনি চান নি যে, শিক্ষার সুফল মুষ্টিমেয় কিছু ভাগ্যবান মানুষ ভোগ করুক। তিনি বলেছেন, 'আজ জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের প্রয়োজন। আমাদের কতকগুলো মাতৃভাষা ভিত্তিক বিদ্যালয় স্থাপন করা এবং মাতৃভাষায় শিক্ষামূলক বিষয়ে প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক রচনা করা। আমাদের উচিত এমন একদল লোককে শিক্ষিত করে তোলা যারা শিক্ষকতার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

১) গণশিক্ষা বিস্তারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান সংক্ষেপে বিবৃত কর।

২) বাংলা ভাষার উন্নতিকল্পে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান সংক্ষেপে বিবৃত কর। ৩+৩ = ৬

সপ্তম অধ্যায় : মনোবিদ্যা ও শিক্ষা

প্রথম একক : শিক্ষা মনোবিদ্যা

দ্বিতীয় একক : বৃদ্ধি ও বিকাশ

তৃতীয় একক : বিকাশের বিভিন্ন স্তরের বৈশিষ্ট্য ও চাহিদা

চতুর্থ একক : শিখন

পঞ্চম একক : শিখনের বিভিন্ন তত্ত্ব

সপ্তম অধ্যায় : মনোবিদ্যা ও শিক্ষা

উদ্দেশ্য (Objective) :

এই অধ্যায়টি পাঠ করার পর শিক্ষার্থীরা যে যে বিষয়ে ধারণা লাভে সমর্থ হবে তা হল—

- শিক্ষা-মনোবিদ্যা বলতে কি বোঝায়
- শিক্ষা ও মনোবিদ্যার সম্পর্ক
- শিক্ষা-মনোবিদ্যার প্রকৃতি ও পরিধি
- কিভাবে শিক্ষা-মনোবিদ্যার জ্ঞান শিক্ষককে সাহায্য করে।
- বৃদ্ধি ও বিকাশের অর্থ সম্পর্কে ধারণা লাভে সমর্থ হবে।
- বৃদ্ধি ও বিকাশের মধ্যে কি কি পার্থক্য রয়েছে।
- বৃদ্ধি ও বিকাশের নীতিগুলো সম্পর্কে ধারণা লাভে সমর্থ হবে।
- শৈশব স্তরের দৈহিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য ও চাহিদা সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে।
- প্রাথমিক বাল্যস্তরের দৈহিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য ও চাহিদা সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে।
- প্রাথমিক বাল্যস্তরের বিকাশের শিক্ষামূলক গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে।
- প্রান্তীয় বাল্যস্তরের দৈহিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য ও চাহিদা সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে।
- কৈশোরের দৈহিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে।
- বয়:সন্ধিকালের বিভিন্ন চাহিদা, সমস্যা এবং এই স্তরের শিক্ষামূলক গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে।
- শিখনের সংখ্যা বলতে পারবে।
- শিখনের সংজ্ঞা বলতে পারবে।
- কোনটি শিখন নয় তা বলতে পারবে।
- শিক্ষনের সংজ্ঞা পরিণমনের সম্পর্ক এবং পার্থক্য সম্পর্কে বলতে পারবে।
- শিখনের ক্ষেত্রে প্রেষণা ও উদ্বোধকের প্রভাব সম্পর্কে বলতে পারবে।
- প্রচেষ্টা ও ভুলের তত্ত্ব বর্ণনা করতে পারবে এবং বিভিন্ন সূত্রগুলো সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবে।
- প্রাচীন অনুবর্তন তত্ত্ব ও তার শিক্ষামূলকগুরুত্ব অলোচনা করতে পারবে।
- গেস্টাল্ট মতবাদ ও তার শিক্ষামূলকগুরুত্ব সম্পর্কে আলেচেনা করতে পারবে।

প্রথম একক　　শিক্ষা মনোবিদ্যা

শিক্ষা মনোবিদ্যা বিশুদ্ধ মনোবিদ্যা বা মনোবিজ্ঞানের একটি শাখা। এটি শিক্ষার মূল ভিত্তি গড়ে তোলে। শিক্ষার তত্ত্ব ও প্রয়োগমূলক দিকের উপর শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। এটি শিখন ও শিক্ষাদান প্রক্রিয়াকে সমৃদ্ধ করে তুলতে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করে। শিক্ষা-মনোবিদ্যা 'শিক্ষা' ও 'মনোবিদ্যা' এই দুটি শব্দ নিয়ে গঠিত। শিক্ষা মনোবিদ্যা সম্পর্কে আলোচনা করার আগে 'শিক্ষা' ও 'মনোবিদ্যা' বলতে কি বোঝায় সে সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল—

মনোবিদ্যার অর্থ : মনোবিদ্যার ইংরেজি প্রতিশব্দ হল 'Psychology' । এই 'Psychology' শব্দটি গ্রীক শব্দ 'Psyche' এবং 'Logos' থেকে এসেছে। 'Psyche' শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ হল 'Soul' বা আত্মা এবং 'Logos' শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ হল 'Science' বা বিজ্ঞান । সুতরাং Psychology শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় 'আত্মা সম্পর্কিত বিজ্ঞান' বা 'Science of Soul'। সেই হিসাবে মনোবিজ্ঞানীদের মতে মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হল আত্মা। কিন্তু আধুনিক মনোবিজ্ঞানীগণ এ ব্যাপারে একমত নন। কারণ আত্মাকে দেখা যায় না, ধরা কিংবা ছোঁয়া যায় না, পরীক্ষাগারেও প্রমাণ করা যায় না। তাই এমন একটি বিষয় কখনও কোন বিজ্ঞানের বিষয় হতে পারে না। তাই এই ব্যাখ্যাকে বাদ দেওয়া হয়।

মনোবিদ্যার অন্য আরেকটি ব্যাখায় ডেকার্তে (Descartes) প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীগণ বলেন মনোবিদ্যা হল 'Science of Mind' বা মনের বিজ্ঞান। মনোবিজ্ঞানের এই ব্যাখ্যাও মনোবিজ্ঞানীগণ গ্রহণ করেননি। তাদের মতে, যে যুক্তিতে মনোবিজ্ঞানকে 'আত্মার বিজ্ঞান' বলা যায় না। একই কারণে 'মনের বিজ্ঞানও' বলা যায় না।

উইলিয়াম জেম্‌স (William James) মনোবিদ্যাকে 'Science of Consciousness' বা চেতনার বিজ্ঞান বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু মনের তিনটি স্তর রয়েছে — চেতন, অবচেতন ও অচেতন। চেতন স্তর হল মনের জাগ্রত অবস্থা। কিন্তু ব্যক্তির আচরণের উপর অন্য দুটিরও প্রভাব পড়ে। সেই দিক থেকে এই ধারণাটি অসম্পূর্ণ। তাছাড়া মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তু যদি চেতনা হয় তাহলে মনোবিজ্ঞানকে বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান (Positive Science) রূপে গণ্য করা সম্ভব হয় না। কেন না চেতনাকেও প্রত্যক্ষ করা যায় না। তাছাড়া ব্যক্তি কেবলমাত্র নিজের চেতনাকেই সোজাসুজি জানতে পারে। অন্যের ক্ষেত্রে তার বাহ্যিক আচরণের ভিত্তিতে তার চেতনাকে অনুমান করে নিতে হয়। এই কারণে এই ধারণা অসম্পূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য নয়।

মানব শিশুকে তার আচরণ থেকে জানা যায়। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে আচরণই ব্যক্তির সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়াকে প্রকাশ করে। আচরণকে পর্যবেক্ষণ করা যায়। বিচার বিশ্লেষণ করা যায়। তাই পরবর্তীকালে মনোবিদ্যাকে আচরণের বিজ্ঞান হিসাবে গড়ে তোলা হল। জন ব্রডাস্ ওয়াটসন (John Broadus Watson) মনোবিজ্ঞানকে আচরণের বিজ্ঞান বলে অভিহিত করলেন।

James Drever মনোবিদ্যাকে জীবের আচরণ সম্পর্কিত বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান বলে অভিহিত করেছেন। আচরণ হচ্ছে আভ্যন্তরীণ চিন্তা ও অনুভূতির বহি:প্রকাশ, যাকে আমরা মানবিক জীবন বলি।

Robert sessions woodwarth এর মতে মনোবিজ্ঞান হল পরিবেশের সঙ্গো সম্পর্কিত ব্যক্তির ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কিত বিজ্ঞান।

Burrhus Frederic Skinner এর মতে মনোবিদ্যা জীবনের সকল ধরনের প্রতিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে। আচরণের প্রতিক্রিয়া বলতে জীবের সকল ধরনের প্রক্রিয়া, অভিযোজন, ক্রিয়াকলাপ এবং অভিজ্ঞতার সমষ্টিকে বোঝায়। যেমন— হাঁটা, দৌড়ানো, কথা বলা, কাজ করা, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রতিক্রিয়া করা। সমস্ত ধরনের মানসিক কার্যকলাপ যেমন— চিন্তা করা, কল্পনা করা, স্মরণ করা এবং সমস্ত ধরনের প্রাক্ষোভিক কার্যাবলি যেমন— ভালবাসা, ভয় করা, রাগ করা ইত্যাদি।

এই সমস্ত কার্যাবলীগুলোই হচ্ছে সক্রিয় কার্যাবলী এবং স্থান কালের পরিবর্তনের সঙ্গো সঙ্গো ব্যক্তির নতুন অভিজ্ঞতা লাভের মধ্যে দিয়ে পরিবর্তিত হয়। এই কারণে আধুনিক কালে মনোবিদ্যাকে 'আচরণের বিজ্ঞান' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

মনোবিজ্ঞানীদের বিভিন্ন মূল্যবান মতামতের আলোকে মনোবিজ্ঞানের একটি পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা গ্রহণ করা যেতে পারে। তাহল — মনোবিজ্ঞান হচ্ছে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গো সম্পর্কযুক্ত জীবের আচরণ সম্বন্ধীয় বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান যা জীবের আচরণের ভিত্তিতে তার মানসিক প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা করে এবং মানসিক প্রক্রিয়ার সঙ্গো সংযুক্ত যে দেহগত প্রক্রিয়া সেগুলোরও বর্ণনা করে।

শিক্ষার অর্থ :

প্রতিটি মানুষই কোন না কোন সমাজে বাস করে। সেই সমাজের অস্তিত্ব রক্ষা ও উন্নয়ন নির্ভর করে সেই সমাজের অপরিণত নাগরিকদের বিশেষ কতগুলো সুনির্বাচিত, সুনির্দিষ্ট এবং সমাজ অনুমোদিত আচরণ আয়ত্ত করার উপর। এই কাজটি সম্পন্ন হয় শিখনের মাধ্যমে। শিখন ব্যক্তি আচরণের পরিবর্তন আনার মাধ্যমে তাকে অভিজ্ঞতা লাভে সহায়তা করে। এই অভিজ্ঞতাই শিক্ষা।

জন্মের পর শিশু বয়স্কদের উপযুক্ত যত্নে বেড়ে ওঠে। পরবর্তী সময়ে সে শেখে কিভাবে হাঁটতে, কথা বলতে এবং অন্যদের সঙ্গো আচরণ করতে হবে। এইভাবে ধীরে ধীরে সে তার চারদিকের সবকিছুকে চিনতে এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মিথস্ক্রিয়া করতে শেখে। এইভাবে সে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এবং তার আচরণের পরিবর্তন হয়। ব্যক্তি বিভিন্ন সংস্থা থেকে যেমন— পরিবার, সমাজ, বিদ্যালয়, গণমাধ্যম এবং জীবনে সম্মুখীন হওয়া সমস্ত পরিস্থিতি থেকে শিক্ষা লাভ করে। তাই বলা যায় শিক্ষা একটি ধারাবাহিক ও জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া।

এ প্রসঙ্গো মনে রাখা প্রয়োজন যে কেবলমাত্র সমাজ উন্নয়ন ও অগ্রগতিই নয় ব্যক্তির মধ্যে জন্মসূত্রে নিহিত সুপ্ত শক্তিগুলোর উন্মোচনের মাধ্যমে ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ বিকাশ সাধনই একান্ত আবশ্যক। ব্যক্তির সক্ষমতায় সমাজ লাভবান হয় এবং সমাজ সংহত ও উন্নত হলে ব্যক্তি তার বিকাশের উপযুক্ত সহায়ক পরিবেশ লাভ করে। সমাজের সঙ্গো ব্যক্তির এই অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথা মনে রেখে শিক্ষার একটি ব্যাপক সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে—

শিক্ষা বলতে আমরা সেই সব সুনির্বাচিত, সুনির্দিষ্ট এবং সমাজ অনুমোদিত আচরণ আয়ত্ব করা

বুঝি যেগুলো ব্যক্তি ও সমাজ উভয়েরই সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য এবং যে আচরণগুলো সমাজ অনুমোদিত কতগুলো বিশেষ সংস্থার মাধ্যমে সমাজের অপরিণত নাগরিকদের আয়ত্ত করতে সাহায্য করা হয়ে থাকে।

শিক্ষা ও মনোবিদ্যার সম্পর্ক :

শিক্ষা ও মনোবিদ্যার মধ্যে অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান রয়েছে। মনোবিজ্ঞান যদি হয় আচরণের বিজ্ঞান তাহলে শিক্ষা হল সেই বিজ্ঞানের প্রায়োগিক শাস্ত্র। এই সম্পর্কের ক্ষেত্রগুলো কি তা দেখা যাক—

শিক্ষার লক্ষ্য ও মনোবিদ্যা : শিক্ষার লক্ষ্য কি হবে তা স্থির করে দেয় শিক্ষাশ্রয়ী দর্শন। কিন্তু এই লক্ষ শিক্ষার্থীর জন্য কতটা উপযুক্ত তা বিচার করে মনোবিজ্ঞান। তাই লক্ষ নির্বাচনের সময় শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞানের উপর নির্ভর করতে হয়।

শিক্ষা-পদ্ধতি ও মনোবিদ্যা: শিক্ষার সার্থকতা বহুলাংশে নির্ভর করে উপযুক্ত শিক্ষা পদ্ধতি নির্বাচনের উপর। কোন শিক্ষা পদ্ধতি কাদের পক্ষে কতটা কার্যকরী তা জানার জন্য এবং কার্যকরী পদ্ধতি গড়ে তোলার জন্য শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞানের দ্বারস্থ হতেই হবে।

শিক্ষা ও শিশু মনোবিদ্যা : আধুনিক শিক্ষাকে বলা হয় শিশু কেন্দ্রিক শিক্ষা। এই শিক্ষায় শিশুর আগ্রহ, চাহিদা ও সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষাদানের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। শিশুর আগ্রহ, চাহিদা ও সামর্থ্য সম্পর্কে সঠিক ধারণা করতে গেলে শিক্ষাকে শিশু মনোবিদ্যা নামে মনোবিজ্ঞানের যে শাখা রয়েছে তার সাহায্য নিতে হবে।

বিদ্যালয় প্রশাসন ও পরিচালনার মনোবিদ্যা : মনোবিদ্যা বিদ্যালয় প্রশাসন ও পরিচালনার ক্ষেত্রেও নতুন দিশা দেখিয়েছে। বিদ্যালয়ের সময় তালিকা তৈরি, শৃঙ্খলা স্থাপনের দিক, বিদ্যালয় পরিচালকের কি কি বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ে মনোবিজ্ঞান শিক্ষাকে সঠিক দিশা দেখিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে।

আচরণ পরিবর্তন ও মনোবিদ্যা: শিক্ষা মানুষের আচরণের সার্থকতা, সংহত, বাঞ্ছিত ও সমাজসম্মত পরিবর্তন আনয়নে সহায়তা করে। মানুষের আচরণের এই ধরনের পরিবর্তন ঘটানো বা বাঞ্ছিত নতুন নতুন আচরণ সৃষ্টি করার জন্য আচরণের মৌলিক সূত্রের জ্ঞান শিক্ষা মনোবিজ্ঞান থেকেই গ্রহণ করে।

শ্রেণি সমস্যা ও মনোবিদ্যা : শ্রেণি পরিবেশে শিক্ষকগণ অনেক সময়ই নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হন। যেমন- বিভিন্ন মেধা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের একই শ্রেণিকক্ষে বসিয়ে শিক্ষাদান, অবাধ্য শিশুদের বশে আনা ইত্যাদি। এক্ষেত্রে শিক্ষকের মনোবিজ্ঞান সম্মত জ্ঞান তাকে বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে সহায়তা করে।

বিশেষ শিক্ষা ও মনোবিদ্যা : শিক্ষাক্ষেত্রে আজ অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার (Inclusive Education) ধারণা চলে এসেছে। বিদ্যালয়ে কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থী দেখা যায় যারা ভিন্নভাবে সক্ষম। যাদের জন্য বিশেষ সহায়তাদানের ব্যবস্থা করার দরকার হয়। মনোবিজ্ঞান তাদের জন্য বিশেষ কৌশল ও কর্মসূচির পরিকল্পনা করে। তাদেরকে উপযুক্তভাবে শিক্ষিত করে তোলার জন্য শিক্ষা, মনোবিজ্ঞানের সেই কৌশলগুলো কাজে লাগায়।

মূল্যায়ন ও মনোবিজ্ঞান : শিক্ষার ফলে শিক্ষার্থীর আচরণের কাঙ্খিত পরিবর্তন ঘটলো কি না কিংবা কতটুকু ঘটলো এবং তা কতটা স্থায়ী ইত্যাদি সমস্ত ধরনের উত্তর শিক্ষার্থীর আচরণের বাহ্যিক নিরীক্ষণের দ্বারা সম্ভব নয়। এই পরিবর্তনের নির্ভরযোগ্য ও নির্ভুল পরিমাপ পাওয়ার জন্য শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞানমূলক মূল্যায়নের উপরই নির্ভর করতে হয়।

শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের অর্থ :

শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান হল প্রয়োগমূলক মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে একটি শাখা যা কেবলমাত্র বিদ্যালয় বা বিদ্যালয়ের বাইরে যে সমস্ত শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণের কাজে নিযুক্ত আছে তাদের নিয়ে আলোচনা করে। এটি শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত সামর্থ্য, জন্মগত আচরণ ক্ষমতা এবং স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে এবং বিভিন্ন রকম শিখন পরিস্থিতিতে এই জ্ঞানের প্রয়োগ করতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। এটি মনোবিজ্ঞান থেকে তার মূল উপাদান সংগ্রহ করলেও এর নিজস্ব আলোচনার ক্ষেত্র রয়েছে।

বিভিন্ন শিক্ষা মনোবিজ্ঞানীগণ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের যে সব সংজ্ঞা দিয়েছে তার কয়েকটি তুলে ধরা হলো —Jason Michael Stephenএর মতে — শিক্ষা মনোবিদ্যা হল শিশুর শিক্ষামূলক বৃদ্ধি ও বিকাশের ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ।

Charles Hubbard Judd এর মতে— ব্যক্তির জন্ম থেকে পূর্ণতা প্রাপ্তির স্তর পর্যন্ত বিকাশের স্তরগুলোর বিজ্ঞানসম্মত পর্যবেক্ষণই হচ্ছে শিক্ষা মনোবিদ্যা।

Walter Bermard Kolesnik এর মতে— শিক্ষা প্রক্রিয়াকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে এবং তার উন্নতি সাধন করতে পারে মনোবিদ্যার যে সব তত্ত্ব, তাদেরই বিশেষ অনুশীলন হল শিক্ষা-মনোবিদ্যা।

শিক্ষা মনোবিদ্যার প্রকৃতি :

শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানকে সাধারণত ব্যবহারিক বা প্রয়োগমূলক মনোবিজ্ঞানের একটি শাখা বলা হয়। কিন্তু এর দ্বারা শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় না। শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং সাধারণ বিজ্ঞান থেকে অধিকাংশ উপাদান সংগ্রহ করলেও এর নিজস্ব একটি দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্মপরিধি আছে। নিজস্ব পরীক্ষামূলক দিকও গড়ে উঠেছে। আধুনিক শিক্ষা মনোবিদ্যা বিজ্ঞানের কোন শাখা হিসাবে নয় পৃথক জ্ঞানের ক্ষেত্র হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে। মনোবিদ্যা যেভাবে বিজ্ঞান হিসাবে গৃহীত তা হল—

১) এটি একটি ফলিত বিজ্ঞান : শিক্ষা-মনোবিদ্যা একটি ফলিত বিজ্ঞান। কারণ এটি মনোবিজ্ঞানের নীতি এবং পদ্ধতিগুলো শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করে শিশুর আচরণকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে, পরীক্ষা করে শিশুমন ও শিখন সংক্রান্ত নানা তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মনোবিজ্ঞানের একটি শাখা হিসাবে এটি ফলিত মনোবিদ্যার যে কোন শাখার সমান্তরাল।

২) বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান : মনোবিজ্ঞান একটি বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান। কারণ এটি আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞানের মতো বিভিন্ন পরিস্থিতিতে শিশুর কি করা উচিত এই ধরনের কোন নির্দেশ দেয় না। পরিবর্তে শিশুর বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়াগুলো যেমন— চিন্তা, অনুভূতি ইচ্ছা ইত্যাদি বাস্তবে যেভাবে ঘটে তা নিয়ে আলোচনা করে। এগুলো কি রকম হওয়া উচিত তা নিয়ে আলোচনা করে না।

৩) সমাজ বিজ্ঞান : শিক্ষা মনোবিদ্যা একটি সমাজ বিজ্ঞান কারণ এটি মানুষ এবং সমাজে তার অভিযোজন

নিয়ে আলোচনা করে। এটি শিক্ষা পরিবেশে সামাজিক মানুষের আচার আচরণকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান ও পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

৪) পৃথক জ্ঞানের ক্ষেত্র : শিক্ষা মনোবিজ্ঞান একটি পৃথক জ্ঞানের ক্ষেত্র হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। কারণ এই বিজ্ঞান নিজস্ব অনুশীলন পদ্ধতির প্রবর্তন করেছে যার সাহায্যে বিশেষ সত্যের অনুসন্ধান করে স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব। সুতরাং যার নিজস্ব অনুশীলন পদ্ধতি আছে, যে জ্ঞানের জন্য অন্য কোন বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করে না, তাকে আধুনিক কালে এটিকে পৃথক বিজ্ঞান হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

৫) বিকাশমান বিজ্ঞান : শিক্ষা মনোবিদ্যা হচ্ছে একটি গবেষণাভিত্তিক বিকাশমান বিজ্ঞান। কারণ এটি আধুনিক গবেষণামূলক তথ্যকে ভিত্তি করে শিশুর বিকাশের প্রক্রিয়াকে ধারাবাহিকভাবে অনুশীলন করে।

৬) আচরণের বিজ্ঞান : এটি একটি আচরণের বিজ্ঞান। কারণ এখানে শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন আচরণগত সমস্যাকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয় এবং এগুলোর সমাধানে মনোবিজ্ঞানের মূলনীতি সমূহকে কিভাবে প্রয়োগ করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়। শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত সব ধরনের আচরণই শিক্ষা মনোবিদ্যার অন্তর্গত।

শিক্ষা মনোবিদ্যার পরিধি :

শিক্ষা মনোবিদ্যা হল বিভিন্ন গবেষণালব্ধ ফলকে ভিত্তি করে সম্প্রসারিত ক্রমবিকাশমান একটি বিষয়। এটি শিক্ষার্থীর শিক্ষার সাথে জড়িত নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করে এবং শিক্ষাকে পাঠদানের জন্য উন্নত পরিবেশ রচনায় বিশেষভাবে সাহায্য করে। এটি শিক্ষা প্রক্রিয়ার তিনটি প্রধান দিক অর্থাৎ শিক্ষার্থী, শিক্ষা পদ্ধতি এবং শিক্ষা পরিবেশ নিয়ে আলোচনা করে থাকে।

শিক্ষা মনোবিদ্যা শিক্ষার্থীর দিক থেকে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলোকে ভিত্তি করে আলোচনা করে—

১) বৃদ্ধি ও বিকাশের ক্ষেত্র : শিক্ষা ব্যক্তির জীবন বিকাশের সমার্থক। আর ব্যক্তির জীবন বিকাশে বিভিন্ন স্তর বর্তমান। শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান এই স্তরগুলোর মধ্যে দিয়ে কিভাবে তার দৈহিক, মানসিক, সামাজিক ও প্রাক্ষোভিক বিকাশ ঘটে তা ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করে শিক্ষার্থীর ক্রমবিকাশের ধারা অনুযায়ী তাকে শিক্ষাদানের বিভিন্ন উপায় সম্পর্কে শিক্ষককে সঠিক দিশা দেখায়।

২) ব্যক্তিগত বৈষম্যের ক্ষেত্র : একটি ব্যক্তির সঙ্গে অপর ব্যক্তির দৈহিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক ও সামাজিক দিক থেকে পার্থক্য বর্তমান। কিভাবে এই ব্যক্তিগত বৈষম্যকে ভিত্তি করে শিক্ষাদান করা যায় এ ব্যাপারে শিক্ষা মনোবিদ্যা শিক্ষককে নির্দেশ দেয়।

৩) আচরণের অনুশীলন : মনোবিজ্ঞান হল 'আচরণের বিজ্ঞান' এবং শিক্ষার অর্থ 'আচরণের পরিবর্তন'। ব্যক্তির আচরণ তার জীবন বিকাশের বিভিন্ন স্তরে স্থান ও কালের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। তাই জীবের আচরণ সংক্রান্ত আলোচনা মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য পরিধির অন্তর্ভূক্ত। যা শিক্ষামূলক কার্যকলাপের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

৪) ব্যক্তিত্বের পর্যবেক্ষণ ক্ষেত্র : শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বংশগতি, পরিবেশ, বিভিন্ন পরিস্থিতির সঙ্গে তার মিথস্ক্রিয়া, বিভিন্ন সংস্কৃতির সঙ্গে তার অভিযোজন, গৃহ, বিদ্যালয় এবং শ্রেণি-পরিবেশ ইত্যাদির সমন্বয়ে গড়ে উঠে। শিক্ষা প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই ব্যক্তিত্বের আলোচনাকে শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের পরিধিভুক্ত করা হয়েছে।

৫) বুদ্ধি সংক্রান্ত আলোচনা : শিক্ষার্থীর বুদ্ধি শিখন প্রক্রিয়ার উপর প্রভাব বিস্তার করে। শিক্ষা মনোবিদ্যা তাই বুদ্ধি সংক্রান্ত আলোচনাকে তার পরিধিভুক্ত করেছে।

৬) শিক্ষামূলক পরিসংখ্যানের ক্ষেত্র : পরিসংখ্যান বা রাশি বিজ্ঞানের আলোচনা শিক্ষামূলক মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। কারণ রাশিবিজ্ঞানকে ব্যবহার করে শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্যকে যেমন তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রকাশ করা সম্ভব তেমনি শিক্ষার্থীর অগ্রগতিরও মূল্যায়ন করা যায়।

শিখন প্রক্রিয়ার অধীনে শিক্ষা-মনোবিদ্যার ক্ষেত্র :

১) শিখন প্রক্রিয়া সম্পর্কিত আলোচনা : শিক্ষা হচ্ছে শিখনের প্রক্রিয়ার উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। শিখনের মাধ্যমে ব্যক্তির আচরণের পরিবর্তন ঘটে। তাই শিক্ষা মনোবিদ্যা শিখনের স্বরূপকে, শিখনের সূত্রকে, শিখনের তত্ত্বাবলীকে, শিখনে প্রভাব বিস্তারকারী বিভিন্ন উপাদান এবং ভুলে যাওয়া ইত্যাদি বিষয়কে তার আলোচনার পরিধিভুক্ত করেছে।

২) বিভিন্ন কৌশল ও পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা : শিশুকে ভালভাবে জানার জন্য শিক্ষা-মনোবিদ্যা নানা ধরনের বিজ্ঞানসম্মত কৌশল এবং পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকে। পরিমাপ এবং মূল্যায়ণের সাহায্যে বিভিন্ন সময় শিশুর মধ্যে যে পরিবর্তনগুলো ঘটে তা জানা যায়। তাই এই বিষয়টিকেও শিক্ষা-মনোবিদ্যা তার আলোচ্য পরিধিভুক্ত করেছে।

শিক্ষা পরিবেশের দিক থেকে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলো নিয়ে শিক্ষা মনোবিদ্যা আলোচনা করে :

১) শ্রেণি পরিবেশ সম্পর্কিত আলোচনা : শিখন পরিবেশ বলতে সাধারণভাবে পরিবেশের সেই অবস্থাকে বোঝায় যা শিক্ষার্থী এবং শিক্ষা পদ্ধতি উভয়ের উপরই প্রভাব বিস্তার করে। বিদ্যালয়ের শ্রেণি পরিবেশ সামাজিক এবং প্রাক্ষোভিক পরিবেশকে এই শ্রেণিভুক্ত করা যায়।

২) শিক্ষকের কার্যকারিতার ক্ষেত্র সম্পর্কিত আলোচনা : শিক্ষার্থীর শিখনের ক্ষেত্রে গুণগত এবং পরিমাণগত দিক থেকে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর উভয়ের মিথস্ক্রিয়া বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষকের কার্যকারিতার উন্নয়নের বিষয়টির ধারাবাহিক আলোচনা ও অনুসন্ধানের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

শিক্ষকের কাছে মনোবিদ্যার গুরুত্ব :

শিক্ষকতা হচ্ছে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এক্ষেত্রে শিক্ষককে যে বিষয়ে বিশেষভাবে সচেতন থাকতে হবে তা হল — কাকে শেখানো হচ্ছে, কেন শেখানো হচ্ছে, কি শেখানো হচ্ছে এবং কিভাবে শেখানো হচ্ছে। মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান শিক্ষামূলক কার্যকলাপকে উপযুক্তভাবে সম্পাদন করতে সহায়তা করে। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ জ্যঁ জ্যাক রুশোর ভাষায়— ‘A Child is a book which the teacher is to learn from page to page’ । অর্থাৎ রুশোও একজন শিক্ষকের পক্ষে শিশুকে জানা অর্থাৎ তার রুচি, প্রবণতা, সামর্থ্য, মানসিক অবস্থা ইত্যাদিকে জানার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীদের চিন্তার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে, একজন শিক্ষক শিক্ষাকে ফলপ্রসু করে তোলার জন্য কোন কোন বিশেষ দিকের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করবেন —

১) শিক্ষার্থীকে জানা : আধুনিক শিক্ষার মূলনীতি অনুযায়ী শিক্ষককে শুধু বিষয় জ্ঞানে জ্ঞানী হলে চলবে না, তাকে জানতে হবে শিক্ষার্থীকে। শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান শিক্ষককে এই কাজে সহায়তা করতে পারে।

একজন শিক্ষক মনোবিজ্ঞানের জ্ঞানের সহায়তায় শিক্ষার্থীর নিম্নলিখিত দিকগুলো সম্পর্কে জানতে পারেন—

ক) ব্যক্তিগত বৈষম্য : ব্যক্তিগত বৈষম্যের তত্ত্বটি আধুনিক মনোবিজ্ঞানের একটি বড় অবদান। এই তত্ত্ব অনুযায়ী দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, প্রাক্ষোভিক ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে মানুষে মানুষে প্রচুর পার্থক্য রয়েছে। ফলে তার বিকাশের ধরনেও পার্থক্য দেখা যায়। শিক্ষকের মনোবৈজ্ঞানিক জ্ঞান শিক্ষার্থীর মধ্যেকার ব্যক্তিগত বৈষম্যকে চিহ্নিত করতে এবং সেই অনুযায়ী শিক্ষাদান করতে সাহায্য করে।

খ) বংশগতি ও পরিবেশ : আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মতে ব্যক্তির জীবন বিকাশে বংশগতি ও পরিবেশের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে এদের সমন্বিত প্রয়োগ করতে না পারলে শিক্ষা সার্থক হবে না। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা যখন প্রথম আসে তখন কিন্তু জন্মগত ক্ষমতা নিয়ে আসে। যার উপর শিক্ষকের কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। কিন্তু বংশগত ক্ষমতাগুলোর বিকাশের প্রকৃতি ও মাত্রা নির্ভর করে পরিবেশের উপর। উপযুক্ত পরিবেশ পেলেই বংশধারা স্বাভাবিক ও সহজ পথে এগোতে পারে এবং তার পূর্ণ পরিণতিতে পৌঁছতে পারে। তাই শিক্ষকের মনোবৈজ্ঞানিক জ্ঞান এ বিষয়ে জানা এবং শিশুর জন্য উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়।

গ) মানসিক স্বাস্থ্য : শিক্ষা-মনোবিদ্যা শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে আলোচনা করে। শ্রেণিকক্ষে অনেক সময় নানা অস্বাভাবিক শিশু দেখা যায়। তাদের মধ্যে অনেকে থাকে যারা বিভিন্ন কারণে অপসঙ্গাতি সম্পন্ন। শিক্ষার লক্ষ্য হল উপযুক্ত অভিযোজন ক্ষমতা গড়ে তুলে তাদের মধ্যে উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব গঠন করা। মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান শিক্ষকের মধ্যে অস্বাভাবিক শিশুদের চিহ্নিত করণের এবং তাদের সমস্যা দূরীকরণের জন্য উপযুক্ত সামর্থ্য গড়ে তোলে।

ঘ) বৃদ্ধি ও বিকাশ : শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে শিশুর সামঞ্জস্য পূর্ণ বৃদ্ধি ও বিকাশে সহায়তা করা। ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তরে শিশুর মধ্যে নানা ধরনের দৈহিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক, সামাজিক বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। বিদ্যালয়ের উচিত সমস্ত ধরনের পাঠক্রমিক ও সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীগুলো তাদের ক্রমবিকাশের নীতি অনুসারে পরিকল্পনা করা। মনোবৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সাহায্যে শিক্ষক এ বিষয়ে জানতে পারে এবং কোন ত্রুটি বা অভাব থাকলে তা দূরীকরণের চেষ্টা করতে পারে।

২) শিখন পদ্ধতি সম্পর্কে জানা : শিখন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে গবেষণা চালানোই হল শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের প্রধান লক্ষ। প্রাণী কিভাবে শেখে, শিক্ষার বিষয় বস্তুর প্রকৃতি ও পরিমাপের সঙ্গে শেখার কার্যকারিতার কি সম্বন্ধ, মানসিক শক্তি, প্রক্ষোভ ও প্রেষণা প্রভৃতির উপর শিক্ষা কতটুকু নির্ভরশীল, কোন্ কোন্ পরিস্থিতি শিক্ষার অনুকূল বা প্রতিকূল ইত্যাদি শিক্ষাঘটিত বিভিন্ন সমস্যাগুলো কিভাবে সমাধান করা যায়, শিক্ষক এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় জ্ঞান মনোবিজ্ঞান থেকে লাভ করতে পারে।

৩) শিখন পরিবেশকে জানা : শিশু যেখানে শিক্ষা লাভ করে সেই প্রতিষ্ঠান দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। বিদ্যালয় গৃহ, শ্রেণিকক্ষের আকার, বসার ব্যবস্থা, গ্রন্থাগার, পরীক্ষাগার, বিদ্যালয়ের বাগান, খেলার মাঠ, পাঠক্রমিক ও সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী, পরীক্ষা পদ্ধতি। বিদ্যালয় প্রশাসন, শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব, বিদ্যালয়ের প্রতি শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদি শিক্ষার্থীকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিক্ষা-মনোবিদ্যা শিক্ষককে এই সমস্ত শিক্ষা পরিবেশ সম্পর্কে জানতে সাহায্য করে।

৪) পাঠ্যক্রম সংগঠন : পাঠক্রম হচ্ছে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সমষ্টি যা শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কার্যকলাপের মধ্যে দিয়ে অর্জন করে। এই সমস্ত কার্যাবলীগুলো শিক্ষকের দ্বারাই পরিকল্পিত এবং সংগঠিত হয়। মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান শিশু কেন্দ্রিক পাঠক্রমকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শিক্ষককে সাহায্য করে।

৫) কার্যকরী শিক্ষণ পদ্ধতি গ্রহণ : আদর্শ শিক্ষণ পদ্ধতি শিক্ষার্থীকে শিখনের বিষয়ে প্রেষিত করে। আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতি মনোবিজ্ঞান ভিত্তিক। শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান শিক্ষককে উপযুক্ত শিক্ষাদান পদ্ধতি গ্রহণ করতে সহায়তা করে।

৬) বিভিন্ন অনুসন্ধানমূলক পদ্ধতি সম্পর্কে জানা : শিক্ষার বিভিন্ন অনুসন্ধানমূলক পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষকের ধারণা থাকা প্রয়োজন। যেমন—সাক্ষাৎকার পদ্ধতি, সার্ভে পদ্ধতি, পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি, পরীক্ষণ পদ্ধতি, কেস-স্টাডি পদ্ধতি, সোসিওমেট্রিক পদ্ধতি ইত্যাদি। এগুলো বিদ্যালয় কর্মসূচি সংগঠনের পূর্বে শিক্ষার্থী সম্পর্কে ধারণা লাভে সহায়তা করে।

মনোবিদ্যার জ্ঞান একজন দলনেতা এবং শিখন সহায়তাকারী হিসাবে শিক্ষককে তার নিজস্ব কর্তব্য সম্পর্কে ধারণা লাভে সহায়তা করে। এই জ্ঞান শিক্ষককে পেশাগত ভাবে দক্ষ হতে সাহায্য করে। তাই একজন শিক্ষকের পক্ষে মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জন করা বিশেষ প্রয়োজনীয়।

দ্বিতীয় একক

বৃদ্ধি ও বিকাশ

বৃদ্ধি ও বিকাশ (Growth and Development) :

পরিবর্তন প্রকৃতির স্বাভাবিক ধর্ম। তাই স্বাভাবিক কারণেই এই পরিবর্তনের ঢেউ প্রকৃতির অন্যান্য উপাদানের মতো মানবজীবনেও এসে লাগে। মানব জীবনে, মাতৃগর্ভে ভ্রূণের সূচনা থেকে প্রতি মুহূর্তের পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে ভ্রূণ পরিণত রূপ লাভ করলে শিশু ভূমিষ্ঠ হয়। তারপর এই পরিবর্তন এগিয়ে চলার মধ্যে দিয়ে একটি মানব শিশু ধীরে ধীরে তার শৈশব, বাল্য, কৈশোর পেরিয়ে একদিন একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষে পরিণত হয়। তারপর একসময় বৃদ্ধ অবস্থায় পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়। এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়া মানুষের জীবনে বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পায়। যেমন— বৃদ্ধি ও বিকাশ। অনেকে এই দুটি প্রক্রিয়াকে একই অর্থে ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু তাৎপর্যগত দিক থেকে দুটি প্রক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তবে বৃদ্ধি ও বিকাশ একই সঙ্গে সংগঠিত হয়।

বৃদ্ধির অর্থ : মানব দেহের বিভিন্ন মুখী পরিবর্তনকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা যায়— পরিমাণগত ও গুণগত। বৃদ্ধি পরিমাণগত পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার অন্তর্গত। এই পরিবর্তনকে দেখা বা পর্যবেক্ষণ করা যায় এবং সরাসরি মাপা যায়। বৃদ্ধি সাধারণভাবে শরীরের আকার, আয়তন, উচ্চতা এবং দৈর্ঘ্যের ক্রমবর্ধমান পরিমাণগত পরিবর্তনকে নির্দেশ করে। যাকে পরিমাপ করে বিভিন্ন পরিমাণগত মাত্রা অর্থাৎ ইঞ্চি, ফুট, সেন্টিমিটার, পাউন্ড, কিলোগ্রাম ইত্যাদি এককে প্রকাশ করা যায়। তবে এ প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখতে হবে প্রতিটি মুহূর্তেই বৃদ্ধি ঘটে চললেও তা বাইরের থেকে চোখে পড়ে না। তবে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণযোগ্য হয়। যেমন, একটি দু বছর বয়সী শিশুর মধ্যে প্রতিদিন যে পরিবর্তন ঘটে চলেছে তা হয়তো প্রতিদিন চোখে দেখে বোঝা যাবে না। কিন্তু দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে অর্থাৎ ছ'মাস বা এক বছর বা তারও বেশি সময়ের ব্যবধানে তা স্পষ্টভাবে লক্ষ করা সম্ভব।

বৃদ্ধি একটি নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত হয়। পরিণমন সম্পন্ন হলে বৃদ্ধিরও পরিসমাপ্তি ঘটে। সেই দিক থেকে বলা যায় পরিণমনের সঙ্গে বৃদ্ধির নিকট সম্পর্ক রয়েছে। মনোবিদ জরডন বার্ন্ট পিটারসন (Jordon Bernt Peterson) তাই বৃদ্ধি বলতে পরিণমনের পথে মানব শিশুর সেই ধরনের উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন যা পরিবেশিক প্রভাব এবং আভ্যন্তরীণ পরিণমনের ফল হিসাবে লাভ করা যায়। বৃদ্ধি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলোকে একত্রিত করে বৃদ্ধি সম্পর্কে বলা যায়— বৃদ্ধি হচ্ছে আকৃতি ও দেহগত পরিবর্তনের একটি নির্দিষ্ট সময়ভিত্তিক, পরিমাপযোগ্য সদর্থক পরিবর্তনের একটি ধারাবাহিক অগ্রগতিমূলক পরিবর্তন প্রক্রিয়া।

বিকাশের অর্থ :

প্রাণীর মধ্যে ক্রমপরিবর্তন কেবলমাত্র শারীরিক পরিবর্তনে সীমাবদ্ধ থাকে না। আমরা দেখেছি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যে ধরনের পরিবর্তন দেখা যায় তা পরিমাণগত পরিবর্তন। কিন্তু মানব জীবনে এমন কিছু পরিবর্তন দেখা যায় যা পরিমাণগত ও গুণগত উভয় ধরনেরই হয়ে থাকে। তাকে বলা হয় বিকাশ। এটি বৃদ্ধির তুলনায় অনেক বেশি ব্যাপক এবং অনেক বেশি জটিল প্রক্রিয়া। বৃদ্ধি বিকাশেরই একটি দিক। বিকাশের পরিমাণগত দিকটিই হল বৃদ্ধি। বিকাশের অপর যে দিকটি রয়েছে তা হল তার গুণগত পরিবর্তনের দিক। যার সবদিক পরিমাপ করা খুবই কঠিন।

ব্যক্তির সকল দিকের অর্থাৎ দৈহিক, মানসিক, সামাজিক এবং প্রাক্ষোভিক এই সমস্ত দিকের পরিবর্তনই বিকাশের অন্তর্গত। মাতৃগর্ভে ভ্রূণের সূচনা থেকে এর শুরু হয় / শেষ হয় মৃত্যুতে। বিকাশ বলতে বিশেষভাবে আকৃতিগত পরিবর্তনের সঙ্গো সঙ্গো কর্মক্ষমতার উৎকর্ষকে বোঝায়। যেমন—যখন আমরা বলি শিশুটির দৈহিক বিকাশ হয়েছে তখন শিশুটির দৈর্ঘ্য-প্রস্থের পরিবর্তন বা আকৃতিগত পরিবর্তনের সঙ্গো সঙ্গো তার কর্মক্ষমতাগত উন্নয়নের কথাও বোঝান হয়। আর ঠিক এই কারণেই একটি দু'বছরের শিশুর হাত-পা ইত্যাদির দৈর্ঘ্য প্রস্থের পার্থক্য হয় এবং দু'বছরের শিশু যতটা ভারী ওজন তুলতে পারে একটি দশ বছরের শিশু তার থেকে বেশি ভারী ওজন তুলতে পারে।

মনোবিজ্ঞানী এলিজাবেথ বার্গনার হারলক (Elizabeth Bergner Hurlock) বিকাশ বলতে বুঝিয়েছেন— অভিজ্ঞতা ও পরিণমনের ফলে ক্রমউন্নয়নশীল পরিবর্তনের একটি প্রক্রিয়া।

বৃদ্ধি ও বিকাশের পার্থক্য :

উল্লেখিত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে বৃদ্ধি ও বিকাশ এই দুটি প্রক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য বর্তমান। নিচে পৃথকভাবে তা উল্লেখ করা হল—

বৃদ্ধি	বিকাশ
বৃদ্ধি সম্পূর্ণভাবে শারীরিক পরিবর্তনকে অর্থাৎ আকার, উচ্চতা ও ওজনগত পরিবর্তনকে বোঝায়।	বিকাশ বলতে পরিণমনের উদ্দেশ্যে জীবের আকৃতি ও বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কর্মক্ষমতাগত পরিবর্তনকে বোঝায়।
বৃদ্ধি সারাজীবন ধরে হয় না, একটি নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত হয়। পরিণমন সম্পন্ন হলে বৃদ্ধিরও পরিসমাপ্তি ঘটে।	বিকাশ হচ্ছে জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। জন্মাবস্থায় তা শুরু হয়, শেষ হয় মৃত্যুতে। পরিণমনে তার পরিসমাপ্তি ঘটে না। এমনকি বৃদ্ধি থেমে গেলেও বিকাশ চলতে থাকে।
বৃদ্ধি হল বিকাশের একটি দিক। বিকাশের পরিমাণগত পরিবর্তনের দিকটি হল বৃদ্ধি।	বিকাশ হল একটি ব্যাপক শব্দ। বিকাশের ফলে মানবজীবনে গুণগত ও পরিমাণগত উভয় ধরনের পরিবর্তন ঘটে।
বৃদ্ধির ফলে যে পরিবর্তন আসে তা পরিমাপযোগ্য।	বিকাশের ফলে যে পরিবর্তন আসে তা কেবল বাইরের থেকে পর্যবেক্ষণযোগ্য।

বৃদ্ধি বলতে প্রধানত দৈহিক পরিবর্তনকে বোঝায়।	ব্যক্তির দৈহিক, মানসিক, সামাজিক ও প্রাক্ষোভিক পরিবর্তন সবকিছুই বিকাশের অন্তর্ভুক্ত।
বৃদ্ধি হল কারণ।	বিকাশ তার ফল।
বৃদ্ধি স্বত:স্ফূর্তভাবে ঘটতে থাকে। তবে বৃদ্ধির উপর অনুশীলনের যথেষ্ট প্রভাব দেখা যায়।	ব্যক্তির সক্রিয়তা ও অনুশীলন দুই-ই বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।
বৃদ্ধি হলেও বিকাশ নাও হতে পারে। একটি শিশু মোটা হওয়ার ফলে তার ওজন বৃদ্ধি পেতে পারে, কিন্তু তাতে তার কর্মক্ষমতার গুণগত পরিবর্তন ঘটবে তা বলা যায় না।	বৃদ্ধি ছাড়া বিকাশ সম্ভব। যেমন- কোন শিশুর উচ্চতা, ওজন বা আকারগতভাবে পরিবর্তিত না হয়েও দৈহিক, মানসিক, সামাজিক বা প্রাক্ষোভিক ক্ষমতাগত দিকে অভিজ্ঞ হতে পারে।
বৃদ্ধি জন্মগত ক্ষমতা।	জন্মগত ও পারিবেশিক জটিল উপাদান বিকাশকে নির্ধারণ করে।

বৃদ্ধি ও বিকাশের প্রক্রিয়াটিকে স্পষ্টভাবে বোঝানোর উদ্দেশ্যে এদের মধ্যে পার্থক্য করা হলেও বাস্তবক্ষেত্রে এই দুই পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে আলাদা করা যায় না। কারণ পরিমাণগত পরিবর্তন ছাড়া গুণগত পরিবর্তনকে উপলব্ধি করা যায় না। আবার গুণগত পরিবর্তন ছাড়া পরিমাণগত পরিবর্তনের তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায় না। তাই এই দুই প্রক্রিয়া পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। একটি ছাড়া অপরটি অর্থহীন।

বৃদ্ধি ও বিকাশের সাধারণ নীতি :

বৃদ্ধির নীতি :

১) নিরবিচ্ছিন্ন ও ধারাবাহিক প্রক্রিয়া : মানব জীবনের বৃদ্ধি ও বিকাশের ধারাকে সঠিকভাবে অনুশীলন করার জন্য মনোবিজ্ঞানীগণ তাকে কয়েকটি স্তরে ভাগ করেছেন। যদিও মানব জীবনকে এইভাবে ভাগ করা যায় না। মানবশিশুর বৃদ্ধিকে সাধারণভাবে শৈশব, বাল্য, কৈশোর এবং প্রাপ্তবয়স্ক এই স্তরগুলোতে বিভক্ত করা হয়েছে। এই স্তর গুলোর মধ্যে কোন ফাঁক বা ব্যবধান নেই। মানব বৃদ্ধি নিরবচ্ছিন্ন ও ধারাবাহিকভাবে একটি স্তর থেকে অন্য স্তরে এগিয়ে যায় এবং একটি শিশু উচ্চতা ও ওজন বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে শৈশব, বাল্য, কৈশোর পেরিয়ে প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিতে পরিণত হয়। কোন একটি সময়ে বৃদ্ধির প্রক্রিয়াটি থেমে গিয়ে আবার শুরু হয় এ ধরনের ঘটনা ঘটে না। এই কারণে বৃদ্ধিকে নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া বলা যায়।

২) বৃদ্ধির হারে তারতম্য : বিভিন্ন বয়সে শিশুর বৃদ্ধির হারের সঙ্গে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় । যেমন— জন্মের পর থেকে দুই আড়াই বছর পর্যন্ত বৃদ্ধির হার খুব বেশি থাকে। তারপর বৃদ্ধির হার কিছুটা হ্রাস পায়। আবার বয়:সন্ধিকালে এই হার আবার বৃদ্ধি পায়। শিশু পরিণমনের স্তরের দিকে যত অগ্রসর হয়, এই হার ক্রমশ কমতে থাকে। পূর্ণ পরিণমন স্তরে পৌঁছলে বৃদ্ধি প্রক্রিয়া সমাপ্ত হয়। বিভিন্ন বয়সে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের পরিণমনের হারের মধ্যেও পার্থক্য দেখা যায়। শৈশবে হাতের তুলনায় পায়ের বৃদ্ধি দ্রুত হয়। বিভিন্ন যৌন অঙ্গের তুলনায় মস্তিষ্কের বৃদ্ধি বেশি দ্রুত হয়। বিভিন্ন অঙ্গের বৃদ্ধির হারের দিক থেকে এক

ব্যক্তির সঙ্গে অন্য ব্যক্তির পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এর জন্য দায়ী ব্যক্তিগত বৈষম্য। আর এই বৈষম্যের কারণেই কোনো কোনো শিশুর উচ্চতা, ওজন দ্রুত হারে বৃদ্ধি পায়। আবার কোনো কোনো শিশুর ক্ষেত্রে খুব ধীর গতিতে উচ্চতা, ওজন বৃদ্ধি পায়।

৩) বৃদ্ধির গতি সাধারণ থেকে বিশেষের দিকে : জীবনের প্রথম পর্যায়ে বৃদ্ধির অভিমুখ থাকে সাধারণ থেকে বিশেষের দিকে। তাই জীবনের প্রথম পর্যায়ে কোন বিষয়ে মানুষের আচরণগুলি থাকে সামগ্রিক। ক্রমশ: সে বিশেষ আচরণগত প্রতিক্রিয়ার জন্য বিশেষ অঙ্গ ব্যবহার করতে শেখে। যেমন— প্রথম দিকে শিশু কোন কিছু ধরার জন্য হাত পা ও সম্পূর্ণ দেহ কাজে লাগানোর চেষ্টা করে। কিন্তু ক্রমশ যত বড় হয় তখন কিছু ধরার জন্য নির্দিষ্ট অঙ্গ ব্যবহার করে। কিংবা প্রথম দিকে একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাওয়ার জন্য হাত এবং পা দুটোই সে ব্যবহার করে কিন্তু বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে যখন হাঁটতে শেখে তখন হাঁটার সময় কেবলমাত্র পা ব্যবহার করে এবং হাত দুটোকে অন্য কাজে লাগায়।

৪) বৃদ্ধি অনুশীলন দ্বারা প্রভাবিত : অনুশীলন বৃদ্ধির হারকে তরান্বিত করতে পারে। এ ব্যাপারে মনোবিজ্ঞানীগণের একাধিক পরীক্ষা থেকে ধনাত্মক প্রভাবের প্রমাণ পাওয়া গেছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় শরীর চর্চা অনুশীলন দ্বারা শারীরিক বৃদ্ধির হার তরান্বিত করা যায়।

৫) বৃদ্ধি কেবলমাত্র শারীরিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ : বৃদ্ধি সকল জীবের বৈশিষ্ট্য। বৃদ্ধির দ্বারা শারীরিক পরিবর্তনের দিকটিকেই বিশেষভাবে নির্দেশ করা হয়। মানসিক, প্রাক্ষোভিক, সামাজিক, নৈতিক পরিবর্তন কতটা হয়েছে— তা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাই বলা যায় বৃদ্ধির ধারণা কেবলমাত্র শারীরিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। একটি নির্দিষ্ট বয়সে বৃদ্ধি ও নির্দিষ্ট ধরনেরই হয়। প্রাক শৈশবে শিশুর উচ্চতা ওজন দ্রুত হারে বৃদ্ধি পায়। বাল্যকালে এই গতি কিছুটা হ্রাস পায়। বয়:সন্ধিকালে উচ্চতা ও ওজনের হঠাৎ বৃদ্ধির মধ্যে দিয়ে শারীরিক পরিবর্তন বিশেষভাবে চোখে পড়ে। এই সময় কিশোর কিশোরীদের দেহে বিভিন্ন ধরনের শারীরিক বৃদ্ধির লক্ষণ ফুটে ওঠে। এই ধরনের দ্রুত শারীরিক পরিবর্তন কিশোর কিশোরীদের সঞ্চালন ক্ষমতারও বৃদ্ধি ঘটায়। শরীরের আকার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রেরও বৃদ্ধি ঘটে। যার প্রভাবে একটি শিশু মানসিক দিক থেকে সমর্থ হয়ে ওঠে। এই সামর্থ্য তার ভাষাগত ও আবেগমূলক বিকাশকে তরান্বিত করে।

বিকাশের নীতি :

মনোবিজ্ঞানীগণ পরীক্ষা নীরিক্ষার মাধ্যমে লক্ষ্য করেছেন যে বিকাশ প্রথম অবস্থা থেকেই একটি যৌক্তিক এবং পর্যায়ক্রমিক ধরনকে অনুসরণ করে এগিয়ে চলে। এটিই প্রমাণ করে যে বিকাশ কিছু সাধারণ নিয়ম বা নীতি দ্বারা পরিচালিত হয়। যাকে বিকাশের নীতি বলা যায়। সেই নীতিগুলো সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া হল।

১) অবিচ্ছিন্নতার নীতি : বিকাশ অবিচ্ছিন্ন গতিতে এগিয়ে চলে। মাতৃগর্ভে ভ্রূণ সঞ্চার থেকে এর শুরু হয়। শেষ হয় মৃত্যুতে। বিকাশের ফলে যে পরিবর্তন দেখা দেয় তা কোন আকস্মিক ঘটনা নয়, এটি সময় সাপেক্ষ এবং একটি পর্যায়ক্রমিক ধারাকে অনুসরণ করে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে। আলোচনার সুবিধার্থে আর্নেস্ট জোনস, পিকুনাস প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীগণ এই বিকাশের ধারাকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন। বাস্তবে

যদিও মানব জীবনকে এইভাবে সময়ে রেখা টেনে ভাগ করা সম্ভব নয়। যাই হোক, এই পর্যায়গুলো হল শৈশব (Infancy), বাল্যকাল (Childhood), কৈশোর (Adolesence), প্রাপ্ত বয়স্কস্তর (Adulthood)। এই বিভাগের ক্ষেত্রে আবার বিভিন্ন মনোবিদদের মধ্যে মত পার্থক্য আছে। তবে পর্যায় নিয়ে যতই মতবিরোধ থাকুক না কেন, একথা সকলের স্বীকার করেন যে, এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে উপনীত হওয়াটা কোন আকস্মিক ঘটনা বা বিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া নয়। এটি নিরবিচ্ছিন্নভাবেই এগিয়ে চলে।

২) **নমুনাগত সাদৃশ্যের নীতি :** মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যক্তিগত বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও প্রত্যেক মানব শিশু বিকাশের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট ধাঁচ অনুসরণ করে। আগের ধাপকে অনুসরণ করে পরের ধাপটি এগিয়ে চলে। যেমন— সঞ্চালনমূলক বিকাশের ক্ষেত্রে প্রথমে দেখা যায় হাত পা নাড়াচাড়া, তারপর আসে কনুই এবং হাঁটুর সংযোগ স্থলের নাড়া-চাড়া এবং অবশেষে ঘটে আঙুল নাড়া-চাড়ার বিশিষ্ট প্রক্রিয়াগুলো।

৩) **ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতি :** ব্যক্তিভেদে বিকাশ প্রক্রিয়ায় পার্থক্য হয়। সেটা যমজ শিশুর ক্ষেত্রেও একইভাবে সত্য। আর এই কারণেই সমস্ত শিশু বিকাশের সকল পর্যায়ে একই সময়ে পৌঁছায় না। বিকাশের ক্ষেত্রে একটি সাধারণ নিয়ম হচ্ছে— শিশু প্রথমেই দৌড়াতে পারে না। সে প্রথমে বসতে শেখে, তারপর হামাগুড়ি দেয়, তারপর হাঁটতে শেখে এবং সবশেষে দৌড়াতে শেখে। কিন্তু প্রত্যেকটি শিশুই যে একটি নির্দিষ্ট বয়সেই এই কাজগুলো করতে শিখবে তা নয়। কখনও তা তরান্বিত কখনও বা বিলম্বিত হতে পারে। তাছাড়া ব্যক্তিভেদে দৈহিক, মানসিক, সামাজিক ও প্রাক্ষোভিক বিকাশেরও তারতম্য হতে পারে। মনোবিজ্ঞানীদের মতো পরিবারের সামাজিক ও আবেগমূলক বাতাবরণ এবং পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা শিশুর মধ্যে ব্যক্তিগত বৈষম্য সৃষ্টির জন্য দায়ী থাকে।

৪) **বিভিন্ন অঙ্গের বিকাশের হারের বিভিন্নতার নীতি :** বিকাশের সময় শরীরের বিভিন্ন তন্ত্রগুলো বিভিন্ন গতিতে বিকাশ লাভ করে। যেমন, মানব মস্তিষ্ক জন্মের আগে ও পরে খুব দ্রুত বিকাশ লাভ করে এবং বয়:সন্ধি স্তরে পৌঁছানোর কয়েক বছর আগেই তা পূর্ণ ওজন লাভ করে। অন্যদিকে বিভিন্ন যৌন অঙ্গাগুলো জীবনের প্রথম দিকে খুব সামান্য পরিবর্তিত হয়। বয়:সন্ধিকালে তার দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে।

৫) **নতুন ক্ষমতা অর্জনের জন্য প্রস্তুতির নীতি :** বিকাশের প্রক্রিয়ায় শিশুর কোন নতুন ক্ষমতা বা দক্ষতা অর্জন করার আগে পূর্ব প্রস্তুতি চলতে থাকে। যেমন— মুখ দিয়ে বিভিন্ন অর্থহীন শব্দ উচ্চারণ করতে করতে একসময় ভাষাকে আয়ত্ত করতে পারে। হাত পা ছুঁড়ে খেলাধূলা করতে করতে ক্রমে জটিল খেলাধূলা করতে পারে।

৬) **অনুশীলনের মাধ্যমে বিকাশের আকাঙ্খার নীতি :** বিকাশের প্রক্রিয়ায় ব্যক্তির মধ্যে যে পরিবর্তনগুলো হতে থাকে ক্রমাগত চর্চার মধ্যে দিয়ে সেগুলোকে উন্নত করার প্রচণ্ড ইচ্ছা লক্ষ করা যায়। যেমন— শিশুর মুখে যখন আধো আধো বুলি ফোটে বা সে হামাগুঁড়ি দিতে শেখে তখন সে ঐ কাজটি ঘন্টার পর ঘণ্টা অনুশীলন করে। আবার যেই মাত্র হাঁটা শিখে ফেলে তখন হামাগুঁড়ি বন্ধ হয়ে যায় এবং তখন ঐ কাজটিরই চর্চা করে।

৭) **Cephalocaudal এবং Proximodistal প্রবণতার নীতি :**

মস্তিষ্ক ও দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিকাশ যে ক্রম অনুসারে হয় তাকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়—

(i) Cephalocaudal Order (ii) Proximodistal Order.

সেফালোকডাল প্রবণতা অনুযায়ী বিকাশের গতি দৈর্ঘ্য বরাবর এগোয়। অর্থাৎ মাথা থেকে পায়ের দিকে। সাধারণভাবে বলা হয় শরীরের উপরের অংশের বিকাশকে নীচের অংশের বিকাশ অনুসরণ করে। Cephal কথাটির অর্থ মাথা। এই কারণেই শিশু দাঁড়ানোর সামর্থ্য লাভ করার আগে মাথা এবং বাহুর উপর তার নিয়ন্ত্রণ গড়ে তোলে তারপর তার পায়ের উপর।

প্রক্সিমডিস্টাল প্রবণতা অনুযায়ী বিকাশ মস্তিষ্কের কাছে থেকে দূরের দিকে এগিয়ে যায়। আর এই কারণেই শিশু প্রথমে বৃহৎ পেশিগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ লাভের অনুশীলন করে। অর্থাৎ হাতের দীর্ঘ পেশিগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ আসার পর ক্ষুদ্র পেশি অর্থাৎ আঙুলের উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করে।

৮) বহুবিধ উপাদানের প্রভাবের নীতি : মানুষের বৃদ্ধি ও বিকাশ অত্যন্ত জটিল প্রক্রিয়া, যা বহুবিধ উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। এই উপাদানগুলোর হল— স্বাস্থ্য, পুষ্টি, গ্রন্থিসমূহের আভ্যন্তরীণ ক্ষরণ এবং যেখানে বসবাস করে সেই পরিবেশ, বংশগতি।

৯) বিভিন্ন পর্যায়ে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের নীতি : বিকাশের প্রতিটি স্তরের পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন— খেলার সামগ্রী ও পরিস্থিতি বাস্তবে একরকম থাকলেও একটি এক বছরের ও একটি চার বছরের শিশুর খেলার মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। বিভিন্ন স্তরের এই বৈশিষ্ট্যগুলো জানা থাকলে শিক্ষকগণ শিশুর কাছ থেকে চাওয়ার সীমা সম্পর্কে ধারণা গঠন করতে পারবেন।

১০) সর্পিল বনাম রৈখিক গতির নীতি : বিকাশ যে পথ ধরে এগিয়ে যায় তা সোজা বা রৈখিক পথ নয়, এটি সর্পিল গতিতে এগিয়ে যায়। শিশুর যে কোন স্তরের বিকাশের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট পথ এগিয়ে যাওয়ার পর সর্পিল ভঙ্গিতে বিকাশ আবার পিছনে ফিরে তারপর আবার সামনের দিকে এগিয়ে যায়। এই কারণেই বিকাশের যে কোন স্তরে তার পূর্ববর্তী স্তরের বৈশিষ্ট্যও পরিলক্ষিত হয়। যেমন— বাল্যস্তর অতিক্রম করে বিকাশ যখন কৈশোর স্তরে পৌঁছায় তখন কখনও কখনও কিশোর কিশোরীদের আচরণে বাল্যের কিছু কিছু আচরণের প্রতিফলন দেখা যায়।

এইভাবে আবার পিছনে ঘুরে আসে। প্রথমদিকে ব্যক্তি এইভাবে এগিয়ে যায়। এই বিন্দু থেকে ব্যক্তির বিকাশ ও বৃদ্ধি শুরু হয়।

তৃতীয় একক বিকাশের বিভিন্ন স্তরের বৈশিষ্ট্য ও চাহিদা

মানব শিশু জন্মের সময় কিছু ক্ষমতা ও সম্ভাবনা নিয়ে জন্মায়। নবজাতকের মধ্যে এই ক্ষমতা ও সম্ভাবনাগুলো থাকে অত্যন্ত অপরিণত ও অবিকশিত। জীবনের এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই সম্ভাবনাগুলো, পরিবেশের প্রভাবে ধীরে ধীরে বিকশিত হয় এবং পরিণত রূপ লাভ করে। মনোবিদগণ মনে করেন ব্যক্তি জীবনের বিকাশ তার বংশগতি ও পরিবেশের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফল অর্থাৎ ব্যক্তির বিকাশ হল জন্মগতভাবে পাওয়া বিভিন্ন ক্ষমতা ও সম্ভাবনার এবং বিশেষ মুহূর্তে পরিবেশ তার উপর কিভাবে ক্রিয়াশীল তার উপর নির্ভর করে।

ব্যক্তিজীবনে বিকাশের ধারা স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে। অর্থাৎ কোনো বিশেষ বয়সের একজন শিশুর বিকাশের ধারার সঙ্গে সেই বয়সের অন্য আরেকটি শিশুর বিকাশের মিল থাকে না। পাশাপাশি এটাও উল্লেখ করা দরকার যে এই বৈশিষ্ট্যগুলো আবার বিশেষ নিয়মও মেনে চলে। এদের মধ্যে নানা স্বাতন্ত্র্য সত্বেও ঐক্যও বর্তমান। প্রত্যেক ধরনের বিকাশ একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। একটি অপরিণত মানব শিশু ধীরে ধীরে এই বিকাশের ধারাপথ ধীরে এগিয়ে যেতে যেতে একসময় প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিতে পরিণত হয়। তারপর বৃদ্ধ বয়সে জীবনাবসানে পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়। মানব জীবনের এই সুদীর্ঘ পরিক্রমা ঘটে চলে নিরবিচ্ছিন্ন ধারায়। তার মধ্যে নেই কোন ফাঁক, নেই কোন বিরতি। তবে মনোবিজ্ঞানীগণ আলোচনা ও বোঝার সুবিধার্থে বৈশিষ্ট্যগুলোর ক্রমশ: পরিণত অবস্থাগুলোকে কয়েকটি স্তরে ভাগ করেছেন। তবে এই স্তর বিভাজনেও মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে পার্থক্য বর্তমান। কেউ কেউ এই বিকাশ ধারাকে বয়স অনুযায়ী, আবার কেউ শিক্ষাক্রম অনুযায়ী ভাগ করেছেন। তবে যে ধরনের শ্রেণিবিভাগকেই ধরি না কেন, লক্ষ্য করলে দেখা যাবে প্রত্যেকেই ব্যক্ত জীবনের বিকাশের অবিচ্ছিন্নতাকে স্বীকার করেছেন। তাই এদের মধ্যে থেকে একটি সাধারণ বিকাশমূলক বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রেণিবিভাগ করে আমরা আমাদের আলোচনাকে এগিয়ে নিয়ে যাব। এই শ্রেণিবিভাগগুলো হল নিম্নরূপ—

শৈশবস্তর — জন্মের পর থেকে পরবর্তী ৩ বছর।
প্রাক্ বা প্রাথমিক বাল্যস্তর — ৩-৭ বছর।
প্রান্তীয় বাল্যস্তর — ৭-১২ বছর।
কৈশোর স্তর — ১২-১৮বছর/২০বছর।
বয়স্ক স্তর — ১৮/২০ বছর - পরবর্তী জীবনকাল।

শিক্ষক ও অভিভাবকের পক্ষে বিকাশের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে ধারণা থাকা অত্যন্ত জরুরী। শৈশবের বিকাশমূলক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্ঞান অভিভাবককে শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশের অনুকূল পরিবেশ গড়ে তুলতে সহায়তা করে। প্রাথমিক বাল্যকাল হচ্ছে ভবিষ্যত শিক্ষার প্রস্তুতির স্তর। তাই এই স্তরের

বিকাশের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্ঞান শিক্ষা বিষয়ক পরিকল্পনাকারী, শিক্ষক এবং অভিভাবকে প্রাথমিক বাল্যকালের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা পরিকল্পনা করতে সহায়তা করে। প্রান্তীয় বাল্যকালও জীবনের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ স্তর। কারণ এই স্তরে শিশু তার প্রাথমিক শিক্ষাকে সমাপ্ত করে । বয়:সন্ধিকালটি মানবজীবনের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ স্তর। কারণ এই সময় দেহে ও মনে বিরাট পরিবর্তন আসে যা আর কোন স্তরে হয় না। এই স্তরে নানা চাহিদা ও সমস্যার উদয় হয়। তাই শিক্ষক, অভিভাবক সকলের পক্ষে এই স্তরগুলো সম্পর্কে বিস্তৃত জ্ঞান রাখাটা অত্যন্ত জরুরী। আমাদের আলোচনাকে উল্লেখিত স্তরগুলোর দৈহিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক ও সামাজিক পরিবর্তন সংক্রান্ত আলোচনায় সীমাবদ্ধ রাখবো। মানব জীবনে দৈহিক বিকাশ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক। কারণ মানসিক, প্রাক্ষোভিক, সামাজিক সমস্ত ধরনের বিকাশই দৈহিক বিকাশের উপর নির্ভরশীল।

শৈশবস্তর (০—৩ বৎসর)

দৈহিক বিকাশ : জন্মের পর থেকে প্রথম দু'বছর শিশুর খুব দ্রুত শারীরিক বৃদ্ধি ঘটে। পরে সেই হার ক্রমশ: কমে যায়। জন্মের সময় শিশুর দৈর্ঘ্য ১৭-২১ ইঞ্চি থাকে। তবে জাতিগত বা বংশগত কারণে এর তারতম্য ঘটতে পারে। শৈশবের প্রথম দিকে বছরে ১০-১৫ ইঞ্চি বাড়ে। মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের উচ্চতা এই সময় কিছু বেশি হয়।

জন্মের সময় ওজন সাধারণত ২.৫ থেকে ৪ কেজি মধ্যে থাকে। জন্মের পর প্রথম সাতদিনে প্রায় ৮ ভাগের ১ অংশ ওজন কমে যায়। একমাস পর তা আবার বাড়তে থাকে। চারমাসে ওজন দ্বিগুণ হয়। সাধারণভাবে মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় হাল্কা থেকে।

শুধুমাত্র উচ্চতা ও ওজনই নয় অন্যান্য অঙ্গা-প্রত্যঙ্গা, যেমন-গলা, হাত, পা লম্বা হয়। কাঁধের হাড় ও পায়ের পাতা প্রশস্ত হয়। নাকের আকৃতির পরিবর্তন হয় । জন্মাবস্থায় শিশুর থুত্নি দেখা যায় না। শৈশবের প্রথম দিকে থুতনি স্পষ্ট হয়।

শিশুর দেহের বাহ্যিক দিকের বিকাশের সঙ্গো সঙ্গো দেহের অভ্যন্তরের শ্বসনতন্ত্র, পাচনতন্ত্র, রক্ত সংবহন তন্ত্র ইত্যাদিরও বিকাশ সাধন ঘটে। ফুসফুসের আয়তন বৃদ্ধির ফলে শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়া স্বাভাবিক হারে হয়।

জন্মের পর থেকে তিন/চার বছর বয়স পর্যন্ত অত্যন্ত দ্রুত হারে স্নায়ুতন্ত্রের বিকাশ হয়। তারপর ধীরে ধীরে এই বিকাশের গতি ক্রমশ: হ্রাস পেতে থাকে। তবে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গো সঙ্গো স্নায়ুতন্ত্রের জটিলতা ও সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

দেহের বিভিন্ন দিকের বিকাশের পাশাপাশি অঙ্গাগুলোর কর্মক্ষমতারও বিকাশ হয়। বিশেষভাবে কর্মেন্দ্রিয় বা পেশির কাজের দক্ষতা বাড়ে। কর্মেন্দ্রিয়গুলোর সক্রিয়তা ও পেশিতন্ত্রের সামঞ্জস্যপূর্ণ নিয়ন্ত্রণকেই বলা হয় সঞ্চালন মূলক বিকাশ। পেশির ক্রিয়াশীলতার বিকাশের ফল হিসাবেই একমাসে শিশু মাথা তুলতে পারে। চারমাসে অন্যের সাহায্যে বসতে পারে। আটমাসে হামাগুঁড়ি দিতে, দশমাসে কারো সাহায্যে দাঁড়াতে পারে। এগারো মাসে কারো সাহায্য পেলে চলতে পারে। ক্রমশ শিশু জটিল কাজ করার ক্ষমতার অধিকারী হয়। সে লাফাতে, দৌড়াতে, উঠতে, নামতে প্রভৃতি নানা প্রকারের কাজ করার ক্ষমতা লাভ করে।

মানসিক বিকাশ : নবজাত শিশু জন্ম সময়ে থাকে অত্যন্ত অসহায় ও পরনির্ভরশীল। ধীরে ধীরে বিভিন্ন ধরনের বিকাশের ফল হিসাবে সে তার অসহায়ত্ব কাটিয়ে স্বনির্ভর হয়ে ওঠে। এই বিকাশেরই একটি দিক হচ্ছে শিশুর মানসিক বিকাশ। এই ধরনের বিকাশের প্রথম দিকে শিশু বিভিন্ন সংবেদনগুলোকে পৃথক করে অর্থ নির্ণয় করতে পারে না। ক্রমশ: শিশু এক সংবেদন থেকে অন্য সংবেদনকে আলাদা করতে শেখে। বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় বা বস্তুর মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করতে পারে। নিজের মাকে অন্যদের থেকে পৃথক করতে শেখে। তাছাড়া প্রান্তীয় শৈশবকালে শিশুর মধ্যে কৌতূহল প্রবৃত্তি, স্মৃতিশক্তি, কল্পনাশক্তি, চিন্তনশক্তি ইত্যাদি বিকাশ ঘটতে থাকে। এই বয়সে শিশুর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল সর্বপ্রাণবাদ। অর্থাৎ সমস্ত বস্তুকে সজীব বা প্রাণবান মনে করে।

মানসিক বিকাশের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হল ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতা অর্জন। ছয় মাসের শিশু অস্ফুটভাবে কয়েকটি বর্ণ উচ্চারণ করতে পারে। এক বছর বয়স থেকেই সে কথা বলতে শেখে। দুই থেকে তিন বছরের মধ্যে মোটামুটি মনের ভাবকে প্রকাশ করার জন্যযতটুকু ভাষা জানা দরকার তা সে শিখে ফেলে। শিশুর ভাষার বিকাশের উপর বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীদের গবেষণালব্ধ ফল থেকে দেখা যায় যে শব্দ আয়ত্ব করার হার সমবয়সীদের ক্ষেত্রে প্রায় একই রকমের হয়।

প্রাক্ষোভিক বিকাশ : শৈশবে চিন্তনশক্তি ও বিচারশক্তি অপরিণত অবস্থায় থাকে বলে শিশু প্রধানত আবেগের দ্বারাই পরিচালিত হয়। শৈশবে শিশুর আবেগ অ-নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় থাকে। সদ্যোজাত শিশুর মধ্যে যে ধরনের প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়া দেখা যায় তা খুব একটা স্পষ্ট নয়। জন্মের পর প্রথম দু'মাস পর্যন্ত শিশু তার চারপাশের বস্তু ও ব্যক্তি সম্পর্কে কোন আগ্রহ দেখায় না। তার ইন্দ্রিয়গুলো তখন থাকে অপরিপুষ্ট। মস্তিষ্কের স্নায়ুর সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের যোগাযোগ করার ক্ষমতা তখনও ভালোভাবে হয় না। এই অবস্থায় তার দৈহিক চাহিদাকে কেন্দ্র করে যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয় তার প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই তার প্রথম প্রক্ষোভের বহিপ্রকাশ দেখা যায়। সেই হিসাবে কান্নাই হচ্ছে তার প্রথম প্রক্ষোভমূলক আচরণ। যেমন— খিদে পেলে, তেস্টা পেলে বা ব্যাথার সময় তার শারীরিক অস্বস্তিকে বোঝানোর জন্য কাঁদে, ধীরে ধীরে স্নায়ু ও মস্তিষ্কের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য আবেগের উন্মেষ ঘটে। ক্যাথরিন ব্রিজেসের মতে তিনমাস বয়স থেকে প্রক্ষোভের পৃথকীকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই সময় শিশুর মৌলিক সাধারণধর্মী উত্তেজনা থেকে প্রথমে দু'ধরনের প্রক্ষোভের জন্ম নেয়— আনন্দ ও অস্বাচ্ছন্দ্য বা দু:খভাব শিশু সমস্ত বিষয়ে তার মায়ের উপর নির্ভর করে এবং তার প্রতি মায়ের মনোযোগ সে নিরন্তর প্রত্যাশ্যা করে। তাই মায়ের উপস্থিতিতে সে আনন্দে থাকে। তার থেকে বিচ্ছিন্ন হলে সে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে যা কান্নার মাধ্যমে প্রকাশ করে। ছ'মাস বয়স থেকে শিশু পরিচিত মুখ দেখলে হাসতে শেখে। পরে বয়:বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই হাসিই উচ্চ হাসির রূপ গ্রহণ করে। ১০ মাসে বড়োদের প্রতি অর্থাৎ বাবা মা এবং অন্যান্য পরিচিত মুখকে ভালবাসতে শুরু করে এবং ১৫ মাস বয়সে অন্য ছোট শিশুদের ভালবাসা প্রকাশ করতে শেখে। অন্যদিকে অস্বাচ্ছন্দ্য বা দু:খভাব থেকে ৪ মাস বয়সে রাগে, ৫ মাসে বিরক্তিতে, ৬ মাস বয়সে ভয় এবং ১৫ মাস বয়সে হিংসার সৃষ্টি হয়। নীচে ছকের মাধ্যমে বিষয়টি দেখানো হলো —

প্রক্ষোভ

জন্মের পর সাধারণ উত্তেজনা

আনন্দ (৩ মাস) → উচ্ছ্বাস (৩মাস) → বড়োদের প্রতি ভালবাসা (১০মাস) → ছোটোদের প্রতি ভালবাসা (১৫মাস)

অস্বাচ্ছন্দ্য (৩মাস) → রাগ (৪মাস) → বিরক্তি (৫ মাস) → ভয় (৬মাস) → হিংসা (১৬মাস)

ধীরে ধীরে শিশুর যখন ভাষার বিকাশ হয়, তখন সে তার আবেগকে ভাষার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করতে শেখে। তাছাড়া বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারও বৃদ্ধি পেতে থাকে। এক্ষেত্রে অন্য নতুন নতুন উদ্দীপক যেমন প্রক্ষোভ সৃষ্টি করতে পারে, তেমনি পুরোনো উদ্দীপক প্রক্ষোভ জাগ্রত করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলতে পারে। যেমন— আগে উচ্চ শব্দ শিশুর মধ্যে যে ভয় সৃষ্টি করতো বড় হবার পর তা আর শিশুর মধ্যে ভয়ের প্রক্ষোভ সৃষ্টি করে না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতা, ধারণা ও কল্পনার বিকাশের ফলে প্রাক্ষোভিক উদ্দীপনার বিস্তৃতি ঘটে। যেমন— শিশুর মধ্যে কল্পনার বিকাশের ফলে কোন কাল্পনিক পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে শিশুর মধ্যে প্রক্ষোভ সৃষ্টি হতে পারে।

বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশু মনের দিক থেকে যত পরিণত হতে থাকে প্রক্ষোভের বাহ্যিক প্রকাশের তীব্রতা তত কমে আসে। এবং আচরণেও যথেষ্ট সংযত ও মার্জিতভাবে দেখা দেয়। যেমন-৩/৪ বছরের শিশু রেগে গেলে, চিৎকার করে কাঁদে, হাত-পা ছোঁড়ে কিন্তু ১০/১২ বছর বয়সে সে রাগ হলে অনুরূপভাবে রাগকে প্রকাশ করে না। আর বেশি বয়সে রাগ হলে একেবারেই কাঁদে না, দৈহিক প্রকাশ অনেক বেশি মার্জিত ও সংযত হয়।

সামাজিক বিকাশ : জন্মাবস্থায় শিশু থাকে সম্পূর্ণ আত্মকেন্দ্রিক। এই আত্মকেন্দ্রিকতার গণ্ডীর বাইরে গিয়ে সে কোন প্রতিক্রিয়া করতে পারে না। জন্মের পর প্রায় দু'মাস পর্যন্ত শিশু কেবলমাত্র তীক্ষ্ণ উদ্দীপকের প্রতি প্রতিক্রিয়া করতে পারে। এই অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে শিশুর সামাজিক বিকাশ বা সামাজিকীকরণ শুরু হয়। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক রীতিনীতি ও আচরণ আয়ত্ত করণের প্রক্রিয়াই হল সামাজিকীকরণ। 'মা'কে চেনার মধ্যে দিয়ে শিশুর সামাজিকীকরণের সূত্রপাত হয়। পরবর্তী সময়ে বাবা, ভাই-বোনদের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া করতে গিয়ে সামাজিক বিকাশ হতে থাকে। পরিবারে শিশুর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং গৃহের

অনুশাসন থেকে শিশু সামাজিক আদর্শকে গ্রহণ করে এবং তার মধ্যে নীতিবোধ জাগে । শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর সে তার বিভিন্ন ইচ্ছা পূরণ করার চেষ্টা করে। কিন্তু ইচ্ছা পূরণ করতে গিয়ে দেখে ইচ্ছা পূরণে অনেক বাধা। সব ইচ্ছা পূরণ সম্ভব নয়। এইভাবে বিধি নিষেধের মধ্যে চালিত হয়ে ক্রমে সে বুঝতে পারে কোন ইচ্ছাটা ভাল, আর কোনটা তার পক্ষে অনুচিত। এভাবেই তার মধ্যে গড়ে ওঠে বিচারবোধ। এরপর পরিবার ছাড়াও প্রতিবেশি, সমবয়সী ছেলে মেয়েদের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া করতে গিয়ে সে বিভিন্ন সামাজিক বৈশিষ্ট্যাবলীর যেমন-সহযোগিতা, সহানুভূতি, নিজের লোভকে দমন করা, নি:স্বার্থপরতা ইত্যাদির অনুশীলন করে।

ঠিক কোন বয়স থেকে শিশু সামাজিক আচরণ করতে শুরু করে তা নির্দিষ্টভাবে বলা যায় না। তবে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মোটামুটিভাবে যেটা লক্ষ্য করা হয়। দ্বিতীয় মাসে সে বয়স্কদের প্রতি হাসির দ্বারা প্রতিক্রিয়া করে। তিন মাস বয়সে যে যখন কাঁদে, তখন পাশে কেউ কথা বললে কান্না বন্ধ করে দেয়। কাছ থেকে কেউ করার মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। আট থেকে নয় মাসের মধ্যে বয়স্কদের কথা ও আচরণ অনুকরণের চেষ্টা করে। এক বছর বয়সে সে 'না' কথাটার মানে বুঝতে শেখে এবং 'না' করলে ঐ কাজ থেকে বিরত থাকে। দেড় বছর বয়সে তার অপছন্দের বিষয়ের প্রতি অনীহা দেখাতে শেখে। এই বয়সের আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হোল শিশুরা সমবয়সীদের তুলনায় বয়স্কদের প্রতি প্রতিক্রিয়া করতে পছন্দ করে। অর্থাৎ অন্য সমবয়সীদের তুলনায়, হয় সে নিজে নিজে খেলতে পছন্দ করে কিংবা মা বা অন্য পরিচিত বয়স্কদের সঙ্গে খেলা করতে চায়। দুই বছরের আগে পর্যন্ত সাধারণত শিশুদের মধ্যে আত্মকেন্দ্রিকতার মনোভাব তীব্র থাকে। তাই সেই সময় সমবয়সীদের সহেগ বেশিক্ষণ মানিয়ে নিয়ে খেলা করতে পারে না। তিন বছর বয়সের পর তার মধ্যে সত্যিকারের সমান চেতনা লক্ষ করা যায়। ফলে সহযোগিতা, সমবেদনা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইত্যাদি বিভিন্ন সামাজিক প্রবণতাগুলো তার মধ্যে বিকাশ লাভ করতে থাকে।

শৈশবের চাহিদা : চাহিদাই আচরণের জন্ম দেয়। এখন প্রশ্ন হল চাহিদা বলতে কি বোঝায়। যা আমরা আকাঙ্ক্ষা করি, যা আমাদের দরকার, যা আমাদের জীবনধারনের জন্য একান্তভাবে প্রয়োজন, তার অভাববোধই হলো চাহিদা। মানব চাহিদাকে মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করা যেতে পারে। ১) জৈবিক চাহিদা (২) সামাজিক চাহিদা।

১) জৈবিক চাহিদা : দেহের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য যে চাহিদাগুলো মেটানো প্রয়োজন তাদের বলে জৈবিক চাহিদা। শৈশবে যেসব জৈবিক চাহিদাগুলো দেখা যায় তা হলো শিশুর বেঁচে থাকার জন্য এবং দৈহিক নিরাপত্তার জন্য খাদ্য ও জলের চাহিদা। প্রাকৃতিক তাপমাত্রার হাত থেকে দেহকে রক্ষা করার জন্য উপযুক্ত বস্ত্রের চাহিদা— এগুলোকে শিশুর মুখ্য জৈবিক চাহিদা বলা হয়। এছাড়াও বলা যায় সক্রিয়তা শিশুর স্বাভাবিক ধর্ম। বিকাশের স্বাভাবিক নিয়মে কর্মেন্দ্রিয় ও পেশিতন্ত্রের বিকাশের ফলে শিশুর মধ্যে সক্রিয়তার চাহিদা বা বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোর সঞ্চালনের চাহিদা দেখা দেয়। তাই সে নিজেকে বেশিক্ষণ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় রাখতে পারে না। কোন কিছু করা বা খেলাধূলার মধ্যে দিয়ে নিজেকে সর্বদা সক্রিয় রাখার মাধ্যমে তার এই চাহিদাকে পূরণ করতে চায়।

২) সামাজিক চাহিদা : পারিবারিক পরিবেশে বেড়ে ওঠার ফলে শিশুর মধ্যে ধীরে ধীরে সামাজিকতাবোধ গড়ে উঠতে শুরু করে। এই ধরনের বোধ তার মধ্যে বিভিন্ন সামাজিক চাহিদার জন্ম দেয়। শিশু যতই বড়

হতে থাকে ততই তার মধ্যে নিত্যনতুন সামাজিক চাহিদা সৃষ্টি হতে থাকে। ক্রমশ জৈবিক চাহিদার চেয়ে এই সামাজিক চাহিদাগুলোই তার আচরণের প্রধান নিয়ন্ত্রক হয়ে দাঁড়ায়। তবে এই সময়ের সামাজিক চাহিদাগুলো কোন সুনির্দিষ্ট ও স্থায়ী চাহিদা নয়। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত চাহিদাগুলোও পরিবর্তিত হতে থাকে। পরিবেশের বিভিন্নতা অনুযায়ী এগুলোর প্রকৃতিও বিভিন্ন হয়ে থাকে । এই স্তরে শিশুর গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক চাহিদাগুলো হল — শিশুমন সর্বদা অন্যের কাছ থেকে ভালবাসা প্রত্যাশা করে। এই চাহিদা পূরণ না হলে তা ব্যক্তিত্বের গঠনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষায় দেখা গেছে জীবনের প্রথম দিকে ভালবাসা, মনোযোগ, স্নেহ শিশুর দৈহিক মানসিক, আবেগমূলক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। বিশেষজ্ঞদের মতে ভালবাসা ও স্নেহস্পর্শ শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশের সহায়ক।

অপর একটি সামাজিক চাহিদা হল অনুকরণের চাহিদা। জন্মের পর সমাজে প্রচলিত রীতি-নীতি বা অনুশাসন সম্পর্কে শিশু থাকে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। এই অবস্থায় অনুকরণের চাহিদা পূরণের মাধ্যমেই বয়স্কদের কাছ থেকে বিভিন্ন রীতি-নীতি ও অনুশাসন সম্পর্কে ধারণা গঠন করে।

কৌতূহল শিশু মনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এই কৌতূহলের চাহিদা পূরণ করার জন্যই শিশু নতুন নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনে উৎসাহী হয়ে ওঠে, যা তার জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে তোলে।

সাহচর্যের চাহিদার ফলে এই বয়সের শিশুরা সমবয়সীদের থেকে বয়স্কদের সাহর্যচ বেশি কামনা করে এবং তাতে বেশি নিশ্চিন্ত বোধ করে। বিশেষ করে মায়ের সাহচর্য তাদেরকে বেশি তৃপ্তি দেয়।

এই বয়স স্তরের প্রথম দিকে শিশুরা থাকে আত্মকেন্দ্রিক। তাই সেই সময় সমবয়সীদের সঙ্গে বেশিক্ষণ পরস্পর সহযোগিতার ভিত্তিতে মিলেমিশে অবস্থান করা সম্ভব হয় না। যেমন— দেখা গেল দলবদ্ধ হয়ে সবাই মিলেমিশে খেলছে, মুহূর্তের মধ্যে ঝগড়া হয়ে দল ভেঙে গেল। তবে এই বয়স স্তরের শেষে শিশু আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে মুক্ত হয়ে সমবয়সীদের সঙ্গে মিলে মিশে পরস্পর সহযোগিতার মাধ্যমে খেলাধূলা করতে পারে।

এই স্তরে শিশু বেশিরভাগ সময় পরিবারকে কেন্দ্র করে অতিবাহিত করে। আর পরিবার শিশুর আচরণকে বাঞ্ছিত রূপ দান করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যে কোন আচরণের মূলে থাকে চাহিদার পরিতৃপ্তি। শিশুর সব ধরনের চাহিদার পরিতৃপ্তি বাস্তবে সম্ভব নয়। তাই পরিবারের লক্ষ হবে সমাজ ও শিশুর পক্ষে কল্যাণকর চাহিদাগুলোর পরিতৃপ্তির উপযোগী সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করে এবং উপযোগী পরিবেশ গঠন করে তার মধ্যে বাঞ্ছিত আচরণ গড়ে তোলা। এভাবেই ব্যক্তি কল্যাণ এবং সমাজকল্যাণ এক সার্থক রূপ লাভ করবে।

প্রাক্ বা প্রাথমিক বাল্যস্তর (৩বছর — ৭বছর)

তিন থেকে সাত বছর সময়কালকে প্রাথমিক বাল্যকাল বলা হয়। এই স্তরটি দুই দিক থেকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ—

১) এটি হচ্ছে সেই স্তর যখন শিশু প্রথা অনুযায়ী বিদ্যালয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়।

২) এই স্তরে শিশু, গৃহ ও বিদ্যালয় এই দুই ভিন্ন পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হয়।

এই স্তরের বৈশিষ্ট্যগুলো হল—

দৈহিক বিকাশ : প্রাথমিক বাল্যস্তরে বিভিন্ন ধরনের শারীরিক পরিবর্তন এবং সঞ্চালনমূলক বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। এই স্তরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল উচ্চতা ও ওজনের বৃদ্ধি। জীবনের প্রথম দু'বছর শিশু

বছরে ৭—৮ ইঞ্চি বাড়ে। কিন্তু এই স্তরে শিশু বছরে মাত্র ৩—৪ ইঞ্চি বৃদ্ধি পায়। একটি পাঁচ বছরের শিশু উচ্চতায় বছরে ৮—৯ ইঞ্চি বাড়ে। এই বয়সে তাদের গড় উচ্চতা ৪৩—৪৪ ইঞ্চি এবং ওজন বছরে ৪—৫ পাউণ্ড বাড়ে। সাধারণভাবে বলা যায় তাদের পূর্ণ বয়সের ওজন ও উচ্চতার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ তারা এই স্তরে পৌঁছানোর সময় অর্জন করে। তবে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের দৈহিক বিকাশ একটু বেশি হয়। এই সময় শিশুর শারীরিক বিকাশ শৈশবের তুলনায় মন্থর অথচ দৃঢ়তর হয়। শরীরের বিভিন্ন অংশ যেমন, মাথা, হাত, বাহু, পা সমানুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায়। বাহুর চাইতে পা ধীর গতিতে বাড়ে। ৬ বৎসর বয়সে শিশুর পায়ের দৈর্ঘ্য তার শরীরের দৈর্ঘ্যের তুলনায় অর্ধেক থাকে। এই অনুপাত সারাজীবনব্যাপী একই থাকে। এই সময় মস্তিষ্কের এত দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে যে, শিশুর পাঁচ বছর বয়সে তার মস্তিষ্কের ওজন পরিপূর্ণ মস্তিষ্কের ওজনের ৯০শতাংশ হয়ে যায়।

এই স্তরে পেশির সমন্বয় এবং সঞ্চালনমূলক ক্ষমতার বিকাশ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। শিশু এই বয়সে বিভিন্ন ধরনের দেহ সঞ্চালনমূলক খেলাধূলা করে এবং তার এই বয়সে বিভিন্ন ধরনের দেহ-সঞ্চালনমূলক খেলাধূলা করে এবং তার ফলে পেশি মজবুত হয় এবং বিভিন্ন দিক থেকে সে সঞ্চালনমূলক দক্ষতাও অর্জন করে। এর ফল হিসাবে শিশু কোন কিছুকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরার ক্ষমতা, বল ছোঁড়া বা কোন জিনিস ছোঁড়া, দৌড়ানো, লাফানো, উঁচু জায়গায় চড়া, কারো সাহায্য ছাড়াই সিঁড়ি বেয়ে ওঠা ইত্যাদি কাজগুলো সহজেই করতে পারে। হাত সঞ্চালনের উপর তার নিয়ন্ত্রণ আসে। চার বৎসর বয়সে সে কোন হাতে কাজ করবে, বাঁ না ডান তা ঠিক হয়ে যায়।

সাধারণভাবে ৫ অথবা ৬ বৎসর বয়সে শিশুরা হাত এবং আঙুলের সূক্ষ্ম মাংসপেশিগুলোর মধ্যে সাযুজ্য স্থাপন করে নানা রকম কাজ, যেমন লেখা, সেলাই করা, মাটি বা বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে কিছু তৈরি করতে প্রস্তুত হয়। এই পর্যায়ে যে সব সূক্ষ্ম সঞ্চালন শক্তি শিশুদের থাকে তা খুবই প্রাথমিক ধরনের হয়। অবশ্য যতই তারা বড়তে থাকে ততই এই দক্ষতা তার মধ্যে বাড়তে থাকে।

সাধারণত ৬ বৎসরের কাছাকাছি সময়ে অনেক শিশুরই দুধের দাঁত পড়ে যেতে থাকে। জোড়া জোড়া ভাবে স্থায়ী দাঁত উঠতে থাকে। ছয় বৎসরের দিকে মাড়ির প্রথম দাঁতটি বেরোয়।

মানসিক বিকাশ : শিশুর বৌদ্ধিক বিকাশ যাকে মানসিক বিকাশও বলা হয়, তার মধ্যে কল্পনা চিন্তা করা, মনে রাখা, বিচার করা, পর্যবেক্ষণ করা ইত্যাদি বিষয়গুলো অন্তর্ভূক্ত। এই ধরনের সামর্থ্যগুলো বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বিকাশ লাভ করে। এই মানসিক সামর্থ্যগুলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং সামগ্রিকভাবে তা বিকাশ লাভ করে। মানসিক বিকাশ হচ্ছে স্নায়ুতন্ত্রের ক্রিয়া বিশেষভাবে মস্তিষ্কের ক্রিয়া।

এই স্তরে শিশুর দ্রুত হারে মানসিক বিকাশ হয়ে থাকে। বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গুলোর ক্ষমতা ক্রমশ: বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা যতই বাড়তে থাকে শিশুর অভিজ্ঞতাও তত সুনির্দিষ্ট ও সুসংহত রূপ লাভ করে। স্মৃতিশক্তির বিকাশের ফলে শিশু কিছু কিছু ক্ষেত্রে পূর্ব অভিজ্ঞতাকে স্মরণ করে বর্তমান ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে পারে। মানসিক বিকাশের আরেকটি লক্ষণ হল মন:সংযোগ ক্ষমতার বিকাশ। এর ফলে শিশু উদ্দীপক চিন্তা কর্ষক হলে সেই বিষয়ে সহজেই মন:সংযোগ করতে পারে।

শিশুর মানসিক বিকাশের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হল ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতা অর্জন। তিন বছরের শিশু বেশ ভালভাবেই কথা বলতে পারে, চার বছরে অনর্গল কথা বলতে পারে এবং সম্পূর্ণ বাক্য

ব্যবহার করতে পারে। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশু জটিল বাক্য ব্যবহার করতে শেখে। শিশু সাধারণত: ৫/৬ বছর বয়সে পড়তে এবং সাত-আট বছর বয়সে লিখতে শেখে।

এই স্তরের মানসিক বিকাশের অপর গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হল বাস্তবের বস্তুটির অনুপস্থিতিতে কোন প্রতীকের মাধ্যমে বস্তুটির চিন্তা করতে পারা। যেমন দুটি কাষ্ঠিকে দিয়ে ঘোড়ার কল্পনা করা, একটি দেশলাই বাক্স দিয়ে গাড়ীর কল্পনা করা ইত্যাদি একে বলা হয় প্রতীকী ক্রীড়া (Symbolic Play) । অর্থাৎ যে জিনিস দিয়ে শিশু খেলছে তাতে সে অন্য জিনিসের কল্পনা করতে পারে।

প্রাক্ষোভিক বিকাশ : প্রাথমিক বাল্যস্তরে যে ধরনের প্রক্ষোভগুলো দেখা যায় তার মধ্যে রাগ, ভয়, আনন্দ, ঈর্ষা, স্নেহ, কৌতূহল ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ। এই স্তরের আবেগের বা প্রক্ষোভের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল নিয়ন্ত্রণের অভাব। আর এই কারণেই ৩-৪ বৎসরের শিশু মজাদার কোন কিছু দেখলে যেমন উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, তেমনি দু:খ পেলে বা রাগ হলে কান্নায় ভেঙে পড়ে বা রাগের বিষয়টির উপর আক্রমণ করে, চিৎকার-চেঁচামেচি করে, হাত-পা ছোঁড়ে, জিনিস পত্র ভাঙচুর করে। অন্য কোন শিশুর খেলনাটি তার পছন্দ হলে তা সে ছিনিয়ে নিজের কাছে নিতে চায়, না পারলে বিমর্ষ হয়ে পড়ে।

বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আবেগির প্রকাশের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। শিশু যত পরিণত হয় ততই তার বাহ্যিক প্রকাশের তীব্রতা কমে এবং আচরণ সংযত ও মার্জিত হয়। যেমন— ৪/৫ বছরের শিশু রাগ হলে চিৎকার করে, কাঁদে, হাঁত-পা ছোঁড়ে। কিন্তু ৭/৮ বৎসর বয়সে সে রাগকে এভাবে প্রকাশ করে না। আরও বড় হলে সে একেবারেই কাঁদে না এবং তার দৈহিক প্রকাশ অনেক সংযত হয়।

এই স্তরে প্রত্যক্ষ বিষয়বস্তু ছাড়াও কল্পনাকে কেন্দ্র করেও আবেগ সৃষ্টি হয়। আবার কিছু পুরোনা উদ্দীপক যা আগে আবেগ সৃষ্টি করতো, এখন আর তা করে না। যেমন— শৈশবে জোরে শব্দ শুনলেই ভয় পায়, কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা যায় উচ্চ শব্দ আর ভয় জাগায় না। প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়ার দ্রুত পরিবর্তন এই স্তরের বৈশিষ্ট্য। তাই দেখা যায় শিশু সামান্য কারণে খুব রেগে যায়, আবার পর মুহূর্তেই ভুলে যায়।

এই স্তরের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হল— প্রাক্ষোভিক বিকাশের ফলে শিশুর প্রক্ষোভগুলোর আরও পৃথকীকরণ হয়। পরিবারকে ছাড়িয়ে তার স্নেহ-ভালবাসা বৃহত্তর পরিবেশের মধ্যে বিস্তৃত হয়। তার সঙ্গী-সাথীদের প্রতি ভালবাসা দেখা যায়, অন্য গুরুজনদের প্রতিও ভালবাসা লক্ষ্য করা যায়।

সামাজিক বিকাশ : শিশুর সামাজিক বিকাশ বলতে বোঝায় শিশুর চারপাশে যে সব ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন আছে তার সঙ্গে শিশুর সম্পর্কের ক্রমবিকাশ। বিদ্যালয়ে প্রবেশ করার পর থেকে তার সত্যিকারের সামাজিক বিকাশের কাজ শুরু হয়ে যায়।

প্রাথমিক বাল্যকালে মন্থর গতিতে সামাজিক সচেতনতার বিকাশ হয়। ৩/৪ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের আচরণ থাকে প্রধানত: আত্মকেন্দ্রিক। যার ফলে দেখা যায় তার মা যদি তার সমবয়সী অন্য কোন শিশুকে আদর করে তাহলে তার রাগ হয়। কারণ সে ভাবে তার মা কেবলই তার এবং মায়ের আদর কেবলমাত্র তারই প্রাপ্য। অথবা তার খেলনা অন্য কোন শিশু নিলে তার থেকে সে ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করে। তার সঙ্গে মারামারি করে। তা সত্ত্বেও পরিবারে মা-বাবা সহ অন্যান্যদের সঙ্গে থাকতে থাকতে বিভিন্ন বিষয়ে তাদের উপর নির্ভর করতে করতে ধীরে ধীরে তার মধ্যে সামাজিক মনোভাব জাগ্রত হতে থাকে। শুধু

তাই-ই নয় এইভাবে চলতে চলতে বিভিন্ন ধরনের আচরণ, কথাবার্তার ধরন ও রীতি-নীতিও অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। পরিবারের লোকেদের আচার ব্যবহার, আদেশ-উপদেশ, স্নেহ-ভালবাসা, সহানুভূতি ইত্যাদির মাধ্যমে শিশুর মধ্যে সামাজিক মনোভাবের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই বয়সে শিশুরা বিদ্যালয়ে যাওয়া শুরু করে। তাই তাদের সামাজিকীকরণে বিদ্যালয় পরিবেশেরও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পড়ে। এই সময় শিশুরা দিনের বেশ কিছুক্ষণ সময় ঘরের পরিবেশ থেকে দূরে থাকে। তাই বিদ্যালয় শিক্ষক, সমবয়সীদের দল, বিদ্যালয় পরিবেশ শিশুর সামাজিক বিকাশে সহায়তা করে।

এই স্তরের শিশুদের মধ্যে দলবন্ধভাবে খেলাধূলা করার বিশেষ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। দলের অন্তর্ভুক্ত থাকাকালীন সে, দলের নিয়ম কানুন মেনে চলে, দলীয় নেতার নির্দেশ অনুযায়ী চলে। তবে এই দল বেশি দিন স্থায়ী হয় না। অর্থাৎ এরা খুব বেশি দিন কোন বিশে, দলের সভ্য থাকে না। অল্প সময়ের মধ্যেই একদল ছেড়ে অন্য দলের সভ্য হয়।

এই স্তরের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল শিশুরা স্বীকৃতি পেতে চায়, প্রশংসা চায়। তারা চায় তারা যে কাজ করে, বয়স্করা সেই কাজের প্রশংসা করুক, তারাও যে কাজ করতে পারে সেই স্বীকৃতি দিক। এতে তারা খুশী হয়। যেমন-৪/৫ বছরের একটি শিশুকে বলা হল— তার বইগুলো গুছিয়ে টেবিলের নির্দিষ্ট জায়গায় রাখতে। কাজটি করার পর সে অপেক্ষা করে বড়রা তার কাজটি যে ভালভাবে করতে পেরেছে তা বলুক এবং প্রশংসা করুক।

এই বয়সে শিশুদের মধ্যে সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতার মতো সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলোরও বিকাশ হয়। তারা দলের জন্য দলবদ্ধভাবে লড়াই করে। পরস্পর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। এইভাবেই প্রাক্ বাল্যকালে সামাজিকীকরণের ভিত্তি স্থাপিত হয়।

প্রাক্ বাল্যকালের চাহিদা : প্রাক্ বাল্যকালে শিশুর মধ্যে যে চাহিদাগুলো দেখা যায় তা হল— শৈশবের মতো খাদ্য, জল ও বস্ত্রের চাহিদার পাশাপাশি সক্রিয়তার চাহিদাও দেখা যায়। এই সময় শিশুর মধ্যে সঞ্চালনমূলক বিকাশ ঘটে। ফলে শিশুর মধ্যে লাফানো, দৌড়ানো, ছোঁড়া ইত্যাদি কাজগুলোর মধ্যে দিয়ে নিজেকে সবসময় সক্রিয় রাখার চাহিদা দেখা যায়। তাছাড়া এই স্তরের প্রথম দিকে শিশুদের মধ্যে আজগুবি গল্প শোনার চাহিদা দেখা যায়। তবে এই স্তরের শেষদিকে বাস্তবের সংস্পর্শে এই চাহিদার পরিবর্তন ঘটতে থাকে তখন সবকিছুকে বিচার বুদ্ধি দিয়ে গ্রহণ করার চাহিদা দেখা দেয়। এছাড়াও এই স্তরের প্রথম দিকে শিশুর মধ্যে আত্মকেন্দ্রিকতার ভাব থাকে। ধীরে ধীরে তা দূর হয়ে গিয়ে তাদের মধ্যে দলভূক্তির চাহিদা দেখা দেয়। ফলে সমবয়সীদের নিয়ে দল গঠন করে। এই সময় সহযোগিতা ও সমবেদনার চাহিদা ও জাগ্রত হয়। এর ফলে শিশু তার দলের সঙ্গীদের প্রতি বা অন্যান্যদের প্রতি সহযোগিতার মনোভাব প্রদর্শন করে এবং তাদের দু:খ কষ্টে সমবেদনা জ্ঞাপন করে । এছাড়া এই সময় তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক চাহিদাও দেখা দেয়। ফলে বিভিন্ন কাজে নিজেকে সফল প্রমাণ করার জন্য অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়।

প্রাক বাল্যস্তরের বিকাশের শিক্ষামূলক গুরুত্ব :

শিক্ষার্থীদের যাতে যথাযথ দৈহিক বিকাশ ঘটে তার জন্য বাড়ীতে বাবা-মা বা অভিভাবককে খেয়াল করতে হবে যাতে তারা প্রতিদিনের গৃহীত খাদ্যের মধ্যে দিয়ে উপযুক্ত পুষ্টিকে গ্রহণ করতে পারে। কারণ পুষ্টির দিক থেকে কোন ঘাটতি হলে তা ভবিষ্যতের স্বাস্থ্যের উপর এক ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলে। তাছাড়া

বৃহৎ পেশির ও সঞ্চালনমূলক বিকাশের জন্য বাড়িতে খেলাধূলা করার সুযোগ থাকতে হবে। শিশু আঘাত পাবে এই ভয়ে বল খেলা, সাইকেল চড়া, দৌড়ান প্রভৃতির সুযোগ থেকে তাকে বঞ্চিত করলে সমবয়সী শিশুদের বিকাশের তুলনায় সে দৈহিক দিক থেকে পিছিয়ে থাকে। যার ফলে অনেক সময় সে হীনমন্যতার শিকার হয়। পাশাপাশি বিদ্যালয়ে শিক্ষক বিভিন্ন ধরনের সহপাঠ্যক্রমিক শিক্ষা, খেলাধূলা, ব্যায়াম, শারীর চর্চা ইত্যাদির আয়োজন করে শিশুর দৈহিক বিকাশে সহায়তা করতে পারেন। তাছাড়া সূক্ষ্মপেশির বিকাশের জন্য ছবি আঁকা এবং তাতে রঙ করা। কাগজ কেটে বিভিন্ন জিনিস তৈরি করা, মাটি, ভিজে বালি বা অন্যান্য উপকরণ দিয়ে কিছু তৈরি করার ব্যবস্থা করার মাধ্যমে দৈহিক বিকাশের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলবেন।

প্রাক বাল্যস্তরের শিশুদের মধ্যে যেহেতু অনুকরণের অভ্যাস রয়েছে তাই তাদেরকে ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য রক্ষার প্রশিক্ষণ দিতে হবে। শিশুরা যাতে তাদের দৈনন্দিন কাজগুলো নিজে নিজে করতে পারে প্রশিক্ষণের সাহায্যে তাদের মধ্যে সেই অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। এভাবে তারা স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারবে।

মানসিক বিকাশ : ভাষাগত বিকাশ মানসিক বিকাশের একটি দিক। তাই শিশুরা যাতে ভাষার মাধ্যমে নিজেদের মনের ভাবকে প্রকাশ করতে প ারে এবং অন্যের মনের ভাবকে বুঝতে পারে তার দিকে শিক্ষক ও পিতা মাতা উভয়কেই নজর দিতে হবে। ভাষার বিকাশ চর্চার দ্বারা বাড়িয়ে তোলা যায়। তাই গৃহে ও বিদ্যালয়ে শিশু যাতে তাদের শব্দভাণ্ডারকে বৃদ্ধির মাধ্যমে এ ব্যাপাারে চর্চার সুযোগ পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। কৌতূহলের চাহিদার কারণে শিশুর মনে নানা ধরনের জিজ্ঞাসার উদয় হয়। এর যথাযথ উত্তর খুঁজে পাওয়ার মাধ্যমে শিশু মন যাতে তৃপ্ত হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। শিশুর মধ্যে ধারণার বিকাশ ঘটানোর জন্য তাকে বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন করতে হবে।

প্রাক্ষোভিক বিকাশ : ভালবাসার চাহিদা একটি মৌলিক চাহিদা। শিশুরা যাতে পিতা-মাতা, অভিভাবক ও শিক্ষকের নিকট থেকে প্রকৃত ভালবাসা পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে, ভালবাসার অর্থ অতিরিক্ত প্রশ্রয় দান নয়। কারণ অতি প্রশ্রয়ে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য বিপন্ন হতে পারে। এছাড়াও অভিভাবক এবং শিক্ষককে অন্য যেদিকে খেয়াল রাখতে হবে তা হল সবসময় নেতিবাচক উপদেশকে ত্যাগ করে ইতিবাচকভাবে শিক্ষার্থীদের উদ্দীপিত করার চেষ্টা করবেন। ইতিবাচক উপদেশ যেমন শিক্ষার্থীর মনে ইতিবাচক সেন্টিমেন্ট গড়ে তোলে তেমনি নেতিবাচক উপদেশ আবেগের যথাযথ বিকাশকে বিঘ্নিত করে মানসিক ভারসাম্যকে নষ্ট করে দিতে পারে। অভিভাবক ও শিক্ষককে এ ব্যাপারে বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে তা হল কোন দৈহিক শাস্তি নয়, স্নেহ-ভালবাসার মধ্যে দিয়ে শিশুর চিত্তকে জয় করার চেষ্টা করবেন।

সামাজিক বিকাশ : পরিবারের নিয়ম, শৃঙ্খলা, ভালবাসা, সহযোগিতা, সহানুভূতি ও অনুপ্রেরণার মাধ্যমেই একজন শিশু সমাজে প্রত্যাশিত আচরণ করতে শেখে। পরিবারই সমাজকে শিশুর কাছে পরিচিত করে তোলে। পারিবারিক পরিবেশ যাতে নিরাপদ ও শিশুর উপযোগী হয় তার প্রতি অভিভাবকদের যত্নশীল থাকা প্রয়োজন। শিশুর উপযোগী পারিবারিক পরিবেশ বলতে বোঝায়— স্বাস্থ্যসম্মত বাসগৃহ, যেখানে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস, নিরাপদ পানীয় জল, স্বাস্থ্যসম্মত জীবন-যাপন ব্যবস্থার পাশাপাশি রয়েছে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসার সম্পর্ক রয়েছে, পরস্পরের প্রতি সহযোগিতার মনোভাব। যেখানে

অন্য সকলের সঙ্গে অনায়াসেই শিশু মানিয়ে বা অভিযোজন করতে পারে। বিদ্যালয় পরিবেশও এমনভাবে পরিকল্পিত হবে যাতে শিশুরা বিদ্যালয়ে এসে সহজভাবে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারে। সহপাঠীদের সঙ্গে পারস্পরিক মেলা-মেশার মধ্য দিয়ে যাতে তারা বিদ্যালয়-পরিবেশে আপন আপন সুনির্দিষ্ট স্থান বেছে নিতে পারে সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।

প্রান্তীয় বাল্যস্তর (৭ বৎসর-১২বৎসর) :

দৈহিক বিকাশ : বিকাশের হার আগের স্তরের মতোই মন্থর থাকে। আগের স্তরের চেয়ে ছেলে মেয়েরা লম্বায় বছরে গড়ে দুই-তিন ইঞ্চি বাড়ে এবং ওজনে বছরে গড়ে ছয়-সাত পাউন্ডের বেশি বাড়ে না। এই বয়সে দেহের নিচের দিকের অঙ্গ বেশি বৃদ্ধি পায় বলে পা-গুলোকে দেহের তুলনায় বেশি লম্বা মনে হয়। বাহুর চাইতে পা ধীর গতিতে বাড়ে। ছয় বছর বয়সে শিশুর পায়ের দৈর্ঘ্য তার শরীরের দৈর্ঘ্যের তুলনায় অধিক থাকে। এই অনুপাত সারা জীবনব্যাপী বজায় থাকে। মোটামুটি পাঁচ বা ছয় বৎসর বয়স থেকে ছেলেমেয়েদের ছোট মাংসপেশিগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ থাকে। যার ফলে তারা বল ধরা, লেখা, সেলাই করা, হাতের কাজ করা ইত্যাদি করতে প্রস্তুত হয়। তবে এই বয়সে শিশুদের যে সব সূক্ষ্ম সঞ্চালণ শক্তি থাকে তা খুবই প্রাথমিক ধরনের হয়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই দক্ষতাও বাড়তে থাকে।

শৈশবে শিশুর হাড় নরম ও স্থিতিস্থাপক থাকে। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হাড়গুলো দৃঢ়, প্রশস্ততর ও দীর্ঘতর হতে থাকে। হাড়ের এভাবে শক্ত হয়ে ওঠাকে বলে ওসিফিকেশন। এক বছর বয়স থেকে এই প্রক্রিয়ার শুরু হয় এবং বয়:সন্ধিকালে এই বৃদ্ধি সম্পূর্ণ হয়।

ছয় বছরের কাছাকাছি সময় দুধের দাঁত পড়ে গিয়ে জোড়া জোড়াভাবে স্থায়ী দাঁত উঠতে থাকে। ১২ বছর বয়সে সাধারণত সমস্ত দুধের দাঁত পড়ে এবং সে জায়গায় স্থায়ী দাঁত ওঠে।

শিক্ষামূলক গুরুত্ব : শিশুর উপযুক্ত শারীরিক বিকাশের জন্য বাবা-মা কিংবা অভিভাবক পুষ্টিকর খাদ্যের জোগান দেবেন। তার ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের উন্নয়নের জন্য নখ কাটা, খাওয়ার আগে হাত ধোয়া সহ বিভিন্ন স্বাস্থ্যকর অভ্যাসগুলো গড়ে তোলার দিকে নজর দিতে হবে এবং এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে ইতিবাচক মানসিকতাও গড়ে তুলতে হবে। সুস্বাস্থ্যের অভাব ছেলেমেয়েদের শিক্ষা লাভের উপর, ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠা বা পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তাই গৃহে বিভিন্ন স্বাস্থ্যকর অভ্যাস চর্চা এবং তার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তোলার পাশাপাশি বিদ্যালয়েও বিভিন্ন ধরনের শারীর শিক্ষা কর্মসূচি গড়ে তোলার ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়াও বিভিন্ন ধরনের রোগ সম্পর্কে ধারণা দান এবং কিভাবে তার প্রতিরোধ করা যায় সে সম্পর্কে শিক্ষার আয়োজন করতে হবে।

যথার্থ দৈহিক সঞ্চালনমূলক বিকাশে সহায়তা করার জন্য গৃহ এবং বিদ্যালয় উভয় ক্ষেত্রেই বাবা-মা কিংবা অভিভাবকসহ শিক্ষককে ব্যায়াম, শরীরচর্চা, অঙ্গ সঞ্চালনমূলক খেলাধূলার পাশাপাশি অঙ্কন, নৃত্য, লিখন ইত্যাদি বিষয়ে অংশগ্রহণে আগ্রহী করে তুলতে হবে।

সর্বোপরি বিভিন্ন স্তরে শিশুর মধ্যে কি ধরনের শারীরিক বিকাশ হয়, বিভিন্ন স্বাস্থ্যকর অভ্যাস ও পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে সুস্পষ্ট ধারণা বাবা-মা কিংবা অভিভাবক সহ শিক্ষকের মধ্যে উপযুক্ত সচেতনতা গড়ে তুলতে সহায়তা করবে এবং ছেলে-মেয়েদের মধ্যে কোন ঘাটতি থাকলে তা চিহ্নিত করে সে ব্যাপারে উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে সহায়তা করবে।

মানসিক বিকাশ : এই বয়সে শিশুর মানসিক বিকাশ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই সময় দ্রুত বুদ্ধির বিকাশ ঘটে। ভাষার বিকাশের ফলে শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধি পায় এবং গুছিয়ে সুন্দরভাবে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে। স্মরণ ক্ষমতা, মনোযোগ দানের ক্ষমতা তীক্ষ্ম হয়। স্থান-কাল-দূরত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণার উন্নতি ঘটে। বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে কৌতূহলের বিস্তার ঘটে। কোন কিছু জানার জন্য তার মধ্যে আত্মসক্রিয়তার ভাব লক্ষ্য করা যায়। নিজে হাতে-কলমে কাজ করতে ভালবাসে। কাল্পনিক গল্পের চেয়ে বাস্তবে অভিজ্ঞতাভিত্তিক গল্প শুনতে পছন্দ করে। বিমূর্ত্ত চিন্তন ক্ষমতা ও যুক্তি শক্তির বিকাশ ঘটলেও তা পরিণত ব্যক্তিদের মতো হয় না। কোন বস্তুকে বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করার ক্ষমতা জন্মায়। কোন সমস্যার সমাধানের জন্য অনেক বেশি সময় ধরে মনোনিবেশ করতে পারে। এই বয়সের মানসিক বিকাশের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হল সৃজনশীলতার প্রকাশ। ছেলে-মেয়েরা কাঠ, কাগজ, মাটি, প্যাস্টিসাইন ইত্যাদি দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরি করে কিংবা নাচ, গান, আবৃত্তি, অঙ্কন, অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করতে উৎসাহী হয়। খেলাধূলা ও নানা গঠনমূলক কাজের মধ্যে দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে আনন্দ লাভ করে।

শিক্ষামূলক গুরুত্ব : প্রাথমিক শিক্ষার শুরুর স্তর হিসাবে এই স্তরটির বিশেষ শিক্ষামূলক গুরুত্ব রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার শুরুতে যদি মানসিক বিকাশ যথাযথ না হয়, খুব স্বাভাবিকভাবেই পরবর্তী শিক্ষা বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। গৃহে পিতা-মাতা এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষককে তাই তাদের প্রতি বিশেষ যত্নবান হওয়া উচিত। ছেলে-মেয়েদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানার যে কৌতূহল দেখা যায় তা মেটাতে গিয়ে যাতে তাদের মধ্যে কোন কুঅভ্যাস গড়ে না ওঠে বা কোন বিকৃত তথ্য সংগৃহীত না হয় সেদিকে পিতা-মাতা ও শিক্ষককে খেয়াল রাখতে হবে। বিভিন্ন সৃজনমূলক কাজের সুযোগ দানের মাধ্যমে শিক্ষক ও অভিভাবক তার সৃষ্টি করার আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করতে সাহায্য করবেন। এই বয়সে ছেলে মেয়েদের অনুরাগের ক্ষেত্র অনেক বিস্তৃত হয়। তাদের অনুরাগের বিষয়বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে হবে। শ্রেণির বিষয়বস্তুকে এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে যাতে তার বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার যথেষ্ট মিল তাকে। তবেই ছেলে মেয়েরা বিষয়টির বাস্তব উপযোগিতাকে উপলব্ধি করে বিষয়টিকে গ্রহণ করতে উৎসাহী হবে। ভাষার যথাযথ বিকাশের জন্য শব্দ ভাণ্ডার বৃদ্ধির প্রতি নজর দিতে হবে। বিতর্ক, সেমিনার, আলোচনার মধ্যে দিয়ে বৌদ্ধিক বিকাশের চেষ্টা করতে হবে।

প্রাক্ষোভিক বিকাশ : বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়েদের উপলব্ধির ক্ষমতা, মানসিক সামর্থ্য, দৃষ্টিভঙ্গির পরিধি যতই বৃদ্ধি পেতে থাকে তাদের প্রক্ষোভমূলক অনুভূতি প্রবণতার পরিধিও ততই প্রসারিত হতে থাকে। আগে শিশুর প্রক্ষোভমূলক অনুভূতি দৈহিক নিরাপত্তা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বা যেসব উদ্দীপক সরাসরি শিশুর উপর কাজ করত, শিশু কেবলমাত্র সেগুলো সম্পর্কেই প্রক্ষোভ অনুভব করত, বর্তমানে অনুপস্থিত কোন উদ্দীপক তার উপর খুব একটা প্রভাব বিস্তার করত না। শিশুর বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে অতীতের ঘটনা বা বর্তমানে অনুপস্থিতি কোন ঘটনাও প্রক্ষোভ সৃষ্টির কারণ হত। কিন্তু এই স্তরে সামাজিক সাংস্কৃতিক নৈতিক ইত্যাদি কারণগুলোও বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে থাকে এবং ছেলে মেয়েদের মনে প্রক্ষোভ সৃষ্টি করতে পারে। যেমন— দেশের গৌরবে গর্ব অনুভব করে। অন্যায় কাজ করলে লোকে নিন্দা করবে সে ব্যাপারে মনে ভয় কাজ করে। কাউকে উপকার করে মনে তৃপ্তিকর অনুভূতি হয় ইত্যাদি।

এই বয়সের ছেলেমেয়েদের মন চিন্তাভাবে ভারাক্রান্ত থাকে না। ফলে তাদের মধ্যে আনন্দ উচ্ছ্বলতা

যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। তবে ভয়, ক্রোধ, আশাঙ্খার মতো নেতিবাচক প্রক্ষোভগুলো যে একেবারে থাকে না তা নয়। শিশুসুলভ ভয়ের পরিবর্তে তাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভয়ের ভাব দেখা যায়। বাবা মায়ের স্নেহ-ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হবার ভয়ে ছোট ভাই বোনদের প্রতি এবং কোন সহপাঠী, শিক্ষকের প্রিয় পাত্র হলে তার প্রতি ঈর্ষা ভাব দেখা দেয়। বয়স্কদের অবহেলা, সমবয়সিদের পরিহাস, কাজে বাধা, অন্যদের সঙ্গে তুলনা করে তার ঘাটতিগুলোকে নির্দেশ করা ইত্যাদি এই বয়সের ছেলে মেয়েদের রাগের কারণ হয়।

শিক্ষামূলক গুরুত্ব : শিশুর প্রাক্ষোভিক বিকাশকে সঠিক পথে চালনা করারক্ষেত্রে পিতা মাতা ও শিক্ষকের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। গৃহে এবং বিদ্যালয়ে শিশু যাতে প্রক্ষোভমূলক নিরাপত্তার অভাববোধ না করে সেই পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। ছেলে মেয়েরা যাতে বিদ্যালয় পরিবেশ এবং গৃহ পরিবেশের মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করতে না পারে সেদিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। এ ব্যাপারে শিক্ষক, শিক্ষিকা যদি তাদের সুমধুর ব্যবহার দ্বারা বিদ্যালয়ের পরিবেশকে আনন্দময় করে তুলতে পারেন তাহলে বিদ্যালয়ের প্রতি তাদের আকর্ষণ সৃষ্টি হবে। শিক্ষকের উচিত যে গৃহ বা সমান পরিবেশ থেকে শিশুরা বিদ্যালয়ে আসছে সেই গৃহ বা সমাজ পরিবেশ সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখা। অপরদিকে পিতা মাতা বা অভিভাবকদের উচিত শিক্ষক ও বিদ্যালয়ের সঙ্গে প্রত্যঙ্গ যোগাযোগ রক্ষা করা।

এই স্তরের ছেলে-মেয়েদের প্রক্ষোভকে সঠিকপথে পরিচালনা করার জন্য তাদের গঠনধর্মী কাজে উৎসাহ দিতে হবে। যেসব কাজে আত্মপ্রকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা পূর্ণ হয় এমন ধরনের কাজের সঙ্গে তাদের যুক্ত করতে হবে। তাই পাঠক্রমিক ব্যবস্থার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের সহপাঠক্রমিক শিক্ষার আয়োজনও বিদ্যালয়ে থাকা প্রয়োজন। খেলাধূলা, নাচক, গান, অঙ্কন, অভিনয়, বাগান করা, এন সি সি, এনস এস এস প্রভৃতি কাজের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের যুক্ত করতে হবে। গৃহে পিতা মাতা বা অভিভাবক এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষকের উৎসাহ ও পরিচালনার মধ্যে দিয়ে ছেলে মেয়েরা এই ধরনের কাজের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করতে উৎসাহিত হবে এবং নিজেদের ক্ষমতাকে প্রমাণ করার জন্য উপযুক্ত পথ খুঁজে পাবে।

সামাজিক বিকাশ : বাল্যকালে সামাজিক চেতনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যায়। এই বয়সে ছেলে-মেয়েদের দলের প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করে। তাই একা একা খেলার চেয়ে সমবয়সীদের সঙ্গে দলবদ্ধভাবে খেলতে ভালবাসে। দলের স্বার্থ রক্ষার জন্যদলবদ্ধভাবে অন্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে দেখা যায়। এই বয়সে যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে তা বহুদিন স্থায়ী হয়। সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা, সহানুভূতি ইত্যাদি সামাজিক গুণগুলো বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। এই বয়সে ছেলে মেয়েদের অনেক আচরণই দলের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এজন্য এই বয়সকে 'দল গড়বার বয়স' বা 'Gang Age' বলে। এই বয়সে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে সামাজিক দায়িত্ব পালনে উৎসাহ দেখা দেয়।

শিক্ষামূলক গুরুত্ব : ছেলে-মেয়েদের সামাজিক চাহিদাকে সুষ্ঠু রূপ দিতে গেলে গৃহে এবং বিদ্যালয়ে বিভিন্ন সামাজিক গুণগুলো চর্চার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। বলা হয়ে থাকে 'Exampgle is better than precept.' তাই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি, সহযোগিতা, সহানুভূতি, শৃঙ্খলাবোধ নৈতিক আদর্শ অনুসরণ শিশুর মধ্যে অনুরূপ গুণ গড়ে তুলতে সহায়তা করবে। পিতা-মাতা তাদের সন্তানদের

সামনে আদর্শ সামাজিক আচরণ অনুসরণের দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন যাতে তারা অনুকরণের মাধ্যমে তা আয়ত্ত করতে পারে। তাছাড়া পিতা মাতা তাদের সন্তানদের বিভিন্ন যৌথ কাজকর্মে এবং সামাজিক রীতিনীতির সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করবেন। ঠিক তেমনি বিদ্যালয়েও শিক্ষার্থীদের খেলাধূলা, অভিনয়, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সমাজসেবামূলক কাজকর্ম প্রভৃতির মতো যৌথ কাজকর্মে অংশগ্রহণ করার মধ্যে দিয়ে তাদের মধ্যে বিভিন্ন সামাজিক গুণাবলির বিকাশ ঘটানো যেতে পারে। যেহেতু এই বয়সে দলের প্রতি ছেলে মেয়েরা তীব্র আকর্ষণ অনুভব করে, তাই শিক্ষককে এবং অভিভাবককে খেয়াল রাখতে হবে যাতে দলের প্রভাবে কোন অন্যায় কাজ না করে। অস্বাভাবিক প্রতিযোগিতার মনোভাবের পরিবর্তে সহযোগিতা, সহানুভূতি, সমানুভূতির মতো বৈশিষ্ট্যগুলো বিভিন্ন কাজের মধ্যে দিয়ে যাতে তাদের মধ্যে বিকাশ লাভ করে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

প্রান্তীয় বাল্যকালের চাহিদা : পূর্ববর্তী স্তরের মতো এই স্তরেও বিভিন্ন জৈবিক চাহিদাগুলো সক্রিয় থাকে। তবে এই স্তরে যে খাদ্যের চাহিদা দেখা দেয় তা শৈশবের খাদ্যের চাহিদা থেকে কিছু ভিন্ন। শৈশবে শিশু যা পেত তাই মুখে দিত খাদ্য-অখাদ্যের বাছবিচার করত না। কিন্তু প্রান্তীয় বাল্যকালে নিজস্ব রুচি গড়ে উঠে। সেই অনুযায়ী খাদ্যগ্রহণ করে। তাছাড়া দেহের উপযুক্ত বিকাশের জন্যও পুষ্টিকর খাদ্য ও পানীয়ের চাহিদা তৈরি হয়। এই স্তরেও সক্রিয়তার চাহিদা দেখা যায়। শৈশবে শিশু খেলার মধ্যে দিয়ে তার সক্রিয়তাকে প্রকাশ করতো। কিন্তু এই স্তরে বিভিন্ন দায়িত্বশীল কাজে এবং সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ করার উৎসাহ দেখা যায়।

এই স্তরের বিভিন্ন সামাজিক চাহিদা সম্পর্কে বলা যায় — এই সময় দলের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করার চাহিদা দেখা যায়। দলের প্রতি আনুগত্য দেখায় এবং দলীয় নেতার নির্দেশ মেনে চলতে চায়। আত্মকেন্দ্রিকতার গণ্ডী ছেড়ে ছেলে মেয়েদের মন তখন বাইরের জগতেও ব্যাপ্ত হতে চায় এবং তার মধ্যে বিভিন্ন সামাজিক আচরণ অনুকরণের চাহিদা দেখা দেয়। অন্যের সঙ্গে বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা করার চাহিদা দেখা যায়। এই সময় ছেলে মেয়েদের মধ্যে প্রক্ষোভমূলক নিরাপত্তার চাহিদা দেখা দেয়। তাই গৃহে এবং বিদ্যালয়ে ভালবাসার অভাব হলে অথবা কেউ নিন্দা বা উপহাস করলে সে ক্ষুব্ধ হয় এবং প্রক্ষোভমূলক নিরাপত্তার অভাব বোধ করে। অপরদিকে ভালবাসা ও প্রশংসা তাকে তৃপ্তি দেয় এবং নিজেকে নিরাপদ মনে করে। এই সময় ছেলে মেয়েদের মধ্যে নতুন নতুন বিষয়ে জানার চাহিদা দেখা দেয়। পাশাপাশি আগ্রহের বিষয়বস্তুকে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখার চাহিদা জাগে। এই স্তরের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা হল সৃজনশীলতার চাহিদা। এই সময় কাঠ, কাগজ, মাটি, প্লাস্টিসাইন ইত্যাদি দ্রব্য সামগ্রীর মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরি করা, নাচ, গান, অভিনয় ইত্যাদি বিভিন্ন সৃজনমূলক কাজের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করার চাহিদা দেখা দেয়।

কৈশোর স্তর (১২ বৎসর—১৮/২০ বৎসর) :

শিশুর জীবন বিকাশের ক্ষেত্রে বাল্যকালের অপেক্ষাকৃত অপরিণত বয়স্কের স্তর থেকে প্রাপ্ত বয়স্কের স্তরে উন্নীত হওয়ার কালই হল বয়:সন্ধি। অর্থাৎ এই স্তরটি হল দুটি বয়সের সন্ধিকাল। এই সময় ছেলে-মেয়েদের দেহে ও মনে অভূতপূর্ব পরিবর্তন আসে। এত বৈচিত্র্য আর কোন স্তরে আসে না। ডরোথি রোজার্স (Dorothy Rogers) মনে করেন যে বয়:সন্ধিকাল হচ্ছে এমন একটি সময় যখন সমাজ ছেলে

মেয়েদের শিশু হিসাবেও গণ্য করে না আবার বয়স্কের মর্যাদাও দেয় না। এই স্তরের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলো হল—

দৈহিক বিকাশ : এই বয়সে কিশোর কিশোরীদের দেহের পেশিতন্ত্র ও অস্থিতন্ত্রের বৃদ্ধির ফল হিসাবে বড় বড় হাড় ও পেশির দ্রুত বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। শরীর দৈর্ঘ্য ও ওজনের দিক থেকে বৃদ্ধি পায়। প্রথম দিকে মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু চৌদ্দ বছর বয়সের পর ছেলেরা মেয়েদের তুলনায় দীর্ঘ ও সবল হয়ে ওঠে। যৌবনাগমের পর উচ্চতা বৃদ্ধির হার ধীরে ধীরে কমতে থাকে, পরে এক সময় তা থেমে যায়। খুববেশি ঘাম হয়। মুখে ব্রণ দেখা দেয়। রক্ত সঞ্চালন, পাকস্থলির ক্রিয়া ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ফলে ছেলে-মেয়েদের ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়। এই সময় ছেলেমেয়েদের মুখে কাঠিন্যের ছাপ পড়ে। মেয়েদের মুখ কোমল, লাবণ্যময় এবং গোলগাল হয়ে ওঠে। ছেলেদের ক্ষেত্রে স্বরনালীর দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে স্বরভঙ্গতা দেখা দেয়। আর মেয়েদের গলার স্বর মিষ্টি হয়। অন্ত:ক্ষরা গ্রন্থির ক্ষরণে পরিবর্তন আসার ফলে দেহে যৌন হরমোন নি:সৃত হয় এবং যৌন অঙ্গে পরিবর্তন দেখা দেয়। ছেলে-মেয়েদের শরীরের বিশেষ বিশেষ স্থানে কেশোদ্গম হয়। ছেলেদের গোঁফ-দাড়ি গজায়। এই স্তরে যৌন পরিণতির ফল হিসাবে মেয়েরা সন্তান ধারনে সক্ষম হয়ে ওঠে।

মানসিক বিকাশ : বয়:সন্ধিকালে ইন্দ্রিয়শক্তির পূর্ণতা লাভ, অন্ত:ক্ষরা গ্রন্থিগুলোর নি:সরণে পরিবর্তন মানসিক জগতে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে। তবে কৈশোর বা বয়:সন্ধিকালে যে হারে দৈহিক পরিবর্তন ঘটে সে হারে মানসিক পরিবর্তন ঘটে না। তাদের ধারণার বিকাশ যথেস্ট পরিমাণে হয়। এই স্তরে শৈশব বস্তুর তাৎপর্য সে বিভিন্ন দিক থেকে বিচার করতে সক্ষম হয়। এই স্তরে শৈশবকালের মতো সব বিষয়ে আগ্রহ দেখায় না। তবে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে গভীর আগ্রহ দেখা দেয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে ছেলেরা অঙ্ক, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল বিষয়ে আগ্রহ দেখায়। মেয়েরা ভাষা, অঙ্কন, গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে আগ্রহী হয়। স্বাধীন চিন্তন ক্ষমতা, বিমূর্ত চিন্তন ক্ষমতা ও বিচার-বিশ্লেষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ফলে যে কোনও অভিজ্ঞতাকে গ্রহণ করার আগে স্বাধীনভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে থাকে। এই স্তরে আত্মসচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ায় সকল ব্যাপারেই নিজের প্রাধান্য এবং স্বকীয়তা বজায় রাখতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। পোশাক-পরিচ্ছদ, চলা-ফেরা, কথাবার্তা প্রভৃতি আচরণে ব্যক্তি তার বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করার জন্য ব্যগ্র হয়।

প্রাক্ষোভিক বিকাশ : দৈহিক দিকে হঠাৎ করে এই পরিবর্তন কিশোর-কিশোরীদের মনেও বিরাট পরিবর্তন আনে। এই আকস্মিক পরিবর্তনে তারা দিশেহারা হয়ে পড়ে। লজ্জার অনুভূতি জাগে। নিজেকে সবার থেকে আলাদা মনে হয় নিজেকে নি:সঙ্গ ও অসহায় মনে করে। আর এর থেকে নিরাপত্তার অভাব বোধ জাগে। এই স্তরে কিশোর কিশোরীদের প্রক্ষোভমূলক আচরণের বহি:প্রকাশে বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। কখনও প্রচণ্ড বিমর্ষ, আবার কখনও উচ্ছ্বাসে উজ্জ্বল। কখনও উৎসাহী কখনও উৎসাহহীন। কখনও প্রচণ্ড স্বার্থপর, কখনও আত্মত্যাগে দ্বিধাহীন। কখনও মন মরা হতাশ, কখনও আক্রমণাত্মক। এই বয়সে মন অত্যন্ত আবেগপ্রবণ থাকে। এই স্তরে কিশোর কিশোরী বিপরীতকাম সম্পর্কে সচেতন হয়। দেহের যৌন অনুভূতি মনে রোমান্টিক কল্পনা সৃষ্টি করে। ফলে তারা দিবাস্বপ্নে বিভোর থাকে। সৌন্দর্য চেতনা সৃষ্টি হয়। নিজেকে সুন্দর হিসাবে জাহির করার প্রবণতা দেখা দেয়।

সামাজিক বিকাশ : এই সময় কিশোর কিশোরীদের মধ্যে সামাজিক চেতনার বিকাশ বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। এই সময় তাদের মধ্যে বিভিন্ন সামাজিক বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। প্রথম কৈশোরে দেহের মধ্যে হঠাৎ পরিবর্তনে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব থেকে নিজেকে সরিয়ে এনে বাবা মায়ের উপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং তাদের সান্নিধ্যই বেশি নিরাপদ বলে মনে হয়। ধীরে ধীরে তা কাটিয়ে ওঠে এবং তখন দলের প্রতি নির্ভরশীলতা বাড়তে থাকে। এই বয়সে দল গঠনের প্রতি ঝোঁক দেখা যায়। সমবয়সীদের কেন্দ্র করে সামাজিক চেতনার বিকাশ ঘটে। মানবতা ও জনকল্যাণমূলক কাজের প্রতি ঝোঁক দেখা যায়। মানুষের প্রতি প্রকৃত ভালবাসা এবং তার কল্যাণ করার আকাঙ্ক্ষা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। সমাজে প্রচলিত কুসংস্কারকে দূর করে এক আদর্শ সমাজ গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখে। সহযোগিতা, সহানুভূতি, প্রতিযোগিতা ইত্যাদি মনোভাবের উদয় হয়। বীরপূজার প্রতি আকর্ষণ দেখা যায়।

বয়:সন্ধিকালের চাহিদা ও সমস্যা :

বয়:সন্ধিকালে কিশোর কিশোরীদের মধ্যে নানা ধরনের পরিবর্তনের ফলস্বরূপ তাদের মধ্যে বিভিন্ন চাহিদার সৃষ্টি হয়। এই চাহিদাগুলোর অ-পূরণে জীবনে নানা সমস্যা দেখা দেয়। এর থেকে উত্তরণের উপায় হল তাদের চাহিদার প্রকৃতি সম্পর্কে বাবা-মা কিংবা অভিভাবক এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ধারণা থাকা উচিত। পাশাপাশি মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে তা যথাসম্ভব পূরণের ব্যবস্থা করতে হবে। তবেই তাদের পক্ষে ভারসাম্যযুক্ত জীবন-যাপন সম্ভব হবে। বিভিন্ন চাহিদা ও সমস্যাগুলো হল—

১) যৌন চাহিদা : এই সময় যৌন অঙ্গের পরিবর্তন এবং যৌন শক্তির পরিপূর্ণ পরিণমন ঘটার ফলে মনোজগতে এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ফলস্বরূপ কিশোর-কিশোরীগণ তাদের পরিবর্তন সম্পর্কে যেমন সচেতন হয়ে ওঠে পাশাপাশি যৌন কৌতূহলও বৃদ্ধি পায়। এই কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে যৌন জীবন সম্পর্কে জানার প্রবল আগ্রহ দেখা যায়। যৌন শক্তির পরিণমনের ফলস্বরূপ তাদের মধ্যে বিপরীত যৌন চেতনা দেখা দেয়। ফলে মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গ চায় এবং ছেলেরা মেয়েদের সঙ্গিনী হিসাবে কামনা করে।

সমস্যা : যৌন অঙ্গের হঠাৎ পরিবর্তনের ফলে তাদের মনে নানা প্রশ্ন এসে ভিড় করে। কিন্তু সামাজিক বিধিনিষেধের বেড়া ভেঙে প্রকাশ্যে কোন কিছু জানা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই তাদের ইচ্ছাকে অবদমন করতে হয়। এই অবদমনের দরুন এবং অত্যধিক কৌতূহলের দরুন পরিবেশের সঙ্গে সার্থকভাবে অভিযোজন করতে তাদের খুব অসুবিধা হয়।ফলে যৌন জীবন তাদের কাছে এক সমস্যার রূপ নিয়ে আসে। তাছাড়া যৌন শক্তির পরিণমনের ফলে কিশোর কিশোরীদের মধ্যে যে যৌন আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয় তার তাড়নায় এবং যৌন কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে কখনও কখনও যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে ফেলে যা পরবর্তীকালে নানা সমস্যার সৃষ্টি করে এবং ব্যক্তি সত্তা বিকাশের পথে বিরাট অন্তরায় স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়।

২) স্বাধীনতার চাহিদা : শৈশব থেকে বাল্যকাল পর্যন্ত শিশুরা বয়স্কদের উপর নির্ভরশীল থাকে কিন্তু বয়:সন্ধিকালে পৌঁছার পর তাদের দেহ-মনে অতিরিক্ত শক্তির উদয় হলে তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস এবং আত্মনির্ভরতা জাগে। এর ফলে বয়স্কদের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিদের মতো স্বাধীনভাবে কাজ করা এবং স্বাধীন মতামত প্রকাশ করতে চায়। একেই প্রাপ্ত যৌবনের স্বাধীনতার চাহিদা বলা হয়।

সমস্যা : বয়স্ক শাসিত সমাজ প্রাপ্ত যৌবনের এই মনোভাবকে মেনে নেয় না। ফলে কিশোর কিশোরীদের

এই চাহিদা পূরণ সম্ভব হয় না। যার পরিণতি হিসাবে বয়স্কদের সঙ্গে তাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। আর এই দ্বন্দ্বের ফলে কখনও তাদের মধ্যে নানা ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ, দলবদ্ধভাবে দৌরাত্মের প্রবণতা, হীনমন্যতাবোধের জন্ম হওয়া ইত্যাদি দেখা যায়। অনেকে আবার সংঘাত এড়ানোর জন্য নানা অপকৌশল অবলম্বন করে যা পরবর্তীকালে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি করে বা তাদের স্বাভাবিক বিকাশকে ক্ষুন্ন করে।

৩) সামাজিক চাহিদা : এই চাহিদা দুইভাবে ক্রিয়াশীল হয় —

প্রথমত: আত্মকেন্দ্রিকতা ত্যাগ করে এই সময় বৃহত্তর সমাজ জীবনকে গভীরভাবে উপলব্ধি করার জন্য ব্যাকুল হয়। তাই একই আদর্শযুক্ত সমবয়সী ব্যক্তিদের নিয়ে দল গঠন করে এবং নানা প্রকার সামাজিক কাজকর্মের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করে সামাজিক দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে চায়।

দ্বিতীয়ত: তারা চায় সমবয়সীদের নিয়ে গঠিত এই দলকে বয়স্ক সমাজ স্বীকৃতি দিক এবং তাদের মতামতকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দিন।

সমস্যা : দলবদ্ধভাবে সক্রিয় হয়ে কিশোর-কিশোরীগণ বিভিন্ন সামাজিক দায়দায়িত্ব পালন করতে এগিয়ে এলেও বয়স্ক সমাজ অপরিণত ও অনভিজ্ঞ মনে করে তাদের উপর পূর্ণ অবস্থা স্থাপন করে সমস্ত দায়িত্ব স্বাধীনভাবে পালনের সম্মতি দেয় না। ফলে প্রচলিত সমাজের প্রতি এইসব ছেলেমেয়েদের বিরূপ মনোভাব দেখা দেয় এবং তারা তখন বিভিন্ন দলের মধ্যে থেকে নানা অসামাজিক আচরণ করে নানা সামাজিক সমস্যাকে গড়ে তোলে।

৪) নিরাপত্তার চাহিদা : বয়স্কদের দ্বিমুখী আচরণকে অনেক সময় কিশোর-কিশোরীদের মনে তাদের সামাজিক অবস্থানটি কি তা নিয়ে প্রশ্ন জাগে। কারণ বয়স্ক সমাজ কখনও তাদেরকে ছেলেমানুষ হিসাবে বিবেচনা করে এবং মনে করে বড়দের সমস্ত ব্যাপারে তাদের মাথা গলানো উচিত নয়। আবার কখনও মনে করে এখন আর ছেলেমানুষ নেই তাই সব ব্যাপারে বুঝে চলা উচিত। বয়স্কদের এই পরস্পর বিরোধী আচরণে তাদের মনে এই আশঙ্কা দেখা দেয় এই বুঝি বড়োরা তাদের কাজের জন্য বকাবকি করবে। অর্থাৎ নিরাপত্তার অভাববোধ করে। এর থেকে মুক্তি পাবার জন্য দল গঠন করে। আবার দলের সঙ্গে মানিয়ে না নিতে পারলে তাকে দলচ্যুত করা হবে— এই ভয়ও একই সঙ্গে কাজ করে। ফলে সেখানেও নিরাপত্তার অভাব বোধ হয়।তাছাড়া স্বাবলম্বী না হওয়ার আর্থিক ব্যাপারে তখনও তাদেরকে বাবা-মা কিংবা অভিভাবকের উপর নির্ভর করতে হয়। সেখানেও তাদের মতের বিরুদ্ধে কোন কাজ করলে অর্থনৈতিক অসুবিধায় পড়তে হবে। সেখানেও নিরাপত্তার অভাববোধ হয়। এই অবস্থায় সমাজ থেকে সে চায় নিরাপত্তার গ্যারান্টি। এটাকেই বলে প্রাপ্ত যৌবনের নিরাপত্তার চাহিদা।

সমস্যা : বয়স্ক শাসিত সমাজে তাদের চাহিদা পূরণে বিভিন্ন বাধা তাদের মনে নিরাপত্তাহীনতা বোধের সৃষ্টি করে। ফলস্বরূপ বিভিন্ন পরিবেশে অভিযোজনে অক্ষম হয়ে পড়ে। হীনমন্যতাবোধের সৃষ্টি হয়। এর থেকে মুক্তি পেতে কখনও বাড়ি থেকে পালায়, চুরি কিংবা বিভিন্ন সমস্যামূলক আচরণ করে থাকে। যা তার নিজের এবং সমাজের উভয়ের কাছেই বিরাট সমস্যার রূপ নিয়ে আসে।

৫) আত্ম-প্রকাশের চাহিদা : এই বয়সে কিশোর কিশোরীরা চায় সবার নজর কাড়তে। তারা চায় সকলে যাতে তাদের গুরুত্বকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করে। তাই তার মধ্যে কোন বিশেষ কর্মক্ষমতা থাকলে সেটাকে

সবার সামনে প্রকাশ করতে চায়। এর উদ্দেশ্য হল সমাজের বয়স্কদের সামনে বা দলের অন্যান্য সভ্যদের সামনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা।

সমস্যা : উপযুক্ত পরিবেশের অভাব এবং বয়স্ক সমাজের দৃষ্টিভঙ্গীর সংকীর্ণতার কারণে অনেক সময়ই তাদের আত্মপ্রকাশের চাহিদা তৃপ্ত হতে পারে না। যা তার ব্যক্তিত্বের যথাযথ বিকাশকে ব্যাহত করে জীবনকে সমস্যাসঙ্কুল করে তোলে।

৬) জ্ঞানের চাহিদা : এই বয়সে বাল্যকালের মতো আগ্রহের এত বিস্তৃতি থাকে না। কিন্তু আগ্রহের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রগুলো গভীর হয়। বিভিন্ন দিক থেকে আগ্রহের বিষয়গুলোকে বিশ্লেষণ করে তার সম্পর্কে নতুন নতুন তথ্য সংগ্রহের চাহিদা দেখা যায়। বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয় এবং এ ব্যাপারে বিভিন্ন তথ্যকে জানার জন্য পড়াশোনা করে, পর্যবেক্ষণ করে বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য জানার চেষ্টা করে। কৈশোরের এই চাহিদাকে বলে জ্ঞানের চাহিদা।

সমস্যা : এই বয়সে ছেলেমেয়েদের মধ্যে তখনও সূক্ষ্ম বিচার বোধ তৈরি হয় না। কিন্তু জ্ঞানলাভের উৎসাহে তারা অনেক সময় এমন সব উৎস থেকে খবর সংগ্রহ করে ফেলে যা যথার্থ নয়। এই ভ্রান্ত জ্ঞান যেমন তাকে ভ্রান্ত দিক নির্দেশ করে। পাশাপাশি তার মধ্যে নানা কু-অভ্যাসেরও জন্ম দিতে পারে। যা তাদের জীবনে পরবর্তীকালে নানা সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে।

৭) দিবাস্বপ্নের চাহিদা : বয়স্ক সমাজের নানা বিধি-নিষেধের বেড়া ডিঙিয়ে কিশোর কিশোরীগণ অনেক সময় তাদের চাহিদাকে পূরণ করতে পারে না। এই অপূর্ণ চাহিদাকে পূরণ করার জন্য তাই তারা অনেক সময় অলীক কল্পনার আশ্রয় নেয় এবং প্রয়োজনীয় তৃপ্তিকে খুঁজে নেয়। মনোবিজ্ঞানীগণের মতে এই দিবা স্বপ্ন একটি নির্দিষ্ট মাত্রা পর্যন্ত মানসিক ভারসাম্যকে বজায় রাখতে সাহায্য করে।

সমস্যা : বয়:সন্ধিকালের এই দিবা স্বপ্ন দেখার প্রবণতা স্বাভাবিক। কিন্তু তা মাত্রাতিরিক্ত হলে কিশোর-কিশোরীরা বাস্তব বিমুখ হয়ে পড়ে। যা তার ব্যক্তিত্বের স্বাভাবিক বিকাশের অন্তরায় হয়ে উঠতে পারে।

৮) দু:সাহসিক অভিযানের চাহিদা : নিজেকে সবার সামনে প্রতিষ্ঠিত করার চাহিদা এবং বয়স্কদের কাছ থেকে স্বীকৃতি পাবার চাহিদাকে পূরণ করার উদ্দেশ্যে বয়:সন্ধিপ্রাপ্ত কিশোর-কিশোরীরা অনেক সময় এমন সব দু:সাহসিক কাজের ঝুঁকি নেয়, যা সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ বিবেচনার দ্বারা এড়িয়ে চলে। একে দু:সাহসিক অভিযানের চাহিদা বলে।

সমস্যা : দু:সাহসিক অভিযানের চাহিদার বশবর্তী হয়ে এই বয়সের কিশোর-কিশোরীগণ কখনও কখনও এমন সব দু:সাহসিক কাজ করে ফেলে যা দৈহিক ক্ষতি সহ পরবর্তী জীবন বিকাশের ধারাকে ব্যাহত করে জীবনকে সমস্যাগ্রস্ত করে তোলে।

বয়:সন্ধিকালের শিক্ষামূলক গুরুত্ব : বয়:সন্ধিকালে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে, বিভিন্ন দিকে এত পরিবর্তন ঘটে এবং বিভিন্ন মুখী চাহিদার উদয় হয় যা পূর্ববর্তী আর কোন স্তরে দেখা যায় না। তাই তাদের শিক্ষার ব্যাপারে বাড়ীতে বাবা-মা কিংবা অভিভাবকসহ বিদ্যালয়ে শিক্ষকের বিশেষ সতর্ক পদক্ষেপ নেওয়া দরকার।

এই সময় দেহের বিভিন্ন অঙ্গের পরিবর্তনের ফলে তাদের মধ্যে লজ্জাভাবের উদয় হয় এবং এই পরিবর্তনকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করে কিংবা মনে নানা সংশয়ের সৃষ্টি হয়। এজন্য দায়ী হল যথার্থ জ্ঞানের অভাব। এক্ষেত্রে উপযুক্ত বিজ্ঞানসম্মত পাঠক্রম তাকে অহেতুক লজ্জা ও দ্বন্দ্বের হাত থেকে মুক্তি দিয়ে জীবন সম্পর্কে এক স্বাস্থ্যকর দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। এছাড়া এই স্তরে দৈহিক পরিবর্তনের ফলে অধিক পরিমানে দেহ সঞ্চালনের যে তাগিদ অনুভূত হয় তারজন্য খেলাধূলা, ব্যায়াম, শরীরচর্চার আয়োজন রাখতে হবে। বাবা-মা ও অভিভাবকসহ শিক্ষকের খেয়াল রাখতে হবে যাতে তারা এতে অংশগ্রহণ করে। পাশাপাশি পুষ্টিকর খাদ্যও সরবরাহ করতে হবে।

বিভিন্ন মানসিক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে শিক্ষক ধৈর্য্য ও সহানুভূতির সঙ্গে চাহিদাগুলোকে বিচার করে সমাজসম্মত পথে তা পূরণের ব্যবস্থা করবেন। যেমন— বিতর্ক, আলোচনা, বক্তৃতা ইত্যাদি ব্যবস্থা করে স্বাধীনতা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদাকে পূরণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বিভিন্ন সৃজনমূলক কাজের ব্যবস্থা করে তাদের আত্মপ্রকাশের চাহিদাকে পূরণ করা যেতে পারে। শিক্ষার্থীদেরকে নির্বাচিত বই পড়তে উৎসাহিত করার মধ্যে দিয়ে তার জ্ঞানের চাহিদাকে পূরণ করা যেতে পারে। তাছাড়া দেশভ্রমণ, ঐতিহাসিক স্থান দর্শন, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ, পাঠাগারের ব্যবহার করতে উৎসাহ দানের মাধ্যমে তাদের জ্ঞানের চাহিদার তৃপ্তি ঘটানো যেতে পারে।

শিক্ষক বিদ্যালয়ে বিভিন্ন পাঠক্রমিক ও সহপাঠক্রমিক কাজের মধ্যে দিয়ে সহযোগিতা, সহানুভূতি, ভালবাসা, সমবেদনা, সুস্থ প্রতিযোগিতা ইত্যাদি সমাজ জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় অনুভূতিগুলোর সঞ্চারে সহায়তা করবেন এবং রাগ, ভয়, ঘৃণা ইত্যাদির মতো নেতিবাচক প্রক্ষোভগুলোর সংযত প্রকাশের প্রশিক্ষণ দেবেন। আবেগের সুস্থ-সুন্দর প্রকাশের জন্য বিভিন্ন সৃজনমূলক কাজের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের যুক্ত করবেন। সর্বোপরি শিক্ষক নিজের আবেগকে আদর্শগতভাবে নিয়ন্ত্রণ করে শিক্ষার্থীকে প্রাক্ষোভিক নিয়ন্ত্রণের শিক্ষা দেবেন।

শিক্ষার্থীর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক গুণের বিকাশ ঘটানোর জন্য তাদেরকে দলগত কাজে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করবেন।

চতুর্থ একক শিখন

শিখনের অর্থ :

শিখন জীবের এক বিশেষ ধর্ম। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণী থেকে উন্নত জীব মানুষ পর্যন্ত সকলেই শেখে, তবে সবার মধ্যে মানুষ সবচেয়ে বেশি শেখে। শেখার শুরু হয় জন্মের পর থেকে হয় মৃত্যুতে। দৈনন্দিন জীবনে 'শিখন' কথাটিকে আমরা প্রায়ই ব্যবহার করে থাকি, যেমন — শিশুটি হাঁটতে শিখেছে, লোকটি নাম লিখতে শিখেছে, এভাবে গান গাইতে শেখা, আঁকা শেখা রান্না করতে শেখা,গুছিয়ে কথা বলতে শেখা ইত্যাদি ধরণের শেখার সঙ্গে আমরা প্রতিনিয়ত পরিচিত হচ্ছি।

এখন প্রশ্ন হল প্রাণী কেন শেখে? এর উত্তরে বলা যায়-প্রাণীজগতকে ঘিরে যে পরিবেশ রয়েছে, প্রকৃতি স্বাভাবিক নিয়মে প্রতিনিয়তই তার মধ্যে পরিবর্তন ঘটে, চলেছে। আর এই পরিবর্তনের বহু বিচিত্র প্রভাব প্রতিনিয়তই প্রাণীর ওপর এসে পড়ছে। এই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রাণী যদি নিজেকে পরিবর্তিত করতে না পারে তবে তার পক্ষে নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখাও অসম্ভব হয়ে পড়বে। চার্লস ডারউইন বলেছেন অর্থাৎ যোগ্যতমরাই একমাত্র পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পারবে। এই যোগ্যতার অর্থ সার্থকভাবে সঙ্গাতিবিধান। এই সঙ্গাতিবিধানের উদ্দেশ্যেই প্রাণী শেখে। এই সংগতিবিধান করতে গিয়েই প্রাণী তার পূর্বের আচরণের পরিবর্তন করে। পরিবর্তিত সেই আচরণ সম্পূর্ণ মতুন ধরণের হতে পারে কিংবা পূর্ব আচরণের উন্নত রূপও হতে পারে। প্রাণীকে তার আচরণ পরিবর্তণে সাহায্য করে তার অতীত অভিজ্ঞতা, প্রশিক্ষণ এবং পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনের তাগিদ। এই সবকিছুর মিলিত প্রভাবে প্রাণীর মধ্যে অপেক্ষাকৃত স্থায়ী পরিবর্তন সংঘটিত হয়। অপেক্ষাকৃত স্থায়ী পরিবর্তন বলার অর্থ হল পরবর্তীকালে নতুন অভিজ্ঞতার আলোকে এই আচরণ আবারও পরিবর্তিত হতে পারে। এভাবেই প্রাণী তার সঙ্গাতিবিধানের প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

শিখনের সংজ্ঞা :

বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীগণ শিখনকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করার চেস্টা করেছেন। তার কয়েকটি এখানে উল্লেখিত হল—

মনোবিদ জয় পল গিলফোর্ড (Joy Paul Guilford) বলেছেন,শিক্ষন এক ধরণের আচরন পরিবর্তনের প্রক্রিয়া যা আচরণের ফলে গড়ে ওঠে।

গার্ডনার মারফি (Gurdner Murphy) বলেছেন, পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গাতি বিধানের জন্য প্রয়োজনীয় আচরণের যে কোনো ধরণের পরিবর্তনকেই শিখন বলে।

লেভ সিমিওনোভিচ্ ভাইগটস্কির (Lev Semionnovich Vygotsky) মতে, জ্ঞান নির্মাণের সামাজিক প্রক্রিয়া হল শিখন।

রবার্ট উডওয়ার্থ (Robert Woodworth) শিখন বলতে সেই ধরণের সক্রিয়তাকে বলেছেন যা ব্যক্তির

আচরণে পরিবর্তন আনে এবং ব্যক্তির পূর্ববর্তী আচরণ ও অভিজ্ঞতার পরিবর্তন ঘটায়।
বিভিন্ন ধরণের সংজ্ঞাকে বিচা র করে সাধারণভাবে শিখনের সংজ্ঞায় যা বলা যায় তা হল-
অতীত অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণের প্রভাবে আচরণধারার অপেক্ষাকৃত স্থায়ী পরিবর্তনের যে প্রক্রিয়া তাকেই শিখন বলে।

শিখনের স্বরূপ :

শিখন একটি অতি জটিল প্রক্রিয়া। এর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলো বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে তার স্বরূপটি জানা সম্ভব। এখানে আমরা কিছু বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করবো যেগুলোর উপস্থিতিতে প্রকৃত শিখন সংঘটিত হয়। সেগুলো হল -

ক) সর্বজনীন : প্রাণী মাত্রই শেখে। পিঁপড়ে থেকে শুরু করে উন্নত জীব মানুষ পর্যন্ত সবাই শেখে। তাই বলা যায় প্রাণীর একটি সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য। তবে বিভিন্ন প্রাণীর শেখার ধরণের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। জন্মের পর থেকে প্রাণী শেখা শুরু করে, শেষ হয় মৃত্যুতে।

খ) আচরণের পরিবর্তন : শিখনের ফলে আচরণের পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তনের পুরনো আচরণের উন্নতরূপ অথবা সম্পূর্ণ নতুন হতে পারে। আচরণের পরিবর্তন আবার যে বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে তা হল নতুন একটি অভিজ্ঞতা।

গ) সঙ্গতিবিধান : পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের জন্য প্রাণী শেখে অর্থাৎ শিখনের একটি অপরিহার্য শর্ত হল পরিবেশ তথা বাইরের জগতের তাগিদ। পরিবেশ যদি স্থবির হত তাহলে আমরা আমাদের আচরণ পরিবর্তনের তাগিদ যেমন অনুভব করতাম না, তেমনি শিখনেরও প্রয়োজন হত না।

ঘ) আত্মসক্রিয়তা : অতীত অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণের উপর ভিত্তি করে ব্যক্তি আত্মসক্রিয়তার মধ্যে দিয়ে আচরণের পরিবর্তন সাধন করে। পরিবর্তিত পরিবেশে কীভাবে আচরণ করবে ব্যক্তি তা নিজেই ঠিক করে। তাই বলা যায় সক্রিয়তার উপর শিখন সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

ঙ) অনুশীলন নির্ভর : শিখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুশীলন নির্ভর। অনুশীলনের তারতম্যের উপর শিখনের হ্রাস বৃদ্ধি নির্ভর করে। মনোবিদদের বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় ব্যক্তি যখন কোনো সমস্যামূলক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়, তখন যে প্রচেস্টা বা অনুশীলনের মাধ্যমে আচরণের মধ্যে পরিবর্তন আনে। প্রত্যেক প্রচেস্টায় সে সমস্যার সমাধানের দিকে এগিয়ে যায় এবং আচরণের পরিবর্তন হয়।

চ) প্রেষণা : বাইরের জগতের সঙ্গে অভিযোজনের তাগিদ যেমন প্রাণীকে আচরণের পরিবর্তনে উদ্বুদ্ধ করে, তেমনি অন্তর্জগতের তাগিদও তাকে শক্তি যোগায়। এই তাগিদেই মনোবিদ্যার পরিভাষায় প্রেষণা বলে। প্রেষনা ব্যক্তির অন্তরে এমন অবস্থা তৈরি করে যা তাকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য বিশেষ ধরণের আচরণ করতে বাধ্য করে এবং লক্ষ্যে না পোঁছানো পর্যন্ত এই অবস্থা বজায় থাকে।

ছ) পরিণমন: শিখন দেহ ও মনের পরিণমনের উপর নির্ভর করে। উপযুক্ত পরিণমন না ঘটলে শিখন সম্ভব নাও হতে পার। পরিণমন বলতে আমরা সেই সব আচরণের পরিবর্তনকে বুঝি যা কোনো রকম অভিজ্ঞতা বা প্রশিক্ষণ ছাড়াই স্বাভাবিকভাবে সংঘটিত হয়। এজন্য উদ্দীপক পরিস্থিতির বিশেষ কোনো শর্তের প্রয়োজন হয় না।

জ) সমস্যা : সাধারণত শিখন প্রক্রিয়ার সঙ্গো কোনো না কোনো সমস্যামূলক পরিস্থিতি অবশ্যই থাকবে। সমস্যামূলক পরিস্থিতি বলতে বোঝায় যেখানে পুরনো বা অভ্যস্থ আচরণ দ্বারা পরিবেশের সঙ্গো সঙ্গাতিবিধান সম্ভব হয় না। এমতাবস্থায় প্রাণী পুরনো আচরণকে বর্জন করে নতুন আচরণ আয়ত্ত্ব করে তার সাহায্যে সমস্যার সমাধান করার চেস্টা করে। তাই বলা যায় সমস্যা হল শিখনের অপরিহার্য শর্ত।

ঝ) চাহিদা : প্রাণীর শিখনের মূলে কোনো না কোনো ধরণের চাহিদা অবশ্যই থাকবে। সেই চাহিদা ব্যক্তিগতও হতে পারে আবার সামাজিকও হতে পারে। এই চাহিদা পূরণের ল.ক্ষ্যেই প্রাণী নতুন আচরণ আয়ত্ত্ব করার চেস্টা করে।

শিখন ও পরিণমন :

সঙ্গাতিবিধানের উদ্দেশ্যে প্রাণী যেসব আচরণ করে বাসা তৈরি তার সবগুলো শিখন নয়। যেমন- হঠাৎ তীব্র আলো চোখে পড়লে চোখ বন্ধ হয়ে যাওয়া,পাখীদের বাসা াতরি করা, কোনো বিশেষ ঋতুতে পাখিদের স্থানান্তরে উড়ে যাওয়া ইত্যাদি কিংবা সাধারণ নিয়মে শিশু একটি নির্দিষ্ট বয়সে কথা বলতে শেখা এসব শিখনের ফল নয় ।এর মূলে রয়েছে পরিনমণ।

প্রতিটি ব্যক্তি জন্মগতভাবে কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মায়, স্বাভাবিক জীবন বিকাশের পথে এই বৈশিষ্ট্যগুলো ক্রমশ প্রকাশিত হয়, যা ব্যক্তির আচরণকে গুণগত ও পরিমাণগতভাবে পরিবর্তিত করে। আর এই পরিবর্তনের জন্য কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা বা প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয় না । কেবলমাত্র প্রয়োজন হয় স্বাভাবিক বিকাশমূলক পরিবেশের। ওয়ালটার বাণার্ড কোলেসনিকের (Walter Bernard Kolsnik) ভাষায়-Maturation refers to the change quantitative or qualitalive which result from the natural unfolding of inherited tendencies or actualisation of innate potentialities,"

অর্থাৎ জন্মগত প্রবণতার স্বাভাবিক বিকাশের ফলে আচরণের গুণগত ও পরিমাণগত পরিবর্তনের প্রক্রিয়া বা জন্মগত সম্ভাবনাগুলোর বাস্তবায়িত হওয়ার প্রক্রিয়াই হল পরিণমন।

পরিণমন প্রক্রিয়ায় জীবদেহের কোষ, নার্ভ-পেশী এবং বিভিন্ন অঙ্গা-প্রত্যঙ্গোর মধ্যে পরিবর্তন দেখা দেয়। যার ফলে সে বিভিন্ন ধরণের কাজ করতে সমর্থ হয়। তবে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্যযোগ্য যে, পরিণমন আপনাআপনি ঘটে না। শিশুর জন্মের পূর্বের ও পরের পরিবেশের বিভিন্ন প্রভাব শিশুর পরিণমনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করতে পারে। যেমন, গর্ভকালীন অবস্থা মায়ের উপযুক্ত ও সুষম খাদ্যের অভাব অথবা কোনো সংক্রমণ ব্যাধি পরিণমন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে।

পরিণমন ও শিখন পরস্পর নির্ভরশীল একটি প্রক্রিয়া। তাই এককভাবে কোনো একটির দ্বারা ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন বিকাশ সম্ভব নয়। গেসেল ও থমসনের গবেষণা প্রমাণ করে যে পরিণমন ও শিখনের যৌথ অবদানেই ব্যক্তির উপযুক্ত বিকাশ সম্ভব। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিণমনের প্রভাব বেশি, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিখনের প্রভাব অত্যন্ত জরুরী। যেমন, ভাষা বিকাশের ক্ষেত্রে শিশুর ষড়যন্ত্রের ও জিভের পরিপক্কতা এলে তাকে শিখনের মাধ্যমে ভাষা শিক্ষা দেওয়া সম্ভব। কিম্বা একটি এক বছরের শিশুকে বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়েও মোটর গাড়ি চালনা বা বীজগাণিতিক বিভিন্ন তত্ত্বে পারদর্শী করে তোলা সম্ভব নয়।

এজন্য শিশুটির পরিণমনের একটি নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তাই বলা যায় শিখনের সাহায্যে ব্যক্তির কোনো কৌশল আয়ত্ব করতে তখনই সহায়তা দান করা সম্ভব যখন ব্যক্তির মধ্যে উক্ত বিষয়টি আয়ত্ত্ব করার মতো সামর্থ্য বর্তমান থাকবে। আর এজন্য শিখনকে পরিণমনের উপর নির্ভর করতে হয়।

অন্যদিকে বলা যা পরিমিণনকেও শিখনের উপর নির্ভর করতে হয়। যেমন, স্বাভাবিক নিয়মে জিভের জড়তা কাটার পরেও যদি ভাষা শিখনের ব্যবস্থা না করা হয় তাহলে শিশুর পক্ষে ভাষার ব্যবহার যেখা সম্ভব নয়। তাছাড়া ব্যক্তির পরিমিণনের ফলে আচরণের যে পরিবর্তন হয় তাকে দক্ষতার স্তরে উন্নীত করার জন্য পরিণমনকে শিখনের উপর নির্ভর করতে হয়। যেমন, বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর মধ্যে স্বাভাবিক নিয়মে কলম ধরার সামর্থ্য তৈরি হলেও উপযুক্ত শিখনের অভাবে শিশুর পক্ষে দক্ষতার সঙ্গে সঙ্গে কোনো কিছু লেখার কাজ করা সম্ভব নয়।

শিখন ও পরিণমনের মধ্যে এই পারস্পরিক নির্ভরতার সম্পর্ক থাকা সত্বেও পরিণমন আর শিখন এক কথা নয়। এদের মধ্যে যে পার্থক্য বর্তমান

শিখন পরিণমন	পরিণমন
অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণের ফলে আচরণধারা পরিবর্তনের প্রক্রিয়া হল শিখন।	অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণ ছাড়া জন্মগত প্রবণতাগুলোর স্বাভাবিক বিকাশের ফলে আচরণের গুণগত ও পরিমানগত পরিবর্তনের প্রক্রিয়া হল পরিণমন।
শিখন একধরণের মানসিক প্রক্রিয়া।	একধরণের জৈবিক প্রক্রিয়া।
কোনো সুনির্দিষ্ট ধাঁচ অনুসরণ করা হয় না। ব্যক্তিগত বৈষম্য রয়েছে। যেমন,পাঁচ বছরের সকল শিশু শেখার ধরন একই রকম নয়।	নির্দিষ্ট ধাঁচ অনুসৃত হয়। যেমন, পাঁচ বছরের সকল শিশু পরিণমনের ধাঁচ মোটামুটি একই রকম।
শর্ত সাপেক্ষ ও নিয়ন্ত্রণযোগ্য একটি কৃত্রিম প্রক্রিয়া।	শর্ত নিরপেক্ষ একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া।
সচেতন ইচ্ছা ও সক্রিয়তার প্রয়োজন হয়, যেমন কেউ যদি গাড়ি চালানো শিখতে চায়, তাহলে তাকে তার ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করার জন্য সর্বদা সচেতন থাকার পাশাপাশি সক্রিয়ভাবে অনুশীলন করতে হয়।	এটি একটি স্বত:স্ফূর্ত বিকাশ প্রক্রিয়া, যার সম্পর্কে ব্যক্তি সব সময় সচেতন থাকে না। যেমন, বয়:বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট বয়সে শিুর পেশীগুলোর পরিণমন ঘটে এবং তার মধ্যে হাঁটার মতো সার্মথ্য তৈরি হয়।
শিখণের ক্ষেত্রে কোনো জাতিগত প্রভাব নেই। তাই কোনো একটি জাতির সকলের মধ্যে সমান শিখনের ক্ষমতা থাকে না।	নির্দিষ্ট জাতির ক্ষেত্রে পরিণমনের ধাঁচ প্রায় একই রকম। অর্থাৎ পরিণমনের ক্ষেত্রে জাতিগত প্রভাব বর্তমান।
বাইরের জগতের সঙ্গে সঙ্গাতিবিধানের তাগিদ এবং অন্তর্জগতের তাগিদ বা প্রেষণার ফল হল শিখন।	স্বাভাবিক বিকাশের ফল।

শিক্ষককে অবশ্যই শিখন ও পরিণমনের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার কথাটি মনে রেখে শিক্ষাদান করতে হবে। শিক্ষক তার শিখন পরিকল্পনা যেমন শিশুর পরিণমনের উপর নির্ভর করে গড়ে তুলবেন, তেমনি পরিণমনলব্ধ আচরণকে চর্চার সুযোগ দিয়ে দক্ষতার স্তরে উন্নীত করে তুলবেন, তাতে পরবর্তী সময় ওই আচরণ সম্পাদনের জন্য শক্তির অপচয় কম হবে।

শিখন, প্রেষণা ও উদ্‌বোধক :

শিখনের সঙ্গো প্রেষণার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। প্রেষণাকে শিখণের পূর্বশর্ত বলা যায়। বিনা প্রেষণায় কোনো শিখন হতে পারে না। প্রেষণা ব্যক্তির মনে এমন উত্তেজিত অবস্থা তৈরি করে, যা তাকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য বিশেষ ধরণের আচরণ করতে বাধ্য করে এবং লক্ষে না পৌঁছানো পর্যন্ত এই অবস্থা বজায় থাকে, ব্যক্তির সমস্ত আচরণের পিছনে অপরিহার্যভাবেই প্রেষণার ভূমিকা রয়েছে।

কিন্তু কেবলমাত্র প্রেষণার উপস্থিতিতেই শিখন হয় না। প্রেষণার সঙ্গো আরো একটি উপাদান প্রয়োজনীয়। তা হল উদ্‌বোধক আর তা হল সেই উপাদান, যা পেলে বা যেখানে পৌঁছাতে পারলে প্রেষণার তৃপ্তি ঘটে। যেমন, ক্ষুধার সময় খাদ্য পেলে ক্ষুধারূপ প্রেষণার তৃপ্তি ঘটে। এখানে ক্ষুধা হল প্রেষণা, খাদ্যবস্তু হল উদ্‌বোধক। প্রকৃতপক্ষে এই দুটি বিষয় যখন একত্রে মিলিত হয় তখনই শিখন ঘটতে পারে। তাই বলা যায় শিখন সম্ভব হয় কেবলমাত্র প্রেষণা এক উদ্‌বোধকের মিলিত পরিস্থিতিতে।

উদ্‌বোধক হল দুই রকমের - ১) বাহ্যিক উদ্‌বোধক ২) আভ্যন্তরীণ উদ্‌বোধক। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করা যাক্- রমেশবাবু স্বাস্থ্য সচেতন মানুষ। তাই প্রতিদিন ভোরবেলা প্রাত:ভ্রমণে বের হন। নরেনবাবু কিছুদিন ধরে ডাক্তারের নির্দেশ মেনে প্রাত:ভ্রমণ শুরু করেছেন। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সচেতনতার কারণে রমেশবাবু প্রাত:ভ্রমণকে অর্থপূর্ণ বলে মনে করেন এবং তিনি তা করার জন্য আন্তরিক তাগিদ অনুভব করেন। এখানে রমেশবাবুর স্বাস্থ্য সচেতনতা আভ্যন্তরীণ উদ্‌বোধকের কাজ করেছে, যা তাকে প্রাত:ভ্রমণে প্রেষিত করেছে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বাহ্যিক উদ্‌বোধক হিসাবে ডাক্তারের নির্দেশ তাকে কাজটি করতে প্রেষিত করেছে। নিন্দা, প্রশংসা, শাস্তি পুরস্কার, প্রতিযোগিতা ইত্যাদি বাহ্যিক উদ্‌বোধকের উদাহরণ। এ প্রসঙ্গো বলা যায় বাহ্যিক উদ্‌বোধক ব্যক্তিকে বাহ্যিক দিক থেকে প্রেষিত করে আর আভ্যন্তরীণ উদ্‌বোধক আভ্যন্তরীন দিক থেকে ব্যক্তিকে প্রেষিত করে বা উদ্বুদ্ধ করে।

সু-শিক্ষকের কর্তব্য হল উপযুক্ত প্রেষণার সাহায্যে বিচক্ষণতার সঙ্গো শিক্ষার্থীর চিন্তাভাবনাকে উদ্বুদ্ধ করে তার মধ্যে আগ্রহের সৃষ্টি করা এবং পরিশ্রম করার জন্য তাকে উৎসাহিত করা। কোনো উদ্‌বোধক কারও কাছে প্রেষণা সৃষ্টির কারণ হলেও আরেক জনের কাছে তা নাও হতে পারে। তাই প্রেষণা সৃষ্টির জন্য উদ্‌বোধক নির্বাচনের ব্যাপারে শিক্ষককে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করে তাকে লক্ষের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

পঞ্চম একক

শিখনের বিভিন্ন তত্ত্ব

প্রাণী কীভাবে শেখে এই নিয়ে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে নানা ধরণের চিন্তাভাবনা গড়ে উঠেছে। মনোবিজ্ঞানীদের চিন্তাভাবনার ফসল হিসাবে তাদের দীর্ঘকালীন গবেষণামূলক পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব বা মতবাদ গড়ে উঠেছে তার কয়েকটি এখানে আলোচিত হল -

প্রচেষ্টা ও ভুলের তত্ত্ব :

বিখ্যাত আমেরিকান মনোবিদ এডওয়ার্ড লী থর্নডাইক (Edward Lee Thorndike) ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর Animal Intelligence গ্রন্থে শিখন সম্পর্কে তার মতবাদকে প্রকাশ করেন। যা প্রচেষ্টা ও ভুলের তত্ত্ব (Trial and Error Theory) বা উদ্দীপক প্রতিক্রিয়ার তত্ত্ব (Stimulus Response Theory) নামে পরিচিত। এই তত্ত্বে থর্নডাইক মানুষের শিখন সম্পর্কে বলেছেন — 'Learning is the estiblishment of bonds stimulus and responses and it follows a mechanical process of blind trial and error.' থর্নডাইকের মতে প্রাণী যখন কোন সমস্যামূলক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় এবং তার সমাধান সম্পর্কে যখন তার ধারণা থাকে না তখন সে অন্ধ ও যান্ত্রিকভাবে একটির পর একটি চেষ্টা ও ভুল করার মধ্যে দিয়ে সমাধান খোঁজার চেষ্টা করে। প্রত্যেকবার প্রচেষ্টায় একটি করে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে বন্ধন স্থাপিত হয়ে থাকে। এইভাবে স্থাপিত বন্ধনগুলো যখন প্রাণীকে তার লক্ষ্যপূরণে সহায়তা করে না তখন সেই সব অপ্রাসঙ্গিক প্রতিক্রিয়াগুলোকে প্রাণী বর্জন করতে শেখে। এই পন্থায় অগ্রসর হতে হতে শেষ পর্যন্ত প্রাণী নির্ভুল সমাধানটি আবিষ্কার করে ফেলে। এভাবেই প্রাণীর শিখন সম্পূর্ণ হয়। থর্নডাইক বলেন যে শিক্ষা বলতে বোঝায় উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন । তাঁর এই মতবাদকে যোগসূত্র স্থাপনের মতবা বা Connectionism ও বলা হয়।

থর্নডাইক তাঁর মতবাদকে গড়ে তোলার জন্য মুরগী, বিড়াল ইত্যাদি বিভিন্ন প্রাণীর উপর পরীক্ষা করেন। সেই দিক থেকে ক্ষুধার্ত বিড়ালের উপর পরীক্ষাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তা হল—
থর্নডাইক তার এই পরীক্ষায় একটি পাজল বক্স ব্যবহার করেন যার ছিটকিনির উপর চাপ পড়লেই খাঁচাটির দরজা খুলে যায়। ক্ষুধার্ত একটি বিড়ালকে খাঁচার ভিতর ঢুকিয়ে খাঁচার বাইরে এক টুকরো মাছকে এমনভাবে রাখলেন যা খাঁচার ভিতর থেকে দেখা যায় কিন্তু তা বিড়ালের নাগালের বাইরে থাকে। এবার বিড়ালের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করতে লাগলেন—

১) খাঁচার দরজা খোলার কৌশলটি জানা না থাকায়, বাইরে এসে মাছটি খাবার জন্য খাঁচার ভিতরে থেকে এলেমেলোভাবে ছোটাছুটি করতে লাগলো।

২) হঠাৎ ছিটকিনিতে চাপ পড়তেই দরজা খুলে গেল এবং বিড়ালটি বাইরে এসে মাছটি খেলো।

৩) দ্বিতীয় দিন অপেক্ষাকৃত কম ভুল চেষ্টা করে, কম সময়ে খাঁচার বাইরে এসে মাছ খেলো।

৪) পর পর কয়েকদিন একই পন্থা অবলম্বন করে দেখা গেল খাঁচার বাইরে বেরিয়ে আসার জন্য ভুল প্রচেষ্টার সংখ্যা ক্রমশ কমে আসছে।

৫) পরিশেষে এমন একদিন এলো যখন বিড়ালটিকে খাঁচায় ঢোকানো মাত্র দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হল।

এর থেকে প্রমাণিত হয় চেষ্টা ও ভুলের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে বিড়ালটি শেষ পর্যন্ত সঠিক উদ্দীপকের প্রতি সঠিক প্রতিক্রিয়া করতে সক্ষম হল এবং তার শিখন সম্পন্ন হল।

প্রাণী কিভাবে এবং কেন তার ভুল প্রচেষ্টাগুলোকে গ্রহন করে তার সুষ্ঠু ব্যাখ্যা দানের জন্য থর্নডাইক তিনটি মুখ্য ও পাঁচটি গৌণ সূত্রের উল্লেখ করেছেন। যদিও সঠিক অর্থে গৌণ সূত্রগুলোকে সূত্র বলা যায় না। তথাপিও বলা যায় প্রাণীর শিখনের বৈশিষ্ট্যের বিভিন্ন দিক এই সূত্রগুলোতে উল্লেখ করেছেন। তবে বিশেষভাবে লক্ষ করলে দেখা যাবে যে গৌণ সূত্রগুলো পূর্বোক্ত সূত্রেরই অন্তর্ভুক্ত। সূত্রগুলো হল—

১) ফললাভের সূত্র (Law of Effect) : থর্নডাইকের মতে শিখন নির্ভর করে তার প্রচেষ্টার ফল কি ধরনের হয়েছে। প্রচেষ্টার ফল যদি তাকে সুখকর অনুভূতি দান করে তবেই প্রাণী সে বিষয়টি শেখে। বিপরীতভাবে, ফল যদি দু:খজনক অনুভূতি দান করে তাহলে প্রাণী সেই ধরনের প্রতিক্রিয়াকে বর্জন করে এবং এর দ্বারা শিখন হয় না।

এই সূত্রকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষক বিভিন্নভাবে শিখনকে ফলপ্রসূ করে তুলতে পারেন। যেমন, শিশুর মানসিক ক্ষমতা অনুযায়ী বিষয়কে নির্বাচন করে। শিক্ষণীয় বিষয়টিকে শিক্ষার্থীর বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত করে, বিভিন্ন শিখন সহায়ক উদ্দীপক ব্যবহার করে শিখনকে আগ্রহোদ্দীপক করে তুলে শিখনের ফলকে শিক্ষার্থীর কাছে সুখকর করে তোলার মাধ্যমে শিখনকে ফলপ্রসূ করে তুলতে পারেন।

২) অনুশীলনের সূত্র (Law of Exercise) : এই সূত্রটিকে দুইভাগে ভাগ করেছেন —

(ক) অভ্যাসের সূত্র (খ) অনভ্যাসের সূত্র ।

ক) অভ্যাসের সূত্র : সুখকর ফললাভের দ্বারা উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যে বন্ধন স্থাপিত হয়, পরবর্তীকালে সেটিকে বার বার চর্চা করলে বন্ধন শক্তিশালী হয় অর্থাৎ শিখনটি স্থায়ী হয়।

খ) অনভ্যাসের সূত্র : সুখকর ফললাভের দ্বারা উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যে বন্ধনে স্থাপিত হয়, পরবর্তীকালে যদি সেটাকে আর চর্চা না করা হয় তাহলে বন্ধন শিথিল হয়ে যায় এবং প্রাণী বিষয়টি ভুলে যায়।

শিক্ষককে মনে রাখতে হবে অনুশীলন শিখনে পূর্ণতা ও দক্ষতা আনয়নে সাহায্য করে। কাজেই কোন একটি বিষয় শেখা বা বোঝার পর বার বার অনুশীলন করতে হবে। তাহলেই শিখনটি স্থায়ী হবে। তবে শিক্ষক লক্ষ্য রাখবেন যে শিক্ষার্থীর অনুশীলন যাতে অন্ধ বা যান্ত্রিকভাবে না হয়। অর্থাৎ অনুশীলনের বিষয়টির অর্থ যাতে শিক্ষার্থীর কাছে পরিষ্কার থাকে। তাহলেই শিক্ষা সার্থক ও ফলপ্রসূ হয়ে উঠতে পারবে।

৩) প্রস্তুতির সূত্র (Law of Readiness) : শিক্ষার্থী যখন কোন বিষয় শেখার জন্য দৈহিক ভাবে প্রস্তুত থাকে, তখন তাকে ঐ বিষয়টি শিখতে দিলে শিখন ভাল হয় নতুবা শিখন বাধাপ্রাপ্ত হয়। থর্নডাইকের মতে, যে উত্তেজনা স্নায়ু বহন করতে তৈরি তা বহন করতে দিলে ব্যক্তির তৃপ্তি আসবে। অন্যথায় বিরক্তি আসবে এবং শিখন ব্যাহত হবে।

থর্নডাইক তার প্রস্তুতির সূত্রে বিশেষভাবে দৈহিক প্রস্তুতির কথা বললেও পরবর্তী সময় মানসিক

প্রস্তুতির প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি উপলব্ধি করেন। তাই গৌণ সূত্রে 'মানসিক অবস্থার' সূত্রের উল্লেখ করেছেন।

শিক্ষককে মনে রাখতে হবে শিক্ষার্থীর দৈহিক প্রস্তুতি আসে পরিণমনের মাধ্যমে। তাই শিক্ষার্থীর দৈহিক পরিণমন অনুযায়ী বিষয় নির্বাচন করে তা শেখালে শিখন ফলপ্রসূ হয়।

গৌণ সূত্রগুলো হল—

১) বহুমুখী প্রতিক্রিয়ার সূত্র (Law of Multiple Response) :

প্রাণী যতক্ষণ পর্যন্ত চেষ্টা ও ভুলের মধ্যে দিয়ে সঠিক প্রতিক্রিয়াটিকে চিহ্নিত করতে পারছে ততক্ষণ পর্যন্ত একই উদ্দীপকের প্রতি নানা ধরনের প্রতিক্রিয়া করতে থাকে। সবশেষে যোগ্য প্রতিক্রিয়াটি বেছে নেয়।

এই সূত্রানুযায়ী শিক্ষক কোন বিষয়কে শিক্ষার্থীর সামনে সমস্যার আকারে তুলে ধরবেন। শিক্ষার্থী সেই সমস্যাটির সমাধানের জন্য বহু ভুল প্রতিক্রিয়া করতে পারে। এজন্য তার শাস্তি প্রাপ্য হবে না। শেষ পর্যন্ত সঠিক সমাধানটি নির্বাচন করতে পারবে এবং তার প্রকৃত শিখন সম্ভব হবে। তবে এক্ষেত্রে শিক্ষক সহায়তাকারীর ভূমিকায় থাকবে।

২) মানসিক অবস্থার সূত্র (Law of Attitude) : কোন উদ্দীপকের প্রতিপ্রাণীর প্রতিক্রিয়া নির্ভর করে প্রাণীর তখনকার মনোভাব বা মানসিক অবস্থার উপর।

পাঠদানকালে শিক্ষক লক্ষ রাখবেন বিষয়টির প্রতি শিক্ষার্থীর অনুকূল অনুভূতি, আগ্রহ ও মানসিকতা তৈরি হয়েছে কিনা। তা না হলে তিনি বিভিন্ন শিক্ষণ কৌশল প্রয়োগ করে এ সম্পর্কে নিশ্চিত হবেন এবং তারপর পাঠদানে ব্রতী হবেন।

৩) আংশিক প্রতিক্রিয়ার সূত্র (Law of Partial Actirity) : কখনও কখনও উদ্দীপক বা শিখন পরিস্থিতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, সমগ্র বা অভীষ্ট প্রতিক্রিয়াটির জন্ম দিতে পারে।

পাঠদানকালে শিক্ষককে মনে রাখতে হবে প্রাণী সমগ্র বিষয়টির প্রতি একত্রে প্রতিক্রিয়া না করে অংশ বিশেষের প্রতি করে এবং চেষ্টা ও ভুলের মাধ্যমে শেখে । ফলে শিখনের জন্য শক্তির অপচয় কম হয়।

৪) সাদৃশ্য বা উপমানের সূত্র (Law of Assimilation or Analogy) : প্রাণী নতুন পরিস্থিতিতে কিছু শিখতে গেলে প্রথমে পুরোনো পরিস্থিতির সঙ্গে সাদৃশ্য খুঁজে বার করে তার সঙ্গে মিল রেখে প্রতিক্রিয়া করে।

শিক্ষক শিক্ষার্থীকে নতুন কিছু শেখানোর পূর্বে শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞানের সঙ্গে সাদৃশ্য যুক্ত করে শেখালে শিক্ষার্থীর আগ্রহ সহজেই আকর্ষণ করতে পারবেন এবং শিক্ষার্থীর পক্ষে বিষয়টিকে আয়ত্ত করাও সহজ হবে।

৫) অনুষঙ্গমূলক সঞ্চালনের সূত্র (Law of Associative Shifting) : কোন নির্দিষ্ট অবস্থার দ্বারা যে প্রতিক্রিয়া হয়, এই অবস্থার সঙ্গে যুক্ত অন্য আরেকটি উদ্দীপকেও সেই প্রতিক্রিয়াটি সঞ্চালিত করা যায়।

শিক্ষকের প্রীতিপূর্ণ আচরণ এবং কোন অনাকর্ষীণীয় বিষয়ের প্রতিও আকর্ষণ গড়ে তুলতে পারে।

অনুবর্তন তত্ত্ব (Theory of Conditioning) : অনুবর্তনকে ভিত্তি করে শিখনের যে তত্ত্বগুলো গড়ে উঠেছে তা দুইভাগে ভাগ করা যায়। ১) প্রাচীন অনুবর্তনবাদ (২) সক্রিয় অনুবর্তনবাদ। প্যাভলভের অনুবর্তন তত্ত্বকে বলে প্রাচীন অনুবর্তনবাদ বা প্রাচীন অনুবর্তন তত্ত্ব। বর্তমান আলোচনা কেবলমাত্র প্রাচীন অনুবর্তন এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হল।

প্রাচীন অনুবর্তন তত্ত্ব (Classical Conditioning) : প্রাচীন অনুবর্তন তত্ত্বের আলোচনার আগে জানা যাক অনুবর্তন বলতে কি বোঝায়। প্রত্যেক প্রাণীর কতগুলো বিশেষ উদ্দীপকের সাপেক্ষে বিশেষভাবে প্রতিক্রিয়া করার সহজাত ক্ষমতা রয়েছে। যেমন— খাবারের উপস্থিতিতে ক্ষুধার্ত প্রাণীর লালাক্ষরণ, শব্দে প্রাণীর মধ্যে সজাগ ভাব। এখানে খাদ্য হচ্ছে স্বাভাবিক উদ্দীপক আর লালাক্ষরণ হচ্ছে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া।

স্বাভাবিক উদ্দীপক স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এখন যদি স্বাভাবিক, উদ্দীপকটির সঙ্গে একটি বিকল্প উদ্দীপক বার বার উপস্থিত করা হয়, তাহলে একসময় দেখা যায় ঐ বিকল্প উদ্দীপকটিই স্বাভাবিক উদ্দীপকের মতো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। এই ধরনের ঘটনাকেই অনুবর্তন বলে ।

রাশিয়ান শারীরবিজ্ঞানী আইভান প্যাভলভ পাচনতন্ত্রের কার্যাবলী নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে গিয়ে লক্ষ করলেন কেবলমাত্র খাওয়ার সময়ই কুকুরটির লালাক্ষরণ হয় না, উপরন্তু খাওয়ার দেখলে, যে মানুষটি খাওয়ারটি আনে তাকে দেখলে এমনকী তার পদধ্বনি শুনলেও তার মধ্যে লালাক্ষরণ হয়। এ ব্যাপারটি নিয়ে প্যাভলভ পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করলেন, যার নাম দিলেন 'অনুবর্তন'। পরবর্তীকালের বিভিন্ন মনোবিদদের থেকে তাঁর তত্ত্বটি একটু পৃথক ছিল। পরবর্তীকালে এই তত্ত্বটিকে প্রাচীন অনুবর্তন বা Classical Conditioning নামে অভিহিত করা হয়। প্যাভলভের এই তত্ত্বটিকে বোঝার জন্য তাঁর পরীক্ষাটি নিয়ে আলোচনা করা যাক।

ক) একটি ক্ষুধার্ত কুকুরকে পরীক্ষার জন্য নেওয়া হল এবং উদ্দীপিত অবস্থায় তার কতটা লালাক্ষরণ নি:সরণ হয় তা পরিমাপের ব্যবস্থা করা হল।

খ) কুকুরটির সামনে এক টুকরো মাংস রাখা হল (যা কুকুরটিকে উদ্দীপিত করবে)।

গ) উদ্দীপিত অবস্থায় কুকুরের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হল লালাক্ষরণ।

ঘ) এবার কুকুরের কাছে মাংসের টুকরোটি দেওয়ার আগে ঘন্টা বাজানো হল। ঘন্টার শব্দে কুকুরের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হল সজাগভাব।

ঙ) এরপর প্রতিবারই খাবার দেবার আগে ঘণ্টা বাজানো হত।

চ) এইভাবে কিছুদিন পুণরাবৃত্তি চললো।

ছ) একসময় দেখা গেল কেবলমাত্র ঘণ্টাধ্বনিতেই (বিকল্প উদ্দীপক) লালাক্ষরণ (স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া) হয়।

সমগ্র পরীক্ষাটিকে একটি ছকের সাহায্যে দেখানো হল—

খাদ্যবস্তু (স্বাভাবিক উদ্দীপক -১)	⟶	লালাক্ষরণ (স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া-১)
ঘণ্টাধ্বনি (স্বাভাবিক উদ্দীপক-২)	⟶	সজাগভাগ (স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া-২)
ঘণ্টাধ্বনি + খাদ্যবস্তু (অনুবর্তিত উদ্দীপক) + (স্বা:উ-১)	⟶	লালাক্ষরণ
ঘণ্টাধ্বনি (অনুবর্তিত উদ্দীপক)	⟶	লালাক্ষরণ (অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়া)

এই পরীক্ষায় দেখা যায় ক্ষুধার্ত কুকুরের সামনে খাদ্যবস্তু (স্বাভাবিক উদ্দীপক) ধরলে লালাক্ষরণ (স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া) হয়। মনোবিজ্ঞানীগণ খাদ্যবস্তুকে বলেছেন অনাবর্তিত উদ্দীপক এবং লালাক্ষরণকে বলেছেন অনাবর্তিত প্রতিক্রিয়া। যে কৃত্রিম উদ্দীপকের দ্বারা বর্তমানে অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়া সংঘটিত হচ্ছে তাকে বলা হয় অনুবর্তিত উদ্দীপক। আর সেই উদ্দীপকের সঙ্গে যুক্ত স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াকে বলা হয় অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়া।

এইভাবে কোন বিশেষ উদ্দীপকের সঙ্গে বিশেষ প্রতিক্রিয়ার কৃত্রিম সংযোগ স্থাপনকে বলে সংযোগাত্মক অনুবর্তন। এর দ্বারা কোন নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়াকে গ্রহণ করতে শেখানো হয়। আবার বার বার পুণরাবৃত্তিতে বিরূপ ফল লাভ করলে প্রাণী উদ্দীপককে উপেক্ষা করতে শেখে। এই ধরনের প্রতিক্রিয়াকে বলা হয় বিয়োগাত্মক অনুবর্তন।

সংযোগাত্মক ও বিয়োগাত্মক কোন অনুবর্তনই চিরস্থায়ী হয় না। পরীক্ষা করে দেখা গেছে অনুবর্তন সংঘটিত হবার পরবর্তীকালে যদি বার বার ঘণ্টাধ্বনি করার পর খাবার দেওয়া না হয় তাহলে কিছুদিন পর তার আর ঘণ্টাধ্বনি সঙ্গে সঙ্গে লালাক্ষরণ হয় না। এইভাবে অনুবর্তনের বিলোপ ঘটে। একে বলে অপানুবর্তন। তাই অনুবর্তনকে সজীব রাখার জন্য মাঝে মাঝে ঘটনাটির পুণরাবৃত্তির প্রয়োজন হয়। এভাবে অনুবর্তিত বিষয়টিকে সজীব রাখার প্রক্রিয়াকে প্যাভলভ সংযোজন বলেছেন।

অনুবর্তনের শিক্ষামূলক গুরুত্ব: শিক্ষাক্ষেত্রে অনুবর্তন প্রক্রিয়ার বিশেষ প্রভাব রয়েছে। শিশুর ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে অনুবর্তন প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। যেমন—শিশু প্রথম প্রথম কতগুলো অর্থহীন শব্দ উচ্চারণ করে। তারপর যখন দেখে বিশেষ শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ ব্যক্তি সাড়া দেয়। পরবর্তীকালে সে ঐ বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তু বোঝাতে ঐ বিশেষ শব্দটিই ব্যবহার করে। তাছাড়া বিভিন্ন অভ্যাস, যেমন- খাওয়ার বিশেষ কায়দা, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদির অভ্যাস আয়ত্ত করা। সামাজিক আদব কায়দা আয়ত্ত করা, শিষ্টাচার শিক্ষা সবই অনুবর্তনের সাহায্যে হয়। উচ্চারণ ঘটিত ভুল সংশোধনে অনুবর্তন প্রক্রিয়া সাহায্য করে। কোন কিছুর প্রতি ভয়, ঘৃণা, অপছন্দ, আনন্দ, অনুরাগ ইত্যাদি বিষয়গুলো প্রাক্ষোভিক অনুবর্তনের সাহায্যে অর্জিত হয়। শিক্ষকগণ এই ধারণাকে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে শিক্ষাকে ফলপ্রসূ করে তুলতে পারেন।

গেস্টাল্ট তত্ত্ব (Gestalt Theory) :

মনোবিজ্ঞানের শিখন সংক্রান্ত গবেষণাকে কেন্দ্র করে যে সকল তত্ত্ব গড়ে উঠেছে তাদের মধ্যে গেস্টাল্ট মতবাদটি প্রচেস্টা ও ভ্রান্তির মতবাদের প্রতিবাদরূপে গড়ে উঠেছে। এই মতবাদটি সর্বপ্রথম প্রচার করেন তিনজন জার্মান মনোবিদ— কোহ্লার, কফ্কা ও ওয়ার্দিমার। গেস্টাল্ট একটি জার্মান শব্দ। যার অর্থ হল প্যাটার্ন বা অবয়ব। প্রাণী কিভাবে শেখে সে সম্পর্কে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তার ভিত্তিতে তারা তাদের মতবাদকে গড়ে তোলেন। এ ব্যাপারে কোহ্লারের শিম্পাঞ্জীর উপর করা পরীক্ষাটির উল্লেখ করা হল—

কোহ্লার পরীক্ষামূলক পরিস্থিতিটিকে যেভাবে সাজালেন তা হল— একটি খাঁচার মধ্যে উপর থেকে এক কাঁদি কলা ঝোলানো আছে। খাঁচার কোণে একটি কাঠের বাক্স রাখা আছে। একটি ক্ষুধার্ত শিম্পাঞ্জীকে খাঁচার ভিতরে ঢোকালেন। খাঁচার ভেতরে সমস্ত ব্যবস্থা এমনভাবে করা হল যে কেবলমাত্র কাঠের বাক্সটি টেনে এনে তার উপর দাঁড়িয়ে শিম্পাঞ্জীটি কলা পাড়তে পারে। এ ধরনের পরীক্ষামূলক পরিস্থিতিতে কোহ্লার শিম্পাঞ্জীর আচরণ লক্ষ্য করতে লাগলেন—

প্রথমত: খাদ্যবস্তু লাভের জন্য শিম্পাঞ্জীটি খাঁচার ভিতর নানাভাবে চেস্টা করতে লাগলো। না পেরে শেষ পর্যন্ত খাঁচায় হতাশ হয়ে বসে রইল।

দ্বিতীয়ত : কোহ্লার খাঁচার ভিতরে ঢুকে বাক্সটি খাদ্যবস্তুর নীচে টেনে আনলেন এবং তার উপর দাঁড়িয়ে কলাটি ধরলেন। পরে নেমে বাক্সটি আগের জায়গায় রেখে বেরিয়ে এলেন। শিম্পাঞ্জী সমস্ত বিষয়টি লক্ষ্য করলো।

তৃতীয়ত : কোহ্লার বাইরে বেড়িয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে শিম্পাঞ্জীটি বাক্সটি টেনে এনে তার উপর দাঁড়িয়ে কলাটি পেড়ে খেল।

চতুর্থত: শিম্পাঞ্জীটি যখন এভাবে খাদ্য পাড়ার চেস্টা করছিল তখন কোহ্লার আরও কয়েকটি শিম্পাঞ্জীকে এনে খাঁচার বাইরে থেকে বিষয়টি লক্ষ্য করতে দিলেন।

পঞ্চমত: এবার একদিন পর পর সেই শিম্পাঞ্জীগুলোর মধ্যে থেকে একটি করে শিম্পাঞ্জীকে একইভাবে খাঁচায় ছেড়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন। লক্ষ্য করলেন শিম্পাঞ্জীগুলো কোন ইঙ্গিত ছাড়াই কলা পেড়ে খেতে সমর্থ হচ্ছে।

ষষ্ঠত: ঐ শিম্পাঞ্জীগুলোর মধ্যে একটি বোকা শিম্পাঞ্জী ছিল। একসময় সেই শিম্পাঞ্জীটিকে খাঁচায় ঢুকিয়ে দিয়ে তিনি লক্ষ্য করতে লাগলেন। দেখা গেল দীর্ঘসময় ধরে অন্য শিম্পাঞ্জীগুলোর কার্যকলাপ লক্ষ্য করা সত্ত্বেও সে কিছুই শেখেনি। বাক্সটি যেখানে পড়েছিল সেখান থেকেই লাফ দেওয়ার চেস্টা করতে লাগলো এবং বিফল হতে লাগলো।

এই পরীক্ষা থেকে কোহ্লার সিদ্ধান্ত করেন যে, শিখনের জন্য পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশের মধ্যে সর্বাঙ্গীন সম্পর্ক পর্যবেক্ষণ করা দরকার। প্রথমে শিম্পাঞ্জীটি খাদ্যবস্তু পাওয়ার সঙ্গে বাক্সের কি সম্পর্ক তা বুঝতে পারেনি। কিন্তু একবার দেখিয়ে দেওয়ার পর তা সে উপলব্ধি করতে পেরেছে এবং খাদ্যবস্তু লাভে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু বোকা শিম্পাঞ্জীটির পক্ষে তা বোঝা সম্ভব হয়নি ফলে সে খাদ্যলাভে সমর্থ হয়নি।

কোহ্‌লার ছাড়াও আরো অনেকে এ ব্যাপারে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। তাদের সকলের পরীক্ষা নীরিক্ষার ফলকে ভিত্তি করে গেষ্টাল্টবাদীগণ তাদের যে তত্ত্বটি গড়ে তোলেন তা হল—

১) শিখন বিচার বিবেচনাহীন যান্ত্রিক ক্রিয়ার ফল নয়।

২) সব ধরনের শিখনের ক্ষেত্রে প্রাণী চেষ্টা ও ভুলের পদ্ধতিতে শেখে না।

৩) শিখনের সময় প্রাণী সমস্যাটি সামগ্রিকভাবে প্রত্যক্ষ করে— অংশগুলোকে খন্ড খন্ডভাবে প্রত্যক্ষ করে না এবং প্রতিক্রিয়াও করে সমগ্র সমস্যাটির পরিপ্রেক্ষিতে সামগ্রিকভাবে । যেমন— যখন আমরা একটি গোলাপ ফুলকে প্রত্যক্ষ করি তখন তার পাপড়ি, আকার, গন্ধ ইত্যাদিকে আলাদা করে প্রত্যক্ষ করি না, সামগ্রিকভাবে একটি গোলাপ হিসাবেপ্রত্যক্ষ করি।

৪) আমাদের প্রত্যক্ষণের সমগ্র সত্তাটি অংশগুলোর যোগফল মাত্র নয়, তারও অতিরিক্ত কিছু। যেমন— সমগ্র গোলাপটি পাপড়ি, বৃন্ত, গন্ধ, আকার, বর্ণ ইত্যাদির যোগফল মাত্র নয় তারও অতিরিক্ত কিছু। সেই অতিরিক্ত বিষয়টি হচ্ছে গোলাপের গোলাপত্ব। যা বিভিন্ন অংশগুলোকে একত্রে যোগ করে দিলেই পাওয়া যাবে না।

৫) সমগ্র শিখন পরিস্থিতির সঙ্গে তার খণ্ডাংশের সম্পর্ককে উপলব্ধি করার মধ্যে দিয়ে যখন তার একটি সামগ্রিকরূপে প্রাণীর মনে প্রতিভাত হয়ে ওঠে তখনই প্রাণীর মনে বিদ্যুৎ চমকের মতো সমস্যাটির সমাধান দেখা দেয়। একে অন্তর্দৃষ্টি বলে। এই অন্তর্দৃষ্টি জাগলেই শিখন হয়।

৬) অন্তর্দৃষ্টি জাগরণের পূর্ব শর্ত হিসাবে পৃথকীকরণ এবং সামান্যীকরণ এই দুই প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে প্রাণী প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতাগুলোকে বা অংশগুলোকে, অপ্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা বা অংশগুলো থেকে পৃথক করে। একে বলে পৃথকীকরণ। পরবর্তী পর্যায়ে এই পৃথকীকৃত অভিজ্ঞতা বা অংশগুলোর মধ্য থেকে সমধর্মী গুণগুলোকে গ্রহণ প্রক্রিয়াকে বলা হয় সামান্যীকরণ। আর এই সামান্যীকরণ ঘটলে তার সামনে সম্পূর্ণ সমস্যাটির সমাধান উদ্ভাষিত হয়ে ওঠে এবং অন্তর্দৃষ্টি জাগে। আর অন্তর্দৃষ্টি জাগলেই শিখন হয়।

৭) অর্ন্তদৃষ্টিমূলক শিখনের সঙ্গে শিক্ষার্থীর বুদ্ধির সম্পর্ক রয়েছে। কারণ সামান্যীকরণের ক্ষমতা শিক্ষার্থীর বুদ্ধির ওপর নির্ভরশীল। তাই উন্নতবুদ্ধি সম্পন্ন শিক্ষার্থীরা সহজেই অর্ন্তদৃষ্টির সাহায্যে সমস্যার সমাধান করতে পারে, ফলে সহজে শিখতেও পারে।

গেস্টাল্টবাদের শিক্ষামূলক গুরুত্ব :

শিক্ষার্থীর শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে গেস্টাল্ট মতবাদ এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এগুলো হল—

প্রথমত: আধুনিক শিক্ষার দুটি মূলনীতি 'সমগ্র থেকে অংশের দিকে' এবং মূর্ত থেকে বিমূর্তের দিকে, এই গেস্টাল্ট মতবাদ বা সমগ্রতাবাদের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

দ্বিতীয়ত: এই মতবাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা ও আগ্রহ। তাই তাকে সমস্যার সম্মুখীন হতে সাহায্য করা শিক্ষকের বিশেষ কর্তব্য। এই সাহায্যের ফলে শিক্ষার্থী সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং সমস্যা সমাধানে আগ্রহী হয় এবং এরই ফলশ্রুতিতে শিখন সার্থক হয়ে ওঠে।

তৃতীয়ত: শিক্ষার্থীদের অন্তর্দৃষ্টি তাদের বোঝার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। তাই শিক্ষকের কাজ হবে শিক্ষার্থীর মানসিক ক্ষমতানুযায়ী এমনভাবে বিষয়বস্তু। নির্বাচন এবং উপস্থাপন করা যাতে তারা নিজেরাই সমস্যামূলক পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনের মাধ্যমে সামগ্রিক ধারণা গঠন করতে পারে। চতুর্থত: গেস্টাল্টবাদীদের মতে শিখনের ক্ষেত্রে পৃথকীকরণ ও সামান্যীকরণের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। তাই শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের সময় শিক্ষকের কাজ হবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যাতে সমস্যামূলক পরিস্থিতিটি বিশ্লেষণ করে দেখার ও সাধারণ ধারণা গঠন করার অভ্যাস গড়ে উঠে ওঠে সেভাবে চর্চার সুযোগ করে দেওয়া।

সারসংক্ষেপ

প্রথম একক : শিক্ষা মনোবিদ্যা

মনোবিদ্যার অর্থ : মনোবিদ্যার ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Psychology' কথাটি এসেছে দুটি গ্রীক শব্দ 'Psyche' এবং 'Logos' থেকে। 'Psyche' শব্দের অর্থ 'Soul' বা আত্মা এবং 'Logos' শব্দের অর্থ 'Science' বা বিজ্ঞান। সুতরাং 'Psycholgoy' কথাটির অর্থ হল আত্মা সম্পর্কিত বিজ্ঞান বা Science of Soul.

—মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে মতভেদ দেখা যায়। কেউ মনে করেন এর আলোচ্য বিষয় হবে 'মন' (Mind), কারো মতে 'চেতনা' (Cousciousness). কারো মতে 'আচরণ' (Behaviour).

— আধুনিক কালে মনোবিদ্যাকে জীবের আচরণ সম্পর্কিত বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান বলে গ্রহণ করা হয়েছে। এটি শিক্ষামূলক জীবন পরিস্থিতিতে ব্যক্তির সমস্ত প্রতিক্রিয়ামূলক আচরণকে নিয়ে আলোচনা করে।

শিক্ষার অর্থ : শিক্ষা বলতে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের উন্নয়ন ও সংরক্ষণের জন্য অপরিহার্য, সুনির্বাচিত, সুনির্দিষ্ট এবং সমাজ অনুমোদিত আচরণকে আয়ত্ত করা বোঝায়।

শিক্ষা ও মনোবিদ্যার সম্পর্ক : মনোবিদ্যার জ্ঞান যে সব দিক থেকে শিক্ষাকে প্রভাবিত করে উভয়ের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক রচনা করে তা হলো —শিক্ষাশ্রয়ী দর্শন দ্বারা নির্ধারিত লক্ষ্য শিক্ষার জন্য কতটা উপযুক্ত তা বিচারকরণে, কার্যকরী পদ্ধতি নির্বাচনে, শিশুকে সম্যকভাবে জানতে, বিদ্যালয়কে উপযুক্তভাবে পরিচালিত করতে, মানব আচরণে বাঞ্ছিত পরিবর্তন আনার জন্য আচরণের মৌলিক সূত্রের জ্ঞান সরবরাহ করতে, শ্রেণি সমস্যার সমাধানে, ভিন্নভাবে সক্ষম শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ কৌশল ও কর্মসূচির পরিকল্পনা করতে এবং শিক্ষার্থীর মূল্যায়নে মনোবিদ্যার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিদ্যার অর্থ : শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান শিক্ষামূলক পরিস্থিতিতে মানব আচরণকে অনুশীলন করে — এটি ফলিত মনোবিজ্ঞানের একটি শাখা।

— এটি শিক্ষার লক্ষ্যের উপযুক্ততা বিচারকরণে, উদ্দেশ্য নির্ধারণে, শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি নির্বাচনে এবং অন্যান্য বিদ্যালয় কর্মসূচি পরিকল্পনার সহায়তা করে।

শিক্ষা মনোবিদ্যার প্রকৃতি : এটি একটি ফলিত বিজ্ঞান। কারণ এটি মনোবিজ্ঞানের নীতি ও পদ্ধতিগুলোকে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করে।

— এটি একটি বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান (Positive Science)। কারণ এটি আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞানের মতো বিভিন্ন পরিস্থিতিতে শিশুর কি করা উচিত, এই ধরনের কোন নির্দেশ দেয় না। পরিবর্তে শিশুর বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়াগুলো বাস্তবে যেভাবে ঘটে তা নিয়ে আলোচনা করে।

— শিক্ষা মনোবিদ্যার সেই ব্যক্তিদের নিয়ে আলোচনা করে, যারা সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাই এটি একটি সমাজ বিজ্ঞান।

— শিক্ষা মনোবিদ্যা নিজস্ব অনুশীলন পদ্ধতির সাহায্যে বিশেষ কাজের অনুসন্ধান করে স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। তাই এটি পৃথক জ্ঞানের ক্ষেত্র হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

— এটি একটি বিকাশমান বিজ্ঞান (Growing Science) শিশুর জন্ম থেকে প্রাপ্ত বয়স্ক স্তর পর্যন্ত জীবন বিকাশ সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করে।

— এটি শিক্ষার্থীর শিক্ষা সম্পর্কিত আচরণের বিভিন্ন সমস্যাকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে। তাই এটি একটি আচরণের বিজ্ঞান।

শিক্ষা মনোবিদ্যার পরিধি :

—বৃদ্ধি ও বিকাশ সম্পর্কে অনুশীলন।

— ব্যক্তিগত বৈষম্যের অনুশীলন।

— আচরণের অনুশীলন ।

— ব্যক্তিত্ব সম্পর্কিত আলোচনা।

— বুদ্ধি বিষয়ক আলোচনা।

— শিক্ষামূলক পরিসংখ্যান সংক্রান্ত আলোচনা

— শিখন প্রক্রিয়া সম্পর্কিত আলোচনা

— শিশুকে জানার জন্য বিভিন্ন কৌশল ও পদ্ধতি

— শিক্ষা পরিবেশের বিভিন্ন ক্ষেত্র সংক্রান্ত আলোচনা।

শিক্ষকের কাছে মনোবিদ্যার গুরুত্ব :

— শিক্ষার্থীকে জানার জন্য।

— শিখন পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য।

— শিখন পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য।

— পাঠক্রম সংগঠনের জন্য।

— কার্যকরী শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা গঠনের জন্য।

— বিভিন্ন অনুসন্ধান পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য।

দ্বিতীয় একক : বৃদ্ধি ও বিকাশ

— আকার, উচ্চতা ও ওজনগত পরিবর্তনকে বৃদ্ধি বলে, অঙ্গা-প্রত্যঙ্গের কর্মক্ষমতাগত পরিবর্তনকে বিকাশ বলে।

— বৃদ্ধি নির্দিষ্ট সময়ভিত্তিক প্রক্রিয়া, বিকাশ জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া।

— বিকাশের কেবলমাত্র পরিমাণগত পরিবর্তনের দিকটিই হল বৃদ্ধি, মানব জীবনের গুণগত ও পরিমাণগত পরিবর্তনই হল বিকাশ।

— বৃদ্ধি পরিমাপযোগ্য, বিকাশ পর্যবেক্ষণযোগ্য।

— বৃদ্ধি বলতে কেবলমাত্র দৈহিক পরিবর্তনকে বোঝায়, বিকাশ বলতে দৈহিক, মানসিক, সামাজিক ও প্রাক্ষোভিক পরিবর্তনকে বোঝায়।

বৃদ্ধির নীতি :

— নিরবিচ্ছিন্ন ও ধারাবাহিক।

— বৃদ্ধির হারে তারতম্য আছে।

— বৃদ্ধির গতি সাধারণ থেকে বিশেষের দিকে হয়।

— অনুশীলন দ্বারা প্রভাবিত হয়।

— কেবলমাত্র শারীরিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ।

— কেবলমাত্র শারীরিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ।

বিকাশের নীতি :

— বিকাশ মানব জীবনে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ধারায় চলে।

— মানব জীবনে বিকাশ পর পর একই ধাঁচকে অনুসরণ করে।

— একই ধাঁচে বিকাশ ঘটলেও ব্যক্তিগত বৈষম্যের কারণে পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সময়গত পার্থক্য থাকতে পারে।

— জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের বিকাশের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

— বিকাশ সর্পিল গতিতে এগিয়ে চলে।

তৃতীয় একক : বিকাশের বিভিন্ন স্তরের বৈশিষ্ট্য ও চাহিদা

— আকার, উচ্চতা ও ওজনগত পরিবর্তনকে বৃদ্ধি বলে, অঙ্গা-প্রত্যঙ্গের কর্মক্ষমতাগত পরিবর্তনকে বিকাশ বলে।

— বৃদ্ধি নির্দিষ্ট সময়ভিত্তিক প্রক্রিয়া, বিকাশ জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া।

— বিকাশের কেবলমাত্র পরিমাণগত পরিবর্তনের দিকটিই হল বৃদ্ধি, মানব জীবনের গুণগত ও পরিমাণগত পরিবর্তনই হল বিকাশ।

— বৃদ্ধি পরিমাপযোগ্য, বিকাশ পর্যবেক্ষণযোগ্য।

— বৃদ্ধি বলতে কেবলমাত্র দৈহিক পরিবর্তনকে বোঝায়, বিকাশ বলতে দৈহিক, মানসিক, সামাজিক ও প্রাক্ষোভিক পরিবর্তনকে বোঝায়।

বৃদ্ধির নীতি :

— নিরবিচ্ছিন্ন ও ধারাবাহিক।

— বৃদ্ধির হারে তারতম্য আছে।

— বৃদ্ধির গতি সাধারণ থেকে বিশেষের দিকে হয়।

— অনুশীলন দ্বারা প্রভাবিত হয়।

— কেবলমাত্র শারীরিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ।
— কেবলমাত্র শারীরিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ।

বিকাশের নীতি :

— বিকাশ মানব জীবনে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ধারায় চলে।
— মানব জীবনে বিকাশ পর পর একই ধাঁচকে অনুসরণ করে।
— একই ধাঁচে বিকাশ ঘটলেও ব্যক্তিগত বৈষম্যের কারণে পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সময়গত পার্থক্য থাকতে পারে।
— জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের বিকাশের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে।
— বিকাশ সর্পিল গতিতে এগিয়ে চলে।

বিকাশের বিভিন্ন স্তরের বৈশিষ্ট্য ও চাহিদা

শৈশব স্তর (জন্মের পর থেকে পরবর্তী ৩ বৎসর)

দৈহিক বিকাশ :

— প্রথম দু'বছর খুব দ্রুত শারীরিক বৃদ্ধি ঘটে। পরে সেই হার ক্রমশ কমে।
— ফুসফুসের আয়তন বৃদ্ধির ফলে শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়া স্বাভাবিক হারে হয়।
— জন্মের পর থেকে তিন/চার বছর পর্যন্ত দ্রুত হারে স্নায়ুতন্ত্রের বিকাশ হয়।
— দেহের বিভিন্ন অঙ্গগুলোর কর্মক্ষমতারও বিকাশ হয়।

মানসিক বিকাশ

— খুব দ্রুত হারে মানসিক বিকাশ হয়।
— শিশুর আত্মসচেতনতার বিকাশ হয়।
— এই স্তরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানসিক বিকাশ হল ভাষার বিকাশ।
— সমস্ত বস্তুকে সজীব বা প্রাণবান মনে করে।

প্রাক্ষোভিক বিকাশ

— চিন্তন শক্তি ও বিচারশক্তি অপরিণত থাকে বলে শিশু প্রধানত: আবেগর দ্বারাই পরিচালিত হয়।
— আবেগ অ-নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় থাকে।
— আবেগের পৃথকীকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়।
— বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আবেগকে ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করতে শেখে।
— কল্পনা ও ধারণার বিকাশের ফলে প্রাক্ষোভিক উদ্দীপনার বিস্তৃতি ঘটতে শুরু করে।

সামাজিক বিকাশ

— জন্মাবস্থায় শিশু থাকে সম্পূর্ণ আত্মকেন্দ্রিক।
— বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে সামাজিক রীতি-নীতিকে আত্মস্থ করতে শেখে।
— পরিবার ছাড়াও প্রতিবেশি, সমবয়সী ছেলে মেয়েদের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া করতে গিয়ে বিভিন্ন সামাজিক বৈশিষ্ট্যাবলীর অনুশীলন করে।
— সমবয়সীদের থেকে সে বেশি পছন্দ করে নিজে নিজে খেলতে অথবা মা-বাবা ও অন্যান্য পরিচিত বয়স্কদের সঙ্গে খেলতে।

— তিন বছরের পর থেকে সত্যিকারের সমাজ চেতনা লক্ষ্য করা যায়।

শৈশবের চাহিদা

জৈবিক চাহিদা :

— শিশুর বেঁচে থাকা এবং দৈহিক নিরাপত্তার জন্য খাদ্য, পানীয় ও বস্ত্রের চাহিদা দেখা যায়।

— কর্মেন্দ্রিয় ও পেশিতন্ত্রের বিকাশের ফলে সক্রিয়তার চাহিদা দেখা যায়।

সামাজিক চাহিদা :

— অন্যের কাছ থেকে ভালবাসা পাওয়ার চাহিদা।

— বয়স্কদের কাছ থেকে রীতি-নীতি অনুকরণের চাহিদা।

— নতুন কিছু জানার মাধ্যমে কৌতূহল নিরসনের চাহিদা।

— বয়স্কদের সাহচর্য পাওয়ার চাহিদা।

প্রাথমিক বাল্যস্তর (৩ বৎসর — ৭বৎসর)

দৈহিক বিকাশ :

— দৈহিক বিকাশ শৈশবের তুলনায় মন্থর ও দৃঢ়তর হয়=

— পেশির সমন্বয় এবং সঞ্চালনমূলক ক্ষমতার বিকাশ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়।

— সূক্ষ্ম সঞ্চালন শক্তির প্রাথমিক ধরনের বিকাশ হয়।

— এই স্তরের শেষদিকে দুধের দাঁত পড়ে গিয়ে জোড়া জোড়াভাবে স্থায়ী দাঁত উঠে।

শিক্ষামূলক গুরুত্ব

— পুষ্টিকর খাদ্যের যোগান দিতে হবে।

— আদর্শ অভ্যাস গঠনের প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

— বৃহৎ পেশির সঞ্চালনমূলক বিকাশের জন্য খেলাধূলা করার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

— সূক্ষ্মপেশির বিকাশের উপযোগী কাজকর্মের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

— নিজের দৈনন্দিন কাজগুলো করার মধ্যে দিয়ে স্ব-নির্ভর করে তুলতে হবে।

— ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

মানসিক বিকাশ

— দ্রুত হারে মানসিক বিকাশ হয়।

— ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতার বিকাশ হয়। ক্রমশ: জটিল বাক্য ব্যবহারের ক্ষমতার বিকাশ হতে থাকে।

— ইন্দ্রিয়গুলোর ক্ষমতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

— প্রতীকের মাধ্যমে কোন বস্তুর চিন্তা করতে পারে।

— আজগুবি গল্প শুনতে ভালবাসে।

শিক্ষামূলক গুরুত্ব

— শব্দ ভাণ্ডার বৃদ্ধি এবং ভাষা চর্চার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

— বিভিন্ন জিজ্ঞাসার যথাযথ উত্তর দিয়ে কৌতূহলের চাহিদা পূরণ করতে হবে।

— বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন করে, ধারণার যথাযথ বিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রাক্ষোভিক বিকাশ :

— প্রথম দিকে আবেগ অনিয়ন্ত্রিত ও তীব্র থাকে। এই স্তরের শেষদিকে আবেগের দৈহিক প্রকাশ অনেক সংযত হয়।

— প্রত্যক্ষ বস্তু ছাড়াও কল্পনাকে কেন্দ্র করে আবেগ সৃষ্টি হয়।

— প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়ার দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে থাকে।

— স্নেহ-ভালবাসা ইত্যাদির মতো আবেগ পরিবারকে ছাড়িয়ে বৃহত্তর পরিবেশের মধ্যে বিস্তৃত হতে থাকে।

শিক্ষামূলক গুরুত্ব :

— ইতিবাচক উপদেশের মাধ্যমে ইতিবাচক সেন্টিমেন্ট গড়ে তুলতে হবে।

— কোন দৈহিক শাস্তি দান নয়।

সামাজিক বিকাশ :

— মন্থর গতিতে সামাজিক চেতনার বিকাশ হয়।

— এই বয়সে শিশু বিদ্যালয়ে যাওয়া শুরু করে। তাই সামাজিকীকরণে বিদ্যালয়ের প্রভাব পড়ে।

— খুব বেশিদিন একটি দলের সভ্য থাকে না। দ্রুত দল বদল করে।

শিক্ষামূলক গুরুত্ব :

— শিশুর উপযোগী ও নিরাপদ পারিবারিক ও বিদ্যালয় পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে যেখানে শিশুরা সহজেই অভিযোজন করতে পারে।

চাহিদা

জৈবিক চাহিদা :

— খাদ্য, পানীয় ও বস্ত্রের চাহিদা দেখা যায়।

— দেহকে বেশিক্ষণ নিষ্ক্রিয় রাখতে পারে না, তাই সক্রিয়তার চাহিদা দেখা যায়।

সামাজিক চাহিদা :

— আজগুবি গল্প শোনার চাহিদা দেখা যায়।

— দলভুক্তির চাহিদা দেখা যায়।

— সহযোগিতা, সমবেদনা ও প্রতিযোগিতার চাহিদা দেখা যায়।

প্রান্তীয় বাল্যস্তর (৭বৎসর—১২বৎসর)

দৈহিক বিকাশ :

— বিকাশের হার আগের স্তরের মতোই মন্থর থাকে।

— শরীরের উপরের অংশের তুলনায় নিচের দিকে অঙ্গ বেশি বৃদ্ধি পায়।

— শরীরের হাড়গুলো প্রশস্ততর ও দীর্ঘতর হতে থাকে।

শিক্ষামূলক গুরুত্ব :

— বিদ্যালয়ে শারীরশিক্ষা কর্মসূচির আয়োজন করতে হবে।

— স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গড়ে তোলার দিকে নজর দিতে হবে।

— বিভিন্ন ধরনের রোগ এবং তার প্রতিকার সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দানের ব্যবস্থা করতে হবে।

মানসিক বিকাশ :

— দ্রুত বুদ্ধির বিকাশ ঘটে।

— ভাষা বিকাশের ফলে গুছিয়ে সুন্দরভাবে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে।

— স্মরণ ক্ষমতা, মনোযোগ দানের ক্ষমতা তীক্ষ্ম হয়।

— স্থান-কাল-দূরত্ব সম্পর্কে ধারণার উন্নতি ঘটে।

— আত্ম-সক্রিয়তার মাধ্যমে কোন কিছু জানার চাহিদা দেখা যায়।

— কাল্পনিক গল্পের চাইতে বাস্তব অভিজ্ঞতাভিত্তিক গল্প শুনতে পছন্দ করে।

শিক্ষামূলক গুরুত্ব :

— শিশুর শব্দ ভাণ্ডার বৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

— কৌতূহলের চাহিদা মেটাতে গিয়ে যাতে কোন বিকৃত তথ্য সংগৃহীত না হয় সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

— সৃজনমূলক কাজের ব্যবস্থা করে ছেলে-মেয়েদের সৃষ্টির আকাঙ্খাকে পূরণ করতে হবে।

— শ্রেণির বিষয়বস্তুকে বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিল রেখে উপস্থাপন করতে হবে।

প্রাক্ষোভিক বিকাশ :

— প্রক্ষোভমূলক অনুভূতি প্রবণতার পরিধি বৃদ্ধি পেতে থাকে।

— সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক ইত্যাদি কারণগুলোও বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে থাকে এবং ছেলে মেয়েমেধের মনে প্রক্ষোভ সৃষ্টি করতে পারে।

— আনন্দ, উচ্ছ্বলতা যথেষ্ট পরিমাণে থাকে।

— শিশু সুলভ ভয়ের পরিবর্তে প্রত্যক্ষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভয়ের ভাব দেখা যায়।

— ভাই-বোন, সহপাঠীদের প্রতি ঈর্ষাভাব দেখা দেয়।

শিক্ষামূলক গুরুত্ব :

— গৃহে বা বিদ্যালয়ে শিশু যাতে নিরাপত্তার অভাব বোধ না করে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

— গৃহ ও বিদ্যালয় পরিবেশকে আনন্দময় করে তুলতে হবে।

— শিক্ষার্থীরা যাতে নিজের ক্ষমতাকে প্রকাশ করতে পারে তার উপযোগী ব্যবস্থা বিদ্যালয়ে রাখতে হবে।

— শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন যৌথ কর্মে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করতে হবে।

সামাজিক বিকাশ :

— দলের প্রতি তীব্র আকর্ষণ দেখা যায়।

— এই বয়সকে 'Gang Age' বা 'দল গড়বার' বয়স বলে।

— যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে তা দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়।

— সামাজিক দায়িত্ব পালনে উৎসাহ দেখা যায়।

শিক্ষামূলক গুরুত্ব :

— সামাজিক গুণগুলোর চর্চার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

— উপদেশ নয়, ছেলে-মেয়েদের সামনে উদাহরণ তুলে ধরতে হবে।

— যৌথ কাজকর্মে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

— অস্বাভাবিক প্রতিযোগিতা নয়, সহযোগিতা, সহানুভূতি ইত্যাদি জাতীয় মনোভাবের উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

চাহিদা :

জৈবিক চাহিদা :

— খাদ্য, পানীয় ও বস্ত্রের চাহিদা দেখা যায়।

— নিজস্ব রুচি অনুযায়ী খাদ্য গ্রহণের দিকে ঝোঁক থাকে।

— খেলার মাধ্যমে দেহকে সক্রিয় রাখতে চায়।

সামাজিক চাহিদা :

— দলের প্রতি আনুগত্য দেখায়।

— আত্মকেন্দ্রিকতার গণ্ডী ছেড়ে বেরিয়ে এসে বাইরের জগতেও ব্যাপ্ত করে।

— সামাজিক আচরণ অনুকরণ করতে চায়।

— ভালবাসার চাহিদা যেখানে পূরণ হয় সেখানেই সে নিজেকে নিরাপদ ভাবে।

— নতুন নতুন বিষয় জানতে চায়।

— আগ্রহের বিষয়কে বিশ্লেষণ করে দেখতে চায়।

— সৃজনশীল কাজের মধ্যে দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করতে চায়।

কৈশোর স্তর (১২ বৎসর—১৮/২১ বৎসর):

দৈহিক বিকাশ

— বড় বড় হাড় ও পেশির দ্রুত বৃদ্ধি লক্ষ করা যায়।

— শরীর দৈর্ঘ্য ও ওজনের দিক থেকে বৃদ্ধি পায়।

— খুব বেশি ঘাম হয়।

— মুখে ব্রণ দেখা দেয়।

— রক্ত সঞ্চালন ও পাকস্থলির ক্রিয়া বৃদ্ধি পায়। ফলে ক্ষুধা বাড়ে।

— ছেলেদের গলার স্বরে ভঙ্গাতা আসে। মেয়েদের স্বর মিষ্টি হয়।

— ছেলেদেরে মুখে কাঠিন্য দেখা দেয়। মেয়েদের মুখ কোমল ও লাবণ্যময় হয়।

— যৌন হরমোন নি:সৃত হয়।

— যৌন অঙ্গে পরিবর্তন দেখা দেয়।

— যৌন পরিণতির ফল হিসাবে মেয়েরা সন্তান ধারনে সক্ষম হয়।

শিক্ষামূলক গুরুত্ব :

--- দেহের বিভিন্ন পরিবর্তন সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান দানের ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে

কিশোর-কিশোরীদের অহেতুক লজ্জা, দ্বন্দ্ব ও সংশয় দূর করতে সাহায্য করবে।

— দেহ সঞ্চালনের চাহিদাকে পূরণ করার জন্য খেলাধূলা, ব্যায়াম ও শরীরচর্চার আয়োজন রাখতে হবে।

মানসিক বিকাশ :

— আগ্রহের বিষয়ে গভীরতা দেখা যায়।

— স্বাধীন চিন্তন ক্ষমতা, বিমূর্ত চিন্তন ক্ষমতা, বিচার-বিশ্লেষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

শিক্ষামূলক গুরুত্ব:

— বিতর্ক, আলোচনা, বক্তৃতা এবং বিভিন্ন সৃজনমূলক কাজের ব্যবস্থা করে তাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা পূর্ণ করতে হবে।

— নির্বাচিত বই, দেশভ্রমণ, পাঠাগারের ব্যবস্থা ইত্যাদি জ্ঞানের চাহিদা পূর্ণ করতে সাহায্য করবে।

— ভালবাসা ও বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ তাদের মনে নিরাপত্তার অনুভূতি জাগ্রত করবে।

প্রাক্ষোভিক বিকাশ :

— লজ্জার অনুভূতি জাগে তাই দৈহিক পরিবর্তনকে সবার কাছ থেকে আড়াল করে রাখার চেষ্টা করে।

— বিপরীত কাম সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

— রোমান্টিক কল্পনা জাগে।

— দিবা-স্বপ্নে বিভোর হয়।

— সবার সামনে নিজের জাহির করার প্রবণতা দেখা যায়।

শিক্ষামূলক গুরুত্ব :

— নেতিবাচক প্রক্ষোভগুলোর সংযত প্রকাশের প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

— পিতা-মাতা বা অভিভাবকসহ শিক্ষককে দৃষ্টান্তমূলকভাবে নিজেদেরকে শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থিত করে তাদের আবেগকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণের শিক্ষা দিতে হবে।

— আবেগের সুস্থ সুন্দর প্রকাশের জন্য বিভিন্ন সৃজনমূলক কাজের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের যুক্ত করতে হবে।

সামাজিক বিকাশ :

— সামাজিক চেতনার বিকাশ বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়।

—হঠাৎ শারীরিক পরিবর্তনে লজ্জাভাব দেখা দেয়, ফলে বাবা-মায়ের উপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

— দল গঠনের ঝোঁক দেখা যায়।

— জন কল্যাণকর কাজের প্রতি ঝোঁক দেখা যায়।

— আদর্শ সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখে।

— বীরপূজার প্রতি আকর্ষণ দেখা দেয়।

শিক্ষামূলক গুরুত্ব :

— বিভিন্ন দলগত কাজের মধ্যে দিয়ে সামাজিক গুণের বিকাশ ঘটাতে হবে।

বয়:সন্ধিকালের চাহিদা ও সমস্যা :

যৌন চাহিদা :

— যৌন অঙ্গের পরিবর্তন মনে নানা কৌতূহল সৃষ্টি করে।

— যৌন চেতনার বিকাশের ফলে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়।

সমস্যা

— সামাজিক বিধি নিষেধের কারণে বিভিন্ন যৌন জিজ্ঞাসার উত্তর জানতে পারে না।

— কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে কখনও যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে ফেলে যা পরবর্তীকালে নানা সমস্যার সৃষ্টি করে।

স্বাধীনতার চাহিদা

— বয়স্কদের শাসন থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে চলতে ও মত প্রকাশ করতে চায়।

সমস্যা

—সমাজ তাদের চাহিদাকে স্বীকৃতি দেয় না, ফলে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়।

— দলবদ্ধভাবে দৌরাত্ম দেখায়।

— হীনমণ্যতাবোধের জন্ম হয়।

সামাজিক চাহিদা

— সামাজিক নানা দায়-দায়িত্ব পালন করতে চায়।

— সমাজের কাছ থেকে স্বীকৃতি আশা করে।

সমস্যা

— বয়স্ক সমাজের আস্থা লাভ করে না। ফলে নানা অসামাজিক আচরণ করে ও সামাজিক সমস্যা গড়ে তোলে।

নিরাপত্তার চাহিদা :

— বয়স্কদের দ্বিমুখী আচরণে নিরাপত্তার অভাব বোধ হয়।

— দলচ্যুত হবার ভয়ে মনে নিরাপত্তার অভাব বোধ এর সৃষ্টি হয়।

— আর্থিক দিক থেকে বিচ্যুত হবার ভয়ে মনে নিরাপত্তার চাহিদা জাগে।

সমস্যা

— অভিযোজনে অক্ষম হয়ে পড়ে।

— হীনমণ্যতাবোধের সৃষ্টি হয়।

— বাড়ী থেকে পালানো, চুরি করা ইত্যাদি সমস্যামূলক আচরণ করে।

আত্মপ্রকাশের চাহিদা

— সকলের সামনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।

সমস্যা

— উপযুক্ত পরিবেশ ও বয়স্কদের উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবে চাহিদা পূরণে বাধা আসে। তার ব্যক্তিত্বের যথাযথ বিকাশকে ব্যাহত করে এবং নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়।

জ্ঞানের চাহিদা :

— বিভিন্ন উৎস থেকে নতুন নতুন তথ্য সংগ্রহের চাহিদা দেখা যায়।

সমস্যা

— অনেক সময় ভ্রান্ত উৎস থেকে ভ্রান্ত খবর সংগৃহীত হয়।

— ভ্রান্ত জ্ঞান নানা কুঅভ্যাসের জন্ম দেয়।

দিবাস্বপ্নের চাহিদা

— যে চাহিদা বাস্তবে পূর্ণ করতে পারে না তা অলীক কল্পনার মাধ্যমে পূর্ণ করে।

সমস্যা

— মাত্রাতিরিক্ত দিবাস্বপ্ন কিশোর-কিশোরীদেরকে বাস্তব বিমুখ করে তোলে। যা ব্যক্তিত্বের স্বাভাবিক বিকাশকে বাধা দান করে।

দু:সাহসিক অভিযানের চাহিদা

— আত্ম স্বীকৃতি পাবার আশায় কিশোর-কিশোরীগণ নানা দু:সাহসিক কাজের ঝুঁকি নেয়।

সমস্যা

— কখনও কখনও এই চাহিদা দৈহিক ক্ষতির কারণ হয়ে ভবিষ্যৎ জীবনকে সমস্যাগ্রস্ত করে তোলে।

চতুর্থ একক : শিখন

শিখনের অর্থ:— শিখন জীবের এক বিশেষ ধর্ম।

— প্রতিটি প্রাণীই শেখে।

— পরিবর্তনের সঙ্গো সঙ্গাতিবিধানের উদ্দেশ্যে প্রাণী শেখে।

— পরিবর্তিত আচরণ সম্পূর্ণ নতুন অথবা পূর্বের আচরণের উন্নতরূপ হতে পারে।

শিখনের সংজ্ঞা

— অতীত অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণের প্রভাবে আচরণধারার অপেক্ষাকৃত স্থায়ী পরিবর্তনের প্রক্রিয়া হল শিখন।

শিখনের স্বরূপ:

— সকল প্রাণীই শেখে। তাই বলা যায় শিখন সর্বজনীন প্রক্রিয়া।

— শিখনের ফলে আচরণের পরিবর্তন হয়।

— পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গো সঙ্গাতিবিধানের জন্য প্রাণী শেখে।

— শিখনের জন্য ব্যক্তির আত্মসক্রিয়তা প্রয়োজন।

— শিখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুশীলন নির্ভর।

— শিখনের জন্য প্রাণীর বাইরের ও অন্তর্জগতের তাগিদ প্রয়োজন, যা তার ভেতরে শক্তি জোগায়, একেই প্রেষণা বলে।

— শিখনের প্রক্রিয়ার সঙ্গো সাধারণত কোন না কোন সমস্যামূলক পরিস্থিতি যুক্ত থাকবে।

— শিখনের মূলে কোন না কোন চাহিদা যুক্ত থাকে।

শিখন ও পরিণমন :

— অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণের ফলে আচরণধারার পরিবর্তন হল শিখন, আর অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণ ছাড়া জন্মগত প্রবণতাগুলোর স্বাভাবিক বিকাশের ফল হল পরিণমন।

— শিখন মানসিকপ্রক্রিয়া। পরিণমন জৈবিক প্রক্রিয়া।

—শিখন কৃত্রিম প্রক্রিয়া। পরিণমন স্বাভাবিক প্রক্রিয়া।

— শিখনের জন্য সচেতন ইচ্ছা ও সক্রিয়তা প্রয়োজন। কিন্তু পরিণমন একটি স্বত:স্ফুর্ত বিকাশ প্রক্রিয়া।

— একটি জাতির সকলের শিখন ক্ষমতা সমান থাকে না। কিন্তু কোন একটি নির্দিষ্ট জাতির পরিণমনের ধাঁচ নির্দিষ্ট ধরণের হয়।

— বাইরের জগতের সঙ্গে সঙ্গাতিবিধান এবং ভেতরের তাগিদের ফল হল প্রেষণা। আর পরিণমন হল স্বাভাবিক বিকাশের ফল।

শিখন, প্রেষণা ও উদ্‌বোধক :

— বিনা প্রেষণায় শিখন হয় না।

—শিখনের জন্য কেবলমাত্র প্রেষণা নয় উদ্‌বোধকেরও প্রয়োজন।

— উদ্‌বোধক দুই ধরনের হয় বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ।

পঞ্চম একক : শিখনের বিভিন্ন তত্ত্ব

প্রচেষ্টা ও ভুলের তত্ত্ব :

— এডওয়ার্ড লী থর্নডাইক এই তত্ত্বটির প্রবক্তা।

— থর্নডাইকের মতে প্রাণী যখন কোন সমস্যামূলক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় যার সমাধানটি তার জানা থাকে না। তখন সে অন্ধ যান্ত্রিকভাবে একটির পর একটি চেষ্টা ও ভুল করার মধ্যে দিয়ে সমাধান খোঁজার চেষ্টা করে। এভাবে অগ্রসর হতে হতে শেষ পর্যন্ত নির্ভুল সমাধানটি সে আবিষ্কার করে ফেলে। এভাবেই প্রাণী শেখে।

— থর্নডাইকের মতে শিখন হল উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে বন্ধন।

— প্রাণী কিভাবে শেখে, এ ব্যাপারে থর্নডাইক তিনটি মুখ্য ও পাঁচটি গৌণ সূত্রের কথা বলেন।

— তিনটি মূখ্য সূত্র হল— ফললাভের সূত্র, অনুশীলনের সূত্র এবং প্রস্তুতির সূত্র।

— পাঁচটি গৌণ সূত্র হল- বহুমুখী প্রতিক্রিয়ার সূত্র, মানসিক অবস্থার সূত্র, আংশিক প্রতিক্রিয়ার সূত্র, সাদৃশ্য বা উপমানের সূত্র, অনুষঙ্গমূলক সঞ্চালনের সূত্র।

অনুবর্তনের তত্ত্ব:

প্রাচীণ অনুবর্তনের তত্ত্ব :

— আইভান প্যাভলভ এই তত্ত্বটির প্রবক্তা। এটিকে প্রাচীন অনুবর্তনের তত্ত্ব বলে।

— অনুবর্তন বলতে বোঝায়-একটি বিকল্প উদ্দীপককে স্বাভাবিক উদ্দীপকের সঙ্গে বার বার উপস্থিত করতে করতে একসময় বিকল্প উদ্দীপকটিই স্বাভাবিক উদ্দীপকের মতো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে।

— প্যাভলভের মতে প্রাণী অনুবর্তনের মাধ্যমে শেখে।

— নির্দিষ্ট উদ্দীপকের সঙ্গে নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়ার সংযোগ স্থাপনকে বলে সংযোগাত্মক অনুবর্তন। আর নির্দিষ্ট কোন উদ্দীপককে লাভ করার আশায় বার বার আচরণ করার পর যদি প্রাণী সেই উদ্দীপকটি না পায় তাহলে প্রাণী উদ্দীপকটিকে উপেক্ষা করতে শেখে। একে বলে বিয়োগাত্মক অনুবর্তন।

— অনুবর্তন ঘটার পর মাঝে মাঝে ঘটনাটির পুণরাবৃত্তি করে অনুবর্তিত বিষয়টিকে সজীব রাখার ঘটনাকে বলে সংযোজন।

শিক্ষামূলক গুরুত্ব :

— শিশুর প্রথম ভাষা শিক্ষা, বিভিন্ন ধরনের অভ্যাস গঠন, সামাজিক আদব-কায়দা আয়ত্ত করা, শিষ্টাচার শিক্ষা ইত্যাদি সবই অনুবর্তনের সাহায্যে হয়।

গেষ্টাল্ট তত্ত্ব :

— 'গেষ্টাল্ট' একটি জার্মান শব্দ। যার অর্থ হল প্যাটার্ন বা অবয়ব।

— কোহ্লার, কফ্কা, ওয়ার্দিমার এই তিনজন গেষ্টাল্টবাদী এই তত্ত্বটির প্রধান প্রবক্তা।

— প্রাণী বিচার বিবেচনাহীন এবং যান্ত্রিকভাবে কেবল চেষ্টা ও ভুল করার মধ্যে দিয়ে শেখে না।

— শিখনের সময় প্রাণী সমস্যাটিকে সামগ্রিকভাবে দেখে এবং প্রতিক্রিয়াও করে সমগ্র সমস্যাটির পরিপ্রেক্ষিতে সামগ্রিকভাবে।

— আমাদের প্রত্যক্ষণের সমগ্র বিষয়টি অংশগুলোর যোগফল মাত্র নয় আরও অতিরিক্ত কিছু । যা অংশগুলোকে একত্রে যোগ করে দিলেই পাওয়া যায় না।

— সমগ্রের সঙ্গো খণ্ডাংশের সম্পর্ককে উপলব্ধি করার মধ্যে দিয়ে যখন বিষয়টির একটি সামগ্রিক রূপ প্রাণীর মধ্যে প্রতিভাত হয় তখনই অন্তর্দৃষ্টি জাগে। আর অন্তর্দৃষ্টি জাগলেই সমস্যাটির সমাধানও প্রাণীর মনে বিদ্যুৎ চমকের মতো ভেসে ওঠে। এভাবেই শিখন হয়।

— অন্তর্দৃষ্টি জাগরণের পূর্ব শর্ত হিসাবে পৃথকীকরণ ও সামান্যীকরণের প্রয়োজন হয়।

— অন্তর্দৃষ্টি জাগরণের সঙ্গো বুদ্ধির সম্পর্ক আছে।

শিক্ষামূলক গুরুত্ব :

— আধুনিক শিক্ষার মূলনীতি সমগ্র থেকে অংশের দিকে, মূর্ত্ত থেকে বিমূর্তের দিকে যাওয়ার নীতিটি সমগ্রতাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ।

— সমস্যা সমাধানের জন্যপ্রাণীর সক্রিয়তা ও আগ্রহ গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।

— শিক্ষার্থীর বোঝার ক্ষমতার উপর অন্তর্দৃষ্টি জাগরণের প্রক্রিয়াটি নির্ভর করে। তাই শিক্ষক বিষয়বস্তুকে এমনভাবে উপস্থাপন করবেন যাতে অন্তদৃষ্টি জাগরণের পক্ষে তা সহায়ক হয়।

অনুশীলনী

ক) ১ মানের প্রশ্ন : সর্বাধিক শব্দসংখ্যা ২০

১) মনোবিদ্যাকে 'Science of Consciousness' বা 'চেতনার বিজ্ঞান' বলে কে অভিহিত করেছেন?
২) বৃদ্ধিকে মূলত কয়ভাগে বিভক্ত করা যায় ?
৩) প্রান্তীয় বাল্যস্তরের সময়সীমা কত?
৪) শিখন বলতে কি বুঝায়?
৫) প্রাচীন অনুবর্তন তত্ত্বের জনক কে ?

খ) ২ মানের প্রশ্ন : সর্বাধিক শব্দসংখ্যা ৪০

১) শিক্ষা মনোবিদ্যা বলতে কি বুঝায়?
২) বিকাশ বলতে কি বুঝায়?
৩) পরিণমন বলতে কি বুঝায়?
৪) Connectionism বলতে কি বুঝায়?
৫) অন্তর্দৃষ্টি বলতে কি বুঝায়?

গ) ৪ মানের প্রশ্ন : সর্বাধিক শব্দসংখ্যা ১০০

১) শিক্ষা ও মনোবিদ্যার পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ কি ?
২) বৃদ্ধি ও বিকাশের পার্থক্য লিখ।
৩) প্রাক বাল্যস্তরের বিকাশের শিক্ষামূলক গুরুত্ব লিখ।
৪) শিখনের স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।
৫) থর্নডাইকের শিখনের সূত্রগুলো সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর।

ঘ) ৫ মানের প্রশ্ন : সর্বাধিক শব্দসংখ্যা ১৫০

১) শিক্ষা মনোবিদ্যার প্রকৃতি ও পরিধি বিশ্লেষণ কর।
২) বৃদ্ধি ও বিকাশের নীতিসমূহ আলোচনা কর।
৩) বয়:সন্ধিকালের বিভিন্ন চাহিদা ও সমস্যা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
৪) শিখন ও পরিণমনের পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচনা কর।
৫) প্রাচীন অনুবর্তন তত্ত্বটি ব্যাখ্যা কর।

ঙ) ৬ মানের প্রশ্ন : সর্বাধিক শব্দসংখ্যা ২০০

বোধপরীক্ষণমূলক

শিখনের সঙ্গে প্রেষণার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। প্রেষণাকে শিখনের পূর্বশর্ত বলা যায়। বিনা প্রেষণায় কোনো শিখন হতে পারে না। কিন্তু কেবলমাত্র প্রেষণার উপস্থিতিতেই শিখন হয় না। প্রেষণার সঙ্গে আরো একটি উপাদান প্রয়োজনীয়। তা হল উদ্‌বোধক। আর তা হল সেই উপাদান যা পেলে বা সেখানে পৌঁছতে পারলে প্রেষণার তৃপ্তি ঘটে। শিখন সম্ভবপর হয় কেবলমাত্র প্রেষণা এবং উদ্‌বোধকের মিলিত পরিস্থিতিতে।

১) উদ্‌বোধক কত প্রকার ও কি কি ?
২) শিখনে প্রেষণা এবং উদ্‌বোধকের সম্পর্ক লিখ। ২ + ৪ = ৬

অষ্টম অধ্যায় : শিক্ষায় মূল্যায়ন

প্রথম একক : মূল্যায়ন

দ্বিতীয় একক : মূল্যায়নের স্বরূপ, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, প্রয়োজনীয়তা

তৃতীয় একক : মূল্যায়নের প্রকারভেদ ও কৌশল

চতুর্থ একক : মূল্যায়নের সাথে জড়িত বিষয়সমূহ

পঞ্চম একক : মূল্যায়নের ধারা

প্রথম একক **মূল্যায়ন**

উদ্দেশ্য :

- *শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের ধারণা, উদ্দেশ্য, উপাদান, ধাপ, নীতি সম্পর্কে জানতে পারবে।*
- *শিক্ষার্থীরা মূল্যায়নের স্বরূপ, শিক্ষার লক্ষ্য ও মূল্যায়ন, শিক্ষায় মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবগত হতে পারবে।*
- *শিক্ষার্থীরা মূল্যায়নের প্রকারভেদ, কৌশল সম্পর্কে বিস্তৃত ধারণা লাভ করবে।*
- *শিক্ষার্থীরা সার্বিক ও নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন, মূল্যায়ন ও পরিমাপের পার্থক্য, পরীক্ষা ও অভীক্ষার মধ্যে পার্থক্য আদর্শ মূল্যায়নের হাতিয়ার সম্পর্কে জানতে পারবে।*
- *শিক্ষার্থীরা মূল্যায়নের ধারা সম্পর্কে অবগত হতে পারবে।*

মূল্যায়ন :

'মূল্যায়ন' শব্দটি আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে বহুল প্রচলিত শব্দ। কোন ব্যক্তির সম্পাদিত আচরনের উপর মূল্য আরোপ করাকেই বলা হয় মূল্যায়ন। আভিধানিক অর্থে 'মূল্যায়ন' কথার অর্থ হল - কোন কিছুর উপর মূল্য আরোপ করা (Evaluation means to place a value on somethings)। শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্তি সম্পাদিত আচরনের উপর মূল্য আরোপ করাই মূল্যায়ন। মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও একই অর্থে মূল্যায়ন শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

শিক্ষাক্ষেত্রে মূল্যায়ন হল - শিক্ষার উদ্দেশ্যমুখী সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষণ ও শিখন প্রচেষ্টার সার্বিক ফলশ্রুতির মান বিচারকরনের অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। অর্থাৎ মূল্যায়ন বলতে আমরা বুঝি সব রকম পরিমাপের সুসামঞ্জস্য সমবায়। শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য ব্যক্তি জীবনের দৈহিক, বৌদ্ধিক, সামাজিক, প্রাক্ষোভিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক ইত্যাদি বিভিন্ন দিকের বিকাশের যে প্রক্রিয়া সতত সক্রিয়, তার সুসামঞ্জস্য রূপ ব্যক্তি জীবনকে কিভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে তার পরিমাপই হল মূল্যায়ন।

মনোবিদ Dandekar বলেছেন - "Evaluation is the systematic process of determining the extent to which educational objectives are achived by the ouoil" অর্থাৎ যে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থী শিক্ষার লক্ষ্যের পথে কতটুকু অগ্রসর হয়েছে তা বিচার করা হয় তাই হল মূল্যায়ন।

NCERT (National Council of Educational Research and Training) - এর মতানুসারে, মূল্যায়ন হল এক ধরনের ধারাবাহিক সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে শিক্ষার নিম্নলিখিত দিকগুলি নির্নয় করা যায় -

- শিক্ষার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলি যা পূর্বেই চিহ্নিত ও সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে সেগুলি কতদূর পর্যন্ত অর্জিত হয়েছে।
- শ্রেণিকক্ষে পরিবেশিত শিখন অভিজ্ঞতার—তার কার্যকারিতা।
- কত ভালোভাবে শিক্ষার লক্ষ্যগুলি সম্পূর্ন করা হয়েছে।

মূল্যায়ন এর ধারনা (Concept of Evaluation) :

বিংশ শতাব্দিতে মনোবিজ্ঞানের সকল শাখাতেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অনুপ্রবেশ ঘটে এবং সকল স্তরে ধীরে ধীরে নৈর্ব্যক্তিক ও বিজ্ঞান ভিত্তিক পদ্ধতি ও কৌশল অনুসৃত হতে থাকে। শিক্ষাবিদরাও তখন উপলব্ধি করেন যে শিক্ষার্থীদের সাফল্য এবং অসাফল্যের পরিমাপও বিজ্ঞান ভিত্তিক হওয়া প্রয়োজন,আর তখনই মূল্যায়নের ধারনার প্রবর্তন ঘটে।

মূল্যায়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। শিক্ষা প্রক্রিয়া চলাকালীন প্রতিদিন শিক্ষার্থীর বিভিন্ন ক্ষেত্রে কি ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তা লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়। এর ফলে পরিবর্তিত আচরনগুলির মূল্যমান নির্ধারনের সাথে সাথে আচরণ পরিবর্তনের সুনির্দিষ্ট ধারাটি সম্পর্কেও ধারনা তৈরী হয়। বিশেষ করে জীবন বিকাশের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আচরণ পরিবর্তনের ধারা সম্পর্কে একটি পরিপূর্ণ ধারনা পাওয়া যায়। তাই বলা যেতে পারে যে মূল্যায়ন হল একটি অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিক প্রক্রিয়া।

আধুনিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন করা। তাই মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর শুধুমাত্র শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতি-ই যাচাই করা হয় না শিক্ষা-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শিধক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনি সাথে সাথে তার প্রক্ষোভিক বিকাশ ঘটে এবং তার চারিত্রক বৈশিষ্ট্যগুলি প্রস্ফুটিত হয়, অর্থাৎ বলা যেতে পারে যে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক ব্যক্তিসত্ত্বার বিকাশ ঘটে। কাজেই মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর দেহিক, মানসিক, সামাজিক, প্রক্ষোভিক সমস্ত ক্ষেত্রের সম্পাদিত আচরন ধারার-ই মূল্য নির্ধারণ করা হয়। আর এই মূল্যায়ন কোন একক প্রক্রিয়া নয় - এটি হল একটি সামগ্রিক প্রক্রিয়া।

সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা মূলত তিনটি স্তর বা পর্যায়ের মধ্য দিয়ে বাস্তবায়িত হয়, এই তিনটি স্তর হল- শিক্ষার লক্ষ্য স্থিরকরন, শিখন অভিজ্ঞতা উপস্থাপন ও মূল্যায়ন। অধ্যাপক B.S.BLoom (Benjamin Samuel Bloom) শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিখন অভিজ্ঞতা ও মূল্যায়নের মধ্যে সম্পর্ককে একটি ত্রিভুজের সাহায্যে ব্যাখ্যা করেছেন। ব্লুমের (Bloom) এই ধারনাকে বলা হয় মূল্যায়ন ত্রিভুজ।

শিক্ষার লক্ষ্য স্থির করার পর ঐ লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য কতকগুলি সুনির্বাচিত শিখন অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীর সামনে রাখা হয় এবং বিভিন্ন কৌশলের সাহায্যে শিক্ষার লক্ষ্য ও শিখন অভিজ্ঞতাগুলির কার্যকারিতা যাচাই করা হয়। এরপর শিক্ষার স্থির করা লক্ষ্যে না পৌঁছালে এর ত্রুটি অনুসন্ধান করা হয় এবং তা সংশোধন করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়। এই কারণেই মূল্যায়নকে একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া হিসেবে গণ্য করা হয়।

শিক্ষা-প্রক্রিয়ার সাথে মূল্যায়ন ব্যবস্থা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর পরিবর্তিত আচরণধারার বিচার করে জানা যায় যে - শিক্ষাপ্রচেষ্ঠা কতখানি সার্থক হল অথবা শিক্ষার্থী উদ্দেশ্য অর্জনের দিকে কতটা অগ্রসর হয়েছে। মূল্যায়নের ফলাফল যদি আশানুরূপ হয় তবে পরবর্তী প্রচেষ্টা শুরু হয়। শিক্ষামূলক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখন অভিজ্ঞতা ও আচরণের পরিবর্তনকে মূল্যায়িত করা হয়। এই মূল্যায়ন প্রক্রিয়া মূলত দুটি উপায়ে সম্পাদিত করা যায় - একটি পরিমানগত মূল্যায়ন ও অপরটি গুনগত মূল্যায়ন। পরিমানগত মূল্যায়নের সাহায্যে কেবলমাত্র বিষয় ভিত্তিক পারদর্শিতার অগ্রগতি ও শিক্ষার্থীর তুলনামূলক অবস্থান নির্নয় করা যায়, এবং গুনগত মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশের অন্যান্য সূচকগুলি পরিমাপিত হয়, তাই পরিমানগত ও গুনগত মূল্যায়ন ঘটানো সম্ভব।

মূল্যায়নের উদ্দেশ্য (Objective of Evaluation) :

মূল্যায়নের নানাবিধ উদ্দেশ্যের মধ্যে মুখ্য কিছু হল নিম্নরূপ —

- মূল্যায়নের সাহায্যে শিক্ষার্থীর সামর্থ্য ও দুর্বলতা নির্ণয় করা।
- মূল্যায়নের সাহায্যে শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যগুলোকে অর্জন করা।
- সম্পূর্ণ শিক্ষাসূচির কার্যকারিতা বিচার করা ও প্রয়োজনে সেগুলোর সংস্কার ও পরিবর্তন সাধন করা।
- শিক্ষার্থীর উন্নতি ও অগ্রগতি সম্পর্কে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, পিতামাতা, অভিভাবককে অবহিত করা।
- শিক্ষার্থীর বর্তমান শিক্ষাগত অবস্থা ও আচরণের পরিবর্তন সম্পর্কে জানতে পারা।
- মূল্যায়ন প্রক্রিয়া ও শিক্ষনের মধ্যে সম্পর্ককে শক্তিশালী করা।
- শিক্ষন পদ্ধতির উপযোগীতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া।
- ভবিষ্যতে বিষয়বস্তু নির্বাচন ও বিন্যাসে সহায়তা করা।
- মূল্যায়ন শিক্ষামূলক তথ্য সংগ্রহে সহায়তা করে।
- শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পুনর্বিবেচনা করতে সহায়তা করা।

মূল্যায়ণের উপাদানসমূহ (Components of Evaluation)

মূল্যায়ণের উপাদানসমূহ নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল—

ক) শিখন ফলাফলকে সুনির্দিষ্টকরণ।
খ) শিখন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহকরণ।
গ) শিক্ষার্থীর শিখন সংক্রান্ত ফলাফলকে বিশ্লেষণ ।
ঘ) শিক্ষার্থীর শিখন সংক্রান্ত বিষয় চিহ্নিতকরণ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণ।
ঙ) আচরণগত উদ্দেশ্যের পরিমার্জন।

ক) শিখন ফলাফলকে সুনির্দিষ্টকরণ : মূল্যায়ন শিখন ফলাফলকে সুনির্দিষ্ট করে থাকে। ফলে মূল্যায়নের দ্বারা শিখন ফলাফলের একটি বাস্তবগ্রাহী ধারণা পাওয়া যায়।

খ) শিখন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহকরণ : মূল্যায়ন শিক্ষার্থীর তথ্য একটি শিক্ষাবর্ষে ধারাবাহিক ও নিরবিচ্ছিন্নভাবে সংগ্রহ করে থাকে বিভিন্ন কৌশল, হাতিয়ার ইত্যাদি ব্যবহারের মাধ্যমে। ফলে শিক্ষার্থী সম্পর্কিত গুণগত ও পরিমাণগত তথ্য মূল্যায়ন এর মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়।

গ) শিক্ষার্থীর ফলাফল বিশ্লেষণ : শিক্ষার্থীর শিখন ফলাফলকে সুনির্দিষ্টভাবে বিশ্লেষণ করে শিক্ষার্থীর শিখন ক্ষমতা সম্পর্কে একটি বাস্তবগ্রাহ্য ধারণা পেতে সহায়তা করে।

ঘ) শিক্ষার্থীর শিখন সংক্রান্ত বিষয় চিহ্নিতকরণ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণ : শিক্ষার্থীর শিখন সক্ষমতা ও দুর্বলতা চিহ্নিতকরণ করা হয় বিভিন্ন বিষয়ে অর্থাৎ শিক্ষার্থী কি বাংলা বিষয়ে সমান না তার প্রদর্শন দুর্বল, ইংরেজী বিষয়ে শিক্ষার্থীর কি অবস্থা — সে কি দুর্বল ইংরেজী বিষয়ে না অত্যন্ত ভালো তার শিক্ষামূলক প্রদর্শন ইত্যাদি। এর থেকে শিক্ষার্থীর শিখন সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে, শিক্ষন-শিখন উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করতে বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণ করা হয়ে থাকে। শিক্ষন পদ্ধতির পরিবর্তন, পাঠ্যসূচির পরিবর্তন, পাঠটীকার পরিমার্জন, অতিরিক্ত ক্লাসের ব্যবস্থা ইত্যাদি গ্রহণ করা হয়।

ঙ) আচরণগত উদ্দেশ্যের পরিমার্জন : শিক্ষার লক্ষ্যকে পূরণ করতে হলে বা প্রত্যাশিত লক্ষ্যে পৌছতে হলে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবকদের সাথে পারস্পরিক আলোচনা ও ফিডব্যাক বা প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে আচরণগত উদ্দেশ্যের পরিমার্জন করা হয়ে থাকে।

মূল্যায়নের ধাপসমূহ (Steeps of Evaluation)

মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে গেলে কতকগুলো ধাপ অনুসরণ করতে হয় যেগুলো নিম্নে সংক্ষেপে দেওয়া হল :—

প্রথম ধাপ: শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ধারণ :

মূল্যায়নের প্রথম পর্যায়েই শিক্ষার নির্ধারণ করে নেওয়া হয় যাতে মূল্যায়ন সঠিক পথে অগ্রসর হতে পারে।

দ্বিতীয় ধাপ: বিশেষধর্মী আচরণমূলক উদ্দেশ্য নির্ধারণ :

শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিক্ষামূলক আচরণের কি কি পরিবর্তন প্রত্যাশিত এবং তাতে বৌদ্ধিক স্তরের উদ্দেশ্য, অনুভূতিমূলক স্তরের উদ্দেশ্য, দক্ষতামূলক স্তরের উদ্দেশ্য কি কি তা সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করতে হবে।

তৃতীয় ধাপ : মূল্যায়নের কৌশল নির্বাচন :

শিক্ষার উদ্দেশ্য, আচরণধর্মী উদ্দেশ্য কতখানি উদ্দেশ্যগুলো কতখানি অর্জিত হয়েছে তা পরিমাপের জন্য বিভিন্ন কৌশল যেগুলো মূল্যায়ণ করতে সক্ষম সেগুলো নির্বাচন করা হয়।

চতুর্থ ধাপ : নির্বাচিত পরিমাপক কৌশল প্রয়োগ :

এই ধাপটি মূল্যায়নের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ করেন নির্বাচিত পরিমাপক কৌশলগুলোর দ্বারা শিক্ষার্থীর শিখন সমর্থতা পরিমাপ করা হয়।

পঞ্চম ধাপ : প্রাপ্ত তথ্যাবলীর সংরক্ষণ :

শিক্ষার্থীর শিখন সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্যগুলোকে সংরক্ষণ করা হয় যাতে প্রয়োজন অনুযায়ী তথ্য ব্যবহার করা যায়।

ষষ্ঠ ধাপ: সংরক্ষিত তথ্যের তাৎপর্য নির্ণয় :

শিক্ষার্থীর শিখন সংক্রান্ত তথ্যের তাৎপর্য নির্ণয় করা হয় এবং এর থেকে জানা যায় শিক্ষার্থীর শিখনের কিরূপ অবস্থা — শিক্ষার্থীদের উন্নতি, অগ্রগতি, সক্ষমতা, দুর্বলতা ইত্যাদি।

সপ্তম ধাপ : মূল্যায়নের ফলাফলকে ফিডব্যাক হিসাবে ব্যবহার
মূল্যায়নের ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষন-শিখন কার্যকারিতার বিচার করা হয়।

অষ্টম ধাপ : ফিডব্যাকের ভিত্তিতে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের পূর্ণগঠন মূল্যায়নের বাস্তবগ্রাহ্যতা, উপযোগিতা, লক্ষ্য পূরণে কতটা সহায়ক তার ভিত্তিতে ফিডব্যাক কার্যকরী ভূমিকা নেয় এবং একে কেন্দ্র করে মূল্যায়নের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের পূর্ণগঠন করা হয়ে থাকে যাতে মূল্যায়ন কাঙ্খিতভাবে চলতে পারে।

মূল্যায়নের নীতি (Principle of Evaluation)

মূল্যায়ন কিছু মৌলিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সেগুলোর কিছু হল নিম্নরূপ—

ক) উদ্দেশ্য বিচারের নীতি : যে উদ্দেশ্য নিয়ে মূল্যায়ণ করা হয় সেগুলোর যথার্থতা হওয়াউচিত।

খ) আচরণগত পরিবর্তন বিচারের নীতি : মূল্যায়নের দ্বারা শিক্ষার্থীর আচরণের পরিবর্তন সাধন করা যায় এবং আচরণের পরিবর্তন ও পরিমার্জন সাধনের দ্বারা শিক্ষার্থীর উন্নতিসাধন করা যায়।

গ) সংগতিবিধানের নীতি : শিক্ষার লক্ষ্য, শিক্ষন-শিখন প্রক্রিয়া, মূল্যায়ণ কৌশল ও পদ্ধতি এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে সর্বদা সঙ্গাতি বিধান থাকা দরকার ।

ঘ) শিক্ষন-শিখন পদ্ধতি বিচারের নীতি : মূল্যায়ণ দ্বারা শিক্ষন-শিখন পদ্ধতির বাস্তব গ্রাহ্যতা, শিক্ষার উদ্দেশ্য কতটা সাধিত হয়েছে তা জানা যায় এবং প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা যায়।

ঙ) মূল্যায়ণ কৌশলের বাস্তবগ্রাহ্যতা স্থির করণের নীতি : শিক্ষার্থীর শিখন সামর্থ্যতা যে সমস্ত মূল্যায়ণ কৌশলের দ্বারা করা হয় তার যৌক্তিকতা ও উপযোগিতা কতখানি তা স্থির করা হয় ও প্রয়োজনে পরিমার্জন ও পরিবর্তন করা হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় একক মূল্যায়নের স্বরূপ, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, প্রয়োজনীয়তা

শিক্ষামূলক মূল্যায়নের স্বরূপ (Nature of Educational Evaluation)

আধুনিক কালে শিক্ষাকে আমরা একটি স্বয়ং সম্পূর্ন বিজ্ঞান রূপে গ্রহণ করে থাকি এবং শিক্ষার একটি প্রয়োগমূলক দিকও রয়েছে। শিক্ষার এই বিজ্ঞানমূলক ও প্রয়োগমূলক উভয় দিকেরই সন্তোষজনক কার্যসম্পাদানের জন্যই পরিমাপ অপরিহার্য। শিক্ষার্থীদের সাফল্য ও অসাফল্যের পরিমাপ বিজ্ঞানভিত্তিক হওয়া একান্ত প্রয়োজন। তাই শিক্ষার মূল্যায়ন অপরিহার্য। মূল্যায়নের দ্বারা শিক্ষার্থীরা তাদের অভীষ্ট লক্ষ্যের প্রতি কতটা অগ্রসর হয়েছে তা বোঝা যায়।

বৈশিষ্ট্য : মূল্যায়ন একটি গতিশীল ও অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া, এর স্বরূপ অত্যন্ত ব্যাপক। এই প্রসঙ্গে মূল্যায়নের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা যায় -

এইগুলি হল---

- মূল্যায়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া।
- মূল্যায়নের সাহায্যে শিক্ষার্থীর ক্রমোন্নতি নির্নয় করা হয়।
- মূল্যায়ন শিক্ষন ও শিখন প্রক্রিয়াকে উন্নতর করার নির্দেশ দেয়।
- মূল্যায়ন শিক্ষার্থীর ব্যক্তি-সত্ত্বার সমস্ত দিকের পরিমাপ করে।
- শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবক - এই তিনটি উপাদানের সহযোগিতাপূর্ণ প্রচেষ্টার উপর মূল্যায়ন প্রক্রিয়া নির্ভরশীল।
- মূল্যায়ন শিক্ষার্থীর আচরনের গুনগত ও পরিমানগত উভয় দিকের বিচার করে।

সুতরাং এইসব বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে মূল্যায়ন হল এমন একটি গতিশীল ধারাবাহিক প্রক্রিয়া যা শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক, বৌদ্ধিক ও ব্যক্তিত্ত্বের গতিশীল পরিবর্তন পরিমাপ করে।

শিক্ষামূলক মূল্যায়নের উদ্দেশ্য (Objectives of Educational Evaluation)

মূল্যায়ন শুধুমাত্র শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানই পরিমাপ করে না, এর উদ্দেশ্য হল শিক্ষা পদ্ধতির উন্নতি সাধন করা।

মূল্যায়ন এর উদ্দেশ্যগুলি হল -

- মূল্যায়নের উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর দ্বারা সম্পাদিত আচরনকে অতীতের প্রেক্ষাপটে বিচার করে, তার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বিচারে মূল্য আরোপ করা।
- একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শিক্ষার লক্ষ্য কতটুকু অগ্রসর হয়েছে তা বিচার করা।
- শিক্ষার্থীর কোন বিষয়ের সাফল্য ও ব্যর্থতার দিকগুলি বিচার করা মূল্যায়নের আরও একটি উদ্দেশ্য।
- পাঠদানের উদ্দেশ্য এবং শিখন অভিজ্ঞতার গুনগত মান নির্ধারন করাও মূল্যায়নের উদ্দেশ্য।

- মূল্যায়নের উদ্দেশ্য হল শিক্ষা-ব্যবস্থাকে সামগ্রিকভাবে বিশ্লেষণ করা।
- পাঠ্যক্রমের সংশোধন ও পুনর্বিন্যাসে সহায়তা করাও মূল্যায়নের উদ্দেশ্য।
- শিক্ষার্থীদের শিক্ষাকালীন পরিবেশে অর্জিত দৃষ্টিভঙ্গি, প্রবনতা, মন:প্রকৃতি ইত্যাদি পরিমাপ করাও মূল্যায়নের উদ্দেশ্যের অন্তর্গত।

শিক্ষার লক্ষ্য ও মূল্যায়ন (Aims of Education and Evaluation)

মূল্যায়ণ মূলত শিক্ষার যে তিনটি লক্ষ্য নির্ণয় করতে সহায়তা করে তা হল—

ক) শিক্ষার লক্ষ্য কতটা অর্পিত হয়েছে।

খ) পঠন পাঠনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যে সামগ্রিক অভিজ্ঞতা লাভ করেছে তার যথার্থতা।

গ) শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য কতটা সাধিত হয়েছে।

শিক্ষার লক্ষ্যকে বাদ দিয়ে মূল্যায়ণ প্রক্রিয়া কখনোই সম্ভবপর নয়। নিম্নে একটি Flow-chart এর মাধ্যমে তা দেখানো হল—

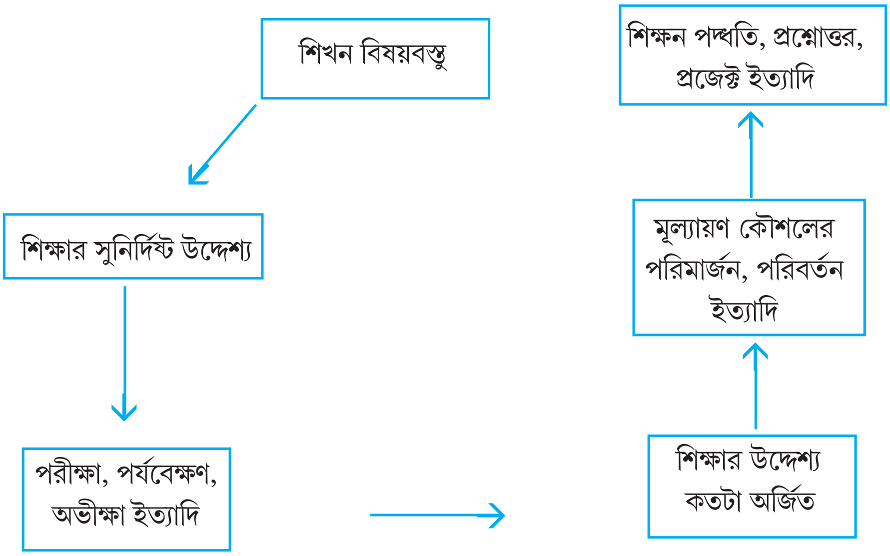

প্রথমেই শিখন বিষয়বস্তু অর্থাৎ পাঠ্যসূচিতে কি থাকবে তা স্থির করে নিতে হবে কারণ এর উপরই শিক্ষা কি অর্জন করতে চাইছে তা নির্ভর করে। শিক্ষার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করেই বিভিন্ন মূল্যায়নের কৌশল যেমন পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ, অভীক্ষা ইত্যাদি স্থির করা হয়ে থাকে। আবার এর উপর ভিত্তি করেই শিক্ষন পদ্ধতি, প্রশ্নোত্তর, প্রজেক্ট ইত্যাদি পরিমার্জিত ও সংশোধন করা হয়ে থাকে এর থেকে মূল্যায়নের বিভিন্ন কৌশলের যৌক্তিকতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য কতটা অর্জিত হয়েছে তা বুঝা যায়। তাই শিক্ষার লক্ষ্য ও মূল্যায়ন একে অপরের সাথে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে।

শিক্ষায় মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা (Necessity of Evaluation in Education)

মূল্যায়ণ শিক্ষার ধারণা সম্পূর্ণ হয় না। শিক্ষায় মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা নিম্নে দেওয়া হল—

১) শিক্ষার উদ্দেশ্য কতটা সাধিত হয়েছে তা মূল্যায়ন দ্বারা জানা যায়।

- শিক্ষন-শিখন কতটা উপযোগী হয়েছে তা মূল্যায়ন জানতে সহায়তা করে।
- শিক্ষার্থীর পরিমাণগত ও গুণগত বিকাশ মূল্যায়নের দ্বারা জানা যায়।
- শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত পারদর্শিতার স্তর জানা যায়।
- ভবিষ্যত বৃত্তি ও পেশা নির্বাচনে মূল্যায়ণ সহায়তা করে।
- Remedial Classes বা Advanced Class এর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কিনা তা জানা যায়।
- পাঠটীকার ব্যবহার যথার্থ কিনা তা জানতে সাহায্য কদ্দের।
- শিক্ষন-শিখন এর বাস্তবায়নের মধ্যে যে সমস্ত বাধা আছে সেগুলোকে দূর করতে পদক্ষেপ নেওয়া।
- শিক্ষার্থীকে, শিক্ষককে, পিতামাতাকে, সমাজকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মান সম্পর্কে অবগত হতে সহায়তা করা।
- মূল্যায়ন শিক্ষার্থীর প্রতি নির্দেশনায় সহায়ক হয়।

তৃতীয় একক

মূল্যায়নের প্রকারভেদ ও কৌশল

মূল্যায়নের প্রকারভেদ (Types of Evaluation)

মূল্যায়নের প্রকৃতি অনুযায়ী মূল্যায়নকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন -

(১) গঠনমূলক মূল্যায়ন (Formative Evaluation)

(২) সামগ্রিক মূল্যায়ন (Summative Evaluation)

গঠনমূলক মূল্যায়ন (Formative Evaluation)

গঠন মূলক সাধারণত: কোন কাজের প্রতিটি স্তর সম্পাদন কালে সম্পন্ন করা হয়। যেমন শিক্ষা প্রক্রিয়ায় পাঠদানের সময় শিক্ষার্থীর অগ্রগতি সম্পর্কীয় তথ্যসংগ্রহে গঠনমূল্যায়ন ব্যবহার করা হয়।

Michael Serivan সর্বপ্রথম এই শব্দটি ব্যবহার করেন কোন কাজ চলাকালীন তার প্রতিটি ধাপে সেই কাজের অবস্থান, প্রকৃতি, অগ্রগতি, উৎকর্ষতা ইত্যাদি সম্পর্কে জানার জন্য যে মূল্যায়ন করা হয় তাকে গঠনমূলক মূল্যায়ন বলে, এই মূল্যায়ন কোন কাজের নির্মান পর্যায়ে সম্পন্ন হয়।

শ্রেনীকক্ষে শিক্ষাদানের সময় শিক্ষক একটি বিষয়বস্তুকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করে উপস্থাপন করেন এবং উপস্থাপন শেষে শিক্ষার্থীর বোধগম্যতার স্তর যাচাহ করার সময় এই মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার সাহায্য নিয়ে থাকেন। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের দুর্বলতার দিকগুলি চিহ্নিত করে সংশোধনমূলক শিক্ষনের মাধ্যমে তা দূর করার ব্যবস্থা করা হয়।

এই মূল্যায়নের সাহায্যে শিক্ষক শিক্ষার্থীর জন্যে উপযুক্ত পদ্ধতি, কৌশল ও উপকরণ নির্বাচন করতে পারেন।

গঠন মূলক মূল্যায়নের উপকরন (Techniques of Formative Evaluation) :

গঠনমূলক মূল্যায়নের জন্য যে সমস্ত কৌশল ব্যবহার করা হয় তাহল-
একক অভীক্ষা (Unit test) শ্রেনী অভীক্ষা (Class test), প্রশ্নাবলী (Ouestionnaire), গৃহকাজ (Home task)।

বৈশিষ্ট্য (Characteristics) :

গঠনমূলক মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্যগুলি হল -

(১) এটি মূলত: কোন কাজের বিকাসমূলক স্তরের পদ্ধতি।

(২) এই প্রকার মূল্যায়নে আনবিক বিশ্লেষনে উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

(৩) এই মূল্যায়ন অনুসন্ধানমূলক ও নমনীয়।

(৪) এই মূল্যায়নের মাধ্যমে পাঠ্যক্রমের সংশোধন ও সংযোজন সম্ভব।

(৫) এই মূল্যায়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া।

(৬) সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা সুপরিকল্পিতভাবে পরিচালনার কাজে সহায়তা করে।

গুনাবলী (Merits):

গঠনমূলক মূল্যায়নের সুবিধাগুলো নীচে আলোচনা করা হল -

(১) শিক্ষাদানের প্রতিটি স্তরে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি ও ত্রুটি সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়।

(২) এই মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় স্বল্প সময়ের ব্যবধানে শিক্ষার্থীরা নিজেদের ত্রুটি বিচ্যুতি সম্পর্কে জানতে পারে বলে প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে পারে।

(৩) পাঠদান চলাকালীন শিক্ষক কতটা সফল হয়েছেন সেই সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করে।

(৪) এই পদ্ধতি একটি ধারাবাহিক ও চক্রাকার পদ্ধতি হওয়ায় প্রাপ্ত প্রত্যাবর্তিত ফলাফলের ভিত্তিতে সংশোধন - মূলক পাঠদান প্রয়োজন কিনা সেই সম্পর্কে শিক্ষককে অবহিত করে।

সীমাবদ্ধতা (Limitation) : গঠনমূলক মূল্যায়নের নানাবিধ গুন থাকলেও এই প্রকার মূল্যায়ন সম্পূর্ন ত্রুটিমুক্ত নয়। এর কতকগুলি ত্রুটি বিচ্যুতি রয়েছে। যেমন --

(১) গঠনমূলক মূল্যায়ন একটি দীর্ঘমেয়াদী ব্যয় বহুল প্রক্রিয়া।

(২) গঠনমূলক মূল্যায়নে তাৎক্ষনিক পদ্ধতি ব্যবহার করায় মূল্যায়নের যথার্থতা, নির্ভর যোগ্যতা ও নৈব্যক্তিকতা নিশ্চিত করার কোন উপায় নেই।

(৩) গঠনমূলক মূল্যায়ন অতিরিক্ত ব্যাক্তিকেন্দ্রিক, দলগত কার্য্যক্রম দলগত মূল্যায়ন -এসব ক্ষেত্রে গঠনমূলক মূল্যায়ন অসুবিধা জনক।

(৪) গঠনমূলক মূল্যায়নের অর্ন্তনিহিত ধারনা হল, সমস্ত ছাত্রছাত্রীই একই গতিতে একই সময়ে শিখতে পারে, তাই দুর্বল ও পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের প্রতি গঠনমূলক মূল্যায়ন সুবিচার করতে পারে না।

(২) সামগ্রিক মূল্যায়ন (Summative Evaluation)

একটি নির্দিষ্ট কর্মসূচী শেষে শিক্ষন উদ্দেশ্যগুলি কতটা অর্জিত হয়েছে সে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহকে সামগ্রিক মূল্যায়ন বলে। এই ধরনের মূল্যায়নের কথা ও মনোবিদ্ Michael Serivan সর্বপ্রথম উল্লেখ করেন, আর্ন্তজাতিক শিক্ষা সম্বন্ধীয় অভিধানে G.T Page এবং J.B. Thomas উল্লেখ করেছেন যে, শিক্ষার কার্যক্রম শেষ হবার পর তার কার্যকারিতা যাচাই করার জন্য যে ধরনের মূল্যায়ন করা হয় তাকে বলে সামগ্রিক মূল্যায়ন সাধারণভাবে বলা যায় যে। কোনো বিষয়ের বৃহৎ অংশ অনুশীলনের পর চূড়ান্ত ফলাফল সম্পর্কে অবগত হবার জন্য যে ধরনের মূল্যায়ন। শিক্ষন শিখন প্রক্রিয়ার সামগ্রিক ফলাফল এই ধরনের মূল্যায়ন থেকে পাওয়া যায়। একটি নির্দিষ্ট শ্রেনীতে একটি শিক্ষাবর্ষশেষ হবার শিক্ষার্থীরা পরবর্তী শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হবে কিনা তা সামইগ্রিক মূল্যায়ন দ্বারা নির্ধারিত হয়।

সামগ্রিক মূল্যায়নের উপকরণ (Techniques of Summative Evaluation)

সামগ্রিক মূল্যায়নের উপকরণগুলো হল - শিক্ষককৃত অভীক্ষা, বিদ্যালয়ের ত্রৈমাসিক যান্মাষিক ও বার্ষিক পরীক্ষা, পাবলিক পরীক্ষা গ্রেড প্রথা, রেটিং স্কেল ইত্যাদি।

বৈশিষ্ট্য (Characteristics): সামগ্রিক মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নলিখিত ভাবে আলোচনা করা যেতে পারে—

(১) এটি শিক্ষার্থীর শিখন ফলের মাত্রা নিরূপন করে।
(২) এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অর্জিত অভিজ্ঞতার সামগ্রিক চিত্রটি পরিস্ফুট হয়।
(৩) এই ধরনের মূল্যায়নে বর্ণনামূলক বিশ্লেষনের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়।
(৪) এই ধরনের মূল্যায়ন অনমনীয়,
(৫) পাঠদান কর্মসূচীর শেষে তার কার্য্যকারিতা বিচারই হল সামগ্রিক মূল্যায়নে মুখ্য উদ্দেশ্য।
(৬) সামগ্রিক মূল্যায়নের উপকরনগুলি বিশ্বাসযোগ্য ও যথার্থ।

গুণাবলী (Merits) সামগ্রিক মূল্যায়নের সুবিধাগুলি হল -

(১) কোন শিক্ষাবর্ষ শেষে শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট শ্রেনীতে শিখন সামর্থ্যগুলি কতটা আয়ত্ব করতে সক্ষম হয়েছে তা নির্নয় করা যায়।
(২) এই মূল্যায়নের ভিত্তিতে যে কোন ক্ষেত্রে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহন করা সহজ হয়,
(৩) এই মূলায়নের মাধ্যমে পাঠ্যক্রমের ত্রুটি, অসম্পূর্ণতার ধারনা পাওয়া যায়।
(৪) সামগ্রিক মূল্যায়নের জন্য সময় ও অর্থ ব্যয় কম হয়। সীমিত সংখ্যাক পরীক্ষার দ্বারা এই মূল্যায়ন পরিচালিত হয় বলে শক্তির ব্যবহার ও কম হয়।
(৫) সামগ্রিক মূল্যায়ন একযোগে সারা রাজ্যে বা সারা দেশে করা সম্ভব।

সীমাবদ্ধতা (Limitation) : সামগ্রিক মূল্যায়নের উপরে উল্লেখিত সুবিধাগুলি থাকলে ও এর কিছু অসুবিধা ও রয়েছে। যেমন

(১) শিক্ষনীয় বিষয়বস্তু একসাথে মূল্যায়ন একসাথে হয় বলে শিক্ষার্থীর উপর তাৎক্ষনিক চাপ বেশী পড়ে।
(২) ত্রুটিপূর্ণ পরীক্ষা ব্যবস্থার জন্য সামগ্রিক মূল্যায়নের ফলে অনেক সময় যথাযথ ভাবে শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়।
(৩) সামগ্রিক মূল্যায়নে সংশোধনের কোন সুযোগ না থাকায় শিক্ষার্থীদের নানাবিধ সমস্যায় পড়তে হয়।

এই সব দোষত্রুটি সত্ত্বেও তুলনামূলক ভাবে সামগ্রিক মূল্যায়ন কৌশল অধিক প্রচলিত। শিক্ষাক্ষেত্রে গঠনমূলক মূল্যায়নের প্রথা প্রচলিত থাকলেও শিক্ষাবর্ষ শেষে সামগ্রিক মূল্যায়ন করা হয়।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় যে গঠনমূলক মূল্যায়ন শিক্ষাদান কার্য্য চলাকালীন প্রতিটি ধাপে অনুসৃত হয়। এবং সামগ্রিক মূল্যায়ন পাঠদান কর্মসূচীর শেষে প্রয়োগ করা হয়। গঠনমূলক মূল্যায়ন বিকাশ মূলক। এর উদ্দেশ্য হল শিখন পরিস্থিতির উন্নতি সাধন। আর সামগ্রিক মূল্যায়ন হল বিচারমূলক এর উদ্দেশ্য হল শিখন শিক্ষন প্রক্রিয়ার গুনগতমান নির্ধারন করা।

গঠনমূলক মূল্যায়ন ও সামগ্রিক মূল্যায়নের মধ্যে পার্থক্য : Michael Serivan এর মতে পাঠদান কর্মসূচীর শেষে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি এবং পাঠ্যক্রমের কার্যকারিতা যাচাই করার জন্য যে ধরনের মূল্যায়ন করা হয় তাহল সামগ্রিক মূল্যায়ন।

অন্যদিকে যে পাঠদান কর্মসূচীর সংস্কারের অবকাশ আছে তার কার্যকারিতা বিচারই হল গঠন মূলক মূল্যায়ন। এই দুই প্রকার মূল্যায়নের মূল্যায়নের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে, যেমন --

(১) গঠনমূলক মূল্যায়নের মূল উদ্দেশ্য হল প্রক্রিয়ার মূল্যায়ন করা। সামগ্রিক মূল্যায়নের মূল উদ্দেশ্য হল মূল্যমানের মূল্যায়ন করা।

(২) গঠনমূলক মূল্যায়ন বিকাশমূলক এর উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর শিখনের উন্নতি ও শিক্ষকের পাঠদানের উন্নতি ঘটানো।

সামগ্রিক মূল্যায়ন বিচারমূলক। এর উদ্দেশ্য শিখন -শিক্ষন প্রক্রিয়ার গুণগত মান নির্ধারণ।

(৩) কর্মসূচী চলাকালীন কিছু সময় অন্তর অন্তর গঠনমূলক মূল্যায়ন করা হয়।

বর্ষশেষে বা কোর্স সম্পাদনের পর সামগ্রিক মূল্যায়ন প্রয়োগ করা হয়।

(৪) গঠনমূলক মূল্যায়নে সংশোধনমূলক শিক্ষন পরিকল্পনার সুযোগ রয়েছে। সামগ্রিক মূল্যায়নে সেই সুযোগ নেই। এই মূল্যায়ন শিক্ষার্থীদের শ্রেনী করনে ব্যবহৃত হয়।

(৫) গঠনমূলক মূল্যায়নে বিষয়বস্তুর খন্ডখন্ড অংশের মূল্যায়ন করা হয়। সামগ্রিক মূল্যায়নে বিষয়বস্তুর সমগ্র অংশের মূল্যায়ন করা হয়।

(৬) গঠনমূলক মূল্যায়ন শিক্ষন শিখন প্রক্রিয়ায় নির্দ্দেশদানের সময় ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে নিদ্দের্শদান সম্পূর্ন হওয়ার পর সামগ্রিক মূল্যায়ন ব্যবহৃত হয়।

(৭) গঠনমূলক মূল্যায়নে মূল্যায়নকারী পাঠদান কর্মসূচাতে অংশগ্রহন করেন এবং এই কর্মসূচীতে অংশগ্রহন করেন এবং এই কর্মসূচীকে আরো ও উন্নতি করতে সচেষ্ট থাকেন।

অন্যদিকে সামগ্রিক মূল্যায়নে মূল্যায়নকারী পাঠদান কর্মসূচীতে অংশগ্রহন করেন না। পাঠদান কর্মসূচীর কার্যকারিতা বিচার করেন মাত্র।

(৮) গঠনমূলক মূল্যায়নে বৌদ্ধিক,মন:সঞ্চালনমূলক এবং অনুভুতিমূলক আচরনের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

আর সামগ্রিক মূল্যায়নে প্রধানত: বৌদ্ধিক আচরনই গুরুত্ব পায়। মাঝে মাঝে অবশ্য মন:সঞ্চালনমূলক ক্ষেত্র ও বিবোচিত হয়।

মূল্যায়নের কৌশল (Technique of Evaluation)

মূল্যায়নের কৌশল বলতে বোঝায় সেই সব ক্রিয়াকান্ডকে যা একজন মূল্যয়নকারী শিক্ষার্থী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য ব্যবহার করেন। মূল্যায়নে ব্যক্তির সব ধরনের বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করা যায়। শিক্ষার্থীর সব রকম বৈশিষ্ট্য বলতে দৈহিক, মানসিক, সামাদিক, কৃষ্টিগত ও শিক্ষাগত বৈশিষ্ট্যকে বোঝায় এই বৈশিষ্ট্যগুলি পরিমাপের জন্য নির্দিষ্ট কিছু কৌশল প্রয়োজন। এই কৌশলগুলি ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রকার বৈশিষ্ট্যের ভালোমন্দ দিক ও বিকাশ সহায়ক কথ্য সংগ্রহ করা যায়।

সাধারণভাবে মূল্যায়নে যে সমস্ত কৌশল ব্যবহার করা হয় তাদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী চারভাগে ভাগ করা যায়। যেমন -

(১) অভীক্ষা (Test)

(২) নিরীক্ষন (Observation)

(৩) নিজস্ব মতামত প্রকাশ (Self neporting)

(৪) প্রতিফলন সংক্রান্ত কৌশল (Projective Techiques)

এই চারধরনের কৌশলকে কার্যকর করার জন্য শিক্ষনবিদ ও মনোবিদগন বিভিন্ন ধরনের উপকরণ

আবিষ্কার করেছেন এই উপকরনগুলি একধরনের ব্যবস্থাপনা যা বিভিন্ন কৌশলগুলিকে শিক্ষার্থী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহে সাহায্য করে। মূল্যায়ন কৌশলগুলি তার উপকরনের সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ করে।

(১) অভীক্ষা (Test) অভীক্ষা হল কতকগুলি কার্যাবলী যা কোনো নির্দিষ্ট সময়ে ব্যক্তির বিশেষ কোনো আচরন পরিমাপে ব্যবহৃত হয়। Grarett অভীক্ষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন “A test in merely a series of tasks which are used measure a sample of a person’s behaviour at a time” শিক্ষার বিভিন্ন উদ্দেশ্য পরিমাপের জন্য বিভিন্ন ধরনের অভীক্ষা ব্যবহৃত হয়। অভীক্ষাকে নিম্নলিথিত ভাগে ভাগে করা যায় -

(ক) পারদির্শতার অভীক্ষা (**Achievement Test**) কোন পাঠ্যক্রম বা তার অংশ বিশেষের পাঠ শেষ হলে শিক্ষার্থীরা তার কতটা আয়ও করতে পেরেছে তা পরীক্ষা করার জন্য যে উপায় অবলম্বন করা হয় তাই হল পারদর্শিতার অভীক্ষা। পারদর্শিতার অভীক্ষাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন -

(i) আদশায়িত অভীক্ষা (ii) শিক্ষককৃত অভীক্ষা

যে অভীক্ষা পরিকল্পিতভাবে পরিসংখ্যান শাস্ত্রের কষ্টিপাথরে বিচার করা হয় এবং যার আদর্শমান আছে। শিক্ষককৃত অভীক্ষা সবসময় পরিসংখ্যান শাস্ত্রের দ্বারা যাচাই করা হয় না এবং এর কোন আদর্শমান থাকে না।

(খ) মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষা (**Psychological Test**) : অভীক্ষার্থীর মানসিক বৈশিষ্ট্য গুলি যে অভীক্ষার দ্বারা পরিমাপ করা হয় তাকে মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষা বলা হয়। যেমন বুদ্ধির অভীক্ষা, আগ্রহের অভীক্ষা ইত্যাদি। এই অভীক্ষাগুলি সাধারনত আদর্শায়িত হয়ে থাকে। এই অভীক্ষার প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে শিক্ষা পরিকল্পনা রচনা করা এবং শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক নির্দ্দেশনা প্রদান সহজ হয়।

লিখিত পরীক্ষা (Written Test): এখানে বিষয়ভিত্তিক কিছু প্রশ্ন শিক্ষার্থীর সামনে রাখা হয়। শিক্ষার্থী এই প্রশ্নগুলির উত্তর লিখিত ভাবে দেয়। প্রশ্নের উত্তর পরীক্ষা করে মান নির্ধারন করা হয়। এই ধরনের পরীক্ষায় তিন ধরনের প্রশ্ন থাকে - (i) রচনাধর্মী প্রশ্ন (ii) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও (iii) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন,

(ঘ) মৌখিক পরীক্ষা (**Oral test**) : এখান প্রশ্ন ও উত্তর মৌখিকভাবে উপস্থাপন করা হয়। এই পরীক্ষার দ্বারা উচ্চারনের নির্ভুলতা, গুছিয়ে কলার ক্ষমত, জ্ঞানের গভীরতা, পঠন ক্ষমতা ও সপ্রতিভতা প্রভৃতির মূল্যায়ন করা হয়।

(ঙ) দুর্বলতা নির্নায়ক অভীক্ষা (**Diagnostic Test**): শিক্ষার্থীদের দুর্বলতা ও ত্রুটিপাঠবিষয়ে কতটা রয়েছে তা জানার জন্য এই অভীক্ষা ব্যবহৃত হয়। পাঠ্যবিষয়গত ত্রুটি কোথায় ও কি পরিমান রয়েছে তা যেমন জানা যায়, তেমনি কেন এই দুর্বলতা রয়েছে তাও জানা যায়।

(২) নিরক্ষনমূলক কৌশল (Observation) : ব্যক্তির বাহ্যিক আচরন সম্পর্কে অবগত করাকে নিরক্ষীন বা পর্যবেক্ষন বলে। এখানে বাস্তব পরিস্থিতিতে পর্যবেক্ষন করে আচরন লিপিবদ্ধ করা হয়। এই আচরনের পরিপ্রেক্ষিতে কোন ব্যক্তি বা দল সম্পর্কে মূল্যায়ন করা হয়। নিরক্ষীয় কৌশলকে গুনগত পরিমাপক স্কেল বলা যেতে পারে। নিরীক্ষন কৌশলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল--

(ক) অতীত সংক্রান্ত তথ্য (Annecdotal Record) অতীত সংক্রান্ত তথ্যলিপি বলতে বোঝায় কোনো ঘটনাকে ঘটায় সময় তা পর্যবেক্ষন করে তার বিবরন লিপিবদ্ধ করা। এটি একটি পর্যবেক্ষন সংক্রান্ত তথ্যসংগ্রহের কৌশল এর দ্বারা বিভিন্ন নির্দিষ্ট করা বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধীয় তথ্য লিপিবদ্ধ করা যায়। নির্দিষ্ট কোন ঘটনা ঘটবার পর বা শিক্ষার্থীদের দ্বারা সম্পাদিত কোনো কর্মের মাধ্যমে তার আচরনের পরিবর্তনকে সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ননা ও লিপিবদ্ধ করা হয় অ্যানেকডোটাল। লিপিবদ্ধ করা তথ্যকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি ও বিকাশকে ত্বরান্বিত করা যায়।

(খ) চেকলিস্ট (Check - List) : মূল্যায়নের পর্যবেক্ষন কৌশলের একটি উপকরন হলে চেকলিস্ট। এখানে শিক্ষার্থীর আচরনের উপর ভিত্তিকরে কিছু প্রশ্ন বা পদের তালিকা তৈরী করা হয়। কোন ঘটনা ঘটাবার সময় শিক্ষক এই তালিকাটি পূর্ণ করেন। এখানে কোন বক্তব্য বা মন্তব্য পেশের সুযোগ নেই। শুধুমাত্র হ্যাঁ বা না দ্বারা আচরনের পরিবর্তনকে চিহ্নিত করা হয়। এখানে গুনগত পরিমাপের কোন সুযোগ নেই।

(গ) রেটিং স্কেল (Rating Scale) : সাধারনত: রেটিং স্কেল বলতে বোঝায় একজনের দ্বারা অন্যজনের বিচারকরণ। এর সাহায্যে শিক্ষার্থীর বাহ্যিকভাবে প্রকাশ্যে বৈশিষ্ট্যগুলি পরিমাপ করা হয়। এই ধরনের পরিমাপে শিক্ষার্থীর মধ্যে বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য কি পরিমাপে বিকাশ লাব করেছে তা বোঝানোর জন্য একটি ক্রমর্বধমান স্কেলের দ্বারা অবস্থান নির্দ্দেশ করা হয়। শিক্ষার্থীর বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্যকে শিক্ষক পর্যবেক্ষন করেন এবং নিজস্ব বিবেচনা অনুযায়ী একটি স্কেলে তার মাত্রা নির্দ্দেশ করেন। এখানে শিক্ষার্থীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষন করার জন্য তার উদ্দেশ্যে একটি বিবৃতি দেওয়া থাকে যাতে শিক্ষার্থী তার মতামত চিহ্নিত করতে পারে।

(ঘ) সমাজমিতি (Sociometry): এর জনক হলেন J.L.Moreno, 1953 সালে Moreno সোসিওমেট্রির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন- "The inquiry into th evolution and organization of groups and the position of individuals within them" সমাজের চোখে ব্যক্তির অবস্থান পরিমাপ করার কৌশলকে সমাজমিতি বলে। যে অভীক্ষার দ্বারা এটি কার্যকরী রূপ লাভ করে তাকে সমাজমিতি অভীক্ষা বলে। সমাজমিতি অভীক্ষা দলের অন্তর্ভূক্ত সদস্যদের মধ্যে আন্ত:সম্পর্ক চিত্রের আকারে প্রকাশ করে। এর উদ্দেশ্য হল রেখার দ্বারা সংগঠিত দলের সদস্যদের মধ্যে একের প্রতি অন্যের আর্কষন ও বিকর্ষন চিহ্নিত করা এবং মন্তব্য করা। সমাজমিতি প্রস্তুত করার একাধিক পদ্ধতি আছে। যার মধ্যে M.L.Northeray এর পদ্ধতিটি বহুল প্রচলিত।

(৩) নিজস্ব মতামত প্রকাশ (Self-Repoting) এই পদ্ধতিতে ব্যক্তি তার নিজের আচরন বা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করে। এই পদ্ধতিটি পুরোপুরি ব্যক্তিগত। এর সাহায্যে ব্যক্তির আগ্রহ। সংগতিবিধান, মনোভাব, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি মূল্যায়ন করা যায়।

এই কৌশলকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) প্রশ্নাবলী (Questionnaire)

(খ) সাক্ষাৎকার (Interview)

(গ) ব্যক্তিগত দিনলিপি (Personal Dairy)

(ঘ) আত্মজীবনী (Autobiography)

(ক) প্রশ্নাবলী (Questionnaire) : প্রশ্নাবলী একটি নিদ্দির্ষ্ট বিষয় বা বিশেষ কোন মানসিক বৈশিষ্ট্য পরিমাপের জন্য তৈরী করা হয় এবং এতে একগুচ্ছ প্রশ্ন থাকে যার উত্তর শিক্ষার্থীকে লিখতে বা চিহ্নিত করতে হয়। প্রবনতা, আগ্রহ, ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তিসত্তার প্রলক্ষন, প্রতিন্যাল ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য আহরনে এটি বহুল প্রচলিত কৌশল এই ধরনের কয়েকটি আদর্শায়িত প্রশ্নাবলী হল -

(i) Woodworth Personal Data Sheet (ii) Minnesota Teachen Attitude Inventery

(খ) সাক্ষাৎকার (Interciew) সাক্ষাৎকারের ক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীর সামনে বসে প্রত্যক্ষভাবে পরিমাপ করেন। সাক্ষাৎকার হল নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে আলাপ আলোচনা বা প্রশ্ন-উত্তরের সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ করা। এছাড়া শিক্ষার্থীর আচার-আচরন, বাচনভঙ্গি, দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদি পর্যবেক্ষন করে নানা ধরনের তথ্য সংগ্রহ করেন।

(গ) ব্যক্তিগত দিনলিপি (Personal Dairy) শিশুর রসবোধ, আগ্রহ, দৃষ্টিভঙ্গী, ব্যক্তিগত ও সামাজিক সমস্যা ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক ধারনা গঠনের জন্য ব্যক্তির দিনলিপির উপযোগিতা অনস্বীকার্য, সাধারনত দিনলিপিতে ব্যাক্তির একান্ত ব্যক্তিগত তথ্য লিপিবদ্ধ থাকে যা অন্য কোনো পদ্ধতি দ্বারা জানা সম্ভব নয়।

(ঘ) আত্মজীবনী (Autobiography) আত্মজীবনী থেকে ব্যক্তি সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়। ব্যক্তির পছন্দ- অপছন্দ, চিন্তাধারা জীবনদর্শন ব্যক্তিত্বের সংগঠন, হাতের লেখা ভাষার উপর দখল প্রভৃতি সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়।

(৪) প্রতিফলন সংক্রান্ত কৌশল (Projective Test): এই ধরনের অভীক্ষায় শিক্ষার্থীর সামনে কোনো শব্দ, অর্থহীন ছবি, বহু অর্থবোধক ছবি বা অসম্পূন বাক্য দেওয়া হয়। যার উপর অভীক্ষার্থীকে প্রতিক্রিয়া করতে বলা হয়। শিক্ষার্থীর প্রতিক্রিয়াগুলি বিশ্লেষন করে শিক্ষার্থীর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করা হয়। প্রতিফলন অভীক্ষাকে ছয়টি ভাগে ভাগে করা হয় : সংযোগমূলক গঠনমূলক, সম্পূর্নকরন, নির্বাচনভিত্তিক, ভাবমূলক এবং উপকরনের সাহায্যে খেলা। এখানে পরোক্ষভাবে ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করা হয়। ব্যক্তির আবেগ ও আভ্যন্তরীন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানার ক্ষেত্রে খুবই কার্য্যকর।

ব্যক্তির সব বৈশিষ্ট্যগুলি সবরকম মূল্যায়ন কৌশল দ্বারা পরিমাপ করা সম্ভব নয়। কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য যেমন বুদ্ধি, প্রবনতা, পারদর্শীতা ইত্যাদি অভীক্ষার দ্বারা সততা, ধৈর্য্য মেজাজ কর্মপদ্ধতি ইত্যাদি পর্যবেক্ষন বা নীরক্ষণের দ্বারা এবং একান্ত ব্যক্তিগত তথ্য, নিজের সম্পর্কে ধারনা ইত্যাদি সম্পর্কে জানার জন্য স্বীয় মতামত কৌশল ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত, সামগ্রিকভাবে ব্যক্তিত্ব পরিমাপ, মানসিক দ্বন্দ, মানসিক জট ইত্যাদি জানার জন্য প্রতিফলন কৌশল ব্যবহার অধিকতর কার্যকরী।

চতুর্থ একক মূল্যায়নের সাথে জড়িত বিষয়সমূহ

সার্বিক ও নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন (Continuous and Comprehensive Evaluation)

চিরাচরিত পরীক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার্থীর মুখস্থ করার ক্ষমতার উপর জোর দিয়ে এসেছে, স্কুল পাঠ্য বিষয়গুলির উপর অনুমানভিত্তিক কিছু প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করে লিখে আসা পরীক্ষা ব্যবস্থা বলতে এই রকম একটি ছবি ভেসে ওঠে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীন মূল্যায়ন সম্ভব নয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন ও কমিটি পরীক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি দুর করার লক্ষ্যে সুপারিশ করেছে এবং বহির্মূল্যায়নের ওপর গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেছে। মুদালিয়ার কমিশনের (Mudaliar Commission 1952-53) মতে মূল্যায়ন কেবলমাত্র বিষয়গত পারদর্শিতা পরিমাপ করে না, বিষয় বর্হিভুত ক্ষেত্রগুলি যেমন - মনোভাব, আগ্রহ, আর্দশ, চিন্তার দিক, স্বাস্থ্য, কাজের অভ্যাস এবং সামাজিক অভিব্যক্তিও এর অন্তর্ভূক্ত। এই শিক্ষা কমিশন সুপারিশ করে যে-- প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য উপযুক্ত নথিপত্রের ব্যবস্থা করতে হবে এবং শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত মূল্যায়নের সময় আন্ত:পরীক্ষার ফলাফলকে গুরুত্ব দিতে হবে। কোঠারি কমিশন (Kothari Commission 1964-66) মূল্যায়নের নতুন দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োগ করার কথা বলা হয়েছে। কমিশনের বিচারে বিদ্যালয় দ্বারা পরিচালিত আভ্যন্তরীন মূল্যায়নের গুরুত্ব বোর্ড পরিচালিত বহির্মূল্যায়নের চেয়েও বেশী, বিদ্যালয় কর্তৃক আভ্যন্তরীন মূল্যায়নের গুরুত্ব দিতে হবে, মূল্যায়ন শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশের ধারাকে বিচার করে, মূল্যায়ন শিক্ষা-ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং শিক্ষার লক্ষের সাথে ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত।

১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে (National Policy of Education, 1986) বলা হয়েছে যে CCE (Continuous and Comprehensive Evaluation) বিদ্যালয়ে দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করতে হবে, যার প্রধান উদ্দেশ্য হল - শিক্ষার্থীর মানসিক চাপ কাটানো, মূল্যায়নকে নিয়মিত ও পদ্ধতি মাফিক করা, সৃজনশীল শিক্ষনের জন্য শিক্ষকদের সুযেগ করে দেওয়া এবং নির্নায়ক কৌশল প্রয়োগ করা ইত্যাদি। ১৯৯৭ সালে Report of the Task Force on The Role and Status of the Board of Secondary Education এ সার্বিক ও নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রচলন করার ক্ষেত্রে পরীক্ষা নিয়ামক পর্ষদগুলোকে অগ্রণী ভূমিকা নেবার কথা বলা হয়েছে।

তাই বলা যায় যে কেন্দ্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ (Central Board of Secondary Education - CBSE) এর নেতৃত্বে সারাদেশে বিদ্যালয় স্তরে 'সার্বিক ও নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন' ব্যবস্থা প্রচলন করার উদ্দ্যোগ গ্রহন শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। সার্বিক ও নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন হল শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশে যাচাই করার বিদ্যালয়কেনিন্দ্রক একটি সুষ্ঠ এবং মনোবিজ্ঞান সম্মত ব্যবস্থা।

এর দ্বারা ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে পাঠ্যক্রমিক এবং সহ-পাঠ্যক্রমিক বিষয় মূল্যায়নের সাথে সাথে তাদের কৃতিত্ব এবং যোগ্যতা সমূহ নির্নয় করা হয়।

শিশুর জ্ঞান আহরন ও তা বোঝার এবং সেই জ্ঞান যথার্থ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার ক্ষমতার নিয়মিত ও ব্যাপক মূল্যায়ন করার কথা শিক্ষা অধিকার আইন (Right to Education. Act - 2009) ২০০৯ এ বার বার আলোচিত হয়। অর্থাৎ শিক্ষার্থী বিভিন্ন বিষয়ে যতটুকু শিখেছে তা প্রয়োগ করতে পারছে কিনা - নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ন যেন সেই বিষয়ে স্বচ্ছ ধারনা দেয় (RTE Act - 2009)

এখানে নিরবচ্ছিন্ন (Continuors) কথাটির দ্বারা বোঝানো হচ্ছে যে মূল্যায়ন শিক্ষন (Teaching) শিখন (Learning) পদ্ধতির বাইরে কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং একটি শিক্ষাবর্ষের পুরো সময় ধরে চলতে থাকা সার্বিক শিক্ষন-শিখন কর্মসূচির এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং শিক্ষন- শিখনের সাথে নিরবচ্ছিন্নভাবে মূল্যায়নও চলতে থাকবে।

অন্যদিকে সার্বিক (Comprehensive) কথাটি বলতে বোঝানো হচ্ছে যে এই মূল্যায়ন ব্যবস্থা শিক্ষার্থীর বৃদ্ধি ও বিকাশে বিষয়গত (Scholastic) এবং ষিয় সহযোগী (Co-Scholastic) সমস্ত ক্ষেত্রেরই সুস্পষ্ট ধারনা দেবে।

সার্বিক ও নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন শিক্ষার্থীর বৃদ্ধি ও বিকাশেক নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলির অগ্রগতির ধারনা দেয় --

♦ জ্ঞান, ♦ বোধ, ♦ প্রয়োগ, ♦ বিশ্লেষন ক্ষমতা, ♦ বিচারকরণ ক্ষমতা ও ♦ সৃজনী ক্ষমতা।

এই মূল্যায়ন ব্যবস্থা শিক্ষাকে পরীক্ষা নির্ভর না করে সার্বিক শিখনকে উৎসাহ দেয়, এর ফলে শিক্ষার্থীরা বাস্তব জীবনের বিভিন্ন গুন ও দক্ষতার অধিকারী হবে এবং সেইসাথে জীবনের নানা প্রতিদ্বন্দিতায় এরা অংশ গ্রহন করতে সমর্থ হবে।

সার্বিক ও নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন ব্যবস্থার উদ্দেশ্য

সার্বিক ও নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন ব্যবস্থার উদ্দেশ্যগুলি হল --

♦ শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক, অনুভূতিমূলক, মন:সঞ্চালনমূলক দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

♦ শিক্ষার্থীর মানসিক চাপ মুক্ত করা।

♦ শিক্ষার্থীর মুখস্ত নির্ভরতা কমানো এবং তার চিন্তাশক্তিকে উজ্জীবিত করা।

♦ শিক্ষার্থীর বছর-ব্যাপী বৃদ্ধি ও বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি সম্বন্ধে শিক্ষন-শিখন চলাকালীন ধারনা প্রদান করা।

♦ নিয়মিত ত্রুটি নির্নয়ের মাধমে প্রতিকারমূলক শিক্ষনের আয়োজন করা।

♦ কাঙ্খিত লক্ষ্যে শিক্ষার্থীর আচরনকে চালিত করা।

♦ শিক্ষা কার্যক্রমের সামাজিক উপযোগিতা, কার্যকারিতা এবং গুরুত্ব নির্ধারন করা।

♦ শিক্ষন-প্রক্রিয়াকে পরিবেশ এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক করে তোলা।

♦ সৃজনশীল শিক্ষনের জন্য শিক্ষকদের সুযোগ করে দেওয়া।

সার্বিক ও নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্য সমূহ

♦ এই মূল্যায়ন অবিরাম ও নির্দিষ্ট সময় অন্তর চলতে থাকে।

- একটি নির্দিষ্ট কোর্স বা একটি নির্দিষ্ট সময় শেষ করে অন্তিম মূল্যায়ন করা হয়।
- শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের সার্বিক মূল্যায়ন করার লক্ষ্যে বিষয়মূলক (Scholastic) এবং বিষয় - সহযোগী (Co-scholastic) ক্ষেত্রগুলি মূল্যায়ন করা হয়। বিষয়গত ক্ষেত্রগুলির মধ্যে থাকছে বাংলা, ইংরাজি, বিজ্ঞান, ভূগোল ইত্যাদি পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত বিভিন্ন বিষয়গুলি। অন্যদিকে বিষয় সহযোগী ক্ষেত্রের মধ্যে থাকছে জীবন শৈলীর শিক্ষা যেমন - সহ পাঠ্যক্রনিক বিষয় সমূহ, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি ধরনের শিক্ষা।

সার্বিক ও নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়নের গুরুত্ব

সার্বিক ও নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন শিক্ষার্থীর দুর্বলতা নির্নয়ে সহায়ক হয় এবং সেই দুর্বলতাগুলি প্রতিকারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে সার্বিকভাবে সমৃদ্ধ করে তোলে। সার্বিক ও নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়নে পুরো শিক্ষাবর্ষ জুড়ে শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের ধারাবাহিক পর্যবেক্ষন ও নথিবন্ধনকরন হয়। সার্বিক ও নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়নের শিক্ষাক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, যেমন -

- কার্যকরী শিক্ষন পরিকল্পনা গ্রহনে শিক্ষককে সাহায্য করে।
- শিক্ষার্থীর বিষয়মূলক ও বিষয়-সহযোগী ক্ষেত্রগুলির সার্বিক অগ্রগতির অবিরাম তথ্য যোগান দেয়।
- শিক্ষার্থীর নির্দিষ্ট কোন ক্ষেত্রে শিখন সক্ষমতা বা দুর্বলতার চিত্র শিক্ষকের কাছে স্পষ্ট করে তুলে ধরে।
- শিক্ষার্থীও নিজের শিখন অগ্রগতি বা দুর্বলতার জায়গাগুলি চিহ্নিত করেত পারে।
- শিক্ষার্থীর প্রবনতা, আগ্রহ ও সামর্থ্যের ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করা যায় যা পরবর্তী সময়ে শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনায় কাজে লাগে।
- ভবিষ্যতে শিক্ষার্থীর বিশেষ কোনো ক্ষেত্রে সর্বাধিক সাফল্য আসতে পারে-এ ব্যাপারে আগাম সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়।

সার্বিক ও নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়নের বিভিন্ন দিক

সার্বিক ও নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন ব্যবস্থা শিক্ষার্থীর অগ্রগতির ধারনা দিতে সক্ষম। শিক্ষন উদ্দেশ্য কতটা সফল হল তার যাচাই শ্রেনিকক্ষের ভিতরে ও বাইরে শিক্ষার্থীর সম্পাদিত আচরনের নিরীখে বলে দেওয়া সম্ভব এই মূল্যায়ন ব্যবস্থায়।

কাজেই শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর নিম্নলিখিত সামর্থগুলি মূল্যায়িত হওয়া প্রয়োজন।

- বিভিন্ন বিষয়ের কাঙ্খিত দক্ষতাগুলি আয়ত্ব করতে পারে।
- বিভিন্ন বিষয়ে নির্দিষ্ট মান অবধি দক্ষতা অর্জন।
- ব্যক্তিগত দক্ষতা, আগ্রহ ও দৃষ্টিভঙ্গি গঠন।
- সুস্থ এবং উৎপাদনক্ষম জীবন সম্পর্কে ধারনা অর্জন ও তা অজর্নে সমর্থ হওয়া।
- শিক্ষার্থীর শিখন আচরন এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ঘটিত অবিরাম পরিবর্তনগুলি বোঝার ক্ষমতা অর্জন।
- স্বাধীনভাবে ও দলবদ্ধভাবে কাজ করার মানসিকতা।
- বিভিন্ন সামাজিক এবং পরিবেশমূলক পরিস্তিতি ও সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা অর্জন
- সমাজ পরিবেশমূলক প্রকল্পে অংশ গ্রহন।
- অধিতবিদ্যাকে জীবন-ব্যাপী লালন, পুর্নগঠন। পুনর্মাজন এবং প্রয়োজন পরিবর্তন করার দক্ষতা অর্জন।

সুতরাং মূল্যায়ন ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যাতে শিক্ষার্থীর শুধুমাত্র আয়ত্বীকৃত জ্ঞানের পরিমাপ না করে সার্বিক বিকাশের ধারনা দেবে। সার্বিক ও নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন ব্যবস্থায় বিষয়-ভিত্তিক মূল্যায়নের পাশাপাশি বিষয়-বহির্ভূত বিভিন্ন মানবীয় গুনাবলীর মূল্যায়ন করা হয়। এর জন্য প্রয়োজন প্রত্যেক শিক্ষর্থীর জন্য একটি প্রবহমান রেকর্ড, এই রেকর্ড নথিভুক্ত থাকবে শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের নিরবচ্ছিন্ন চিত্র। সপ্তাহে কিংবা মাসান্তে অভীক্ষা এবং পরীক্ষা গ্রহনের মাধ্যমে শিক্ষক অনবরত পরিকল্পনা করবেন শিক্ষার্থীর শিকন অভিজ—তাকে পূর্ন করতে আর সেই সাথে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি সম্পর্কে ধারনা পেতে, এবং এটা করা যেতে পারে মূলত গঠনমূলক (Formative) এবং অন্তিম (Summative) মূল্যায়নের সাহায্যে।

মূল্যায়ন ও পরিমাপের পার্থক্য (Differentiate between Evaluation and Measurement)

মূল্যায়ন (Evaluation)	পরিমাপ (Measurement)
১) মূল্যায়ন হল সার্বিক নিরবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া ও উপায় যার দ্বারা শিক্ষার কাঙ্খিত উদ্দেশ্যগুলো পরিমাণগত এবং গুণগতভাবে কতখানি বাস্তবায়িত বা অর্জিত হয়েছে তা জানা যায়।	১) পরিমাপ হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা শিক্ষার্থীর বিশেষ কোন শিক্ষাগত বৈশিষ্ট্যকে সাংখ্যমান দ্বারা প্রকাশ করা হয়।
২) শিক্ষায় মূল্যায়নের উদ্দেশ্য ব্যাপক।	২) শিক্ষায় পরিমাপের উদ্দেশ্য সংকীর্ণ।
৩) মূল্যায়নে শিক্ষার্থীর ক্রমোন্নতি হার নির্ণয় করা হয়।	৩) পরিমাপে শিক্ষার্থীর শুধুমাত্র চূড়ান্ত অবস্থা নির্ণয় করা হয়।
৪) মূল্যায়ন দ্বারা শিক্ষার্থীর সামাজিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক, শিক্ষাগত ইত্যাদি বিষয় জানা যায়।	৪) পরিমাপ দ্বারা মূলত শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত বিষয় জানা যায়।
৫) মূল্যায়ন মূলত একটি দীর্ঘসময়ব্যাপী এবং জটিল প্রক্রিয়া।	৫) পরিমাপ মূলত একটি কম সময়ব্যাপী এবং অপেক্ষাকৃত সরল প্রক্রিয়া।
৬) মূল্যায়ন হল একপ্রকার মূল্যগত বিষয়।	৬) পরিমাপ মূল্যগত বিচার নয়।
৭) মূল্যায়ন হল একটি নিরবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া।	৭) পরিমাপ হল একটি সাময়িক প্রক্রিয়া।
৮) মূল্যায়নে শিক্ষার্থীর শিখন সামর্থ্যতা ছাড়াও শিক্ষন-শিখন প্রক্রিয়াও সামগ্রিকভাবে বিশ্লেষণ করা হয়।	৮) পরিমাপে কেবলমাত্র শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব ও পারদর্শিতাই কেবল প্রাধান্য দেওয়া হয়।
৯) মূল্যায়ন পাঠ্যক্রমের পুনর্বিন্যাসে সহায়তা করে, শিক্ষন-পদ্ধতির বাস্তবগ্রাহ্যতা উপলব্ধিতেও মূল্যায়ণ সহায়ক।	৯) পরিমাপ পাঠ্যক্রমের গুণবিন্যাস শিক্ষন পদ্ধতির বাস্তবগ্রাহ্যতা উপলব্ধিতে মূল্যায়ণের মত নিবিড়ভাবে সহায়ক নয়।

১০)মূল্যায়ন দ্বারা শিক্ষার্থীর শিখন ফলাফল প্রায়শই বিবরণাত্মক বা আংশিক বিবরণাত্মক ও বিশ্লেষণাত্মক হতে পারে যার দ্বারা এক বাএকাধিক সিদ্ধার্ন্ত গ্রহণ করা যায়।	১০) পরিমাপ দ্বারা সাংখ্যমানের সাহায্যে শিখন ফলাফলকে প্রকাশ করা হয়। যেমন একজন শিক্ষার্থী বাংলা বিষয়ে 1st unit test এ ১০০ নম্বরে ৫৭ পেয়েছে।
১১) মূল্যায়ন প্রক্রিয়া পরিমাপের উপর নির্ভরশীল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে।	১১) পরিমাপ মূল্যায়মের উপর অপেক্ষাকৃত কম নির্ভরশীল।
১২) মূল্যায়ন গুণগত এবং পরিমাণগত তাই মূল্যায়ণ কেবলমাত্র নৈর্ব্যক্তিক নয়।	১২) পরিমাপ যেহেতু পরিমাণগত ধারণা তাই পরিমাপ সর্বদাই নৈর্ব্যক্তিক হয়ে থাকে।
১৩) মূল্যায়ন কেবলমাত্র পরিমাপের দ্বারা প্রাপ্ত তথ্যের উপর নির্ভরশীল নয়। সুতরাং মূল্যায়ণ দ্বারা প্রাপ্ত তথ্যের বহুমুখী বিশ্লেষণ সম্ভবপর হয়।	১৩) পরিমাপের অন্যতম শর্ত হল নির্ভরযোগ্যতা। তাই পরিমাপ দ্বারা প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ বহুমুখী করা সম্ভবপর নয়।
১৪) মূল্যায়ন দ্বারা পরিমাপের জন্য তথ্য সংগ্রহ করা হয় না।	১৪) পরিমাপ দ্বারা মূল্যায়ণের জন্য তথ্য সংগ্রহ করা হয়।
১৫) মূল্যায়নে শিক্ষার্থীর সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য অনেক কৌশল ব্যবহার করা হয়।	১৫) পরিমাপে শিক্ষার্থীর সম্পর্কীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য মূলত শিক্ষককৃত পরীক্ষা, অভীক্ষা ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।
১৬) মূল্যায়ন শুধুমাত্র শিক্ষামূলক তথ্য বর্ণনা করে না বরং কি কি পদক্ষেপ এর পরিপ্রেক্ষিতে গ্রহণ করা যেতে পারে তা জানতে সহায়তা করে।	১৬) পরিমাপ কেবলমাত্র শিক্ষামূলক তথ্যের বর্ণনা দেয়।
১৭) মূল্যায়ন তথ্যের সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে সহায়তা করে।	১৭) পরিমাপ তথ্যের সংগ্রহে ব্যবহার হয়।
১৮) মূল্যায়ন দ্বারা একজন শিক্ষার্থী সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ তথ্য পেতে সহায়তা করে।	১৮) পরিমাপ দ্বারা একজন শিক্ষার্থীর আংশিক তথ্য পাওয়া যায়।

মূল্যায়ন পরিমাপ থেকে উন্নত প্রক্রিয়া
(Evaluation is a Better Process than Measurement)

মূল্যায়ন হল একটি প্রচেস্টা ও উপায় যার সাহায্যে কাঙ্খিত উদ্দেশ্যগুলো পরিমাণগত ও গুণগতভাবে কতখানি বাস্তবায়িত হয়েছে তা জানা যায়।

অপরদিকে পরিমাপ হল কোনো নির্দিস্ট নিয়মে বিভিন্ন বস্তুতে সংখ্যা প্রদানের এমন এক প্রক্রিয়া যা বস্তুর বৈশিস্ট্যের পরিমাণগত দিক নির্দেশ করে, অর্থাৎ কোনো বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে কি পরিমাণ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য রয়েছে তার সংখ্যামূলক বর্ণনা হল পরিমাপ।

- মূল্যায়ন সর্বদা শিক্ষার লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে অগ্রসর হয় কিন্তু পরিমাপ শিক্ষার উদ্দেশ্যকেন্দ্রিক নয়।
- মূল্যায়ন ব্যাপক ধারণা এবং মূল্যায়ণ পরিমাণগত ও গুণগত কিন্তু পরিমাপ কেবলমাত্র পরিমাণগত বিষয় নিয়ে যুক্ত ।
- মূল্যায়ন একটি ব্যাপক ধারণা ও মূল্যায়ণের মাধ্যমে শারীরিক, মানসিক, বৌদ্ধিক, প্রাক্ষোভিক ইত্যাদির সার্বিক মূল্যায়ন করা সম্ভব কিন্তু পরিমাপের দ্বারা মূলত শিক্ষার্থীর জ্ঞানের পরিবর্তন পরিমাপ করা হয়।
- বিভিন্ন মানবিক গুণাবলী সমূহ যেমন দয়া, ভাললাগা, সহমর্মিতাবোধ ইত্যাদি পরিমাপ পদ্ধতি দ্বারা মাপা যায় না কিন্তু মূল্যায়নের বিভিন্ন কৌশল দ্বারা এগুলোর পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়।
- শিক্ষার্থীদের শিখন ক্ষমতা মাপার জন্য বিভিন্ন কৌশলগুলো কার্যকারিতা মূল্যায়নের মাধ্যমে অবহিত হওয়া যায়। তাই মূল্যায়ন অনেক বেশি উন্নত কিন্তু পরিমাপে যে সুযোগ নেই।
- মূল্যায়ন একটি দীর্ঘসময়ব্যাপী প্রক্রিয়া যার দ্বারা শিক্ষার্থীর অনেক বিষয়ের গভীরে যাওয়া যায় কিন্তু পরিমাপ স্বল্প সময়ব্যাপী প্রক্রিয়া এবং এর দ্বারা নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে জানা যায় এবং সমস্যার মূল গভীরে যাওয়া যায়।

সুতরাং বলা যায় যে মূল্যায়ন পরিমাপ থেকে একটি উন্নত প্রক্রিয়া।

পরীক্ষা ও অভীক্ষার মধ্যে পার্থক্য (Difference between Examination and Test)

শিক্ষায় পরীক্ষা বা Examination এবং অভীক্ষা বা Test এদুটি শব্দ প্রায়শই ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

পরীক্ষা (Examination) হল একটি বিষয় যার দ্বারা শিক্ষার্থীর নানাবিধ বিষয়ে শিখন পারদর্শিতা যাচাই করা হয়।

অপরদিকে অভীক্ষা (Test) হল এমন কার্যাবলী যা নির্দিষ্ট কোনো সময়ে ব্যক্তির নির্দিষ্ট কোনো আচরণ পরিমাপে ব্যবহৃত হয়। পরীক্ষা ও অভীক্ষার মধ্যে পার্থক্য হল নিম্নরূপ:

পরীক্ষা (Examination)	অভীক্ষা (Test)
১) পরীক্ষা একটি পদ্ধতি যার দ্বারা শিক্ষার্থীর শিখন পরিমাপ করা হয়।	১) অভীক্ষা একটি কৌশল যার দ্বারা শিক্ষার্থীর বিশেষ কোন একটি শিখন পরিমাপ করা হয়।
২) পরীক্ষায় প্রশ্ন হল এর মূল চালিকাশক্তি।	২) অভীক্ষায় Item বা পদ হল এর মূল চালিকা শক্তি।
৩) পরীক্ষা মূলত শিক্ষামূলক বিষয়ে ব্যবহার করা হয়।	৩) অভীক্ষা মূলত মনোবিজ্ঞানমূলত ও শিক্ষামূলক উভয় বিষয়েই ব্যবহার করা হয়।
৪) শিক্ষার্থীদের শিক্ষাস্তরের ব্যবধান বুঝতে পরীক্ষা ব্যবহার করা হয়।	৪) শিক্ষার্থীদের মনোবৈজ্ঞানিক কোন বিষয়ের গভীরতা বুঝতে ইহা ব্যবহত হয়।
৫) পরীক্ষা সকল শিক্ষার্থীর জন্য প্রয়োজ্য।	৫) বিশেষ শ্রেণির শিক্ষার্থীর জন্য প্রযোজ্য।

৬) পরীক্ষার দ্বারা প্রাপ্ত ফল শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক পার্থক্য, ক্রম নির্ণয়ে সহায়তা করে।	৬) অভীক্ষা কোন বিষয়ে শিক্ষার্থীর বিশেষ ঝোঁক জানতে সহায়তা করে।
৭) পরীক্ষার দ্বারা সমগ্র শিক্ষন-শিখন পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।	৭) অভীক্ষার দ্বারা কোন একটি বিশেষ বিষয় সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।
৮) পরীক্ষার দ্বারা পাঠ্যক্রম এর পরিবর্তন, পরিমার্জন করা সম্ভবপর হয়।	৮) অভীক্ষা দ্বারা পদ বা Item এর পরিবর্তন পরিমার্জন সম্ভবপর হয়।
৯) পরীক্ষার জন্য মনোবৈজ্ঞানিক প্রয়োজনীয়তা বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়।	৯) পদ নির্বাচনে মনোবৈজ্ঞানিকের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।
১০) পরীক্ষার জন্য সময় বেশি প্রয়োজন হয়।	১০) অভীক্ষার জন্য তুলনামূলক অনেক কম সময় প্রয়োজন হয়।
১১) আদর্শায়ন বা Standardisation এর বিষয়টি সর্বদা পরীক্ষার সাথে জড়িত নাও থাকতে পারে।	১১) আদর্শায়ন বা Standardisation এর বিষয়টি সাধারণত অভীক্ষার সাথে জড়িয়ে থাকে।
১২) পরীক্ষার ফলাফলকে বিশ্লেষণ করার জন্য জটিল Statistics এর ব্যবহার সাধারণত করা হয় না।	১২) অভীক্ষার ফলাফলকে বিশ্লেষণ করার জন্য প্রায়শই জটিল Statistics এর ব্যবহার করা হয়।

আদর্শ মূল্যায়ণের হাতিয়ারের বৈশিষ্ট্য
(Characteristics of a Good Evaluation Tool)

একটি আদর্শ মূল্যায়ণের হাতিয়ারের যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত তা নিম্নে সংক্ষেপে দেওয়া হল—

১) যথার্থতা : যথার্থতা বলতে বুঝায় যে উদ্দেশ্যের জন্য হাতিয়ার (Tool)টি ব্যবহার করা হচ্ছে তা পরিমাপ সঠিকভাবে করতে পারছে কিনা। ধরা যাক ইংরেজি পরীক্ষার প্রশ্ন দ্বারা শিক্ষার্থীর শিখন নিজস্বতা ও ব্যাকরণের দক্ষতা যাচাই করা হল উদ্দেশ্য, সেই ইংরেজীর প্রশ্নগুলো সত্যিকারের অর্থে সেই উদ্দেশ্যপূরণে সমর্থ কিনা— এই বিষয়টি।

২) নির্ভরযোগ্যতা : নির্ভরযোগ্যতা বলতে বুঝায় বারংবার ব্যবহারের ফলে একই ফল আসবে। নির্ভরযোগ্যতা বলতে বুঝায় কতটা সঠিকভাবে তা পরিমাপ করে। ধরাযাক অষ্টম শ্রেণির গণিত বিষয়ের একটি প্রশ্ন দুটি বিদ্যালয়ে প্রয়োগ করা হল এবং তার মাধ্যমেই উঠে আসবে দুটি বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির গণিত বিষয়ের শিক্ষার্থীর গণিতের পারদর্শিতা।

৩) নৈর্ব্যক্তিক : নৈর্ব্যক্তিকতার দুটি দিক রয়েছে — (ক) নৈর্ব্যক্তিক পদ (পদগুলোর নৈর্ব্যক্তিকতা)
(খ) নৈর্ব্যক্তিক স্কোরিং বা নম্বর প্রদান (নম্বর প্রদান নৈর্ব্যক্তিকতা)

(ক) নৈর্ব্যক্তিক পদ (পদগুলোর নৈর্ব্যক্তিকতা) : নৈর্ব্যক্তিক পদ বলতে বুঝায় শিক্ষার্থীর শিখন সামর্থ্যতাকে পরিমাপ করার প্রশ্ন বা Item গুলো হল শিক্ষকের ব্যক্তিগত প্রভাবমুক্ত। তাই Item গুলোতে সঠিক নির্দেশ

থাকবে (যেমন শব্দের সংখ্যা), দ্ব্যর্থবোধক প্রশ্ন থাকবে না, বিভ্রান্তিকর প্রশ্ন থাকবে না। Itemগুলির নির্বাচন এমনভাবে করতে হবে যার দ্বারা মেধাবী—মাঝারি—নিম্ন মেধাযুক্ত সকল স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য সমান সুযোগ থাকে প্রদর্শন করার।

(আ) নৈর্ব্যক্তিক স্কোরিং বা নম্বর প্রদান হতে ব্যক্তিগত প্রভাবমুক্ত অর্থাৎ পরীক্ষকের ব্যক্তিগত প্রভাব নম্বর প্রদানের কাজ করবে না।

৪) ব্যবহারিকতা ও প্রয়োগশীলতা : মূল্যায়ণের হাতিয়ারটি যাতে সহজেই ব্যবহার ও প্রয়োগ করা যায় সে বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে হবে।

৫) সুস্পষ্টতা : মূল্যায়ণের হাতিয়ারটি ব্যবহার করার জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকতে হবে সহজে তা ব্যবহার করা যায়।

৬) সহজ পরিচালনা : মূল্যায়ণের হাতিয়ারটি এমন হওয়া উচিত যাতে তা সহজেই যে কোনো শিক্ষক অন্য শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে পরিচালনা করতে পারে।

৭) সহজ স্কোরিং : পরীক্ষক যাতে সহজে স্কোরিং করতে পারে অর্থাৎ হাতিয়ারটি ব্যবহারের পরিপ্রেক্ষিতে অসুবিধা ছাড়া ব্যবহার করতে পারেন।

পঞ্চম একক মূল্যায়নের ধারা

মূল্যায়নের ধারা :

মূল্যায়নের ধারা বা Trend ক্রমপরিবর্তিত এবং ক্রমবিবর্তিত কারণ মূল্যায়ন আর পূর্বের ন্যায় পাঠ্যক্রমিক দিকে সীমাবদ্ধ নেই বরং বর্তমানে মূল্যায়ন শিক্ষার্থীর পাঠ্যক্রমিক দিক এবং সহপাঠ্যক্রমিক দিক —এই দুটি বিষয়েই গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। তাই মূল্যায়নের ধারাও আর পূর্বের ন্যায় শ্রেণিকক্ষের চার দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই এবং কেবলমাত্র শিক্ষকের উপর নির্ভরশীল নয়। শিক্ষার্থী আর পূর্বের ন্যায় নিষ্ক্রিয় শ্রোতা নয় বরং সে সক্রিয় ও সম্পূর্ণভাবে শিক্ষকের উপর নির্ভরশীল নয়। তাই পূর্বের ন্যায় মূল্যায়ন আর নেই এবং তার ধারা পরিবর্তিত। সেই পরিবর্তিত ধারার মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ নিম্নে সংক্ষেপে দেওয়া হল—

ক) প্রশ্নব্যাঙ্ক (Question Bank)
(খ) গ্রেডস্ বা গ্রেড প্রথা (Grading System)
(গ) সর্বাত্ম বিবরণীলিপি (Comulative Record Card)
(ঘ) কেস স্টাডি (Case Study)
(ঙ) মূল্যায়ণে কম্পিউটারের ব্যবহার (Use of Computer in Evaluation)
(চ) লিখিত পরীক্ষা, মৌখিক পরীক্ষা ও ব্যবহারি পরীক্ষা (Written Examination, Oral Examination and Practical Examination).
(ছ) যান্মাসিক প্রথা (Semester System)

(ক) প্রশ্নব্যাঙ্ক (Question Bank) : পরীক্ষা ব্যবস্থায় প্রশ্নপত্র রচনা সংক্রান্ত যে সব ত্রুটি বিচ্যুতি আছে তার সংস্কার সাধনের জন্য প্রশ্নব্যাঙ্ক বা ভাণ্ডার নামক এক নতুন ধারণার সংযোজন হয়েছে বর্তমান মূল্যায়ন ব্যবস্থায়। প্রশ্নব্যাঙ্ক হল সংগ্র পাঠ্যাংশের থেকে সম্ভাব্য যত ধরনের প্রশ্ন হতে পারে তার একটি পূর্ণাঙ্ক পুস্তক আকারের গ্রন্থ শিক্ষার্থীদের জন্য তৈরি করে দেওয়া । এই প্রশ্ন ভাণ্ডার দীর্ঘ সময় নিয়ে অনেক শিক্ষকের সম্মিলিত ফসল। শুধু সংখ্যার দিক থেকে নয়, প্রশ্নের যতরকম প্রকারভেদ থাকা সম্ভব তারও হদিসও পাওয়া যায় প্রশ্ন ভাণ্ডারে।

প্রশ্ন ব্যাঙ্ক নির্মাণের প্রণালী (Steps of Preparing Question Bank) :

প্রশ্নকর্তা নিয়োগ : কয়েকজন দক্ষ প্রশ্নকর্তার একটি কমিটি নিয়োগ করা হয় এবং এরা সারা বৎসর প্রশ্ন পত্র তৈরি, প্রশ্নের মান উন্নয়ন ও পরিমার্জনার কাজে নিযুক্ত।

পাঠ্যক্রম বিশ্লেষণ : পাঠ্যক্রমের বিভিন্ন অংশকে একক ও উপ-এককে বিভক্ত করা হয় এবং পাঠ্যসূচির গুরুত্ব হিসাবে প্রশ্ন নির্বাচিত করা হয়।

প্রশ্নের পরিমার্জন : পাঠ্যসূচি অনুযায়ী প্রশ্নের নম্বর স্থির করা হয় ও প্রয়োজনে পরিমার্জন করা হয়।

একক বিভাজন : পাঠ্যসূচি হিসাবে প্রশ্নগুলোকে বিভিন্ন একক অনুযায়ী বিভাজন করা হয়।

প্রশ্নের প্রকাশন ও সংস্কার : প্রশ্নের ব্যাঙ্ক প্রকাশিত হলেই হয় না, ভাষা, নতুন প্রশ্নের সংযোজন ইত্যাদির উপর নির্ভর করে প্রশ্নব্যাঙ্ক প্রকাশিত হবার পরও প্রশ্নের সংস্কার হতে থাকে।

প্রকৃত পরীক্ষার প্রশ্ন : পরীক্ষার প্রশ্নকর্তা প্রশ্নব্যাঙ্ক থেকে সমগ্র পাঠ্যসূচির প্রতিনিধিত্ব থাকে, এমন প্রশ্ন নির্বাচন করে প্রকৃত পরীক্ষার প্রশ্ন নির্বাচিত করা হয়।

প্রশ্নব্যাঙ্কের গুরুত্ব (Importance of Question Bank) :

- প্রশ্নের মান ভাল হওয়ায় মূল্যায়ণ সহজ হয়।
- শিক্ষন-শিখন নির্দিষ্ট কাঠামোয় চলতে সুবিধা হয় সেহেতু প্রতিটি বিভাগ ও উপ-বিভাগে প্রশ্ন কি হবে তা জানা থাকে।
- প্রশ্নকর্তার অভাবে ও প্রশ্নব্যাঙ্ক সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে।
- শিক্ষার্থীর প্রস্তুতি উদ্দেশ্যমূলক ও সুনির্দিষ্ট প্রকৃতির হয়ে থাকে।
- প্রশ্নব্যাঙ্ক দীর্ঘসময় ব্যবহার করা যায়।

প্রশ্নব্যাঙ্কের সীমাবদ্ধতা (Limitations of Question Bank) :

- অভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা প্রশ্নব্যাঙ্ক তৈরি করা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার।
- অনেক সময় ভাষার অস্পষ্টতা থেকে যায়।
- শিক্ষন-শিখন ব্যবস্থা একটি বাঁধাধরা ধাচের মধ্যে চলে আসে।
- প্রশ্নব্যাঙ্কের মুদ্রন ও পুর্নমুদ্রন আর্থিক খরচ সাপেক্ষ ব্যাপার।
- কেবলমাত্র প্রশ্নব্যাঙ্কের দ্বারা মূল্যায়ণ করা সম্ভবপর নয়।

গ্রেডস্ বা গ্রেড প্রথা (Grading System) :

- গ্রেড মানে হল স্তর বা মানসূচক স্তর। এই প্রথায় প্রাপ্ত নম্বরকে সরাসরি গ্রেডে রূপান্তর করা হয়।

একটি বিষয়ের নম্বর শূন্য থেকে একশ নম্বরের ভিত্তিতে প্রাপ্ত নম্বরকে নির্দিষ্ট একটি গ্রেডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মূলত নম্বর সাতটি গ্রেডে বিভক্ত করা হয় । যেমন—

নম্বর	গ্রেড
৯০ বা তার বেশি	0
৮০—৮৯	A
৭০—৭৯	B
৬০—৬৯	C
৫০ —৫৯	D
৪০—৪৯	E
৩৯ বা তার কম	F

যখন একশ নম্বরের ভিতরে প্রাপ্ত নম্বরকে সাতটি গ্রেডভুক্ত করা হয় তখন সেটি 7-point scale, আবার পাঁচটি গ্রেডভুক্ত করা হলে সেটি 5-point scale অবশ্য 7-point scale বা 5-point scale গ্রেডিকরণ দলকে ভিত্তি করে হয়। নম্বরের ভিত্তিতে একটা দণ্ডিত মান ধরা হয়।

নিম্নে উদাহরণ হল নম্বরের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের পাঁচটি গ্রেডভুক্ত করা। যেমন ডিস্টিংশন, প্রথম বিভাগ, দ্বিতীয় বিভাগ, তৃতীয় বিভাগ এবং অকৃতকার্য।

নম্বর	গ্রেড
৭৫ - এর উপর	A
৬০—৭৪	B
৪৫—৫৯	C
৩৩—৪৪	D
৩৩-র নীচে	E

ইহা ছাড়াও গ্রেড অন্য আরো বেশি বা কম বিভাগে বিভক্ত করা যায়।

গ্রেডিং প্রথার গুরুত্ব (Importance of Grading System) :

- শিক্ষার্থীর উপর মানসিক চাপ কম পড়ে।
- গ্রেডিং প্রথার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে অতি সহজেই তুলনা করা যায়।
- গ্রেডিং এর মাধ্যমে খুব তাড়াতাড়ি শিক্ষার্থীর দুর্বলতা ও সক্ষমতা নির্ণয় করা যায়।
- শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা সহজ হয়।
- নম্বর পাবার যে আতঙ্ক তা গ্রেডিং প্রথা হ্রাস করতে পারে কারণ শিক্ষার্থীদের উপর মানসিক চাপ বর্তমানে থাকে যে তাদের পূর্ণমান পেতে হবে।

গ্রেডিং প্রথার সীমাবদ্ধতা (Limitation of Grading System) :

- শিক্ষার্থীদের মধ্যে নেতিবাচক মানসিকতার সৃষ্টি করে। কারণ এটা একটি নির্দিষ্ট মানের মধ্যে গ্রেড সমান ধরা হয়।
- প্রকৃত নম্বর জানা যায়।
- প্রকৃত মূল্যায়ন গ্রেডিং এর মাধ্যমে সম্ভবপর নয়।
- অনেক প্রতিষ্ঠান গ্রেডিং এর পরিবর্তে নম্বরকে গুরুত্ব প্রদান করে ফলে শিক্ষার্থীর ভর্তির সমস্যা সৃষ্টি হয়।
- সমস্ত শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক কেবলমাত্র গ্রেডিং পছন্দ করেন না।

গ) সর্বাত্ম বিবরণী লিপি (Comulative Record Card) :

♦ মূল্যায়নলব্ধ তথ্য নথিবন্ধ করার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হল সর্বাত্ম বিবরণী লিপি বা Cummulative Record Card)। এটি হল শিক্ষার্থীর সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে জানার একটি বিশ্বাসযোগ্য তথ্যের ভাণ্ডার।

সর্বাত্ম বিবরণী লিপি (উদাহরণ) —

প্রাথমিক তথ্য

শিক্ষার্থীর নাম :

লিঙ্গ :

শ্রেণি :

বিভাগ :

ক্রমিক সংখ্যা :

শিক্ষার্থীর মাতা নাম :

শিক্ষার্থীর পিতার নাম :

শিক্ষার্থীর জন্মের তারিখ :

শিক্ষার্থীর রক্তের গ্রুপ :

শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ে প্রথম ভর্তির তারিখ :

শিক্ষার্থীর বর্তমান বিদ্যালয়ে ভর্তির তারিখ :

শিক্ষার্থীর পারিবারিক তথ্য

শিক্ষার্থীর মাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা :

শিক্ষার্থীর মাতার পেশা :

শিক্ষার্থীর পিতার শিক্ষাগত যোগ্যতা :

শিক্ষার্থীর পিতার পেশা :

শিক্ষার্থীর ভাই-বোনের সংখ্যা :

শিক্ষার্থীর পারিবারিক মাসিক আয় (আনুমানিক) :

শিক্ষার্থীর শারীরিক তথ্য

বৎসর	২০১৬		২০১৭		২০১৮		২০১৯		২০২০	
উচ্চতা										
ওজন										
দৃষ্টি শক্তি	ডান	বাম	ডান	বাম	ডান	বাম	ডান	বাম	ডান	বাম
শ্রবণ শক্তি	ডান	বাম	ডান	বাম	ডান	বাম	ডান	বাম	ডান	বাম
দাঁত										

হস্তব্যবহারের ক্ষমতা :—

(ডান হাত / বাম হাত)

বিশেষ কোন রোগ :—

অন্য বিশেষ কোন শারীরিক তথ্য :—

কোন রোগে আক্রান্ত বা হাসপাতালে ভর্তির ইতিহাস :—

মনোবৈজ্ঞানিক তথ্য

বুদ্ধি :

সৃজনক্ষমতা :

ব্যক্তিত্ব :

আগ্রহের ধরন :

বিশেষ প্রবণতা :

প্রেষণা :

অনুরাগ :

মনোযোগ :

বিদ্যালয়ে আচরণ সংক্রান্ত তথ্য

বৎসর	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০
উপস্থিতির শতকরা হার					
অনুপস্থিতির শতকরা হার					
সহপাঠীদের সাথে আচরণ					
শিক্ষকদের সাথে আচরণ					

শিক্ষার্থীর কোন সমস্যামূলক আচরণ

ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক তথ্য

বিশেষ পারদর্শিতার বিষয় :

বিষয়	বৎসর				
	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০

শিক্ষার্থীর বিশেষ কোন স্মরণীয় পারদর্শিতা :—

পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য

পরীক্ষার ফলাফল

বিষয়	শ্রেণি				
	ষষ্ঠ	সপ্তম	অষ্টম	নবম	দশম
বাংলা					
ইংরেজি					
গণিত					
ইতিহাস					
ভূগোল					
ভৌতবিজ্ঞান					
জীববিজ্ঞান					
কর্মশিক্ষা					
মোট					

শ্রেণি শিক্ষকের পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য :

প্রধান শিক্ষকের পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য :

সর্বাত্ম বিবরণীলিপি তৈরির সতর্কতা

- প্রাপ্ত তথ্যগুলো যাতে নির্ভরযোগ্য হয় তা খেয়াল রাখতে হবে।
- প্রাপ্ত তথ্যগুলো যাতে যথার্থ হয় তা খেয়াল রাখতে হবে।
- প্রাপ্ত তথ্যগুলোর ব্যবহার যাতে নৈর্ব্যক্তিক হয় তা খেয়াল রাখতে হবে।
- তথ্যগুলোর উৎস যাতে বিশ্বাসযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য হয় তা খেয়াল রাখতে হবে।
- তথ্যগুলোর সঠিক লিপিবদ্ধকরণ ও সংরক্ষণ প্রয়োজনীয়।

সর্বাত্ম বিবরণী লিপির গুরুত্ব (Importance of Cumulative Record Card) :

- শিক্ষার্থীর ভবিষ্যত শিক্ষাক্রমের জন্য ইহা প্রয়োজনীয়।
- শিক্ষার্থী সম্পর্কে পরিস্কার ও সর্বাত্মক ধারণা পেতে সহায়তা করে।
- শিক্ষার্থীর সক্ষমতা ও দুর্বলতা নির্ণয় করা সহজ হয়।
- পাঠ্যবিষয় নির্বাচন, শিক্ষণ-শিখনে সহায়ক।
- সমস্যামূলক শিক্ষার্থীদের নির্ণয় করা যায়।

সর্বাত্ম বিবরণী লিপির সীমাবদ্ধতা (Limitation of Cumulative Record Card) :

- তথ্যের সংগ্রহ সঠিক না হলে ভুল ব্যাখ্যা হয় শিক্ষার্থী সম্পর্কে।
- শিক্ষক যদি দায়িত্ব নিয়ে তথ্যের লিপিবদ্ধ না করেন তা হলে ভুল তথ্য আসে।
- সর্বদা প্রাপ্ত তথ্য নৈর্ব্যক্তিক হয় না।
- এই লিপি সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রেও অসুবিধা রয়েছে।
- সমস্ত তথ্য লিপিবদ্ধ করা জটিল প্রক্রিয়া করেন শিক্ষকতার পেশায় বদলি একটি নিয়মিত প্রক্রিয়া, ফলে তথ্যের প্রাপ্তিতে ও লিপিবদ্ধকরণে অসুবিধা হয়।

ঘ) কেসস্টাডি (Case Study)

কেস স্টাডি দ্বারা সমগ্র ব্যক্তিকে বিচার করা হয় এবং এর দ্বারা অনুসন্ধানের মাত্রা অত্যন্ত গভীর। কেস স্টাডি কোন অভিযোজন সংক্রান্ত সমস্যাভুক্ত শিক্ষার্থী, ব্যতিক্রমী শিক্ষার্থীদের উপর বেশি পরিমাণে করা হয়। কারো সম্পর্কে নিবিড়ভাবে জানতে হলে কেস স্টাডি অত্যন্ত প্রচলিত একটি বিষয়। কেস স্টাডি কী জন্য করা হচ্ছে সে লক্ষ্য সামনে রেখেই কেস স্টাডি পরিচালনা করতে হবে অর্থাৎ যে লক্ষ্যকে সামনে রেখে কেস স্টাডি করা হচ্ছে সে লক্ষ্য পূরণের জন্য তথ্য যাতে সম্পূর্ণ ও পরিপূর্ণ হয় তা খেয়াল রাখতে হবে।

কেস স্টাডিতে সংগৃহীত তথ্যের ধরন:

প্রাকৃতিক পরিবেশ : ইহা বলতে বুঝায় ব্যক্তির বসবাসের স্থান, কি শহর, না গ্রাম, না বস্তি, না ফ্ল্যাট ইত্যাদি।

সামাজিক পরিবেশ : চারপাশের প্রতিবেশি কি ধরনের। ব্যবসায়ী, শ্রমিক, চাকুরিজীবি ইত্যাদি।

অর্থনৈতিক পরিবেশ : প্রতিবেশিদের আর্থিক আয় কি রকম, আয় কি স্থায়ী না অস্থায়ী ইত্যাদি। উচ্চ আয়ভুক্ত, মধ্যআয়ভুক্ত, নিম্ন আয়ভুক্ত প্রতিবেশি ইত্যাদি।

সাংস্কৃতিক পরিবেশ : প্রতিবেশিদের জীবনধারা, আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, খাদ্যাভাস ইত্যাদি।

পরিবারের প্রাথমিক তথ্য : পিতা, মাতা, ভাই, বোন-এর শারীরিক স্বাস্থ্য, পরিশ্রমী না অলস প্রকৃতির, পরিবারের সদস্য সংখ্যা ইত্যাদি।

পরিবারের সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা : কি ধরনের শিক্ষিত, উচ্চশিক্ষিত, অল্প শিক্ষিত, নিরক্ষর ইত্যাদি।

পরিবারের ধরন : পরিবারটি কি ধরনের। যৌথ পরিবার না একক পরিবার ইত্যাদি।

পরিবারের সামাজিক অবস্থান : খুব পরিচিত পরিবার সবার কাছে না কেউই বেশি জানে না।

ব্যক্তির মানসিক ক্ষমতা : উচ্চবুদ্ধি সম্পন্ন, নিম্নবুদ্ধি সম্পন্ন ইত্যাদি।

প্রাক্ষোভিক তথ্য : ব্যক্তি কি হতাশাগ্রস্ত প্রকৃতির, না কি আত্মবিশ্বাসী, না উগ্রমেজাজের, না কি একদম চুপচাপ, নাকি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, না কি ভীতু প্রকৃতির ইত্যাদি।

আদর্শ ও মনোভাব সম্পর্কিত তথ্য : কি ধরনের আদর্শ, মতবাদ, নীতিবোধে বিশ্বাসী ইত্যাদি।

অস্বাভাবিক আচরণ সংক্রান্ত তথ্য : ব্যক্তি কোন ধরনের অস্বাভাবিক আচরণ করেছে কি অতীতে বা বর্তমানে কোন অস্বাভাবিক আচরণ সংক্রান্ত সমস্যায় যুক্ত কিনা ইত্যাদি।

ইহা ছাড়া কেস স্টাডির তথ্য, ইহার নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে হতে পারে। তাই কেস স্টাডির তথ্য সংগ্রহের বিষয়সমূহ আরোও বিস্তৃত বা সংকুচিত হতে পারে।

কেস স্টাডির গুরুত্ব (Importance of case study) :

- শিক্ষার্থীর পিতা-মাতা, ভাইবোন এবং অন্যান্য নিকট আত্মীয়স্বজন, বন্ধুদের সাথে সম্পর্কের ধারণা কেস স্টাডি থেকে পাওয়া যায়।
- শিক্ষার্থীর প্রবণতা, আগ্রহ, চাহিদা ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য কেস স্টাডি থেকে জানা যায়।
- শিক্ষার্থীর আচরণগত সমস্যা সম্পর্কে জানা যায়।
- শিক্ষার্থীর শিক্ষাসংক্রান্ত সক্ষমতা ও দুর্বলতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।
- শিক্ষার্থী কোনো ধরনের রোগ অতীতে বা বর্তমানে আক্রান্ত কি না তাও জানা যায়।

কেস স্টাডির সীমাবদ্ধতা (Limitation of Case Study) :

- প্রায়শই সমস্যার মূলে প্রবেশ করা সম্ভবপর হয় না।
- সমস্ত ধরনের তথ্য সঠিকভাবে সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয় না।
- সব ধরনের তথ্য সমান গুরুত্ব পায় না অথচ কোন তথ্যকেই অবহেলার দৃষ্টিতে দেখা উচিত নয়।
- বেশি পরিমাণে কেস স্টাডি তৈরি করা কঠিন কারণ শিক্ষকগণ বর্তমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দ্বারা আরোপিত বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকেন।

- যার উপর কেস স্টাডি করা হচ্ছে তার মূল সমস্যা অনেক সময়ই কেন্দ্রিভূত হয় না।

একটি কেসস্টাডির উদাহরণ এর Format / খসড়া নিম্নে প্রদান করা হল —

কেসস্টাডির বিষয় : বিদ্যালয়ে অনুপস্থিতি

প্রাথমিক তথ্য

- বিদ্যালয়ের নাম :
- শিক্ষার্থীর নাম :
- শিক্ষার্থীর জন্মতারিখ :
- শিক্ষার্থীর লিঙ্গ :
- শিক্ষার্থীর মাতার নাম :
- শিক্ষার্থীর পিতার নাম :
- শিক্ষার্থীর মাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা :
- শিক্ষার্থীর পিতার শিক্ষাগত যোগ্যতা :
- শিক্ষার্থীর মাতার পেশা:
- শিক্ষার্থীর পিতার পেশা :
- শিক্ষার্থীর ভাই-বোনের সংখ্যা :
- শিক্ষার্থীর স্থায়ী বসবাসের ঠিকানা :

শিক্ষার্থী সম্পর্কিত তথ্য

- শিক্ষার্থীর ক্রমিক নং :
- শিক্ষার্থীর শ্রেণি ও শাখা:
- শিক্ষার্থীর বিগত বছরের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর :
- শিক্ষার্থীর বিশেষ কোন রোগ :
- শিক্ষার্থীর হাসপাতালে ভর্তির কোন ইতিহাস :
- শিক্ষার্থীর বিশেষ প্রবণতা :
- শিক্ষার্থীর বিশেষ কোন আগ্রহের ক্ষেত্র :
- শিক্ষার্থীর বিগত একবছরে উপস্থিতির শতকরা হার :

নির্দিষ্ট সমস্যা ও সমাধানের উপায়

কেসস্টাডির উদ্দেশ্য : শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ে অনুপস্থিতির সমস্যা নির্ধারণ করা ও সমাধান করা, শিক্ষার্থীকে শিক্ষার মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনা।

সমস্যার প্রকৃতি : শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্যা।

সমস্যার কারণ :

অ)

আ)

ই)

ঈ)

সমস্যা দূরীকরণের উপায় :

অ)

আ)

ই)

ঈ)

গৃহীত পদক্ষেপ গ্রহণের ফলাফল :

ঙ) মূল্যায়নে কম্পিউটারের ব্যবহার (Use of Computer in Evaluation) :

মূল্যায়নে কম্পিউটার বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে এবং তার কিছু মুখ্য হল নিম্নরূপ

- মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন বিষয়ে কম্পিউটারকে ব্যবহার করা যায়।
- মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজন নির্দিষ্ট তথ্যের এবং কম্পিউটারের দ্বারা তা সহজেই ব্যবহার করা যায় ও সংরক্ষিত করা যায়।
- শিক্ষক দ্বারা অনিচ্ছাকৃতভাবে ও মূল্যায়ণ প্রক্রিয়ায় ভুল হতে পারে কিন্তু কম্পিউটারে সে বিষয় নেই।
- নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের মূল্যায়নে কম্পিউটার অত্যন্ত দ্রুত কার্য সম্পন্ন করতে পারে কারণ কেবলমাত্র নির্দিষ্ট কিছু ধাপের মাধ্যমেই উত্তরের মূল্যায়ন করা সম্ভবপর হয়।
- দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষার্থীর তথ্য বারংবার ব্যবহার করা যায় ও অন্যকে প্রদান করা যায়।
- মূল্যায়নের শ্রমের অপচয় কমাতে কম্পিউটার সাহায্য করে থাকে।
- মূল্যায়ন সংক্রান্ত তথ্যের সংরক্ষণের জন্য বিরাট স্থান প্রয়োজন কিন্তু কম্পিউটারের ব্যবহারের দ্বারা সামান্য স্বল্প স্থানে বিপুল পরিমানে তথ্যের সংরক্ষণ করা যায়।
- কম্পিউটারে নির্ভুলতা ও যথার্থতা মানুষ থেকে অনেক বেশি।
- শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সংক্রান্ত দুর্বলতা চিহ্নিতকরণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বারংবার কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়।
- মূল্যায়নে কম্পিউটারের ব্যবহার শিক্ষন-শিখনকে সুগম করে থাকে।

(চ) লিখিত পরীক্ষা, মৌখিক পরীক্ষা ও ব্যবহারিক পরীক্ষা

(Written Examination, Oral Examination and Practical Examination)

লিখিত পরীক্ষা : এই পরীক্ষায় প্রদত্ত প্রশ্নপত্রে শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্ধারিত প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন কয়েকটি ভাগে বিভক্ত হতে পারে :— রচণাত্মক প্রশ্ন (Eassy Type Questions), সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (Short Answer Type Questions), অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (Very Short Answer Type Questions), নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন (Objective Type Questions).

মৌখিক পরীক্ষা : এই ধরনের পরীক্ষায় শিক্ষক শিক্ষার্থীর মুখোমুখি বসে তাকে সরাসরি প্রশ্ন করেন এবং শিক্ষার্থী ও তার উত্তর সরাসরি শিক্ষকের কাছে দিয়ে থাকে। এখানে লিখিত পরীক্ষার মত অনেক দীর্ঘসময়ের প্রয়োজন হয় না।

ব্যবহারিক পরীক্ষা : যে সমস্ত বিষয়গুলোতে তাত্ত্বিক পঠন পাঠন হয় সেইসব বিষয়ে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষাই যথেষ্টকিন্তু যেসব বিষয়ে হাতে কলমে বা পরীক্ষাগারে পরীক্ষা নীরিক্ষার মাধ্যমে পঠন পাঠন হয় অর্থাৎ ব্যবহারিক দিকও গুরুত্ব পায় তাতে ব্যবহারিক পরীক্ষা অনস্বীকার্য। এই ধরনের পরীক্ষায় শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সামনে আরোপিত কার্য হাতে-কলমে প্রদর্শন করে দেখায় এবং শিক্ষক বা পরীক্ষকরা সমস্ত কিছু পর্যবেক্ষণ করে মূল্যায়ণ করে থাকেন।

লিখিত পরীক্ষার গুরুত্ব (Importance of Written Examination) :

- লিখিত পরীক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন সহজ হয়।
- লিখিত পরীক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীদের বিস্তৃতভাবে মূল্যায়ন করা সম্ভবহয়।
- শিক্ষক তার শিক্ষণ পদ্ধতি শিক্ষার্থীর নিকট কতটা বোধগম্য হয় তা উপলব্ধি করতেপারেন।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতার মানসিকতা বৃদ্ধি পায়।
- ব্যক্তিগত প্রভাব থেকে এই পরীক্ষা অনেকটাই মুক্ত বা অনেকটাই নৈর্ব্যক্তিক কারণ নম্বর পেতে হলে শিক্ষার্থীদের অধ্যয়ন করতে হয় গভীরভাবে এবং পরীক্ষায় লিখতে হয় দীর্ঘক্ষন ধরে।

লিখিত পরীক্ষার সীমাবদ্ধতা (Limitation of Written Examation) :

- যাদের স্মরণশক্তি ভাল কেবল তারাই মূলত পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করে থাকে।
- লিখিত পরীক্ষা সময় সাপেক্ষ দীর্ঘ ব্যাপার ফলে ক্লান্তি এই বিষয়ে বড় একটা বাধা।
- যাদের হাতের লেখার দ্রুততা বেশি কেবল তাদের জন্য সুবিধাজনক কারণ অনেক শিক্ষার্থী তাদের মন্থর গতির হাতের লেখার জন্য সম্পূর্ণ নম্বরের উত্তর করতে পারে না অথচ উত্তর তাদের জানা থাকে।
- শিক্ষার্থী সাজেশন বা সম্ভাব্য প্রশ্নের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে ফলে পাঠ্যবিষয় থেকে শিক্ষার্থীদের নিকট সাজেশন বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে।
- পরীক্ষার প্রশ্নের কাঠিন্যমান প্রশ্নকর্তার উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ প্রশ্ন কি সহজ-মাঝারি-কঠিন হবে তা। তাই এর দ্বারা মূল্যায়ন যথার্থ হয় না।

মৌখিক পরীক্ষার গুরুত্ব : (Impurtance of Oral Examination)

- যাদের হাতের লেখা মন্থর তাদের জন্য উপযোগী।
- নৈর্ব্যক্তিকতা বজায় রাখা সম্ভব কারণ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন করা হয়।
- কম ব্যয় সাপেক্ষ কারণ মুদ্রণ এর প্রয়োজন নেই প্রশ্নের।
- আনুমানিক উত্তরের সুযোগ কম থাকে।
- শিক্ষার্থীর বিষয়গত সক্ষমতা ও দুর্বলতা সম্পর্কে তাৎক্ষনিক ধারণা পাওয়া যায়।

মৌখিক পরীক্ষার সীমাবদ্ধতা (Limitation of Oral Examination)

- যে সমস্ত শিক্ষার্থী অর্ন্তমুখী তাদের পক্ষে মৌখিক পরীক্ষা অসুবিধাজনক।
- পরীক্ষক ইচ্ছা করলেই কাউকে চূড়ান্ত কঠিন প্রশ্ন বা চূড়ান্ত সহজ প্রশ্ন করতে পারেন।
- কোন শিক্ষার্থীর ঘাবড়ানোর স্বভাব আছে তাদের পক্ষে মৌখিক পরীক্ষা ভীতিমূলক ।
- হঠাৎ করে কোন প্রশ্নের উত্তর এত অল্প সময়ে তাৎক্ষনিকভাবে মনে নাও আসতে পারে।
- শিক্ষার্থীকে মৌখিক পরীক্ষার দ্বারা চূড়ান্তভাবে মূল্যায়ণ করা যায় না।

ব্যবহারিক পরীক্ষার গুরুত্ব (Importance of Practical Examination)

- শিক্ষার্থীরা তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক এই উভয় বিষয়েই গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে।
- শিক্ষার্থীরা হাতে-কলমে কাজের সুযোগ পায়।
- শিক্ষার্থীদের বিষয়ের প্রতি আগ্রহ ও মনোযোগ বৃদ্ধি পায়।
- শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তিসম্মস মানসিকতা বৃদ্ধি পায়।
- সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আত্মনির্ভরশীলতাও সক্রিয়তা বৃদ্ধি পায়।

ব্যবহারিক পরীক্ষার সীমাবদ্ধতা (Limitation of Practical Examination)

- নৈর্ব্যক্তিকতার অভাব রয়েছে। প্রশ্ন, উত্তরের ব্যাখ্যা, মূল্যায়ণ সমগ্র ব্যাপার পরীক্ষকের উপর নির্ভরশীল।
- পুনরাবৃত্তির সুযোগ কম এবং নির্ভরযোগ্যতাও কম।
- পাঠ্যসূচির অন্তর্গত ব্যবহারিক সব বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয় না ফলে ব্যবহারিক কাজে বিশেষ কিছু দিকই গুরুত্ব পায়।
- অনেক সময় দলগত কাজ দেওয়া হয় ফলে পৃথক পৃথক মূল্যায়নের সুযোগ থাকে না।
- যন্ত্রপাতি ও ল্যাবরেটরি কক্ষের অভাব প্রায় সময়ই লেগে থাকে।

(ছ) যান্মাষিক প্রথা (Semester System)

এই প্রথম সম্পূর্ণ কোর্সের সময়কালকে কয়েকটি যান্মাসিক বা ছয়মাস অন্তর অন্তর এককে ভাগ করে নেওয়া হয় এবং প্রত্যেকটি সেমিস্টার এর সময়সীমা ছয়মাস। যদি স্নাতককোর্স তিন বৎসরের হয় তবে মোট ছয়টি সেমিস্টার। আবার মাস্টার ডিগ্রি হলে দুবছর বা চারটি সেমিস্টার ইত্যাদি। প্রতিটি সেমিস্টার এর জন্য পাঠ্যক্রম নির্দিষ্ট থাকে এবং ছয়মাস অন্তর অন্তর প্রতি সেমিস্টার এর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রতিটি সেমিস্টার সম্পূর্ণ করা বাধ্যতামূলক এবং সবকটি সেমিস্টার মিলিয়ে চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করাহয়। বর্তমান উচ্চশিক্ষায় সেমিস্টার গ্রহণ অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি প্রথা। বর্তমানে বিদ্যালয়গুলোতে এর ধারণা অনুসরণ করা হয়।

যান্মাসিক প্রথার গুরুত্ব : (Importance of Semester System) :

- একই সাথে সম্পূর্ণ কোর্সের উপর মনোযোগ দিতে হয় না।
- শিক্ষার্থীকে সারা সেমিস্টার বাবদ তৎপর থাকতে হয় ফলে শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা বৃদ্ধি পায়।
- প্রতিটি সেমিস্টার হিসাবে মূল্যায়ণ হওয়ায়, শিক্ষার্থীর সক্ষমতা ও দুর্বলতা শিক্ষার্থী নিজে জানতে পারে এবং পরবর্তী সেমিস্টারগুলোতে ভালো প্রদর্শন করার সুযোগ থাকে।

- বিষয়বস্তু বা সমগ্র পাঠ্যক্রম যা এক সেমিস্টার এ থাকে তা আর পরের সেমিস্টার এ থাকে না ফলে শিক্ষার্থীরা অত্যধিক পড়ার চাপ থেকে মুক্ত থাকতে পারে।
- শিক্ষার্থী শিক্ষকদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া বৃদ্ধি পায় কারণ সময়সীমা ছয়মাস প্রতিটি সেমিস্টার হওয়ার ফলে শিক্ষার্থীদের অনেক কিছু জানার ও বোঝার থাকে। এর দ্বারা শিক্ষকরা শিক্ষন পদ্ধতির পরিমার্জন করতে পারেন।

ষান্মাসিক প্রথার সীমাবদ্ধতা (Limitation of Semester System) :

- এই প্রথা চালাতে গেলে যে পরিমাণ শিক্ষক দরকার তার অভাব রয়েছে।
- সম্ভাব্য ভিত্তিক প্রশ্ন পড়ার যে মানসিকতা শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রচলিত তার থেকে সেমিস্টার প্রথা দ্বারা ছয়মাস বিষয়ের উপর দখল তৈরি করে অনেকটাই কঠিন কাজ।
- সেমিস্টার প্রথা চালাতে গেলে যে পরিমাণ শিক্ষন দক্ষতা প্রয়োজন তা প্রায়শই শিক্ষকদের মধ্যে অভাব থাকে।
- পূর্বের সেমিস্টার এর বিষয় আর পুণরাবৃত্তি হয় না কিন্তু অনেক বিষয় শিক্ষার্থীরা আরোও গভীরভাবে ও পুনরায় জানতে চায়, কিন্তু এই প্রথায় এই সুযোগ নেই।
- শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের উপর চাপ অত্যধিক বিদ্যমান থাকে।

সুতরাং উপরিউক্ত ধারাগুলোর সাথে পরিচিত হবার মাধ্যমে ইহা জানা গেল যে মূল্যায়ণের ধারা ক্রম পরিবর্তিত এবং বর্তমানে মূল্যায়ণ যাতে সামগ্রিক, পরিমাণগত ও গুণগত উভয়ই হয় সেই বিষয়ও গুরুত্ব পাচ্ছে। মূল্যায়ণ বর্তমানে মনোবিদ্যা, প্রযুক্তিবিদ্যা, পরিসংখ্যান ইত্যাদি বিষয়ের দ্বারা প্রভাবিত হবার ফলে এর বহুমাত্রিকতা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে উত্তরোত্তর।

সারসংক্ষেপ

প্রথম একক : শিক্ষায় মূল্যায়ন

মূল্যায়ন হল একটি ধারাবাহিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রক্রিয়া যা শিক্ষার উদ্দেশ্যমুখী শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার সার্বিক ফলাফলের মান বিচার করে, এটি শিক্ষা প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। শিক্ষাগত মূল্যায়ন শিক্ষার্থীদের চাহিদা, অনুরাগ, ক্ষমতা ইত্যাদির এবং শিক্ষণের চেয়ে শিখনের উপর অধিক গুরুত্ব দেয়। মূল্যায়ন মানে শুধু শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ণ নয়, তা প্রকৃতপক্ষে পাঠ্যক্রমের এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট শিখনেরও মূল্যায়ন।

দ্বিতীয় একক : মূল্যায়নের স্বরূপ, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, প্রয়োজনীয়তা

মূল্যায়ন শিখন পদ্ধতি থেকে বিচ্ছিন্ন কোন বিষয় নয়। মূল্যায়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, প্রাক্ষোভিক সমস্ত ক্ষেত্রের সম্পাদিত আচরণ ধারারই মূল্য নির্ধারণ করা হয়। মূল্যায়নের উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর দ্বারা সম্পাদিত আচরণকে অতীতের প্রেক্ষাপটে বিচার করে তার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বিচারে মূল্য আরোপ করা। মূল্যায়ন শিক্ষার্থীর আচরণের গুণগত ও পরিমাণগত উভয় দিকের বিচার করে।

তৃতীয় একক : মূল্যায়নের প্রকারভেদ ও কৌশল

শ্রেণিকক্ষে নির্দেশদান বা পাঠদান শেষ হলে শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি মূল্যায়ন করার জন্য দুই ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় — গঠনমূলক মূল্যায়ন ও সামগ্রিক মূল্যায়ন। গঠনমূলক মূল্যায়ন শিক্ষার্থীদের অগ্রগতির নজর রাখে এবং পাঠদান চলাকালীন ধারাবাহিকভাবে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের সাফল্য ও ব্যর্থতা সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করে, অন্যদিকে সামগ্রিক মূল্যায়ন শিক্ষণ সমাপ্তে শিক্ষার্থীরা পূর্ব নির্দারিত লক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে কাঙ্খিত মান অর্জনে কতটা সক্ষম হয়েছে তা পরিমাপ করে। সুতরাং বলা যায় যে শিক্ষার মতো পরিকল্পিত কর্মসূচিতে গঠনমূলক ও সামগ্রিক মূল্যায়ণ — এই দুই ধরনের মূল্যায়নের প্রয়োজন রয়েছে।

মূল্যায়নে শিক্ষার্থীর সব ধরনের বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করা হয় এবং এই বৈশিষ্ট্যগুলো (দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, কৃষ্টিগত ও শিক্ষাগত বৈশিষ্ট্য) পরিমাপ করার জন্য যে কৌশলগুলো ব্যবহার করা হয় সেগুলো হল- অভীক্ষা, নিরীক্ষণ, নিজস্ব মতামত প্রকাশ এবং প্রতিফলন সংক্রান্ত কৌশল। বিদ্যালয়ে মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার সাহায্যে শিক্ষার্থীর পাঠ্যক্রমিক ও সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলির বিভিন্ন দক্ষতা পরিমাপ করা হয় এবং শিক্ষার্থীর সাফল্য ও ব্যর্থতার ক্ষেত্রগুলোকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা হয়।

চতুর্থ একক : মূল্যায়নের সাথে জড়িত বিষয়সমূহ

সার্বিক ও নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন হল শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশকে যাচাই করার বিদ্যালয়কেন্দ্রিক একটি সুষ্ঠ এবং মনোবিজ্ঞানসম্মত ব্যাবস্থা। এই মূল্যায়ন ব্যবস্থা শিক্ষাকে পরীক্ষা নির্ভর না করে সার্বিক শিখনকে উৎসাহ দেয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য হল নিয়মিত ত্রুটি নির্ণয়ের মাধ্যমে প্রতিকারমূলক শিক্ষণের আয়োজন করা এবং কাঙ্খিত লক্ষ্যে শিক্ষার্থীর আচরণকে চালিত করা। সার্বিক ও নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন ব্যবস্থায় বিষয়-ভিত্তিক মূল্যায়নের পাশাপাশি বিষয় বহির্ভূত বিভিন্ন মানবীয় গুণাবলী মূল্যায়ন করা হয়। এরফলে যে সমস্ত শিক্ষার্থীরা লেখাপড়ার ক্ষেত্রে দুর্বল কিন্তু অন্যদিকে যেমন-কলা, খেলা, সংগীত ইত্যাদি দিকে এগোনো তারা তাদের যোগ্যতা প্রদর্শন করার সুযোগ পায়।

পঞ্চম একক : মূল্যায়নের ধারা

মূল্যায়নের ধারা বা Trend ক্রমপরিবর্তিত এবং ক্রমবিবর্তিত কারণ মূল্যায়ন আর পূর্বের ন্যায় পাঠ্যক্রমিক দিকে সীমাবদ্ধ নেই বরং বর্তমানে মূল্যায়ণ শিক্ষার্থীর পাঠ্যক্রমিক দিক এবং সহপাঠ্যক্রমিক দিক —এই দুটি বিষয়েই গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। তাই মূল্যায়নের ধারাও আর পূর্বের ন্যায় শ্রেণিকক্ষের চার দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই এবং কেবলমাত্র শিক্ষকের উপর নির্ভরশীল নয়। শিক্ষার্থী আর পূর্বের ন্যায় নিষ্ক্রিয় শ্রোতা নয় বরং সে সক্রিয় ও সম্পূর্ণভাবে শিক্ষকের উপর নির্ভরশীল নয়।

অনুশীলনী

ক) ১ মানের প্রশ্ন : সর্বাধিক শব্দসংখ্যা ২০

১) মূল্যায়নের একটি উদ্দেশ্য লিখ।
২) মূল্যায়ন কি পরিমাণগত না গুণগত বিষয়, নাকি উভয় বিষয়ের সম্মিলিত একটি বিষয়?
৩) গঠনমূলক মূল্যায়ন কি ?
৪) পরিমাপ বলতে কি বুঝায়?
৫) কেস স্টাডি কি?

খ) ২ মানের প্রশ্ন : সর্বাধিক শব্দসংখ্যা ৪০

১) মূল্যায়ন কাকে বলে?
২) মূল্যায়নের তিনটি উদ্দেশ্য লিখ।
৩) গঠনমূলক মূল্যায়নের তিনটি বৈশিষ্ট্য লিখ।
৪) অভীক্ষা বলতে কি বুঝায়?
৫) গ্রেডিং সিস্টেম বলতে কি বুঝায়?

গ) ৪ মানের প্রশ্ন : সর্বাধিক শব্দসংখ্যা ১০০

১) মূল্যায়নের নীতিসমূহ লিখ।
২) শিক্ষায় মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা লিখ।
৩) সামগ্রিক মূল্যায়ন সম্পর্কে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর।
৪) মূল্যায়নকে কেন পরিমাপ থেকে উন্নত প্রক্রিয়া বলা হয়? সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর।
৫) মূল্যায়নে কম্পিউটারের ব্যবহার সম্পর্কে লিখ।

ঘ) ৫ মানের প্রশ্ন : সর্বাধিক শব্দসংখ্যা ১৫০

১) মূল্যায়নের ধাপসমূহ লিখ।
২) শিক্ষার লক্ষ্য ও মূল্যায়নের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর।
৩) মূল্যায়নের কিছু কৌশল সংক্ষেপে লিখ।
৪) একটি আদর্শ মূল্যায়নের হাতিয়ারের বৈশিষ্ট্য লিখ।
৫) যান্মাসিক প্রথা বা Semester System সম্পর্কে লিখ।

ঙ) ৬ মানের প্রশ্ন : সর্বাধিক শব্দসংখ্যা ২০০

বোধপরীক্ষণমূলক :

কেস স্টাডি দ্বারা সমগ্র ব্যক্তিকে বিচার করা হয় এবং এর দ্বারা অনুসন্ধানের মাত্রা অত্যন্ত গভীর। কেস স্টাডি কোন অভিযোজন সংক্রান্ত সমস্যাভুক্ত শিক্ষার্থী, ব্যতিক্রমী শিক্ষার্থীদের উপর বেশি পরিমাণে করা হয়। কারো সম্পর্কে নিবিড়ভাবে জানতে হলে কেস স্টাডি অত্যন্ত প্রচলিত একটি বিষয়। কেস স্টাডি পরিচালনা করতে হবে অর্থাৎ যে লক্ষ্যকে সামনে রেখে কেস স্টাডি করা হচ্ছে সে লক্ষ্য পূরণের জন্য তথ্য যাতে সম্পূর্ণ ও পরিপূর্ণ হয় তা খেয়াল রাখতে হবে।

১) কেস স্টাডিতে কি কি ধরনের তথ্য থাকে? ২) কেস স্টাডির গুরুত্ব সম্পর্কে লিখ। ২ + ৪ = ৬

একাদশ শ্রেণি : শিক্ষা বিজ্ঞান (Education)

Blue - Print

অধ্যায়	সর্বোচ্চ শব্দ সংখ্যা ২০ ক-বিভাগ মান-১	সর্বোচ্চ শব্দ সংখ্যা ৪০ খ -বিভাগ মান-২	সর্বোচ্চ শব্দ সংখ্যা ১০০ গ -বিভাগ মান-৪	সর্বোচ্চ শব্দ সংখ্যা ১৫০ ঘ -বিভাগ মান-৫	সর্বোচ্চ শব্দ সংখ্যা ২০০ ঙ-বিভাগ মান-৬
প্রথম অধ্যায়	১	১	১	১	প্রতিটি অধ্যায় থেকে বিষয় অর্ন্তভুক্ত করতে হবে। কোন ধরনের অধ্যায় ও অধ্যায়ের একককের পুনরাবৃত্তি বারবার চলবে না। ***
দ্বিতীয় অধ্যায়	১	১	--	--	
তৃতীয় অধ্যায়	১	১	১	১	
চতুর্থ অধ্যায়	১	১	১	--	
পঞ্চম অধ্যায়	১	১	--	১	
ষষ্ঠ অধ্যায়	১	১	১	--	
সপ্তম অধ্যায়	১	১	১	১	
অষ্টম অধ্যায়	১	১	১	--	
মোট প্রশ্ন এবং মান	৮ (১ ×৮)	১৬ (২ ×৮)	২৪ (৪ ×৬)	২০ (৫ ×৪)	১২ (৬ ×২)

*** (প্রশ্নের মান হতে পারে ২ + ২ + ২ / ১ + ১ + ২+ ২/১ + ২+ ৩/৩ + ৩ /২+ ৪ ইত্যাদি যা নির্ভর করবে বিষয়বস্তুর প্রকৃতির উপর।)

মোট নম্বর = ১০০ (প্রশ্ন: ৮০ + প্রজেক্ট: ২০)

Suggested Further Readings

প্রথম অধ্যায়

Durkheim, E. (1956) *Education and Sociology*. New York : The Free Press
Sharma, S.N. (1995). *Philosophical & Sociological Foundation of Education.* Herald Book Service : Faridabad

Web Source : http://www.plato.standford.edu/:standford Encyclopedia of Philosophy
ঘোষ, অ. (২০১১). *শিক্ষা বিজ্ঞানের দর্শন ও মূলতত্ত্ব।* কলকাতা : এডুকেশনাল এন্টারপ্রাইজার্স।

দ্বিতীয় অধ্যায়

Brunna. J. (1977). *The Process of Education.* USA : Harvard Univesity Press.
Gange, R. M. (1970). *The Conditions of Learning.* N.Y. Holt. New York : Rinehart & Winston Publishing House.
রায়, স. (১৯৯৩). *শিক্ষণ ও শিক্ষা - প্রসঙ্গ।* কলিকাতা : সোমা বুক এজেন্সী।

তৃতীয় অধ্যায়

Cook, L.A., & Cook, E.(1970). *Sociological Approach to Education.* New York: McGrad Hill.
Deshpande, S. (2004). *Contemporary India : A Sociological View* . New Delhi: Penguin.
রায়, স. (২০০৪). *শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শন।* কলকাতা : সোমা বুক এজেন্সী।

চতুর্থ অধ্যায়

Naik, J.P., & Narullah, S. (1996). *A Students History of Education in India.* New Delhi : Mc. Millan India Ltd.
Singh. R. P. (1970). *Education in Ancient and Medieval India.* Delhi : Arya Book Deput.
হালদার, গ. (১৯৮৭). শিক্ষণ প্রসঙ্গে শিক্ষার ইতিহাস, কলকাতা : ব্যানার্জী পাবলিশার্স।

পঞ্চম অধ্যায়

Aggarwal, J.C.(2010). *Landmarks in the History of Modern India Education.* New Delhi : Vikash Publishing Pvt. Ltd.

Pandey, R.S. (2008). *Indian Educational System.* Allahabad : Anubhav Publication House.

ঘোষ, র. (১৯৮৪). *আধুনিক ভারতীয় শিক্ষার রূপরেখা।* কলিকাতা : সোমা বুক এজেন্সী।

ষষ্ঠ অধ্যায়

Mukherjee, K.K. (2001). *Some Great Educators of the World.* Calcutta : Das Gupta & Co. Pvt. Ltd.

Purkait, B.K. (2004). *Great Educators.*London : New Central Book Agency.

রায়, স. (২০০৮). *শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শন।* কলকাতা : সোমা বুক এজেন্সী।

সপ্তম অধ্যায়

Skinner, C.E. (1999). *Educational Psychology.* New Delhi : Prentice Hall of India.

Vygotsky, L.S.(1999). *Educational Psychology,* Shilong. Book Seller and Distributors.

রায়, স. (১৯৯২). *শিক্ষামনোবিদ্যা।* কলকাতা : সোমা বুক এজেন্সী।

অষ্টম অধ্যায়

Hopking, K.D.(1998). *Education and Psychological Measurement and Evaluation.* Boston : Allyan and Bacon.

Kerlinger, F.N.(1978). *Foundations of Behavioural Research.* Delhi : Sujeet Publishers.

রায়, স. (২০০৮—২০০৯). *মূল্যায়ন : নীতি ও কৌশল।* কলিকাতা : সোমা বুক এজেন্সী।